সত্যেন্দ্র নাথ বসু

রচনা সঙ্কলন

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ
কলিকাতা

সত্যেন্দ্রনাথ বসু
রচনা সঙ্কলন

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ
পি-২৩, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রকাশক :
শ্রীরতনমোহন খাঁ
(কর্মসচিব)
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ
পি-২৩, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রথম প্রকাশ, ২১শে আশ্বিন, ১৩৮৭

মুদ্রাকর :
শ্রীমলয়কুমার ভট্টাচার্য
নীলাচল প্রেস
৯, এ্যান্টনী বাগান লেন
কলিকাতা-৭০০০০৯

মূল্য : ৩০·০০ (ত্রিশ) টাকা

প্রচ্ছদশিল্পী : অমরেন্দ্রলাল চৌধুরী

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

যে সমস্ত পত্র-পত্রিকা ও যাঁদের কাছ থেকে আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর রচনাবলী সংগৃহীত হয়েছে তাঁদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

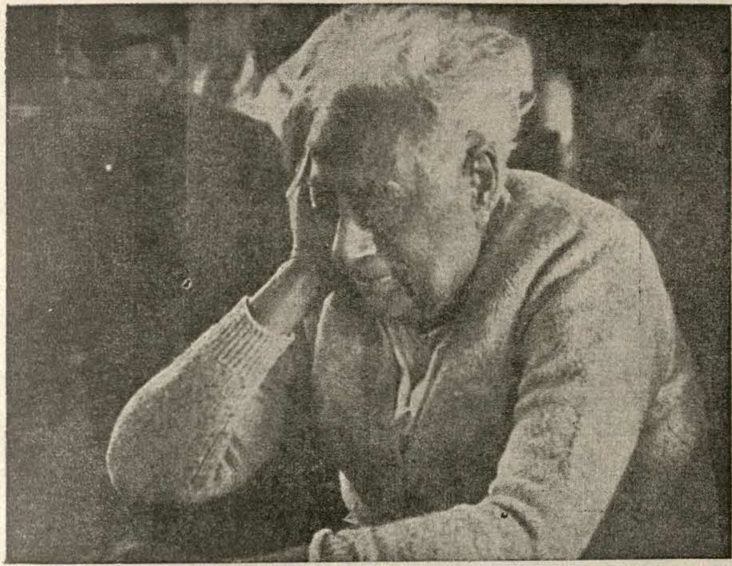
সূচীপত্র

বিষয় | পৃষ্ঠা

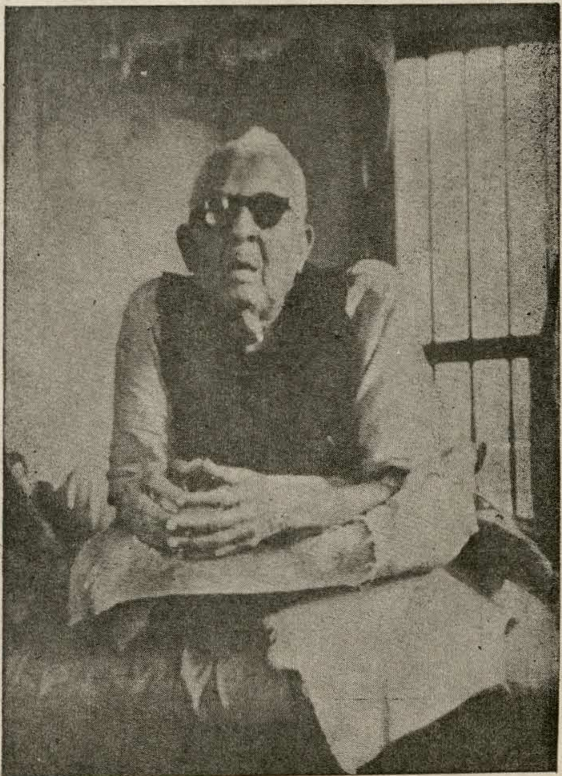
জীবনকথা :

স্মৃতিচারণ

শ্রদ্ধাঞ্জলি :



অশীতিবর্ষে সত্যেন্দ্রনাথ।



পিতা
সুরেন্দ্রনাথ।



মাতা আমোদিনী দেবী।



সহধর্মিণী ঊষাবতীর সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ।



বাঁদিক থেকে—সহায়রাম বসু, হারীতকৃষ্ণ দেব, সত্যেন্দ্রনাথ, প্রফুল্লচন্দ্র সেন, পরিমলকান্তি ঘোষ, সতীশরঞ্জন খাস্তগীর, গিরিজাপতি ভট্টাচার্য (বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের ভবনে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনকালে —১৯৬৪)।



কৈশোরের সত্যেন্দ্রনাথ।



যৌবনে সত্যেন্দ্রনাথ।



প্রৌঢ়ত্বে সত্যেন্দ্রনাথ (কোলে দুটি বিড়াল শিশু)।

প্রাক্-কথন

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর প্রথম ও প্রধান পরিচয় তিনি বিজ্ঞানী। কিন্তু বিজ্ঞানী ও বিদগ্ধ মানুষ সত্যেন্দ্রনাথের আরও একটি বিশেষ পরিচয় আছে। সে পরিচয় এদেশের বিজ্ঞানী ও মনীষীদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথকে এক অনন্য বিশিষ্টতা দান করেছে। মাতৃভাষার মাধ্যমে দেশের সর্বসাধারণের কাছে বিজ্ঞানের কথা প্রচার ও প্রসার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ শ্রেণী পর্যন্ত মাতৃভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষার জন্যে তাঁর ঐকান্তিক ও নিরলস প্রয়াসের মধ্যেই সে পরিচয় পরিস্ফুট।

ছাত্রাবস্থা থেকেই সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন বাংলা সাহিত্যের গভীর অনুরাগী এবং সাহিত্য-চর্চায় আগ্রহী। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ে সত্যেন্দ্রনাথের রচনা শুধু যে প্রকাশভঙ্গীতে সহজ ও প্রাঞ্জল তা নয়, তাঁর লেখার মধ্যে যথেষ্ট সাহিত্যিক মুনসিয়ানার পরিচয়ও পাওয়া যায়। এই সঙ্কলনে অন্তর্ভূক্ত রচনাগুলি পড়লে মনে হবে না এগুলি নীরস বিজ্ঞান-আলোচনা, মনে হবে যেন কোন দক্ষ সাহিত্যিকের রসোত্তীর্ণ রচনা পড়ছি। কিশোর বয়সেই তাঁর বাংলা ভাষায় যথেষ্ট দখল ছিল এবং পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রমথ চৌধুরী, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সংস্পর্শে এসে তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। সুহৃদ হারীতকৃষ্ণদেবের সাহচর্যে তিনি প্রমথ চৌধুরীর "সবুজ পত্র" গোষ্ঠীর সঙ্গে পরিচিত হন এবং তাঁদের বৈঠকে নিয়মিত যোগদান করতেন। প্রমথ চৌধুরী বাংলাদেশে চলতি ভাষারীতি প্রচলন করেন, তা সত্যেন্দ্রনাথকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছিল এবং তাঁর নিজস্ব বাংলা রচনায় এই রীতির প্রভূত প্রভাব দেখা যায়। পরবর্তীকালে বিষ্ণু দে, নীরেন্দ্রনাথ রায়; দিলীপকুমার রায় এবং আরো অনেক খ্যাতনামা সাহিত্যিক ছিলেন তাঁর বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু। চলিত ভাষার প্রসাদগুণে এবং বক্তব্যের স্বচ্ছতায় জটিল বৈজ্ঞানিক আলোচনাও যে কত প্রাঞ্জল হতে পারে, তা সত্যেন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত বাংলা বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ "বিজ্ঞানের সংকট" (পরিচয়, শ্রাবণ ১৩৩৮) পড়লে হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

সত্যেন্দ্রনাথের রচনার পরিমাণ যদিও খুব বেশী নয় কিন্তু তাঁর সব রচনাতেই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সুপরিস্ফুট। বিজ্ঞানীরা স্বধর্মে ভাবাবেগবর্জিত। এ কারণে তাঁদের রচনায় অযথা ভাবোচ্ছ্বাস বা চটকদার বাক্যবাহুল্য দেখা যায় না। যতটুকু কথা তাঁরা বলেন, ওজন করেই তা বলেন, দ্বিতীয়ত ধারণা যাঁর স্বচ্ছ ও অনুভূতি যাঁর গভীর, তাঁর বক্তব্য সহজ ও প্রাঞ্জল হবেই। আচার্য বসু রচিত গবেষণাপত্রে এবং সাধারণ বৈজ্ঞানিক আলোচনাতে এ দুটি গুণই দেখা যায়।

১৯৬৪ সালে আচার্য সতেন্দ্রনাথ বসুর ৭০তম জন্মোৎসবে যে কমিটি গঠিত হয় তাঁরা ১৯৭৪ সালে আচার্য বসুর ৮০তম জন্মোৎসব উপলক্ষে নানা পত্রপত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত তাঁর রচনাসমূহের একটি সংকলন প্রকাশে উদ্যোগী হন। কিন্তু নানা কারণে এই প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হয়নি। তারপর বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ ১৯৭৯ সালে আচার্য বসুর বাংলা রচনা সমূহের সঙ্কলন প্রকাশের উদ্যোগ ও দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তারই ফলে এই গ্রন্থের প্রকাশ।

আচার্য বসুর উত্তরাধিকারিগণ এই রচনা সঙ্কলন প্রকাশনার দায়িত্ব বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের উপর অর্পণ করায় আমরা বিশেষ আনন্দ ও গৌরব অনুভব করছি। এজন্য তাঁদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। অধ্যাপক গগনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় এই সঙ্কলনে 'মাস্টারমশাই' নিবন্ধটি লিখে দিয়ে আমাদের কৃতজ্ঞ-ভাজন হয়েছেন। প্রকাশনার কাজে নানাভাবে সাহায্য করেছেন সুনীল চট্টোপাধ্যায়, বীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, দীপক মুখোপাধ্যায়, সমর বসু, রমা মহিন্তা, শিশির বসু, শ্বেতা পাল, প্রদীপকুমার পাল এবং পরিষদের কর্মীবৃন্দ।

বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত আচার্য বসুর বিজ্ঞান, শিক্ষা, ভাষা, স্মৃতিকথা ইত্যাদি বিষয়ে মৌলিক ও অনূদিত রচনাসমূহ আমরা যথাসম্ভব সংগ্রহের চেষ্টা করেছি। এই সঙ্কলনে আচার্য বসুর যে রচনাগুলি পরিবেশিত হয়েছে, তাদের বিন্যাসে আমরা মূলতঃ বিষয়বস্তুর মূল বক্তব্যকে ভিত্তি করে শ্রেণীবিভাগ করেছি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই শ্রেণী বিভাগ সহজসাধ্য হয়নি। যেমন, আইনস্টাইন প্রসঙ্গে তাঁর একাধিক লেখা আছে। কোনোটি বিজ্ঞানকৃতির আলোচনা, কোনোটি স্মৃতিচারণা, কোনোটি বা গ্রন্থের ভূমিকা। কিন্তু বিষয়বস্তু হিসাবে এগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিন্যাস করা ছাড়া উপায় ছিল না। তাতে কোনো কোনো প্রবন্ধে দেখা গেছে, অন্য প্রবন্ধের কথার কিছু পুনরুক্তি আছে, তবু শিরোনাম বিচারে প্রতিটিকেই পৃথক প্রবন্ধ ধরা হয়েছে।

প্রাক্‌কথন

এই গ্রন্থ মূলতঃ তাঁর বাংলা ভাষায় লিখিত রচনা সমূহের সঙ্কলন বলে, এতে সেগুলিই সংযোজিত হয়েছে। তাঁর বৈজ্ঞানিক গবেষণাগুলি ইংরাজীতে লিখিত হওয়ায় এখানে সেগুলি সংস্থাপিত হয়নি। জীবনকথা আলোচনায় তাঁর জীবনীও বিজ্ঞানকৃতির সংক্ষিপ্ত উল্লেখই আছে। তাঁর বিজ্ঞানকৃতির আলোচনা ও মূল্যায়ন সাধারণের কাছে সহজবোধ্যও নয়। সহজ মানুষ সত্যেন্দ্রনাথ, বাংলাভাষায় বিজ্ঞানচর্চার অগ্রণী যে সত্যেন্দ্রনাথ, বাঙালীর কাছের মানুষ সেই সত্যেন্দ্রনাথের সহজবোধ্য জ্ঞান ও বিজ্ঞানচর্চাকে তুলে ধরাই এ সঙ্কলনের উদ্দেশ্য।

এই সঙ্কলনে পরিবেশিত রচনাগুলি যে যে পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, তাঁদের সকলের কাছেই আমরা কৃতজ্ঞ। ভবিষ্যতে তাঁর অন্য কোনো প্রকাশিত বা অপ্রকাশিত রচনার সংবাদ আমাদের দিয়ে কেউ যদি সাহায্য করেন, তবে পরবর্তী সংস্করণে তা সংযোজিত হতে পারে।

নানা প্রতিকূলতার জন্য আচার্য সত্যেন্দ্রনাথের মাত্র কয়েকটি আলোকচিত্র এই সঙ্কলনে দেওয়া গেছে। আরও কিছু মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য আলোকচিত্র হয়তো কোন প্রতিষ্ঠান বা কারোর ব্যক্তিগত সংগ্রহে থাকতে পারে। সেসব আলোকচিত্র বিজ্ঞান পরিষদে পাঠিয়ে কেউ যদি সাহায্য করেন আমরা সবিশেষ কৃতজ্ঞ হব।

এই সঙ্কলনে প্রকাশ করা হয়নি এমন কোনো আলোকচিত্র বা রচনা আমাদের সংগ্রহে এলে, ভবিষ্যতে এ গ্রন্থের পরিবর্ধিত একটি সংস্করণ করার পরিকল্পনা আমাদের রইল।

বাঙালী সমাজের কাছে বহু আকাঙ্ক্ষিত আচার্য বসুর এই রচনা সঙ্কলনটি বিলম্বে হলেও প্রকাশ করতে পেরে আমরা আনন্দিত। আমাদের আন্তরিক প্রযত্ন সত্ত্বেও কিছু মুদ্রণপ্রমাদ হয়তো চোখে পড়বে—তার জন্য আমরা বিশেষ দুঃখিত। তবু আশা করি, ত্রুটিবিচ্যুতি থাকলেও এই সঙ্কলন গ্রন্থটি বাংলা ভাষাভাষী পাঠক সাধারণ ও সুধীসমাজের কাছে আচার্য বসুর স্মৃতিও কৃতি হিসাবে বিশেষ সমাদৃত হবে এবং তাঁর কর্ম ও চিন্তাধারার প্রতি বৃহত্তর জনগণ আকৃষ্ট হবেন।

জীবন কথা

ঊনবিংশ শতাব্দীটি ছিল বাংলা তথা ভারতের নবজাগরণের একটি গৌরবময় যুগ। এই যুগের শেষ ভাগে অন্যতম দীপ্তিমান নক্ষত্র রূপে আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর আবির্ভাব। আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানী মহলে প্রথম সারিতে ঐ নামটি আজ পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হয়।

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী উত্তর কলিকাতার গোয়াবাগান অঞ্চলে স্কটিশ চার্চ কলেজিয়েট স্কুলের পাশে ২২নং ঈশ্বর মিল লেনে সত্যেন্দ্রনাথের জন্ম। তাঁর পরিবারের আদি নিবাস ২৪ পরগণার কাঁড়োপাড়ার সন্নিকটে বড়জাগুলিয়া গ্রামে। তবে সেগ্রামের সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের পরিবার ছিলেন দীর্ঘসম্পর্কছিন্ন। তাঁর পিতা সুরেন্দ্রনাথ বসু ছিলেন রেলওয়ের হিসাবরক্ষক এবং মাতা আমোদিনী দেবী ছিলেন আলিপুরের খ্যাতনামা ব্যবহারজীবী মতিলাল রায়চৌধুরীর কন্যা। সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন পিতার জ্যেষ্ঠ এবং একমাত্র পুত্র সন্তান। তাঁর ভাগনী ছিলেন ছটি।

সত্যেন্দ্রনাথের শিক্ষাজীবন শুরু হয় নর্মাল স্কুলে, রবীন্দ্রনাথ কিছুকাল এ স্কুলের ছাত্র ছিলেন। পরে সত্যেন্দ্রনাথ বাড়ীর সন্নিকটে নিউ ইণ্ডিয়ান স্কুলে ভর্তি হন। মেধাবী ছাত্র সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রতিযোগিতার কোন উপযুক্ত সহপাঠী না থাকায় সুরেন্দ্রনাথ এন্ট্রান্স ক্লাশে সত্যেন্দ্রনাথকে হিন্দুস্কুলে ভর্তি করে দেন। ১৯০৮ সালে এণ্ট্রান্স পরীক্ষার দুদিন আগে সত্যেন্দ্রনাথ বসন্ত রোগে আক্রান্ত হওয়ায় সে বছর পরীক্ষা দিতে পারেন নি। 'পরের বছর, ১৯০৯ সালে তিনি এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দেন ও পঞ্চম স্থান অধিকার করেন। এরপর তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে আই,এস-সি ক্লাসে ভর্তি হন। বিজ্ঞানের ছাত্র সত্যেন্দ্রনাথের সাহিত্যেও যে অসাধারণ আগ্রহ ছিল তার একটি বিবরণ তখন পাওয়া যায়। ঐ সময় ইংরেজীর অধ্যাপক হিসেবে পার্শিভালের খুব সুনাম ছিল। তিনি আই. এস.-সি-র টেস্ট পরীক্ষায় ইংরেজী রচনা বিষয়ে উত্তরপত্র গুলি পরীক্ষা করেন এবং সত্যেন্দ্রনাথের খাতায় ৬০+১০ লিখে অতিরিক্ত দশ নম্বর দেওয়ার কারণ হিসেবে মন্তব্য করেন যে, ছাত্রটি অসাধারণ, এর নিজস্ব কিছু বলার আছে। প্রেসিডেন্সী কলেজের ইংরেজীর আরেক প্রখ্যাত অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ লিখেছেন, পার্শিভাল সাহেব সত্যেন্দ্রনাথের ইংরেজী খাতা দেখে

সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে সস্নেহে আশীর্বাদ করেন। এ ধরণের ঘটনা আগেও একবার ঘটেছিল হিন্দু স্কুলে। এনট্রান্সের টেস্ট পরীক্ষায় সত্যেন্দ্রনাথ অঙ্কের সব প্রশ্নগুলির উত্তর ত করেছিলেনই, উপরন্তু জ্যামিতির প্রশ্নগুলি একাধিক উপায়ে সমাধান করে দেন। তাতে অঙ্কের শিক্ষক শ্রী উপেন্দ্রনাথ বকসী খুশি হয়ে তাঁকে ১০০-র মধ্যে ১১০ দিয়েছিলেন।

১৯১১ সালে আই এস্‌-সি, ১৯১৩ সালে বি. এস-সি (গণিতে অনার্স) এবং ১৯১৫ সালে এম. এস-সি (মিশ্রগণিতে)-এই তিনটি পরীক্ষাতেই তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। তাঁর এম, এস-সি পরীক্ষার ফল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ইতিহাসে বিস্ময়কর। এই উজ্জ্বল ছাত্র-জীবন এবং সর্ব-বিষয়ে অনায়াসসিদ্ধতা তাঁর মনীষার স্বাভাবিক প্রত্যাশিত পরিণতি। বি. এস-সি ক্লাশে সত্যেন্দ্রনাথ সতীর্থরূপে পেয়েছিলেন মেঘনাদ সাহা, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্র-নাথ মুখোপাধ্যায়, নিখিলরঞ্জন সেন, পুলিনবিহারী সরকার, শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রমুখকে। উত্তরকালে এঁরা প্রত্যেকেই বৈজ্ঞানিক গবেষণায় দিকপাল রূপে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে গেছেন। আচার্য জগদীশচন্দ্র, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, অধ্যাপক ডি. এন. মল্লিক, অধ্যাপক শ্যামাদাস মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক কালিশ (cullis) প্রমুখের ন্যায় যশস্বী শিক্ষাব্রতীদের তিনি শিক্ষকরূপে পেয়েছিলেন। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর এমন মণি-কাঞ্চন যোগ প্রেসিডেন্সী কলেজ বা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আর কখনো ঘটেনি।

ছাত্রজীবনে বিজ্ঞানের বিষয় ছাড়াও খেলাধূলা, সাহিত্য চর্চা, সঙ্গীত প্রভৃতি বিষয়ে তিনি অগ্রণী ছিলেন। ইংরেজশাসনের সেই রুদ্র মধ্যাহ্নে, প্রকৃত স্বাদেশিকতা এবং জাতীয়তাবাদেও তাঁর দীক্ষা ঘটেছিল তখনই অনুশীলন সমিতির মাধ্যমে। এই সময়ে তাঁর কলেজ জীবনের একটি উল্লেখ্য ঘটনা ঃ—হ্যারিসন নামে এক ইংরাজ অধ্যাপক দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর এক ছাত্রকে অকারণ লাঞ্ছনা ও অপমান করেন। সত্যেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে ছাত্ররা এই লাঞ্ছনার যে প্রবল প্রতিবাদ করেন তাতে সেই অধ্যাপক নতি স্বীকারে বাধ্য হয়েছিলেন। সুভাষচন্দ্র এবং ওটেন সাহেবের ঘটনার বহু পূর্বেই সত্যেন্দ্রনাথের উক্ত ঘটনাটি তাঁর অকুতোভয়তা, স্বাদেশিকতা ও বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে সে কথা খুব বেশী লোকে জানে না।

১৯১৫ সালে এম. এস-সি পরীক্ষা-উত্তীর্ণ হবার পর, সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে

ডাঃ যোগেন্দ্রনাথ বসুর কন্যা শ্রীমতী ঊষাবতী দেবীর বিবাহ হয়। এই সময় স্যার আশুতোষ তাঁর নবপ্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান কলেজে সত্যেন্দ্রনাথ, মেঘনাদ প্রমুখ সদ্যপাশকরা যুবকদের মিশ্রগণিত ও পদার্থবিদ্যা বিভাগে অধ্যাপনার জন্যে নিয়োগ করেন। ১৯২০ সাল পর্যন্ত সত্যেন্দ্রনাথ এখানে ছিলেন। এই সময়েও তাঁর নির্ভীকতার পরিচয় নানা ক্ষেত্রে পাওয়া যায়। সেই যুগে স্যার আশুতোষের মত মানুষের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন নিয়ে যখনই কোন মতপার্থক্য হয়েছে তখনই তরুণ সত্যেন্দ্রনাথ নির্ভয়ে তা প্রকাশ করেছেন।

১৯২১ সালে তিনি নবপ্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার রীডার হিসাবে যোগদান করেন। এখানে অধ্যাপনাকালেই ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর সুবিখ্যাত 'বোস সংখ্যায়ন' (Bose statistics) সম্পর্কিত গবেষণা-পত্রটি আইনস্টাইন কর্তৃক প্রশংসিত ও অনূদিত হয়ে জর্মানীর একটি বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং পরে তা' বিজ্ঞানজগতে সত্যেন্দ্রনাথের বিশিষ্ট অবদান রূপে স্বীকৃত হয় ১৯২৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তি নিয়ে তিনি দুবছরের জন্যে ইউরোপে যান। এসময় আইনস্টাইন, শিলভাঁ লেভি, হাইজেনবার্গ প্রমুখ বিজ্ঞানীদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়। লুই দ্য ব্রগ্লীর ভ্রাতা ও মাদাম কুরীর গবেষণাগারেও তিনি কিছুদিন কাজ করেন।

১৯২৭ সালে ইউরোপ থেকে ফিরে এসে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ-বিদ্যার অধ্যাপক রূপে যোগদান করেন এবং পরে বিজ্ঞান বিভাগের ডীন হন, ঢাকায় অবস্থানকালীন ১৯২৯ সালে তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের পদার্থবিদ্যা শাখার সভাপতিত্ব করেন এবং ১৯৪৪ সালে মূল সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন।

দীর্ঘ পঁচিশ বছর ঢাকায় অধ্যপনার পর তিনি পুনরায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে খয়রা অধ্যাপকরূপে যোগদান করেন এবং পরে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ডীন হন। ১৯৫৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর নেওয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'এমেরিটাস প্রফেসর' হিসেবে নিয়োগ করেন। ইতিমধ্যে ভারতসরকারের আমন্ত্রণে তিনি বিশ্ব ভারতীর উপাচার্য পদ গ্রহণ করেন। ১৯৫৬ থেকে প্রায় তিন বছর সত্যেন্দ্রনাথ এই পদে থাকার পর ভারতসরকার ১৯৫৯ সালে তাঁকে পদার্থবিদ্যার জাতীয় অধ্যাপক রূপে নিযুক্ত করেন। মৃত্যু পর্যন্ত তিনি ঐ পদেই আসীন ছিলেন।

ভারতের প্রতিনিধি হিসেবে, পৃথিবীর বিভিন্ন বিজ্ঞান সংস্থার আমন্ত্রণে তিনি বহুবার বিদেশে গেছেন। এই সূত্রে ফ্রান্স, ডেনমার্ক, সুইজারল্যাণ্ড, চেকোশ্লাভাকিয়া

প্রভৃতি দেশের জাতীয় বিজ্ঞান-সংস্থা কর্তৃক তিনি সম্বর্ধিত হন। এই সময় নীলস্ বোর, পাউলি, হাইজেনবার্গ, অটোহান প্রমুখ প্রখ্যাত বিজ্ঞানীদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার ঘটে এবং এক আন্তরিক যোগসূত্র স্থাপিত হয়। ১৯৫৫ সালে ফ্রান্সের জাতীয় গবেষণা সংসদের আমন্ত্রণে তিনি প্যারিসে যান এবং সেখান থেকে সুইজারল্যাণ্ডের বার্ণ শহরে আপেক্ষিকবাদের পঞ্চাশ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে 'আন্তর্জাতিক সম্মেলনে' যোগদান করেন। ১৯৫৮ সালে লণ্ডনের রয়াল সোসাইটির সভায়ও আমন্ত্রিত হয়ে যোগ দেন।

বৈজ্ঞানিক সম্মেলন ছাড়া বিশেষ আমন্ত্রণে তিনি সুইডেন, হাঙ্গেরী, রাশিয়া প্রভৃতি নানা দেশে বিশ্বশান্তি সংক্রান্ত সম্মেলনেও যোগ দেন। ১৯৬২ সালের আগস্টে 'হিরোসিমা নাগাসাকি দিবস' উপলক্ষে জাপানে আয়োজিত আন্তর্জাতিক 'বিজ্ঞান ও দর্শন' সম্মেলনেও যোগদান করেন এবং জাপানের শিল্প ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন কেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করেন। ১৯৬৩ সালে সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের আমন্ত্রণে কায়রোতে তিনি ভারতের বৈজ্ঞানিক প্রতিনিধি দল নিয়ে যান এবং ভারত মিশর সম্পর্কে সেখানে কয়েকটি বক্তৃতা দেন।

বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে ও আন্তর্জাতিক সম্মেলনে নানা বক্তৃতা ছাড়াও কলকাতা, রাঁচী, যাদবপুর প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ভারতীয় পরিসংখ্যান মন্দিরে সমাবর্তন উপলক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দিয়েছেন। এছাড়াও তিনি আচার্য জগদীশচন্দ্র স্মারক বক্তৃতা, মেঘনাদ সাহা স্মারক বক্তৃতা, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ স্মারক বক্তৃতা, মহেন্দ্রলাল সরকার স্মারক বক্তৃতা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য কিছু ভাষণ প্রদান করেছেন।

আইনস্টাইন ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যাঁর নাম যুক্ত, মাদাম কুরীর গবেষণাগারে যাঁর শিক্ষানবিশী, প্ল্যাঙ্ক-শ্রডিংগার-হাইজেনবার্গ-হান-বোর-পাউলি-ফের্মি-ডিরাকের সঙ্গে যাঁর প্রত্যক্ষ আদান-প্রদান ও আন্তরিক সংযোগ, তাঁর কীর্তির অন্যতর স্বীকৃতি নিষ্প্রয়োজন। তবু সেই স্বীকৃতি এসেছে বারবার—এসেছে জাতীয় বিজ্ঞান সংস্থার (National Institute of Science) সদস্য ও সভাপতি নির্বাচনে, এসেছে লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটির সদস্যপদে নির্বাচনে, এসেছে 'ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটের ডক্টরেট ও নানা বিশ্ববিদ্যালয়ের (যেমন যাদবপুর, কলকাতা, এলাহাবাদ) সম্মানসূচক ডক্টরেট উপাধিপ্রদানে, এসেছে বিশ্বভারতীর 'দেশিকোত্তম'

সম্মাননায়, এসেছে পদ্মবিভূষণ উপাধিতে এবং সর্বশেষে ভারতের জাতীয় অধ্যাপক রূপে তাঁর বরণে।

তবু শ্রুতকীর্তি সত্যেন্দ্রনাথের আড়ালে ছিলেন আরেক বিচিত্র সত্যেন্দ্রনাথ। তিনি মজলিশী সত্যেন্দ্রনাথ, খেয়ালী সত্যেন্দ্রনাথ—মেঘদূতের উদাত্ত আবৃত্তিতে তিনি আত্মমগ্ন, এস্রাজের আলাপে তিনি স্বপ্নচারী, ফুল আর সঙ্গীতে তিনি আবিষ্ট, তাস-দাবা-ক্যারামে তাঁর নিপুণ দক্ষতা। আর ছিল তাঁর জনলগ্নতা। কৈশোরে হেদুয়ার আড্ডা থেকে ঢাকায় 'বারোজনা'-র আসরের মজলিশ, কলিকাতায় 'শনিবারের বৈঠক', বিচিত্রার সভা, 'সবুজ পত্র' আর 'পরিচয়'-এর দপ্তর, শিশু-কিশোরদের নানা আসর—সর্বত্রই তাঁর যে উপস্থিতি, তাও সর্বজনবিদিত। বিজ্ঞানের সতর্ক দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে, নানা ভাষা-সাহিত্য-ধর্ম-দর্শন-কলা-শিল্প ও বিবিধ মনীষার বিভিন্ন শাখাতেই ছিল তাঁর অবাধ সঞ্চরণ, প্রগাঢ় বৈদগ্ধ্য ও অবিশ্বাস্য অনায়াস-দক্ষতা।

সত্যেন্দ্রনাথের আরেক পরিচয় দেশব্রতী সত্যেন্দ্রনাথ। ইংরেজ-শাসনের সেই প্রচণ্ড দাপটের কালেই অনুশীলন সমিতির সঙ্গে ছিল তাঁর প্রত্যক্ষ সম্পর্ক, বিপ্লবীদের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ এবং এই উদ্দেশ্যেই সমাজ সেবার নানা ক্ষেত্রের সঙ্গে তাঁর সক্রিয় সংযোগ। ছাত্র জীবনেই ইংরেজ শাসকদের চোখ এড়িয়ে তিনি দিনমজুরদের জন্য নৈশ বিদ্যালয়ে (ওয়ার্কিং মেনস্ ইনস্টিটিউটে) যে শিক্ষকতা করতেন তা তো ঐ উদ্দেশ্যেই। তখন এবং পরেও অনেক বিপ্লবীকে তিনি গোপন আশ্রয় দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, জগদানন্দ, রামেন্দ্রসুন্দর, প্রমুখ মনীষীরা বাংলাভাষায় বিজ্ঞান চর্চার ধারাটিকে একদিন উদ্বোধন করেছিলেন। 'বিশ্বপরিচয়'-এর উৎসর্গ-নামায় রবীন্দ্রনাথ অনুপ্রাণিত করেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথকে বাংলাভাষায় বিজ্ঞান-চর্চায়। চিন্তায়-আচারে-মননে নির্ভেজাল 'বাঙ্গালী' সত্যেন্দ্রনাথ, মাতৃভাষায় বিজ্ঞান চর্চার স্বপ্ন দেখেছিলেন যৌবনেই। ঢাকায় থাকাকালে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'বিজ্ঞান পরিচয়' নামে পত্রিকা—সে উদ্যমকে অভিনন্দিত করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, প্রফুল্লচন্দ্র ও বিভিন্ন বিদগ্ধ গুনিজন। স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে, বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে, দুঃসাহসের সঙ্গে তিনি উচ্চতম ও জটিলতম বৈজ্ঞানিক বিষয়ের বক্তৃতা দিয়েছেন বাংলায়। নিজের সারা জীবন ধরে তিনি নিজেই প্রমাণ করে গেছেন নিজের কথা—"যাঁরা বলেন বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান হয় না, তাঁরা হয় বাংলা জানেন না, নয় বিজ্ঞান বোঝেন না"।

তাঁর অন্তরের সেই আকুতি ও আদর্শকে বাস্তবায়িত করার জন্য কলকাতায় ১৯৪৮ সালে সত্যেন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠা করেন 'বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ'; যার মূল লক্ষ্য ঃ—জনসমাজকে বিজ্ঞান সচেতন করা, জনকল্যাণে বিজ্ঞানের ব্যাপক প্রসার এবং মাতৃভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষার প্রচলন—তারই জন্য—পরিষদের মুখপত্ররূপে প্রকাশ করেন 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকা। অনেক সমালোচনা, অনেক ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ উপেক্ষা করে জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত নিরলস পরিশ্রম করেছেন মাতৃভাষায় বিজ্ঞান প্রচার ও প্রসারের জন্যে। চ্যালেঞ্জ নিয়ে, ১৯৬৩ সালের 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'-এ কেবলমাত্র মৌলিক গবেষণা নিবন্ধ দিয়ে 'রাজশেখর বসু সংখ্যা' প্রকাশ করে তিনি দেখান, বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানের মৌল গবেষণা নিবন্ধও রচনা সম্ভব।

অমায়িক, আত্ম-উদাসীন মানুষ ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ। তাঁর স্নিগ্ধ হাসি, মাধুর্য-মণ্ডিত ব্যক্তিত্ব, ছোটবড় সকলকেই আকর্ষণ করত। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় ঘটনা-স্থলে যিনি ছুটে গিয়েছেন ত্রাণকার্যে, রোগার্ত সতীর্থের সেবা করেছেন নিজের হাতে, দুঃস্থকে সাহায্য করতে যিনি ব্যাংকে ওভারড্রাফট্ কেটেছেন, সেই সত্যেন্দ্রনাথের পূর্ণপরিচয় অনেকেই জানেন না, জানার সুযোগ হয়নি, তাঁর প্রচার-বিমুখ নির্লিপ্ত চরিত্রের জন্য। তাঁর আর এক পরিচয় প্রগাঢ় ছাত্রদরদী অধ্যাপক রূপে। ছাত্রদের তিনি যে কি চোখে দেখতেন, কত ভালবাসতেন সেকথা পরের প্রবন্ধ "মাষ্টার মশাই"-এর মধ্যে কিছুটা বিবৃত।

আইনস্টাইন, ডিরাক, হাইজেনবার্গ প্রমুখ বিশ্ববন্দিত বিজ্ঞানীরা ছাড়াও সত্যেন্দ্র-নাথের গুণমুগ্ধজন অগণন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বিশ্বপরিচয়' এবং অন্নদাশংকর তাঁর 'জাপানে' গ্রন্থটি তাঁকে উৎসর্গ করেন। কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বন্ধু সত্যেন্দ্রনাথের নামে উৎসর্গ করেছেন 'অর্কেস্ট্রা' কাব্যগ্রন্থ। নানা বিচিত্র সুরের ছন্দোবদ্ধ সমন্বয়ে যে মিলিত সুর-সংহতি—তাইই অর্কেস্ট্রার ঐকতান। সত্যেন্দ্রনাথের সমগ্র জীবনও ছিল অর্কেস্ট্রার মতোই নানা বিচিত্র সুরের একটি বিশেষ সুষম সমন্বয়।

১৯৭৪ সালে তাঁর অশীতিতম জন্মবার্ষিকী এবং তাঁর আবিষ্কৃত 'বসু-সংখ্যায়ন'-এর পঞ্চাশ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে কলকাতা সহ ভারতের বিভিন্ন স্থানে সারাবর্ষব্যাপী জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক আলোচনা চক্রের আয়োজন হয়। দেশ-বিদেশের বিজ্ঞানীরা যখন তাঁর বৈজ্ঞানিক অবদানের নানা দিক নিয়ে আলোচনা করছেন—সেই সময়ই—১৯৭৪ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী তাঁর ঈশ্বর মিল লেনের বাস ভবনে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

মাস্টার মশাই

গগনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়

অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর রচনাগুলি পড়ার সাথে সাথে তাঁর পরিবেশ ও তাঁর ব্যক্তিত্ব স্মরণ করলে বোধহয় ভাল হয়। সাধারণ বাঙালীসমাজ সশ্রদ্ধভাবে তাঁর নাম করে 'সত্যেন বোস'। বিদেশীদের কাছে তিনি ছিলেন শুধু 'বোস'। তাঁরই নামে বহু মৌলিক কণার নাম 'বোসন' (Boson)। বিজ্ঞান কলেজের ছাত্রদের কাছে তিনি ছিলেন পরম প্রিয় 'মাস্টারমশায়', কখন কখনও 'নীচের মাস্টার-মশায়'।* এই প্রবন্ধে অধ্যাপক বসুকে 'মাস্টার মশায়'-ই বলা হবে।

২২ নং ঈশ্বর মিল লেনের যে বাড়িটিতে তিনি 'জাতীয় অধ্যাপক' থাকা কালে বাস করেছেন (অন্য সময়ও করেছেন) সেই বাড়িতেই তাঁর জন্ম। পরমপূজনীয়া আমোদিনী দেবী তাঁর মা। বহুগুণসম্পন্না প্রত্যুৎপন্নমতি এই মহিলার পুত্রের জন্য গর্বের অবধি ছিল না। শোনা যায় তিনি বলতেন "সত্যেনের মত না হলে আর আমি পুত্র চাই না।" তবু ত ছেলের সব কৃতিত্ব, সব যশ, সব সম্মান তিনি দেখে যেতে পারেন নি। ১৯০৯ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

পিতা সুরেন্দ্রনাথ কিন্তু দীর্ঘদিন জীবিত ছিলেন। পুত্রের সপ্ততিতম জন্মদিনে সমস্ত কলিকাতা সহর মহাজাতি সদনে উৎসব করল, তারপর মাস্টার মশাই গেলেন দিল্লী, সেখানেও তাঁকে নিয়ে উৎসব—এদিকে কলিকাতাতেও তাঁর গবেষণা ও তাঁর জীবন নিয়ে বক্তৃতাদি হতে থাকল—এ সমস্তই পূজনীয় সুরেন্দ্রনাথ দেখে গেছেন। কোনও কোনও জীবনীকার লিখেছেন যে, পিতার সঙ্গে পুত্রের খুব বেশী আকৃতিগত সাদৃশ্য ছিল। কিন্তু সাদৃশ্যটা কি শুধু আকৃতিগতই ছিল ? অদ্ভুত ধীশক্তি, সর্ববিষয়ে উৎসাহ প্রভৃতি গুণ পুত্র কার কাছে পেয়েছেন ? সুরেন্দ্রনাথও অঙ্কে খুবই দক্ষ ছিলেন। দুর্ভাগ্য এই যে, অল্পবয়সে তাঁর পিতার মৃত্যু হয় এবং সুরেন্দ্রনাথ চাকুরি

---

*এই 'নীচের মাস্টারমশায়' কথাটির পেছনের কথা এই যে, ফলিত গণিতের অধ্যাপক নিখিলরঞ্জন সেনও ছিলেন ছাত্রদের কাছে মাস্টার মশাই ; তাঁর বসার ঘর বিজ্ঞান কলেজের উপর তলায় বলে, তিনি ছিলেন 'উপরের মাস্টার মশাই'।

নিতে বাধ্য হন। চাকুরি করতে করতেও কিন্তু বহু বিষয়ে তাঁর উৎসাহ ছিল অনলস। Indian Chemical and Pharmaceutical works যাঁরা স্থাপন করেন, তাঁদের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন অন্যতম। 'গীতা' ও 'যোগ বাশিষ্ঠে' সুরেন্দ্র নাথের যেমন বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল, তেমনি হেগেল ও মার্কস-এর বহু রচনাও তিনি মনোযোগ দিয়ে পড়েছিলেন। এই পিতারই পুত্র আমাদের মাস্টারমশায়।

মাস্টারমশায় সম্বন্ধে এই কথাটি প্রায় সকলেই জানেন যে, ১৯২৪ সালে মাস্টার-মশায়ের একটি লেখা আইনস্টাইন নিজে জার্মান ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশ করেন ও তৎসহ লেখাটির মৌলিকতার প্রশংসাও মুদ্রিত করেন। এইটিই মাস্টারমশায়েয় সুবি-দিত 'বোস সংখ্যায়ন' (Bose statistics)। তবে এই ধারণা যেন কারো মনে না হয় যে, আইনস্টাইনের তত্ত্বাবধানে গবেষণা করে মাস্টারমশাই এই কাজটি করেন; মাস্টারমশায়ের এই চিন্তাধারা অবলম্বন করে আইনস্টাইন কিছু গবেষণা করেন। কিন্তু কথাটা হয়ত সকলের জানা নেই যে, উক্ত প্রবন্ধটির পর মাস্টারমশায় আরো একটি প্রবন্ধ লেখেন—সেটি কিন্তু আইনস্টাইনের অনুমোদন লাভ করেনি। এই বিষয়ে প্রভূত আলোচনার স্থান আছে। কিছুদিন আগে শুধু এই একটিমাত্র প্রবন্ধকে কেন্দ্র করে সারাদিনব্যাপী একটি বিশেষ আলোচনা চক্র বসেছিল।*

এই সবের দীর্ঘদিন পরে গবেষণার ক্ষেত্রে মাস্টারমশাই আবার আইনস্টাইনের মুখোমুখি হন। আইনস্টাইনকৃত অখণ্ডক্ষেত্র তত্ত্বের ৬৪ টি সমীকরণ নিয়ে পৃথিবীর সবাই যখন হিমসিম খাচ্ছেন, সেই সময় এইগুলির সুন্দর সমাধান মাস্টারমশায় করেদেন। এই সমাধান দেখে আইনস্টাইন মাস্টারমশায়কে চিঠি লেখেন যে, তিনি (মাস্টারমশায়) বিষয়টিতে মনোযোগ দিয়েছেন দেখে আইনস্টাইন খুব আনন্দিত হয়েছেন। কিন্তু সমাধানটি সম্বন্ধে আইনস্টাইনের কিছু সমালোচনা ছিল। সমালোচনাটি মাস্টারমশায়ের ভাষায় বলাই ভাল—"বুঝলি—সাহেব বলছে যে তুমি চাল আর ডাল আলাদা করেছ কেন—দুটিকে মিশিয়ে পুরোপুরি খিচুড়ি করতে হবে।" মাস্টার মশায় ৬৪-টি সমীকরণকে ৪০ ও ২৪ দুই ভাগে ভেঙ্গে নেন, তাই এই উক্তি। এরপর কাউফ্ম্যানের সঙ্গে আইনস্টাইন ঐ সমাধান নিয়ে প্রবন্ধ

---

* Proceedings of International Symposium on Thermodynamic Equilibrium in Radiation Field, held on Dec. 16, 1974 (Satyendranath Bose Institute of Physical sciences, University of Calcutta, দ্রষ্টব্য)

লেখেন—ঐ খিচুড়ির চেষ্টায়। কিন্তু চাল-ডাল আলাদা করে মাস্টারমশায় যে খেলা দেখিয়েছেন, তা থেকেই ওই প্রবন্ধের প্রেরণা। চাল, ডালই হোক বা অন্যান্যদের ঐ সমীকরণ সম্বন্ধে চেষ্টা যাইই হোক, আর আইনস্টাইনও যাইই বলে থাকুন মাস্টারমশায়ের ঐ সমীকরণ-প্রস্তাবই কিন্তু পরবর্তীকালে অন্যান্য বহু কর্মীকে উচ্চতর গবেষণায় প্রেরণা দিয়েছে।

আইনস্টাইনের প্রশংসালাভই মাস্টারমশাইয়ের জীবনের একমাত্র কীর্তি নয়। কার প্রশংসা তিনি লাভ করেন নি? বিজ্ঞানের নানা বিচিত্রক্ষেত্রে নানা সময়ে তিনি যে স্বচ্ছন্দে ও অবাধে বিচরণ করেছেন, তাতে বিস্ময় লাগে! আধুনিক বিজ্ঞানের নানা শাখার জটিলতা একটি মানুষের পক্ষে এমন ভাবে আয়ত্ব করা কি সম্ভব? সংখ্যায়নের গবেষণায় অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, উচ্চ-বায়ুমণ্ডলের গবেষণায় অধ্যাপক সতীশরঞ্জন খাস্তগীর ইত্যাদি কোন্‌জন না মাস্টারমশায়ের কাজ দেখে বিস্মিত হয়েছেন? মাস্টার মশায়ের গবেষণা শুধু তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যায় নয়। পঞ্চম দশকে কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজে বসে তিনি নিজের হাতে ও নিজের তত্ত্বাবধানে একটি যন্ত্র তৈরি করেন। (এই যন্ত্রটি নিয়ে টেবিলের উপর উঠে বসে তাঁকে কাজ করতে দেখেছি—দৃশ্যটা ছবি তুলে রাখার মত)। তাঁর ছাত্র হর্ষনারায়ণ বসু ও অন্যান্যেরা এই যন্ত্রটির নাম দেন Scanning Spectro Photometer"। পরে খড়্গপুরস্থ ভারতীয় প্রযুক্তিবিদ্যা প্রতিষ্ঠানে (I.I.T. Kharagpur) পড়াতে পড়াতে হর্ষনারায়ণ যখন কিছুদিনের জন্য ইংল্যাণ্ডে যান, তখন সেখানকার কয়েকজন পাশ্চাত্য বিজ্ঞানী তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, এই যন্ত্রের উদ্ভাবক 'বোস'—কে? তাঁরা শুনে আশ্চর্য হন যে, বসু-সংখ্যায়নের 'বোস' এবং এই যন্ত্রের নির্মাতা 'বোস' একই লোক। বিজ্ঞানের কত দিকে যে মাস্টারমশায়ের দান তার আংশিক তালিকা [আংশিক কারণ সব গবেষণা তিনি ছাপাননি—তাঁর যাদুর চৌকির (Magic square) কাজ আমাদের সামনেই কোথায় ভেসে গেল!] হল: সংখ্যায়ন, কণাবিদ্যা, আপেক্ষিকবাদ, বর্ণালী, এক্‌স্ রশ্মি, বলবিদ্যা, জৈবরসায়ন, অখণ্ড ক্ষেত্রতত্ত্ব, উচ্চবায়ুমণ্ডল। জানি না এতেও তাঁর কাজের তালিকার কতটা হল! বিজ্ঞানের গবেষণায় মাস্টার মশায় যেখানে অন্ধকার দেখেছেন, সেখানেই আলোকপাত করে সেখান থেকে সরে গেছেন—আবার অন্যদিকে তাকিয়েছেন—অন্য কোথাও অন্ধকার দেখলে সেইদিকে এগিয়ে গেছেন। স্বকৃত আলোকিত স্থানে দীর্ঘদিন দাঁড়িয়ে থেকে নিজেকে দৃশ্যমান করে তোলেন নি। স্বকৃত

আলোকিত স্থানে সাধারণত বিখ্যাত বিজ্ঞানীরা কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকেন এবং সেই দিকে ভাল ভাল কর্মীর দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেন—এতে অবশ্যই অধীত বিষয়টি লাভবান হয় এবং আবিষ্কর্তার নামও ছড়িয়ে পড়ে। ঠিক এই কাজটি মাস্টারমশায় করেন নি। তাঁর ভাবটা ছিল 'আলোকিত স্থানে যার ইচ্ছা এসে দাঁড়াও—আমার কৌতূহল মিটে গেছে।' আলোকিতস্থানে দাঁড়ানটা যে আসল কথা নয়, প্রথম আবিষ্কারটাই যে আসল কথা অনেক বিজ্ঞানী তা ভুলে যান। এবং সেইজন্য কারো কারো মুখে শুনি, "সত্যেন বোস কিছু করেন নি।" ফলে মাস্টার-মশাইয়ের যতটা সুনাম প্রাপ্য ছিল তা তিনি পাননি। তিনি এফ, আর, এস. (F.R.S.) হয়েছেন ১৯৫০ এরও ঢের পরে—১৯৫৮ সালে।

এইত গেল বিজ্ঞানের কথা। কিন্তু মাস্টার মশায়ের কথা বলতে গেলে শুধু বিজ্ঞানের কথা বললেই বলা কিছুই হয় না। তিনি শুধু বিজ্ঞানাচার্য ছিলেন না, তিনি ছিলেন জ্ঞানাচার্য। ঐতিহাসিকদের সঙ্গে যখন তিনি কথা বলতেন তখন অনেক সময় এমন কথা সব বলতেন যা ঐতিহাসিকদের জানা নেই। জীব-বিজ্ঞানের লোকেরাও তাঁর কাছে যাতায়াত করতেন। ইন্‌জিনিয়ারদের তো তিনি যথেষ্ট নতুন চিন্তাধারাই দান করেছেন। সাহিত্যিকদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ এবং সাহিত্যের বৈঠকে বসা তো তাঁর চিরদিনের অভ্যাস। সাহিত্যজগৎ থেকে তিনি প্রশংসা ও পুরস্কার পেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ মাস্টার মশায়কে কি দৃষ্টিতে দেখতেন সেকথা পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের 'বিশ্বপরিচয়' বইখানিতে।

কিন্তু এই সমস্ত গুণকেও ছাপিয়ে ওঠে তাঁর উদার মন—তাঁর বন্ধু প্রীতি,—সকলের প্রতি তাঁর সহানুভূতি ও ভালবাসা। তাঁর দরজা সর্বদা সকলের জন্য খোলা ছিল। এই জন্যই তিনি 'আড্ডাবাজ' খ্যাতি লাভ করেছেন। কিন্তু কি মূল্য-বান ছিল এই আড্ডাগুলি। ঢাকায় ছিল 'বারোজনা', কলকাতায় জীবনের শেষের দিকে ছিল 'শনিবারের বৈঠক'। কত গুণিজন উপস্থিত থাকতেন তাঁর এই মজলিসে—এইসব কথাবার্তার মধ্যে পাওয়া চিন্তাধারা, নানা প্রকারের সংবাদ ও তথ্য সমস্তই জমা পড়েছে দেশের বিস্তৃত জ্ঞানভাণ্ডারে। তার সুফল কিভাবে ফলেছে তা এককভাবে প্রকট না হলেও জাতির সামগ্রিক প্রগতিতে মাস্টার মশায়ের উদারতা ও দেশ প্রীতি এই ভাবে সমাজকে অনেক কিছু দান করেছে সবার অজ্ঞাতে।

ছাত্রদের সঙ্গে বড়ই প্রীতির সম্পর্ক ছিল তাঁর। এ বিষয় লেখা কম আছে, তাই শোনাকথার উপর ও অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে কিছু লিখছি। বিজ্ঞান

কলেজে গবেষণায় রত ছাত্রদের তিনি যে কি ভালবাসতেন, তা লিখে প্রকাশ করা শক্ত। যেদিনের ঘটনা লিখছি সেদিন গবেষণার কোনো মূল্যই ছিলনা অর্থাৎ বাজারদর ছিলনা, না ঘরে—না বাইরে। স্বেচ্ছায় দারিদ্র্য বরণ করে বা নাম মাত্র বৃত্তি নিয়ে অল্প কজন গবেষণা করত। মাস্টার মশাই এদের বিকালবেলা কিছু খাওয়ানর ভার স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছিলেন। (নিজের পকেটের কথা কোন দিনই তিনি চিন্তা করেননি—বস্তুতঃ জাতীয় অধ্যাপক পদটি না পেলে শেষের কিছুদিন তাঁর সংসার চলত কিভাবে বলা শক্ত।) এই সুযোগে সব গবেষকের সঙ্গে তাঁর জানাশুনা হত। কে কোন বিষয়ে কি গবেষণা করছে ও বর্তমানে কি ভাবছে—তার বিস্তৃত খবর তিনি ভালভাবেই জানতেন। গবেষকদের কার মনের গঠন কি রকম, কে পড়ে বেশী—ভাবে কম, কে ভাল বোঝাতে পারে ইত্যাদি সমস্তই মাস্টার মশাই জানতেন। এতে গবেষকরা এবং তাঁদের পথপ্রদর্শকরা উপকৃত হতেন। গবেষকদের কাছে একটা মনোভাব তিনি বারবার তুলে ধরেছেন। সেটা এই ঃ—'অমুক বলেছেন' এর উপর ভিত্তি করে কিছু করবে না—তা সেই 'অমুক' যত বড় বিজ্ঞানীই হন—যাঁরা তত্ত্বীয় গবেষণা করেন তাঁদের অনেকেই আজ মানেন যে 'নিজে করে দেখবে' এই কথাটা অবশ্যই মেনে চলতে হবে। এর মধ্যে দিয়ে শুধু অন্যের কথা যাচাই করা হয় না—করার পেছনে যে চিন্তাটা আছে সেটা অনেক সময় পরিষ্কার হয় ও নতুন পথের আভাস বয়ে আনে।

কিন্তু ছাত্রদের সঙ্গে মাস্টার মশায়ের সম্পর্ক শুধু ঐ গবেষকদের নিয়ে শেষ নয়। যারা আরো অল্প বয়স্ক, যাদের মধ্যে দুষ্টু ছেলেও কিছু আছে—তারাও মাস্টার মশায়ের স্নেহধন্য। এই ছাত্রদের মধ্যে এক শ্রেণী আছে যারা পরীক্ষা পিছাতে চায়—অনশন ধর্মঘট করতে চায়। এই ধর্মঘটের কথাই প্রথম লিখি ঃ ঢাকায় ছাত্রাবাসে অনশন ধর্মঘট—মাস্টার মশায় তার মধ্যে গিয়ে উপস্থিত। "ও খাওয়া হবে না, চল্ ক্যারাম খেলি।" অনেকক্ষণ ক্যারাম খেলা চল্‌ল। তার মাঝে কথা-বার্তা, হাস্য-পরিহাস এমনভাবে চল্ল যেন কিছুই ঘটেনি। ছাত্রদের মধ্যে অনশনের তেজ এতে কিছু মন্দা হল। এমন সময় মাস্টার মশায় বলে বসলেন, "আমার খিদে পেয়েছে রে—চ, তোরাও খাবি চ আমার বাড়ি।" অর্থাৎ অনশন ত ছাত্রাবাসে, মাস্টার মশায়ের বাড়িতে তো নয়। ছাত্ররা জানে এতগুলি ছাত্রকে মাস্টার মশায়ের বাড়িতে খাওয়াতে বাড়ির লোকের কি কষ্ট হবে—অথচ মাস্টারমশাই বলছেন 'খিদে পেয়েছে'। এরপর আর কি অনশন ধর্মঘট থাকে?

হোস্টেলেই রান্নার ব্যবস্থা খুব শীঘ্র হয়ে গেল। এইভাবে মাস্টারমশাই ধর্মঘটের কথা ছেলেদের ভুলিয়ে দিলেন। এইবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যক্ষ থাকাকালীন এম. এ, এম. এস্-সি, ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা পেছোনর ব্যাপার বলি ঃ এখানে ঘটনাটি ছোট এবং মূল কথা—সংকল্পে দৃঢ়তা। ছাত্রদের সঙ্গে কথাবার্তা আরম্ভ হয়েছিল এইভাবে ঃ যেই ছাত্ররা মুখ দিয়ে বার করল পরীক্ষা পিছোনার কথা, বল্লেন "কেন তোদের কারো বিয়ে নাকি"—তারপর সংলাপের মধ্যে আছে "নাঃ বিয়ের নেমন্তন্ন নয় অথচ পরীক্ষা পিছিয়ে দেব—সে কেমন কথা।" হাস্য পরিহাস, যুক্তিতর্ক অনেক কিছু চলল। সবের মধ্যেও মাস্টারমশায় অনড় রইলেন দৃঢ় সংকল্পে এবং ছাত্রদের শেষ পর্যন্ত পরীক্ষা পেছোনর দাবী প্রত্যাহার করতে হয়েছিল তাঁর স্নেহময় মনের জোরে।

উপরের অনুচ্ছেদে যার আভাস পাই, মাস্টারমশায়ের মধ্যে সেই জিনিসটি বিশেষ ভাবে ছিল—দৃঢ় সংকল্প ও উচ্চ আদর্শকে হাস্য পরিহাসের আড়ালে লুকিয়ে রাখা। এর সঙ্গে বহু বিষয়ে উৎসাহ যুক্ত হয়ে তাঁর ব্যক্তিত্বকে অত্যন্ত আকর্ষণীয় করে তুলেছিল। বহুদিকে তাঁর নজরের পরিচয় তাঁর বাংলা লেখার সঙ্কলনের মধ্যেই পাওয়া যাবে। একদিকে তিনি লিখেছেন "বিজ্ঞানের সংকট" অন্যদিকে আচার্য রামেন্দ্রসুন্দরের কথা—আবার বাংলার শিক্ষা সমস্যা ও স্যার আশুতোষের কথাও আছে। কিন্তু এই বহুমুখী বিষয়-বৈচিত্র্যের মধ্যে বিজ্ঞানের স্থান তাঁর মনে ছিল খুব উঁচুতে—সেই বিজ্ঞান মাতৃভাষার মাধ্যমে জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার আদর্শ নিয়েই তিনি বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৪৮ সাল থেকে মৃত্যুকাল ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত তিনিই ছিলেন বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি ও মূল কর্ণধার। মাস্টারমশায়ের তিরোধানের পর তাঁর গবেষণার ধারাটি বহমান রাখার জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 'এস, এন, বোস ইনস্টিটিউট অফ ফিজিক্যাল সায়েন্সেস' নামে একটি গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছেন।

পরিণত বয়সে মাস্টারমশায়ের লোকান্তর ঘটেছে। সেদিক দিয়ে শোক করার সঙ্গত কারণ নেই। অনেক মহাজীবন প্রসঙ্গে একটি কথা উল্লিখিত হয়ে থাকে ঃ "আমার জীবনই, আমার বাণী"। মাস্টারমশায়ের জীবনও ওই কথার ব্যতিক্রম নয়। তাঁর দীর্ঘ জীবনচর্যার মধ্যে, তাঁর অবদান, তাঁর সৃষ্টিমূলক নানা চিন্তা বিকীর্ণ হয়ে আছে। সেই সবের যোগ্য সমাদর এবং তা বাস্তবায়িত করার আন্তরিক প্রয়াসের মাধ্যমেই তাঁর প্রতি দেশ ও জাতির প্রকৃত শ্রদ্ধানিবেদন হবে।



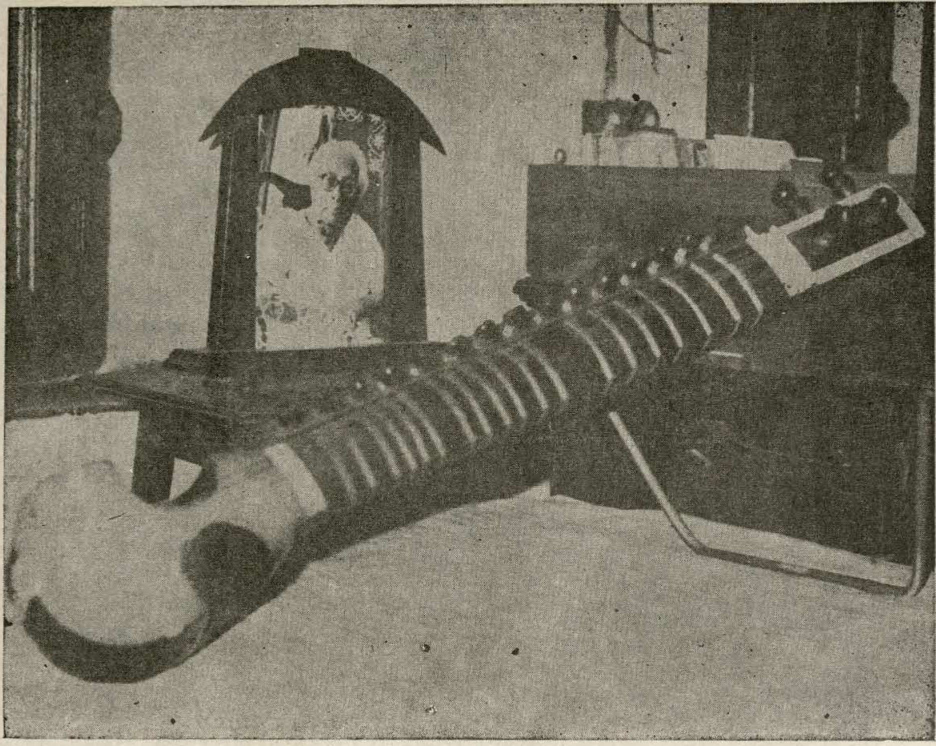
পরিবারবর্গের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ।



ডাক্তার
সত্যেন্দ্রনাথ
(বাঁ থেকে
চতুর্থ)।



বাঁদিক থেকে—
পিছনের সারি :
স্নেহময় দত্ত,
সত্যেন্দ্রনাথ,
দেবেন্দ্রমোহন বসু,
নিখিলরঞ্জন সেন,
জ্ঞানেন্দ্রনাথ
মুখোপাধ্যায়,
নগেন্দ্রচন্দ্র নাগ
সামনের সারি—
মেঘনাদ সাহা,
জগদীশচন্দ্র বসু,
জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ।



ঈশ্বর মিল লেনের
বাসভবনে সত্যেন্দ্রনাথের
পড়ার ঘর, আচার্য বসুর
প্রতিকৃতির সামনে তাঁর
প্রিয় এসরাজ।

বিজ্ঞান চিন্তা

বিজ্ঞানের সংকট

বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই পদার্থ-বিজ্ঞানের একটি নতুন যুগ আরম্ভ হয়েছে। এ যুগের বিশেষত্ব কি, তা আলোচনা করবার আগে, বিজ্ঞানের ক্রমিক পরিণতির বিষয়ে কয়েকটি কথা বলা আবশ্যক।

নিউটন থেকেই আধুনিক বিজ্ঞানের অভ্যুদয়, এ বললে অত্যুক্তি হবে না। তার আগেও আমরা বস্তু জগতের বিষয়ে অনেক জিনিস খণ্ড ও বিচ্ছিন্নভাবে জানতাম। যে জ্ঞান আমাদের নিত্যনৈমিত্যিক জীবনে কাজে আসে, শিল্পে বাণিজ্যে যে জ্ঞান মানুষের সুবিধা ও সম্পদ বৃদ্ধির জন্য কার্যকরী হতে পারে, এমন অনেক জ্ঞান প্রাচীনকাল থেকেই মানুষের জানা ছিল। কিন্তু তখন শুদ্ধ-বিজ্ঞানের নিদর্শন স্বরূপ ছিল একমাত্র গণিতশাস্ত্র। বিশেষ করে জ্যামিতি ছিল বৈজ্ঞানিকদের প্রিয় বিদ্যা। এর অনুশীলনে গ্রীক ও তাঁদের পরবর্তী বৈজ্ঞানিকেরা যে নিয়ম ও সত্যানুসন্ধানের যে রীতি অনুসরণ করেছিলেন, পরের যুগের বৈজ্ঞানিকেরা, জড় জগতের অন্যান্য বিষয়গুলিকে নিজেদের আয়ত্তে আনবার চেষ্টায়, সেই রীতি ও নিয়মসমূহই বরণ করেছিলেন। ইউক্লিড তাই এখনও পর্যন্ত সকল দেশেই পূজা ও সম্মান পাচ্ছেন। গণিতশাস্ত্রের নিয়ম-কানুন যে জড় পদার্থের গতিবিধিতে লাগানো যেতে পারে, তা নিউটনই প্রথম দেখালেন। চোখের সামনে যে বিভিন্ন জড়পদার্থের সমাবেশ দেখছি, তাদের পরস্পরের ব্যবধান এবং তাদের গতির পরিমাণ ও লক্ষ্য জানা থাকলে ভবিষ্যতে আবার তাদের কি রকম অবস্থায় ও কোথায় পাওয়া যাবে, তা আগে থেকে নির্দেশ করা যায় কি-না, এইটেই হল গতিবিজ্ঞানের অনুসন্ধান।

এই গণনা করতে নিউটনই আমাদের শেখালেন। তাঁর পরবর্তী বৈজ্ঞানিকেরা তাঁকে অনুসরণ করে দেখালেন যে, আকাশের গ্রহতারকা থেকে আরম্ভ করে আমাদের পৃথিবীর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ছোট-বড় সব জিনিসের সম্বন্ধেই এই নিয়ম খাটে এবং গণনার ফলাফল ও ভবিষ্যদ্বাণী সত্য সত্যই প্রত্যক্ষভাবে মেলে। আকাশের

কোনখানে দু'বৎসর বাদে কোন্ গ্রহের উদয় হবে, তা আজকে আঁক কষে বলা যায়। আবার কামানের গোলা ছুঁড়লে শত্রুব্যূহের মধ্যে ঠিক কোথায় গিয়ে পড়বে, তাও গণিতশাস্ত্র ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে। এই সফলতায় উৎফুল্ল হয়ে পরবর্তী বৈজ্ঞানিকেরা জড়পদার্থের অন্যান্য গুণাগুণের অনুশীলন আরম্ভ করলেন। উত্তাপ, আলোক, বিদ্যুৎ এসব কিছুই বাদ গেল না। নিউটনের পদানুসরণে পরবর্তী বৈজ্ঞানিকেরা এই সকল প্রসঙ্গের অনুসন্ধানে প্রায় একই রকম রীতির অনুবর্তন করেছেন এবং অনেকাংশে কৃতকার্য হয়েছেন।

এদিকে আবার প্রাচীনকাল থেকেই বিভিন্ন জড় পদার্থের গঠন ও উদ্ভব সম্বন্ধে গবেষণা চলছিল। এই বৈচিত্র্যময় জগতের আদি উপাদান নিরূপণ করবার জন্য অতি আদিম কাল থেকেই মানবমন ব্যগ্র ছিল। বহু দিনের অনুসন্ধানের ফলে আজ রসায়নশাস্ত্র বলতে সক্ষম হয়েছে যে, বিরানব্বইটি আদি বস্তুর বিভিন্ন সংমিশ্রণেই আমাদের নিকট প্রতীয়মান সর্বপ্রকার যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি। কাঠ পাথর থেকে আরম্ভ করে প্রাণিদেহের উপাদানসমূহ সবই ওই আদি বস্তুগুলির সংমিশ্রণে জাত। প্রমাণ-স্বরূপ রাসায়নিক তাঁর পরীক্ষাগারে রোজ রোজ নতুন নতুন জিনিস তৈরী করে দেখাচ্ছেন।

প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে যে-সব জিনিস জন্মায়—কি খনির মধ্যে, কি জীবদেহে—মানবচক্ষের অন্তরালে প্রকৃতি যে সমস্ত জিনিস তৈরী করে, তাদের উৎপত্তি আগে রহস্যময় বলে মনে হত। আজ সেগুলির বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে সকলেরই মূলে কেবল সেই কয়টি আদি বস্তুই আছে, এবং অনেক স্থলেই মৌলিক বস্তুর পুনঃ সংমিশ্রণে সেই সব জিনিস নিজের পরীক্ষাগারে তৈরী করতে মানুষ সক্ষম হয়েছে। এই বিশ্লেষণ ও সংমিশ্রণের নিয়ম খুঁজতে গিয়ে, বৈজ্ঞানিক পরমাণুবাদে উপনীত হয়েছেন। আজকের বৈজ্ঞানিকদের সিদ্ধান্ত এই যে, দৃশ্যতঃ কঠিন, তরল বা বায়বীয় সকল পদার্থই আদিতে কতকগুলি পরমাণুর সমষ্টি; পদার্থের কাঠিন্য, তারল্য ও বায়ু-স্বভাব মূলতঃ পরমাণুদের গতি ও পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ ও বিকর্ষণের ফলাফল। এই সিদ্ধান্তে নিঃসংশয়ভাবে উপনীত হবার জন্য বৈজ্ঞানিকদের দেখতে হল, যে-নিয়মে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুদের গতিবিধি চলছে, সেই নিয়ম ইন্দ্রিয়াতীত সূক্ষ্ম শরীর পরমাণুদের পক্ষেও খাটে কি-না। রাসায়নিক বিরানব্বইটি আদি বস্তু আবিষ্কার করেছেন, সে কথা আমি আগেই বলেছি। ঊনবিংশ

শতাব্দীর শেষভাগে, টমসন, রাদারফোর্ড প্রমুখ বৈজ্ঞানিকেরা গবেষণার ফলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, এই বিরানব্বইটি আদি বস্তুও আবার দুইটি মৌলিক উপাদানে গঠিত। তার একটি ধনাত্মক বিদ্যুৎকণা অর্থাৎ প্রোটন, আর একটি ঋণাত্মক বিদ্যুৎকণা অর্থাৎ ইলেকট্রন। প্রত্যেক পরমাণুরই মূল উপকরণ এই দুইটি। যে বিশ্লেষণে রাসায়নিক দেখিয়েছিলেন যে, বিভিন্ন জড়-পদার্থের মূলে বিরানব্বইটি আদি বস্তু বর্তমান, প্রায় এই রকম বিশ্লেষণ করেই আজকালকার বৈজ্ঞানিকেরা দেখিয়েছেন যে আদি বস্তুর পরমাণুর মূলে ঐ দুটি বিদ্যুতাণুর কল্পনা করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমেই এই সিদ্ধান্ত নিঃসংশয়রূপে প্রমাণিত হয়েছে। আমাদের প্রতীয়মান জগতে ঐ দুই প্রকারের বিদ্যুৎকণার পরস্পর সংযোজনে ও সংমিশ্রণে যত রকম বিভিন্নধর্মী পদার্থের উদ্ভব হয়েছে, সেই সংযোজন মিশ্রণের নিয়ম আবিষ্করণই আজকের পদার্থ বিজ্ঞানের প্রধান কাজ। এই শতাব্দীর প্রথম ভাগে রাদারফোর্ড প্রমুখ বৈজ্ঞানিকেরা নিউটনের গতিবিজ্ঞানের নিয়ম অনুসারে অনুমান করলেন যে, সৌরজগৎ যেমন সূর্যকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন কক্ষে বিভিন্নভাবে ভ্রাম্যমান গ্রহরাশির সমাবেশে গঠিত, প্রত্যেক পরমাণুর গঠনরীতিও তদ্রূপ। প্রত্যেক পরমাণুর মধ্যস্থানে বা নাভিতে একটি বিদ্যুৎকণার সমষ্টি বিদ্যমান, যার গঠনের মধ্যে ধনাত্মক কণার সংখ্যাই বেশী। এরি চতুর্দিকে বিভিন্ন কক্ষে ঋণাত্মক বিদ্যুৎকণা বা ইলেকট্রন ঘুরছে। কেন্দ্রের ধনাত্মক বিদ্যুতের যে পরিমাণ, বহিঃকক্ষে ঋণাত্মক বিদ্যুৎ সমষ্টির পরিমাণও তাই। সমগ্র পরমাণুটি তাই আমাদের স্থূল পরীক্ষায় বিদ্যুৎহীন বলেই প্রতীয়মান হয়। প্রত্যেক কণার বিদ্যুতের পরিমাণ একই, কাজেই আগে যে বিরানব্বইটি আদি বস্তুর কথা বলেছি, তাদের পরমাণু গঠনের তারতম্য বহিঃকক্ষে ইলেকট্রন সংখ্যার উপর নির্ভর করছে। সর্বাপেক্ষা গুরু ধাতুর পরমাণুর মধ্যে বিরানব্বইটি ইলেকট্রন বিরাজমান। রাদারফোর্ড-প্রমুখ বৈজ্ঞানিকেরা এই সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে অনেক কারণ দেখিয়েছেন, এবং এই গঠন প্রণালীর ফলে যে আদি বস্তুর অনেক ধর্মেরই উদ্ভব হয়েছে তার বহু সন্তোষ-জনক প্রমাণ আমরা পেয়েছি। বিদ্যুৎ ও জড়পদার্থের নিবিড় সম্বন্ধ আজকাল আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কিন্তু কি নিয়মে ইলেকট্রন ধনাত্মক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের চারদিকে ঘোরে, সে বিষয়ে আমাদের অজ্ঞতা আজও সম্পূর্ণরূপে ঘোচেনি।

উত্তাপ ও আলোকের বিষয় অনুশীলন করে বৈজ্ঞানিকরা আবার কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, যা আমাদের এস্থলে জানা দরকার। বৈজ্ঞানিকের জ্ঞানচক্ষুতে যখন দৃশ্যতঃ ঘন-কঠিন বস্তুও মূলে কয়েকটি গতিশীল অণুর সমষ্টি বলে প্রতীয়মান হল, তখন তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত করলেন যে এই চির-চঞ্চল অণুরাশির ঘাত-প্রতিঘাত ও তাদের গতিই সমস্ত উত্তাপ ও অন্যান্য বাহ্যাবস্থার কারণ-স্বরূপ ধরতে হবে। আগুনের মধ্যে একটি ধাতু-যষ্ঠির একপ্রান্ত রাখলে আগুনের বাইরে অন্য দিকও যে ক্রমে ক্রমে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এর কারণ, তাদের মতে, অনেকটা এই অগ্নিকুণ্ডের জ্বলন্ত ক্ষিপ্রতর অণুর সংঘাতে পূর্বেকার অপেক্ষাকৃত শীতল ধাতু-দণ্ডের অগ্রভাগস্থিত অণুগুলির গতি আরও চঞ্চল হয়ে উঠে ; সেই চাঞ্চল্যের বেগ ক্রমশঃ ঘাত-প্রতিঘাতে বাহির দিকে সংক্রামিত হয়। উত্তাপের পরিমাণ বস্তু-অণুদের চাঞ্চল্যের পরিমাণ নির্দেশ করে। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তাঁরা উত্তাপভেদে বস্তুর যে অবস্থাভেদ হয়, তা শুধু অণুদের গতির তারতম্য দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করতে লাগলেন। নিউটনের গতিবিজ্ঞানের নিয়মসমূহ এই ক্ষেত্রে খাটানো যায় কিনা, সে বিষয়েরও আলোচনা শুরু হল এবং তাতে তাঁরা কতকটা কৃতকার্যও হলেন। এখানে অবশ্য মনে রাখতে হবে যে, নিউটনের গতিবিজ্ঞান যে রকম করে নক্ষত্রের বিষয়ে লাগানো গিয়েছিল, ঠিক সেইভাবে সে নিয়মগুলিকে ইন্দ্রিয়াতীত পরমাণুদের বিষয়ে লাগানো একরূপ অসম্ভব। আমরা দেখেছি যে, গ্রহ ও জড়বস্তুর অবস্থানের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করতে গেলে গণনার জন্য সেই বস্তুগুলির উপস্থিত সন্নিবেশ ও গতিবিধি জানা দরকার। কিন্তু অণু সম্বন্ধে এই জ্ঞান অসম্ভব। তবুও, তা সত্বেও গতিবিজ্ঞান যে নির্দিষ্ট কিছু বলতে পারে বলে আমরা মনে করে থাকি, সেই বিশ্বাসের ভিত্তি মুখ্যতঃ এই—বহু কোটি সূক্ষ্ম অণুর সমষ্টি নিয়ে স্থূল জড়পদার্থ। জড়পদার্থের গুণাগুণ বিবেচনা করতে গেলে, প্রত্যেক সূক্ষ্ম অণুটির অবস্থানের সঠিক খবর জানা বিশেষ প্রয়োজন নয়, সাধারণ কয়েকটি আচরণ আমরা গতি-বিজ্ঞানের নিয়ম থেকেই বলতে পারি, অনেক সময় উত্তাপবিজ্ঞানের পক্ষে এইটুকুই যথেষ্ট। যেমন একটি দেশে—যেখানে কোটি কোটি লোকের বাস—প্রত্যেক লোকের জীবনের গতিবিধি সূক্ষ্মভাবে না জেনেও দেশের আর্থিক হিতাহিত ও জন্ম-মৃত্যুর গড়পড়তা হারের সম্বন্ধে একটা মোটামুটি সিদ্ধান্ত করা যায় যেটা সাধারণতঃ নির্ভর করে সে দেশের

জলবায়ুর ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপরে। এই জ্ঞান যেমন অনেক সময়েই অনেক বিষয়ে আমাদের কাজে লাগে এবং যে সকল বিষয়ে আমরা যেমন একটা হিসাবনিকাশ খাড়া করতে পারি, অণুর সমষ্টির গতিবিধির নিয়মের গণনাও অনেকটা সেই রকম।

নিউটনের গতিবিজ্ঞনের নিয়ম, জ্যামিতি অথবা অঙ্কশাস্ত্রের নিয়মকানুনের মতো অমোঘ এই বিশ্বাসের ফলেই বৈজ্ঞানিকেরা গ্রহ ও স্থূলজড়ের বিষয়ে সেই নিয়ম খাটিয়েছিলেন। গণনার সঙ্গে ঘটনার সামঞ্জস্য থেকে বৈজ্ঞানিকদের মনে প্রথমে ধারণা জন্মেছিল যে, প্রত্যেক আদর্শ বৈজ্ঞানিক নিয়মই ওই রকম অনতিক্রমনীয় ও অটল হবে। কিন্তু উত্তাপবিজ্ঞানের নিয়মের বিষয়ে সে নিশ্চয়তা যে থাকে না, তা আগেকার কয়েকটা কথা থেকেই বোঝা যাবে। পরমাণু অতিক্রম করে আজ যখন বৈজ্ঞানিকেরা ইলেকট্রন ও প্রোটনের সমষ্টি হিসাবে সমস্ত জড় জগৎকে দেখতে চাচ্ছেন, তখন এটা বোঝা শক্ত হবে না যে, আজ তারা বিদ্যুতের আদি-ধর্ম থেকে যে-সব জাগতিক নিয়মে, গণিতের সূত্র অনুসারে, উপনীত হচ্ছেন, সেগুলিকে আর জ্যামিতিক নিয়মের সঙ্গে এক পঙ্‌তিতে বসানো সম্ভব নয়। ব্যবহারিক জীবনের পক্ষে দরকারী কতকগুলি নিয়মরূপেই সেগুলিকে দেখতে হবে। জ্যামিতিক নিয়ম ও পদার্থবিজ্ঞানের অনেকগুলি নিয়মের মধ্যে তফাতের কথা পরে আরো বলার ইচ্ছা রইল।

ইলেকট্রন ও প্রোটন কিংবা গতিশীল সূক্ষ্মশরীর পরমাণুদের রঙ্গস্থল আকাশ-ক্ষেত্র। প্রথমে পরমাণুবাদীদের ধারণা ছিল যে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড়গোলকের আয়তন ও আকৃতি যেমন আমরা ভাবতে পারি, অতিক্ষুদ্র ও ইন্দ্রিয়াতীত পরমাণুদের কিংবা আরও ছোট প্রোটন বা ইলেকট্রনের আয়তন ও আকৃতিও আমরা সেইরূপে কল্পনা করতে সক্ষম। অণুতে অণুতে কিংবা পত্যেক পরমাণুর ভিতরকার বিভিন্ন বৈদ্যুতিক অংশের ব্যবধান এই সকল সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম খণ্ডগুলির আকৃতির এবং আয়তনের অনুপাতে অনেক অধিক। জগৎ বিচ্ছিন্ন কণাসমষ্টি। তাদের মধ্যে ব্যবধান ও দূরত্ব এত বেশী যে, জগতের কথা ভাবতে গেলে প্রথমেই পদার্থরিক্ত আকাশক্ষেত্রের কথা মনে পড়ে। অথচ আলোকের ধর্ম অনুশীলন করতে গিয়ে বৈজ্ঞানিকেরা দেখলেন যে, আলোককে এই আকাশপথে বহমান তরঙ্গবিশেষ বলে ভাবলে এই শাস্ত্রের অর্ধেক সমস্যার সদুত্তর মিলে যায়। ফলে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম

থেকেই এই ধারণা তাঁদের মনে বদ্ধমূল হয়ে গেল যে, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্যেপে আছে ঈথার নামে একটা বিচ্ছেদহীন, অখণ্ড পদার্থ। পরমাণু বা বিদ্যুৎকণা সেই ঈথার সমুদ্রে ভাসমান। আলোকরশ্মি এই ঈথার সমুদ্রের তরঙ্গবিশেষ। এই সমুদ্রে ছোট-বড় নানা রকমের ঢেউ উঠতে পারে, এবং সকল ঢেউ রিক্ত আকাশক্ষেত্রে সমান ক্ষিপ্রগতিতে ধাবমান। আলোর বর্ণভেদের কারণ ঢেউয়ের দৈর্ঘ্যের তারতম্য। যে-সকল ঢেউয়ের স্পন্দন আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়ে আলোকজ্ঞান উৎপাদন করে, তাদের চেয়ে অনেক বড় অনেক ও ছোট ঢেউ আজকাল বৈজ্ঞানিকেরা আবিষ্কার করছেন। ঈথারে তরঙ্গ উত্তোলন করবার রহস্যের অনেকটা আজকাল মানুষের আয়ত্তে এসেছে। আজ আকাশপথে যে বেতারে নিমেষের মধ্যে একস্থান থেকে সহস্র সহস্র যোজন দূরে মানুষের খবরাখবর যাচ্ছে, সেই কার্যে বার্তাবহ ঈথারের ঢেউ। এগুলি আলোকের ঢেউয়ের চেয়ে অনেক বড়। পক্ষান্তরে যে রঞ্জেনরশ্মি আজকাল রোগনিদানের জন্য প্রায়ই ব্যবহৃত হচ্ছে, সেগুলিও ঐ ঈথারের তরঙ্গ মাত্র। তবে সেগুলি আলোর ঢেউয়ের তুলনায় অনেক ছোট।

এক পরমাণু ও অপর পরমাণুর মধ্যে ; চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারকা ও পৃথিবীর মধ্যে অপরিমেয় ব্যবধান থাকলেও ঈথার সকলকে সংশ্লিষ্ট ও সংযুক্ত করে রেখেছে। ঈথার-তরঙ্গেই আমাদের কাছে চন্দ্র, তারা, নীহারিকা হতে আলো আসছে। এই পথেই আমরা সূর্যের কাছ থেকে উত্তাপ ও আলো পাচ্ছি। পৃথিবী যে আজ জীবনের বিচিত্র লীলায় ছন্দিত, যে শক্তির বিকাশ ও অপচয় আজ আমরা মানুষের নানা ক্রিয়াকলাপে দেখছি, সে সমস্তেরই মূলে হচ্ছে ঈথার-পথে আনীত সূর্যের কিরণ-রাজি। আলোকতরঙ্গে আনীত শক্তিকে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন জড়পদার্থ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ধরে রাখছে এবং কল্পনাতীত অতীত থেকেই এই শক্তি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সঞ্চিত আছে। ঈথার-তরঙ্গের সঙ্গে ঘাত-প্রতিঘাতে ভিন্ন ভিন্ন প্রোটন ও ইলেক-ট্রনের পরস্পর আকর্ষণ-বিকর্ষণেই যে জগতের বিভিন্ন স্থলে বিভিন্ন ধর্মী জড়ের বিকাশ হয়েছে ও তার লীলা-খেলা চলছে, এইটা আজকে পদার্থ-বিজ্ঞানের মূল কথা। আজ বিংশ শতাব্দীতে বৈজ্ঞানিক এই ঘাত-প্রতিঘাতের ও আকর্ষণ-বিকর্ষণের মূল সূত্রগুলির অনুসন্ধানে ব্যস্ত।

পূর্বে সংক্ষেপে বিজ্ঞানের যে ক্রমোন্নতির ও বিকাশের কথা বলেছি, তা নিউটন থেকে আরম্ভ করে এই বিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্যন্ত মানব-প্রতিভার

অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যেই নিউটনের অনুসরণ করে গণিতকারেরা গতিবিজ্ঞানের চূড়ান্ত সত্যগুলিতে উপনীত হয়েছিলেন, এবং জ্যোতিঃশাস্ত্রের সমস্যাগুলিকেও প্রায় সবই ঐ গতিবিজ্ঞানের সাহায্যে নিরাকরণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। ফলে তাঁদের মনে এই ধারণা জন্মেছিল যে, বৈজ্ঞানিক নিয়মগুলি নিউটনের গতিবিজ্ঞানের অনুরূপ কিংবা অনুযায়ী হওয়া উচিত। তখন নিউটনের নিয়মের যে ব্যতিক্রম হতে পারে, তা তাঁরা ভাবতেই পারতেন না। তাঁরা মনে করতেন যে, জ্যোতিষশাস্ত্রের সমস্যার যে দু-একটির উত্তর তখনো মেলেনি, তার জন্য তাঁদের গণনার অক্ষমতাই দায়ী—নিয়মগুলি কিন্তু সর্বকাল ও সর্ববিষয়েই প্রযোজ্য। ঊনবিংশ শতাব্দীতে সেই জন্যেই তাঁরা পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মকানুনগুলিকে জ্যামিতিক স্বতঃসিদ্ধ বা নিউটনের মাধ্যাকর্ষণের নিয়মের মতো ধ্রুব মনে করতেন এবং ভাবতেন, নিয়ম মাত্রই ঐ একই পর্যায়ের অন্তর্গত। ক্রমশঃ যখন পরমাণুবাদ ও ইলেকট্রনবাদের উদ্ভব হল, যখন উত্তাপবিজ্ঞানের নিয়মসমূহ আগেকার নিয়মকানুন থেকে একটু ভিন্ন পর্যায়ের বলে তাঁরা দেখতে পেলেন তখন ওই নিয়মগুলি যথার্থ কি, সে বিষয়ে চিন্তা করতে শুরু করলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে, বিশেষ করে, এই সব কথাগুলি আলোচনা করবার দরকার হল। আলোকবিজ্ঞানের চর্চা করতে করতে বৈজ্ঞানিকেরা তখন উভয়-সংকটে এসে পড়লেন। অন্য ক্ষেত্রে পরীক্ষার ফলে যে সব নিয়মের সত্যতা সম্বন্ধে তাঁরা নিঃসন্দেহ ছিলেন, আলোকশাস্ত্রে সেগুলিকে লাগাতে গিয়ে তাঁরা যে-সব সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন, সেগুলি পরীক্ষার ভুল বলে সাব্যস্ত হল। এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, নিউটনের গতিবিজ্ঞান অনুসারে আলোকতরঙ্গের সঙ্গে পরমাণুদের ঘাত-প্রতিঘাতের ফল, অঙ্ক কষে তাঁরা যা ঠিক করেছিলেন পরীক্ষায় তার-বিপরীত দেখা গেল। ফলে ১৯০০ সালে প্লাঙ্ক তাঁর বিখ্যাত Quantum Theory বা শক্তি-কণাবাদের অবতারণা করলেন। মোটামুটি বলতে গেলে ব্যাপারটি এই :

যদিও আলোকবিজ্ঞানের আগেকার পরীক্ষাগুলি আলোকের তরঙ্গবাদের পক্ষে অনুকূল ছিল, প্লাঙ্ক দেখালেন, যখন আলোকের সঙ্গে পরমাণুর সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, যার ফলে পরমাণু আলোকতরঙ্গ থেকে শক্তি গ্রহণ করতে পারে, কিংবা যার ফলে আলোক সৃষ্টি কালে পরমাণুর কার্যশক্তি ঈথারে অর্পিত হয়, তখন আর তরঙ্গবাদের দ্বারা আসল ঘটনাগুলির কারণ নির্দেশ করা যায় না। আলোক-

পথে বহমান শক্তির প্রবাহকে কেবল তরঙ্গবাদের দ্বারাই সমগ্র ও নিঃসংশয়ভাবে বোঝা গেলেও, পরমাণু ও আলোকরশ্মির মধ্যে যখন শক্তির আদান-প্রদান ঘটে তখনকার সমস্যার সদুত্তর আর তরঙ্গবাদে পাওয়া যায় না। সেই সময়ে বরং আলোক শক্তিকণার সমষ্টি এই ভাবের একটি কল্পনার দরকার হয়।

যেমন রসায়নশাস্ত্রে বিভিন্ন বস্তুর সংযোগ ও বিশ্লেষণের কথা আলোচনা করতে গিয়ে, জড়ের পরমাণুবাদের কল্পনা আমাদের করতে হয়েছিল, আলোকের উৎপত্তি ও আলোকরশ্মি থেকে জড়পদার্থের শক্তি আকর্ষণের ধর্ম বিচার করতে গিয়ে তেমনি আলোককণাবাদে উপস্থিত হতে হল। ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের আলোক ভিন্ন ভিন্ন আলোককণার সমষ্টি, এটিই Quantum Theory-র মূলকথা। আলোকের স্পন্দন-সংখ্যার উপরেই প্রত্যেক বর্ণের আলোককণার অন্তর্নিহিত শক্তির পরিমাণ নির্ভর করে, এবং জড়ের পরমাণু কিংবা ইলেকট্রন যখন আলোক থেকে শক্তি আহরণ করে তখন আলোক থেকে এই একটি আলোককণার তিরোধান ঘটে। পক্ষান্তরে, জড়পদার্থ থেকে স্বতন্ত্রভাবে শক্তি অর্জন করে এক একটি আলোককণা উদ্ভূত হয়। এই ভাবের কল্পনা নিউটনের গতিবিজ্ঞানের একেবারে পরিপন্থী। নিলস্ বর প্রমুখ বৈজ্ঞানিকেরা গত কয়েক বৎসর চেষ্টা করছেন, কি করে এই আলোককণাবাদের সঙ্গে পূর্বযুগের বিজ্ঞান শাস্ত্রের সমন্বয় সাধিত হবে।

আলোকবিজ্ঞানের উভয় সংকটের কথা মুখ্যতঃ এই ঃ আলোকের প্রবাহের বিচার করতে গিয়ে যে-সব প্রশ্ন ওঠে, সেগুলির সমাধান তরঙ্গবাদেই মিলে ; এখানে কণাবাদ অচল। পক্ষান্তরে, আলোকের উৎপত্তি ও বিনাশের বিষয় আলোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখতে পাই যে, কণাবাদই এ-ক্ষেত্রে সমস্ত প্রশ্নেরই উত্তর সুচারুরূপে দিতে সমর্থ। তরঙ্গবাদ এখানে মোটেই চলে না। গত চার-পাঁচ বৎসরের মধ্যে আবার বিদ্যুৎকণার বিষয়ে কতকগুলি নতুন তথ্য আমরা জানতে পেরেছি। তার ফলে পদার্থবিজ্ঞানের অবস্থা আরও সংকটজনক হয়ে উঠেছে। ইলেক্‌ট্রনকে যদিচ আমরা স্বল্পায়তন কণারূপে কল্পনা করে আসছিলাম, তবু টমসন-গারমার প্রমুখ কয়েকজন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, সময় বিশেষে ইলেক্‌ট্রনের স্রোতকে তরঙ্গ-ধর্মী বলে মনে হয়। আলোকতরঙ্গ যেমন সময়-বিশেষে বিচ্ছুরিত হয়ে বর্ণছত্রের সৃষ্টি করে, ইলেক্‌ট্রনের স্রোত অনেক সময়ে সেইরূপভাবে জড়পদার্থের উপর পড়ে প্রতিফলিত হয়।

এই সমস্ত আবিষ্কারের ফলে কয়েক বৎসরের মধ্যে পদার্থবিজ্ঞানে একটা বিপ্লব হয়ে গিয়েছে। জড়কণা ও আলোকতরঙ্গকে আর আগেকার মত কল্পনা করা চলবে না। যাকে এতদিন অত্যল্পায়তন, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিদ্যুৎকণা বলে ভেবে আসা যাচ্ছিল, এখন বোঝা যাচ্ছে, তার মধ্যে বিস্তৃত তরঙ্গের প্রকৃতিও কিয়ৎ-পরিমাণে বিদ্যমান। পক্ষান্তরে, আলোকতরঙ্গকে ঢেউসমষ্টি বলে কল্পনা করলে ভুল হবে। কারণ অনেক সময়ে সেটি ঠিক জড়ের মতো কণাসমষ্টিরূপেই ফলোৎপাদন করে।

এই বিপ্লবের মধ্যে বৈজ্ঞানিক নিয়মগুলিও তাদের উচ্চাসন অটল রাখতে পারছে না। নিউটনের গতিবিজ্ঞানের নিয়ম যে পরমাণু রাজ্যে অচল তার প্রচুর প্রমাণ আমরা ইতিমধ্যেই পেয়েছি। কাজেই আজ বৈজ্ঞানিক মহলে সাড়া পড়ে গিয়েছে যে, যত স্বতঃসিদ্ধ ও অনুমানের উপর বিজ্ঞানের এত বড় ইমারত খাড়া করা হয়েছে, তার ভিত্তিগুলি ভালো করে পরীক্ষিত হওয়া উচিত। নিয়মগুলির কতটা যে বৈজ্ঞানিক সত্য, কতটা বা আমাদেরই মনের বৈজ্ঞানিক কাঠামো তৈরী করার ন্যায়সঙ্গত প্রয়াস, সে বিষয়েও অনুসন্ধান চলছে। সঙ্গে সঙ্গে ব্যবধান ও সময় নির্দেশ সম্বন্ধেও গবেষণা হচ্ছে। ব্যবধান, গতি ও সময়ের পরিমাণ এই মাপজোখের উপরেই গতিবিজ্ঞান ও পদার্থবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত; আমরা যখন সেগুলিকে মাপজোখ করি তখন কি কি প্রচ্ছন্ন জিনিসকে আমরা স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নিই, তারও অনুসন্ধান চলছে। বলতে গেলে এটা হল বিজ্ঞানের আত্মপরীক্ষার যুগ। সাফল্যের উন্মাদনায় নিত্য নতুন আবিষ্কারের লালসায় ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে সমস্ত জিনিসকে বিশেষ বিচার না করেই ধরে নেওয়া হয়েছিল এখন বৈজ্ঞানিকেরা চেষ্টা করছেন সেগুলির সঙ্গে ভালো করে বোঝাপড়া করতে।

আইনস্টাইন

তিরিশ বৎসর আগে আইনস্টাইন যে প্রবন্ধে আপেক্ষিকবাদের সূচনা করেন তাহা পদার্থ বিজ্ঞানে নূতন যুগের অবতরণা করিয়াছে। জড়জগতের ঘটনা সমূহের বিবৃতি ও উহাদের মধ্যে কার্যকারণ সম্বন্ধ নির্ধারণের জন্য বৈজ্ঞানিক যে দেশ ও কালক্ষেপ রূপে প্রক্ষেপভূমির পরিকল্পনা করেন, তাহা যে দর্শক নিরপেক্ষ নয়, দ্রষ্টার গতির সঙ্গে তাঁহার পরিকল্পিত দেশ-কাল-ধর্মের যে নিকট ও নিত্য সম্বন্ধ আছে, ইহাই এই নূতন মতবাদের প্রধান কথা। এই তত্ত্বটি দার্শনিকের কাছে খুব নূতন না ঠেকিলেও ইহাকে স্বীকার করিয়াও যে পদার্থবিজ্ঞান সম্ভব হইতে পারে, এই সত্য একেবারে অনায়াসবোধ্য কিংবা স্বতঃসিদ্ধ নয়। ফলতঃ আইনস্টাইনের পূর্বে কোন বৈজ্ঞানিকই ইহা সম্ভব বলিয়া ভাবেন নাই। দ্রষ্টানির্বিশেষে যে দেশ-কালের ব্যবধানের পরিমাণ বিজ্ঞান সম্মতভাবে সম্ভব এবং ঐ পরিমিতির উপর নির্ভর করিয়া গণিতের সাহায্যে জড়বস্তুর অবস্থান ও গতি কিংবা ঘটনার অবসম্পাতের বিষয়ে ভবিষ্যদ্‌বাণী করা যাইতে পারে, এই বিশ্বাসই বিজ্ঞানের মূলে বর্তমান। কাজেই নিউটন প্রমুখ পূর্বাচার্যেরা দেশ-কালের ধর্ম ও মান ব্যক্তিনিরপেক্ষ ও স্বতঃপ্রতিষ্ঠ, এই কথা স্বীকার করিয়াই পদার্থবিজ্ঞানের সূচনা করিয়াছেন। দেশবোধের জন্য ইউক্লিডীয় জ্যামিতিই তাঁহাদের একমাত্র সম্বল ছিল। দূরত্বের মাপকাঠি যে সকল দ্রষ্টার একই, ইহা তাঁহারা নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করিতেন। গতিভঙ্গে কিংবা স্থান পরিবর্তন যে ঐ মাপকাঠির কোনো রূপান্তর হইতে পারে, ইহা তাহাদের বুদ্ধির অগোচর ছিল।

কালমান যন্ত্রের ধ্রুবত্বের বিষয়ও তাঁহারা একই প্রকারে নিঃসন্দিহান ছিলেন। মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বে ও প্রিন্সিপিয়ার গতিবিজ্ঞানে দেশকালের ব্যক্তিনিরপেক্ষতা স্বতঃসিদ্ধভাবে স্বীকৃত হইয়াছে। দ্রষ্টা বিভিন্ন হইলেও দেশ-কালের প্রক্ষেপভূমি সকলের পক্ষে একই এবং তাহার ধর্ম, দ্রষ্টার বিশেষত্বের অপেক্ষা রাখে না, এই মতবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত গণিতশাস্ত্র ও পদার্থবিজ্ঞান প্রায় দুই শত বৎসর সর্বগ্রাহ্য ছিল। যান্ত্রিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানের প্রয়োগ-ভূমি বিস্তৃত হইল এবং সর্বত্রই

ঈক্ষণ ও গণনার মধ্যে নিত্যসামঞ্জস্য আছে কি-না তাহারই নিরন্তর পরীক্ষা চলিতে লাগিল। ফলে সূক্ষ্মমানের ক্ষেত্রে পরীক্ষা ও গণনার মধ্যে যে অসঙ্গতি ধরা পড়িতে লাগিল, তাহার নিরাকরণ আর পুরাতন বিজ্ঞানের পক্ষে সম্ভব হইল না।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে আলোক তরঙ্গের উপর দ্রষ্টার গতিবৈশিষ্ট্যের কোনো প্রভাব আছে কি-না, এই বিষয়ের আলোচনা প্রসঙ্গেও তৎসম্বন্ধীয় নানাপ্রকার পরীক্ষার ফলে পুরাতন বিজ্ঞানের সহিত চাক্ষুষ অভিজ্ঞতার যে অসামঞ্জস্য সকলের কাছে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল তাহার নিরাকরণের জন্য আইনস্টাইন আপেক্ষিক মতবাদের প্রথম প্রবর্তন করেন। পূর্বে আলোকতরঙ্গ বাহক ঈথার ও তৎসম্ভূত তরঙ্গের স্পন্দন কালই বৈজ্ঞানিকের কাছে নিউটনীয় স্বতঃপ্রতিষ্ঠ দেশকালের মূর্তপ্রতীক হিসাবে গণ্য হইত। এই ধারণা যে ভ্রমাত্মক ও উহা যে আলোক-বিজ্ঞানের সমস্ত অসামঞ্জস্যের কারণ, ইহা আইনস্টাইন খুব সহজ ও সুন্দরভাবে বুঝাইলেন।

দেশকালের নিরপেক্ষবাদ ত্যাগ করিয়াও যে বিজ্ঞানশাস্ত্র সম্ভব, তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য আইনস্টাইন প্রথম প্রবন্ধে যে বিভিন্ন-গামী দ্রষ্টাদের পরিকল্পনা করিয়াছেন তাহাদের পারস্পরিক আপেক্ষিক গতির হ্রাস-বৃদ্ধি হইতেছে না, ইহা ধরিয়াই তিনি আপেক্ষিকবাদের বিচার আরম্ভ করেন। ঐ সময়ে মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবকে তিনি গণনার অন্তর্ভুক্ত করেন নাই। আলোক-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মাধ্যাকর্ষণের কোনো প্রভাবই তদবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। ফলে আপেক্ষিকবাদের প্রয়োগক্ষেত্র উপরোক্তভাবে সীমাবদ্ধ হইলেও যে বিরোধভঞ্জনের প্রয়োজন ছিল তাহা সুসাধিত হইল। অধিকন্তু ঐরূপ নূতন মতবাদের উপর যে বিজ্ঞানশাস্ত্রের ভিত্তিস্থাপন সম্ভব, সে বিষয়েও অপক্ষপাতী বৈজ্ঞানিকের মনে কোনো সন্দেহ রহিল না। আইনস্টাইন কিন্তু এই সাফল্যেই সন্তুষ্ট রহিলেন না। আরও দশ বৎসর নিরন্তর পরিশ্রমের ফলে তিনি আপেক্ষিকবাদের প্রয়োগক্ষেত্র প্রভূতভাবে বিস্তৃত করিতে সক্ষম হইলেন, সঙ্গে সঙ্গে নিউটনীয় মাধ্যাকর্ষণবাদের প্রতিদ্বন্দ্বী এক নূতন গতিশাস্ত্রের ভিত্তি তিনি স্থাপন করিলেন। আপেক্ষিকবাদ পূর্বোক্ত সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আর আবদ্ধ রহিল না। সর্বপ্রকার গতিবৈষম্যের ক্ষেত্রেও যে উহা প্রযোজ্য আইনস্টাইন তাহা দেখাইতে সক্ষম হইলেন।

নূতন গতিশাস্ত্রের সহিত নিউটনীয় মতবাদের বিভিন্নতা বুঝিতে হইলে মাধ্যা-

র্ষণবাদের কয়েকটি মূলকথা আমাদের স্মরণ করিতে হইবে। নিউটন জড়বস্তুর গতিবৈচিত্র্যের কারণ নির্দেশ করিবার জন্য মাধ্যাকর্ষণতত্ত্বের প্রচার করিয়াছিলেন। যে কোনো দুইটি জড়বস্তুর মধ্যে ব্যবধান যত বেশী হোক না কেন, নিউটনের মতে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে আকর্ষণী শক্তি বর্তমান। মাধ্যাকর্ষণ ধর্মসম্ভূত ঐ শক্তির প্রভাব দূরত্বের হ্রাস-বৃদ্ধির সহিত বিপরীত বর্গের নিয়মানুসারে বাড়ে ও কমে। তাঁহার বিজ্ঞানে কিন্তু এক বস্তু হইতে অন্যের উপর প্রভাব-প্রবর্তনের জন্য কোনো অসীম বস্তুধর্মী জড়কোষের পরিকল্পনার সুবিধা নাই। অর্থাৎ আলোকবিজ্ঞানের মত মাধ্যাকর্ষণতত্ত্ব তরঙ্গবাদের উপর অবস্থিত নয়। সর্বপ্রকারে বিযুক্ত থাকিয়াও যে জড়বস্তুরা দূর হইতে পরস্পরের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, এই কল্পনা অনেকের কাছে দুজ্ঞেয় ও রহস্যময় বলিয়া মনে হইয়াছিল। মনে হয় নিউটন নিজেও তাঁহার মতবাদকে এইদিক হইতে অসম্পূর্ণ ভাবিতেন। বিদ্যুৎবাহী জড়কণার মধ্যেও এইরূপ আকর্ষণ-শক্তির কল্পনা নিউটনের পরবর্তী বৈজ্ঞানিকেরা করিয়াছিলেন। কিন্তু ফ্যারাডে ও ম্যাক্সওয়েল পরীক্ষা ও যুক্তির সাহায্যে প্রতিপন্ন করিলেন যে এই ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার তরঙ্গাকারে এক বস্তু হইতে অন্য বস্তুতে পরিব্যাপ্ত হয়। ম্যাধ্যাকর্ষণতত্ত্বের এই দূর হইতে প্রভাব বিস্তারের কল্পনা অনেকের কাছে অসন্তোষজনক মনে হইলেও তাহার পরিবর্তে অন্য কোনো মতবাদ উত্থাপন করিতে আইনস্টাইনের পূর্বে কোনো বৈজ্ঞানিকই সক্ষম হন নাই। এদিকে গ্রহ-উপগ্রহের কক্ষরেখার বৈশিষ্ট্য ও তাহাদের গতিবিধির বৈচিত্র্য এই মতানুসারে সহজ ও সুন্দরভাবে নির্দেশিত হইল। এই তত্ত্বের অদ্ভুত সাফল্য জ্যোতিষশাস্ত্রে যুগান্তর উপস্থিত করিল। কোপার্নিকাস্ টলেমিকে নির্বাসিত করিলেন। আধুনিক জ্যোতির্বেত্তারা মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব যে সৌরমণ্ডল অতিক্রম করিয়া অতিদূরবর্তী তারা-জগতেও অক্ষুণ্ণভাবে বর্তমান তাহার পক্ষে ভূরি ভূরি প্রমাণ উপস্থাপিত করিলেন।

মনে রাখিতে হইবে মাধ্যাকর্ষণতত্ত্বানুমোদিত গতিশাস্ত্রের ভিত্তি ব্যক্তিনিরপেক্ষ দেশ-কালের পরিকল্পনার উপর নির্ভর করিতেছে। এই পরিকল্পনার পরিবর্তে আপেক্ষিকবাদের প্রচার করিতে গিয়া আইনস্টাইন দেখিলেন নিউটনীয় পরিকল্পনার স্থান তাঁহার প্রবর্তিত নূতন বিজ্ঞানে নাই। কাজেই জড়ের, গ্রহের, তারকারাজির গতিবৈচিত্র্যের ভিন্ন হেতুনির্দেশের প্রয়োজন হইল। দশ বৎসরের

সাধনার ফলে যে হেতু তিনি আবিষ্কার করিলেন, তাহা উচ্চগণিতের সাহায্য ব্যতিরেকে হৃদয়ঙ্গম করা একরূপ অসাধ্য। কিন্তু পুরাতন মাধ্যাকর্ষণের সাহায্যে যে সব প্রাকৃতিক ঘটনার হেতুনির্দেশ সম্ভবপর হইয়াছিল, তাহার প্রতেকটি এই মতবাদের সাহায্য ভিন্নভাবে বুঝাইতে তিনি সক্ষম হইলেন। ইহার জন্য আইনস্টাইন ইউক্লিডীয় জ্যামিতিকে বিসর্জন দিয়া রীমান কল্পিত দেশবোধতত্ত্বের আশ্রয় লইয়াছেন। গণিতের সাহায্যে ব্যক্ত করিতে গেলে বলিতে হইবে যে, জড়ের গতি বৈচিত্রের কারণ, দ্রষ্টার দেশকলরূপ প্রক্ষেপ ভূমির অসমতা ও বর্তুলতা।

ব্রহ্মাণ্ডের বিষয়ে পরিকল্পনা এই মতবাদে সম্পূর্ণ নূতন ও চমকপ্রদ। পুরাতন বিভানে ইউক্লিডীয় জ্যামিতিই দেশবোধের একমাত্র অবলম্বন। উক্ত মতে ব্রহ্মাণ্ডের প্রসার অসীম ও অবাধ। উহার পরিমাণের কল্পনাও অসম্ভব। আপেক্ষিক মতবাদে কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডের প্রসার অবাধ বলিয়া স্বীকৃত হইলেও উহাকে আর অসীম কিংবা অপরিমেয় বলা চলে না। দেশকালের বর্তুলতা স্বীকার করিলে আইনস্টাইনের মতানুযায়ী তাহার প্রসারের পরিমাণ করা আর অসম্ভব নয়।

জড়ের গতির ন্যায় আলোকের গতির উপর দেশকালের অসমতা ও বর্তুলতার প্রভাব আছে। কাজেই আলোকরশ্মির উপর তথাকথিত মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব আইনস্টাইনের মতবাদের একটি অপরিহার্য অঙ্গ। এই বিষয়ে তিনি গণিতের সাহায্যে যে যে ভবিষ্যদবাণী করিয়াছিলেন তাহার প্রায় সব কয়টি আজ বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষাগারে সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। প্রথম মহাযুদ্ধের মধ্যেই আইনস্টাইন তাঁহার নূতন গণনার ফল প্রকাশ করেন। সন্ধিস্থাপনের অব্যবহিত পরে ১৯১৯ সালের সূর্যগ্রহণের সময় ইংরেজ জ্যোতির্বেত্তারা এই সিদ্ধান্ত পরীক্ষা করিয়া অভ্রান্ত বলিয়া ঘোষণা করেন। আইনস্টাইনের বিশ্ববিশ্রুত খ্যাতির আরম্ভ ঐ সময় হইতেই। সাধারণ সংবাদপত্রে পর্যন্ত আইনস্টাইনের মতের আলোচনা আরম্ভ হইল। অবৈজ্ঞানিক জনসাধারণের মধ্যেও তাঁহার আপেক্ষিক তত্ত্বের স্বরূপ আলোচনা করিবার প্রবৃত্তি ও কৌতূহল জাগরূক হইল। ফলে আইনস্টাইনের নাম আজ বৈজ্ঞানিক, অবৈজ্ঞানিক সকলের কাছেই সুপরিচিত। তাঁহার জীবনী ও ব্যক্তি-স্বরূপের বিষয় জানিবার কৌতূহলের আজ অবধি নাই।

সর্বসাধারণের নিকট সুপরিচিত হইবার বহু পূর্বেই তাঁহার বহুমুখী প্রতিভা বিজ্ঞান-বিলাসীদের চমৎকৃত করিয়াছিল। তাঁহার প্রখর ও আলোক-সামান্য

অন্তর্দৃষ্টির কল্যাণে বিজ্ঞানের অনেক জটিল রহস্যের মর্ম আজ সকলের পক্ষে সহজবোধ্য হইয়া উঠিয়াছে। আলোকের শক্তিকণাবাদ, ব্রাউন আবিষ্কৃত অণুবীক্ষণীয় বস্তুকণার অবিরত আন্দোলনের বিজ্ঞানসম্মত হেতুনির্দেশ—ইত্যাদি গবেষণার প্রত্যেকটিই আধুনিক বিজ্ঞানের জয়যাত্রায় নেতৃত্ব করিতেছে। এসবের অতি পুরোভাগেই আইনস্টাইনের স্থান আজ সর্বজনস্বীকৃত।

এই অসামান্য বৈজ্ঞানিকদের ব্যক্তি-স্বরূপ বুঝিতে হইলে ইউরোপীয় মহাসমরের পর গত কয়েক বৎসরের জাতীয় ও আন্তর্জাতীয় রাজনৈতিক ক্ষেত্রের পরিস্থিতির কিছু আলোচনা প্রয়োজন। যাঁহারা মানবসভ্যতার ভবিষ্যতে আস্থাবান, জাতি-নির্বিশেষে মনুষ্যজীবন যাঁহারা অমূল্য বলিয়া বিশ্বাস করেন, বর্ণ-ধর্ম-নির্বিশেষে প্রত্যেক জাতিরই পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিবার স্বতঃসিদ্ধ অধিকার স্বীকার করিতে যাঁহারা পরান্মুখ নহেন, তাঁহারা বিগত মহাসমরের হিংস্র ও ভয়াবহ সর্বগ্রাসী মূর্তি দেখিয়া ভীত ও শঙ্কিত হইয়াছিলেন। যে দাবানলে ইউরোপীয় সভ্যতা ধ্বংস হইবার উপক্রম হইয়াছিল, ভেরসাই-এর সন্ধিতে সে দাবানল নির্বাপনের পর পুনর্বার উহা যাহাতে দ্বিগুণ তেজে প্রজ্বলিত না হয়, তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য সকল দেশের প্রকৃত মানব-প্রেমিকরা উৎসুক ও উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠেন। এই মনোভাব হইতেই আন্তর্জাতিক সমবায়ের উৎপত্তি। প্রত্যেক দেশের শিক্ষিত মানব প্রেমিকের চেষ্টাতে যে রাজনৈতিক জগতে শান্তি চিরস্থায়ী হওয়া সম্ভব—রোগ, দৈন্য, অন্ধ-জাতিবিদ্বেষ, নৃশংস সামাজিক অত্যাচার এবং কলুষতার বিরুদ্ধে সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের নিমিত্ত মানুষের সমবেত চেষ্টা, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা নিরন্তর নিয়োজিত থাকিবে, এই আশা ও ধারণা লইয়াই আইনস্টাইন জেনিভার বৈঠকে যোগদান করেন। গত কয়েক বৎসরের কাহিনী কিন্তু বড়ই নিষ্করুণ। জাত্যাভিমান, বর্বর সমর-মনোভাব, পরশ্রীকাতরতা, অত্যাচার ও সাম্রাজ্যলোলুপতার অবসানের স্বপ্ন দেখিয়া যাঁহারা জেনিভার আন্তর্জাতিক বৈঠকে এক মহামানবীয় সভ্যযুগের সূচনা বলিয়া বরণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের আজ বড়ই দুর্দিন।

বহুবর্ষব্যাপী অক্লান্ত পরিশ্রমের পর হতাশ হইয়া আইনস্টাইন ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে জেনিভার বৈঠকে পুনর্বার যোগদান করিতে অস্বীকার করেন। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে হিটলারের অভ্যুদয়ে জর্মানিতে ইহুদীবর্জন নীতি প্রচলিত হইলে তিনি নিজের মানসম্ভ্রম, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি দৃকপাত না করিয়া স্বেচ্ছায় দেশত্যাগ করেন।

স্বধর্মাবলম্বী বহু ইহুদীর ন্যায় আজ তিনি দেশত্যাগী। তাঁহার ন্যায় মন্ত্রদ্রষ্টা বিজ্ঞান সাধককেও নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ও ঘৃণার ঘূর্ণিবায়ুর মধ্যে পড়িতে হইয়াছে।

আইনস্টাইনের বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা, প্রবন্ধ ও পত্রাবলী হইতে সংকলিত হইয়া ১৯৩৩ সালে জর্মান ভাষায় Mein Weltbild বলিয়া যে পুস্তক প্রকাশিত হয়, The World As I See It তাহারই ইংরাজী অনুবাদ। বিষয়ানুসারে পুস্তকখানি পাঁচভাগে বিভক্ত, তন্মধ্যে বিজ্ঞান সম্পর্কীয় প্রবন্ধে প্রায় অর্ধাংশ পূর্ণ। বাকী প্রবন্ধগুলি তাঁহার দার্শনিক মনোভাবের এবং আধুনিক আন্তর্জাতিক, জর্মানীর ও ইহুদী সমস্যার বিষয়ে মতামতের পরিচয় দিতেছে। প্রবন্ধগুলির অধিকাংশই ভিন্ন ভিন্ন সময়ে রচিত। কাজেই বিভিন্ন আলোচনার মধ্যে মতামতের সুসঙ্গতি সব সময়ে সুস্পষ্ট না হইলেও সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত প্রত্যেক প্রবন্ধের মধ্যে লেখককে ভুল বুঝিবার অবকাশ নাই। বর্তমান রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক সংকট হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্য তিনি যে পথ নির্দেশ করিয়াছেন তাহা সকলের কাছে যুক্তিযুক্ত অমোঘ কিংবা বিচারসহ বলিয়া প্রতিপন্ন না হইতে পারে কিন্তু মানবজাতির উপর যে শ্রদ্ধা তাঁহার প্রবন্ধের মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে তাহা সকলকেই স্পর্শ ও মুগ্ধ করিবে। সমস্ত পুস্তকের মধ্যে বিজ্ঞান সম্পর্কীয় রচনা-গুলিই সর্বাপেক্ষা মূল্যবান। ইহার মধ্যে আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের বিভিন্ন সমস্যার আলোচনা, আপেক্ষিক মতবাদের ইতিহাস, বৈজ্ঞানিকের আদর্শ ও গবেষণা পদ্ধতি ইত্যাদি অনেক বিষয়ের প্রবন্ধই গভীরচিত্ত পাঠকের বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

আপেক্ষিক মতবাদের কিঞ্চিত পরিচয় ইতিপূর্বেই দেওয়া হইয়াছে। বিজ্ঞানের প্রকৃতি ও পদ্ধতির বিষয়ে আইনস্টাইনের মতামতের কিঞ্চিত বিবরণ দিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। সৃষ্টির অপার রহস্যের ভিতর আমাদের মন যে অনন্ত সৌন্দর্যের ও বিশুদ্ধ চৈতন্যের অত্যল্প ও ক্ষীণ সন্ধান পায় তাহার সমগ্র উপলব্ধি মানববুদ্ধির অতীত হইলেও নিরন্তর তাহার সাধনাই তাঁহার মতে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক মনোভাবের পরিচায়ক। ব্যক্তিত্বের সংকীর্ণ গণ্ডির বাহিরে সমস্ত জগৎকে বৈজ্ঞানিক অন্ততঃ আংশিকভাবে উপলব্ধি করিতে চায়। এইজন্যই নিজের বুদ্ধি অনুযায়ী বহির্জগতের হেতুসূত্রে যোজিত মনোমত প্রতিকৃতি গড়িয়া তুলিতে সে সর্বদাই ব্যস্ত। এইরূপে হেতুপ্রভব প্রতীকের সাহায্যেই ব্যক্তিত্বের দ্বারা

রঞ্জিত ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে অতিক্রম করিয়া সে বহির্জগতের স্বরূপ সত্যকে ধরিতে চাহে। প্রকৃতির প্রত্যেক জটিল তত্ত্বের বিশ্লেষণ মানববুদ্ধির অতীত বলিয়াই ঐ প্রতীকের রাজ্যে অপেক্ষাকৃত সরল ঘটনাসমূহের বিকলন ও পুনঃসংযোজন লইয়াই বৈজ্ঞানিককে সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। এই সংযোজন ও বিশ্লেষণ ন্যায়ানুগ ও নির্ভুল হওয়া প্রয়োজন। এইজন্যই পদার্থ-বৈজ্ঞানিককে গণিতের রীতি ও পরিভাষার আশ্রয় লইতে হয়। কাজেই অপূর্ণ হইলেও বৈজ্ঞানিকের প্রতীক-রাজ্যে অশুদ্ধতা অস্পষ্টতা বা অনিশ্চয়তার স্থান নাই। সমগ্র জাগতিক ঘটনার হেতুনির্দেশ সসীম মানববুদ্ধির অতীত রহিলেও শুধু ন্যায়সঙ্গত বিকলন-প্রথায় প্রত্যেক বাস্তব বা জৈব ঘটনার হেতুনির্দেশ যে সম্ভব, ইহা আইনস্টাইন বিশ্বাস করেন। যে সামান্য ও চিরন্তন নিয়মাবলী হইতে ন্যায়ের বিকলন পদ্ধতিতে বৈজ্ঞানিক, জগতের প্রতিকৃতি গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করেন, তাহাতে আবিষ্কারের কোন ন্যায়নির্দিষ্ট পন্থা নাই। বহির্জগতের ঘটনাবলীর সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলে উহারা আপনা হইতে বৈজ্ঞানিকের মানসপটে উদ্ভাসিত হয়। অবশ্য এই নিয়মাবলীর যুক্তিযুক্ততা ও যথার্থতা পরীক্ষা করিবার জন্য আমাদের তৎপ্রসূত ফলাফলকে অভিজ্ঞতার সহিত তুলনা করিতে হয়।

নিউটন প্রমুখ পুরাতনপন্থী বৈজ্ঞানিকেরা আইনস্টাইনের মতোই কতকগুলি প্রাথমিক স্বতঃসিদ্ধ হইতে বিকলন-প্রথায় জগতের ঘটনাবলীর হেতুনির্দেশ সম্ভব বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই এই ধারণা ছিল যে, সংকলন-ন্যায়ানুমোদিত প্রথাতেই প্রাকৃতিক বিশেষ অভিজ্ঞতা হইতে মানুষ ঐ স্বতঃসিদ্ধগুলি নিষ্কাশিত করিয়া লইতে পারে। তাঁহারা অভিজ্ঞতার সহিত স্বতঃসিদ্ধগুলি ন্যায়সূত্রে গ্রথিত বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। তাঁহারা আরও বিশ্বাস করিতেন যদৃচ্ছাক্রমে বিভিন্ন প্রকৃতির স্বতঃসিদ্ধ কল্পনা করিয়া বিশ্ব-জগতের হেতুনির্দেশে সাফল্যলাভ করা অসম্ভব।

এই মতের স্বপক্ষে উদাহরণস্বরূপ তাঁহারা ইউক্লিডীয় জ্যামিতি ও নিউটনীয় গতিশাস্ত্রের উল্লেখ করিতেন। বৈজ্ঞানিকদের উক্ত ধারণাকে আপেক্ষিকবাদ ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করিল। আপেক্ষিকবাদের স্বতঃসিদ্ধগুলি পুরাতন গতিশাস্ত্রের প্রত্যয়সমূহ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির হইলেও একই শ্রেণীর ঘটনার হেতুনির্দেশ এই মতেও সন্তোষজনকভাবে সম্ভব। কাজেই যে প্রাথমিক সংজ্ঞা

ও প্রত্যয়গুলির উপর বিজ্ঞানশাস্ত্র গড়িয়া ওঠে, মানুষের অভিজ্ঞতার সহিত সেগুলির ন্যায়গত নিত্য সম্পর্ক নাই।

এই মত কিন্তু নূতন সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে। যে প্রত্যয় ও সংজ্ঞার সংযোজনা হইতে বৈজ্ঞানিকের প্রতীক-জগৎ গড়িয়া ওঠে, তাহার সহিত মানব অভিজ্ঞতার যদি ন্যায়সঙ্গত নিত্যযোগ না থাকে, প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে স্বাধীন কল্পনা করিবার অধিকার যদি স্বীকার করা যায়, তবে কি ভাবিতে হইবে বৈজ্ঞানিকের কল্পিত জগতের প্রকৃতির সহিত বাহ্যজগতের কোনো সম্পর্কই নাই? হেতুপ্রভব প্রতীকের সাহায্যে বহির্জগতের স্বরূপ সত্তার উপলব্ধির চেষ্টা তবে কি মানবের ব্যর্থ প্রয়াস মাত্র? লোকযাত্রার উপযোগিতাই কি তবে বিজ্ঞানের শেষ কথা?

আইনস্টাইন উহা বিশ্বাস করেন না। ন্যায়ানুগত যোগসূত্র না থাকিলেও কোনো অজ্ঞেয় উপায়ে বহির্জগৎ আমাদের প্রতীক জগতের প্রত্যয় ও স্বতঃসিদ্ধ-গুলিকে অদ্বিতীয় সুনির্দিষ্ট করিতেছে, ইহাই আইনস্টাইনের দৃঢ় বিশ্বাস। সেই অদ্বিতীয় নিয়মাবলীকে আবিষ্কার করা যে মানুষের পক্ষে সম্ভব তাহাও তিনি বিশ্বাস করেন। তিনি বলেন যে বাহ্যপ্রকৃতির প্রকৃত স্বরূপ ও ঘটনার অন্তর্নিহিত নিত্যসম্পর্কসমূহকে আমরা গণিতের অপেক্ষাকৃত সরল প্রত্যয়ের অনুসারেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব। কিন্তু সেই প্রত্যয়গুলিকে শুধু ন্যায়পথে পাওয়া যাইবে না। তাহাদের আবিষ্কারের জন্য আমাদিগকে আন্তরিক অনুপ্রেরণার উপর নির্ভর করিতে হইবে। অভিজ্ঞতার ফলে যে প্রত্যয়গুলির সম্ভাব্যতার কথা আমাদের মনোমধ্যে উদিত হইবে, তাহাদের সংযোজনার ফলাফলের সহিত বাহ্য-জগতের প্রকৃতির তুলনা করিয়া বুঝিতে হইবে আমরা যথার্থ প্রত্যয়গুলির সন্ধান পাইয়াছি কি-না। শুদ্ধ প্রত্যয় অবলম্বনে গাণিতিক উপায়ে যে বিজ্ঞানশাস্ত্র আমরা রচনা করি তাহা শুদ্ধ ও অন্তর্বিরোধশূন্য। তাহাতে দ্ব্যর্থবোধের অবকাশ না থাকিলেও তাহার সহিত বহির্জগতের নিত্যসম্বন্ধ নাই। সেই দিক হইতে উহা বস্তুসার-শূন্য সংযোজনা মাত্র। উহার প্রত্যয়গুলির সহিত বহির্জগতের বস্তুসত্তার যথাযথ সম্পর্ক আরোপ করিয়া আমাদিগকে দেখিতে হইবে ঐ বিজ্ঞান অনুসারে বহির্জগতের ঘটনাবলীকে আমরা বুঝিতে পারি কি-না।

আপেক্ষিকবাদ আবিষ্কারব্যপদেশে তাঁহার বিভিন্ন চেষ্টার উদাহরণ দিয়া আইনস্টাইন বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, উপরিলিখিত উপায়ে বহির্জগতের স্বরূপ উপলব্ধি করার চেষ্টা নিষ্ফল ও আকাশকুসুম মাত্র নয়।

আইনস্টাইন যে পূর্বগামী আচার্যদের মতোই বহির্জগতের নিরপেক্ষ অস্তিত্বে ও হেতুপ্রভব বিজ্ঞানের সম্ভাব্যতায় বিশ্বাসী, তাহা উপরের আলোচনা হইতে সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে। পদার্থবিজ্ঞানে নবতম সমষ্টিবাদের ফলে আজকাল অনেকেই হেতুবাদের উপর বিশ্বাস হারাইয়াছেন। ফলে ঘটনার অবশ্যম্ভাবিতার পরিবর্তে তাহার সম্ভাবনার আলোচনাই বিজ্ঞানের প্রকৃত উদ্দেশ্য বলিয়া তাঁহারা মনে করেন। এই নবতমবাদ অণু-পরমাণু রাজ্যের অনেক জটিল সমস্যার সমাধান করিতে সক্ষম হইলেও ভবিষ্যতে বিজ্ঞানে যে হেতুবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হইবে ইহাই আইনস্টাইনের দৃঢ় বিশ্বাস। সেই প্রতিষ্ঠার আয়াসেই তাঁহার সাধনা ও পরিশ্রম সমগ্রভাবে নিয়োজিত।

শক্তির সন্ধানে মানুষ

বস্তুর রাজ্যে বৈচিত্র্যের অবধি নেই। কয়লা, অভ্র, লবণ, হিঙ্গুল ইত্যাদি কত খনিজ রোজ মাটির মধ্য থেকে বেরোচ্ছে। কত উদ্ভিদ্ কীট-পতঙ্গ পশু-পক্ষী পৃথিবীতে জন্মাচ্ছে, নিজের ভাবে বাড়ছে, আবার আয়ু ফুরালে মরছে। প্রাণশক্তির তেজে খাদ্যের পরিপাক চলছে, কায়বস্তুতে তৈরী হ'চ্ছে কত বস্তু, আবার কত বস্তুরও বিকার ঘটছে, নাশ হচ্ছে! প্রাণীর শরীরে সৃষ্টি হ'চ্ছে মেদ, মাংস, রক্ত ও রস। প্রাণের রসায়নশালায় কত জিনিষের ভাঙ্গা গড়া চলছে! গাছের ফলের মধ্যে বীজের মধ্যে তার কাণ্ড, ত্বকের মধ্যে কত জিনিষ পাশাপাশি মিশে রয়েছে!

জগতের মধ্যে জন্ম মৃত্যু, ভাঙ্গা গড়া, যোগ-বিয়োগ, সবেরই রহস্য বুঝতে চায় মানুষ! সে যে শুধু পৃথিবীর কথাই ভাবে তা নয়! সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, তারা, ছায়াপথ, সুদূরের নীহারিকা—সবই সে কৌতূহলের চোখে দেখছে। নিজের বুদ্ধির গণ্ডীর মধ্যে ভরতে চায় অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডকে। দূরে কাছে, এমন কি নীহারিকার মধ্যেও যে সৃষ্টির খেলা চলছে, নতুন নতুন যন্ত্র আবিষ্কার করে তার নিয়ম সে বুঝতে চায়। কি অব্যর্থ নিয়মের বশে বাষ্পময় নীহারিকা জমাট বেঁধে তারা-জগতের জন্ম দিলে, আবার কোন দুর্যোগের ফলে তারকা ভেঙ্গে-চুরে গ্রহজগতের সৃষ্টি হ'ল, এ সবের সার তথ্য তার কল্পনা, তার প্রতিভা ধরতে চায়। চোখে দেখা যায় না যে সূক্ষ্মকণারাশির জগৎ, তার কথাও সে ভাবে। প্রকৃতির সকল গোপন রহস্যের উপর নিজের বুদ্ধির আলোক ফেলে জানতে চায় তার অন্তরের মর্মকথা।

মৌলিক উপাদানের পরমাণুগুলি কি আকর্ষণের বশে মিলিত হ'ল, কিভাবে নিখিল যৌগিকপদার্থের সৃষ্টি হ'ল, অণু-পরমাণুরা কি নিয়ম মেনে কিরূপে সারি বেঁধে কঠিন তরল গ্যাসের আকারে মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হ'ল, এই সব তথ্যই তার সাধনার বিষয়। সূর্য সারা ব্রহ্মাণ্ডে তেজ ছড়াচ্ছে, পৃথিবীকে দিচ্ছে উত্তাপ, আলো। সেই তেজ, আলো, উত্তাপের সাহায্যে প্রাণ গড়ছে অদ্ভুত জীবজগৎ। অচেতন বস্তুর জড়তাকে দূর করে চেতনার কায়বস্তু গড়তে দরকার বিপুল কার্য সম্ভারের, তা'রও চাহিদা যোগায় সূর্যের এই তেজ। এই বিপুল কার্যক্ষমতার সার কি

করে বস্তুর মধ্যে বদ্ধ হ'ল, কি কৌশলেই আবার তা'কে নিজের কাজে লাগান যাবে, সব সময় এই কথা ভাবছে মানুষ। যে অবস্থা, যে পরিবেশের মধ্যে সে জন্মেছে, মানুষ তাকে নিত্য বা ধ্রুব ব'লে মানে না। সে চায়, মনের মত জগৎ গড়তে যার মধ্যে ত'ার প্রাণের প্রেরণা অবাধ স্ফূর্তি লাভ করতে পারবে। জগতের সৃষ্টির খেলার মূলসূত্রগুলি তাই সে খুঁজছে। বস্তুর মধ্যে লুকানো শক্তির ভাণ্ডারের চাবিকাটি তাই তার নিতান্ত দরকার। হাজার হাজার বৎসরের ইতিহাসের মধ্যে তার এই সাধনার কথা, প্রতিকূল অবস্থার সাথে এই সংগ্রামের বর্ণনা, লেখা রয়েছে। কত অতিকায় জন্তু লোপ পেয়েছে, ক্ষীণকায় মানুষ হাজার হাজার বছর টি'কে আছে। বহু শত পুরুষানুক্রমের অভিজ্ঞতার ফলে সে প্রাকৃতিক শক্তিকে নিজের কাজে লাগাতে শিখেছে। প্রকৃতির তাণ্ডবলীলার মধ্যেও সে নিয়তির শাসনের সন্ধান পেয়েছে। নিবিড় পরিচয়ের ফলে ঘটনা পরম্পরার মধ্যে কার্যকারণের অমোঘ শৃঙ্খলা তার কাছে আজ স্পষ্ট। বহুধাবিচ্ছিন্ন বহুশত বৎসরের বহুপুরুষের অভিজ্ঞতা থেকে জমাট করে পেয়েছে বস্তুজগতের ব্যবহারিক সূত্র, তাই দিয়েই সে জ্ঞানের চিরন্তন ভাণ্ডার বোঝাই করে চলেছে। গাছ থেকে ফল পড়ে, সৌরমণ্ডলে গ্রহেরা নিজের পথে চলে ফেরে,—মহাকর্ষের একই নিয়মের সূত্রে, এইরূপে বহু বিচিত্র ঘটনাকে এক সঙ্গে যুক্ত করে ফেলেছে সে। অণুর প্রতি অণুর আকর্ষণের রহস্য আজ তার কাছে গোপন নেই। সাধনাতেই সিদ্ধি। বহু যুগের চেষ্টায় সে তার কল্পনাকে বাস্তব করবার পথে কিছু দূর এগিয়েছে। তার কার্যতৎপরতার ফলে প্রকৃতিরও ঘটেছে স্থায়ী পরিবর্তন। তারই উদ্ভাবনী শক্তির কল্যাণে এই জগতে এসেছে অনেক নতুন বস্তু, নতুন প্রাণী। নতুন আলোর ছটায় অদৃশ্য পরমাণু-জগৎ পর্যন্ত প্রকাশিত হচ্ছে। বহু বাধা সে অতিক্রম করেছে, অদম্য ইচ্ছার চাপে প্রতিকূল অবস্থাকে করে তুলেছে তার অনুকূল। গভীর অরণ্যের জায়গায় আজ বসেছে লোকপূর্ণ জনপদ নগরী। উচ্ছৃঙ্খল বন্যার জলরাশি তার বাঁধে ধরা পড়েছে, তারই বিপুল শক্তি আজ মানুষের কল্যাণরথের চাকা ঘুরোচ্ছে। প্রচণ্ড উত্তাপের তেজে পাথর গ'লে বেরিয়ে আসছে শুদ্ধ ধাতুর স্রোত। কারখানায় তৈরী হ'চ্ছে কত নতুন যৌগিক পদার্থ—কাচ, সেলুলয়েড, রবার ইত্যাদি কত দৈনিক ব্যবহারের জিনিসের মালমশলা—উৎকট রোগের প্রতিষেধক কত নতুন ঔষধ—শিল্পীর তুলির জন্য কত বিচিত্র উজ্জ্বল রং। সে আর হিংস্র জন্তুকে ভয় করে না—শাসন-

মারণের অসংখ্য অস্ত্র তার হাতে। বশীকরণেও সে সিদ্ধহস্ত, বন্য জন্তু আজ তার রথ চালাচ্ছে, বোঝা বইছে, বা কৃষির কাজে সাহায্য করছে। বরফ-ঢাকা পাহাড়ের মাথায় সে উঠিয়েছে বিজ্ঞানের মন্দির কিংবা স্বাস্থ্যধাম। সমুদ্রের গ্রাস থেকে কেড়ে নিয়েছে উর্বরা জমি। এইভাবে নিজের ইচ্ছামত নতুন জগতের সৃষ্টি করতে বিপুল শক্তির দরকার, তাই প্রকৃতির ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মূল সূত্রগুলি সে আয়ত্ত করতে যত্নশীল। বস্তুর মধ্যে যে অসীম শক্তি লুকান রয়েছে বিজ্ঞানের কৌশলে সে তাকে দখল করবে, ইচ্ছামত ব্যয় করবে ও নিজের সেবায় লাগাবে, এই তার বাসনা। সূর্যের অসীম তেজ, সমুদ্র হতে জল বাষ্পাকারে তুলে সুউচ্চ পাহাড়ের চূড়ায় চালছে। নদ-নদীর মধ্য দিয়ে সেই বিপুল জলরাশি আবার মহাকর্ষের বশে পাতালের দিকে ছুটছে, তার গতি দুর্বার—কার্যশক্তিও অফুরন্ত, মানুষ তাকে নিজের কল্যাণকর কাজে লাগাতে বদ্ধচেষ্ট। আবার অতীতের হাজার হাজার বৎসরের সূর্যতেজ প্রাণশক্তি আহরণ করে মাটির কয়লার মধ্যে জমা রেখেছে। কার্বনের পরমাণু অক্সিজেনের পরমাণুর সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে অতীতের আকাশে যে বিরাট পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড চারদিকে পরিব্যাপ্ত ছিল, প্রাণ সূর্যরশ্মির সাহায্যে তাকে বিযুক্ত ক'রে, আবার সেই কার্বন দিয়ে গড়েছিল কোটি কোটি উদ্ভিদের কায়বস্তু। অতীত যুগের বিরাট অরণ্য মাটির মধ্যে কবে কবর পেয়েছে। আজ তাদের সারবস্তু ভেঙেচুরে কয়লা হয়ে গিয়েছে। তবু তার মধ্যে রয়ে গেছে বহু যুগের সঞ্চিত ধন। কয়লাকে আবার অক্সিজেনের সঙ্গে মিলিত হ'তে দিলে, দাহের ফলে প্রকাশ হবে সেই অতীত যুগের সঞ্চিত তেজ। এর রহস্য মানুষ জানে, দহনক্রিয়া আজ নিয়ন্ত্রিত, তার কার্যকরী শক্তি মানুষের ইঙ্গিতে মানুষের কলকারখানা চালাচ্ছে। দাহনের উত্তাপ দিচ্ছে অমিত কার্যকর বাষ্প, তা'র চাপে নানা যন্ত্র ঘুরছে। শক্তিকে নানাভাবে রূপান্তরিত করতে শিখেছে মানুষ। অতীতের সম্পদ সে নানাভাবে নিজের কাজে লাগিয়ে ব্যয় করছে। মাটির মধ্যে যে তেলের স্রোত বইছে, তাও এক হিসাবে অতীতের সঞ্চিত ধন। তাকে উঠিয়ে নিজের কাজে লাগাচ্ছে মানুষ।

মানুষ যতই সভ্যতার ধাপে উঠছে, ততই সভ্যতার প্রসার বৃদ্ধি হচ্ছে, ততই বেড়ে যাচ্ছে জমান তহবিল হ'তে খরচের হার। পৃথিবী প্রতি দিন যা সূর্যের কাছে পাচ্ছে, তারই পরিমিত ব্যয়ে তার সভ্যতার আর চলে না। বর্তমান সভ্যতার

চাহিদা মিটান শক্ত, তবু সে মোহিনী তাকে মুগ্ধ করেছে। কল্পনার কুহকে নিজের খেয়ালে সে পূর্বযুগের তহবিল নিঃশেষ করতে চলেছে। অঙ্গার সম্পদ কিংবা মাটির তেল চিরদিন থাকবে না। ভাণ্ডার হতে যা খরচ হয়, তার প্রতিপূরণ হচ্ছে না। যে অবস্থায় এই সব সম্পদ সঞ্চয় সম্ভব হয়েছিল, সময়ের সঙ্গে তারও হয়েছে আমূল পরিবর্তন। তাই আজকাল সাবধানী মহলে শোনা যায় সতর্কতার বাণী। আর কতকাল অঙ্গার বা তেল মনুষ্যসমাজের নিত্যবর্ধমান চাহিদা যোগাতে পারবে তারও হিসাব হচ্ছে মাঝে মাঝে, আর মানুষ ছুটেছে নতুন কয়লা-খনির সন্ধানে, নতুন তেলের উৎস মাটির বাইরে আনতে।

সর্বদেশের মানুষ একই ভাবে জীবনযাত্রা চালায় না। শিক্ষায়, কৌশলে, কার্যকারিতায় তাদের মধ্যে নানা স্তরভেদ আছে। আবার প্রাকৃতিক সম্পদ সারা পৃথিবীতে একই ভাবে ছড়ান নেই। জাতির মধ্যে যারা প্রভাবশালী তারা সমস্ত খনিজসম্পদ নিজেদের দখলে রাখতে উদ্‌গ্রীব। যারা কপালগুণে পৃথিবীর বিত্ত ভাণ্ডারের আজ অধিকারী, তারা তাদের দখল চিরস্থায়ী করতে চায়। অনুন্নত জাতির দেশে যে প্রাকৃতিক সম্পদ আজও অটুট আছে তার উপর অধিকার বিস্তার করতে উন্নত জাতিদের নিয়ত প্রয়াস। ফলে হয় কঠোর প্রতিযোগিতা, প্রবলের সাথে প্রবলের সংঘর্ষ, নির্মম কঠোর সংগ্রাম। এতে সারা বিশ্বের কল্যাণকারী বিত্ত, বহু বৎসরে মানুষের আয়াসের সঞ্চিত ধন অল্পদিনে পরিণত হয় ভস্ম ও ধ্বংস স্তূপে। সফলতার দেশে দেখা দেয় দুর্ভিক্ষ মহামারী। বিজয়লক্ষ্মী যে জাতির প্রতি নিষ্করুণ তারা হয়ত সমৃদ্ধির শিখর হতে সর্বনাশের সাতলে ডুবে যায়। রক্ত ও বিত্তক্ষয়ে বিজেতারাও হয়ে পড়ে নিস্তেজ। শান্তি সমৃদ্ধি ফিরিয়ে আনতে তাদেরও লাগে বহুদিন, লোকসান পূরাতে সহ্য করতে হয় অনেক ক্লেশ, অনেক দুঃখ।

জুয়াখেলায় সর্বস্বান্ত হয়েও থাকে জুয়াড়ীর চৈতন্য হয় না। সে ফেরে নতুন বিত্তের সন্ধানে, যা পণ রেখে আবার সেই সর্বনেশে জুয়ায় নিজের ভাগ্যপরীক্ষা নতুন করে করতে পারবে।

মানুষের প্রকৃতি কতকটা এই জাতীয়। খনিজ সম্পদ, তেলের স্রোত যখন এইভাবে বৃথাই ভস্মীভূত হতে বসেছে তখন এই পরিচিত জগতে অন্য কোন ভাবে কার্যকরী শক্তি লুকান আছে কিনা তাই সে খুঁজেছে! ঊর্ধ্বে তারামণ্ডলীর বিরাট তেজোভাণ্ডারের দিকে চেয়ে ভাবছে এই সব জ্যোতিষ্কও তারই মত অমিতব্যয়ী,

তেজোস্রোতে যা ঢালে তাতো ফিরিয়ে পায় না। বিজ্ঞানীকে জিজ্ঞাসা করলে ওদের অফুরন্ত ভাণ্ডারের রহস্য কি? পৃথিবীতো এক হিসাবে সূর্যের কায়বস্তুর দ্বারাই গড়া, তাই মাটির মধ্যে অন্য কোন তেজের উৎস আছে কিনা তারই সব সময় খোঁজ। পরমাণু জগতের রহস্য বিশ্লেষণ করতে যে বিজ্ঞানীরা ব্যস্ত, তাঁদের কাছেই মানুষ আজ আবার শক্তির নতুন উৎসের সন্ধান পেয়েছে।

অল্প কয়েকটি মৌলিক উপাদান মিলে গড়েছে সারা বস্তুজগৎ। রাসায়নিক বিশ্লেষণে এদের পাওয়া যায়, আবার তারার আলোর বর্ণালীতে মেলে এদেরই বিশেষ বিশেষ বর্ণচ্ছত্র। সুদূর তারকার সঙ্গে এই পৃথিবীর ধাতুগত নিকট আত্মীয়তা রয়েছে। আবার কি কঠিন, কি তরল, কি বায়বীয় সকল অবস্থায় মৌলিক বস্তু একই পরমাণুর সমষ্টি। যৌগিক বস্তু-অণু অবস্থান্তরগুলো ভেঙে উপাদানিক পরমাণুতে বিযুক্ত হতে পারে। মৌলিক পরমাণু কঠোর তাপে দহন ও প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক নির্যাতন সহ্য করে তবু বদলায় না। মৌলিক উপাদানের মধ্যে আবার গোত্র বিভাগ আছে, ব্যবহার অনুসারে তাদের পর্যায় বিন্যাস চলে, মেণ্ডেলিয়েফের ছক ভাল করে দেখলে তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে, নিকট-ধর্মী উপাদান গুলিকে শ্রেণীর ভাগ ছকের এক স্তম্ভে মিলবে। এই আত্মীয়তার কারণ বহুদিন বিজ্ঞানীরা আলোচনা করছিলেন। এর মধ্যে কি কোন বস্তুগত ঐক্যের রহস্য লুকান রয়েছে অথবা তাদের গঠনমূলক সাদৃশ্যই এই আত্মীয়তার মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে, এই ছিল বিজ্ঞানী মহলে বহুদিনের মূর্ত প্রশ্ন। পরীক্ষা চলতে লাগলো, বিজ্ঞানীরা সূক্ষ্ম-সন্ধানীযন্ত্রপাতি গড়তে লাগলেন, পরমাণু ভাঙার জন্য লাগাতে শিখলেন তীব্র বৈদ্যুতিক চাপ। সব পরমাণুর ভেতর থেকে বেরিয়ে এল একই ইলেকট্রন। পরমাণুর ওজন বের করার পদ্ধতিও বিজ্ঞানীর আয়ত্তে এল। বিকিরণের নিয়মও উপলব্ধি হল। ফলে পরমাণুর গঠনের একটা বর্ণনা দেওয়াও সম্ভব হল। প্রত্যেক পরমাণু যেন একটি সূক্ষ্ম সৌরমণ্ডল। মধ্যে প্রায় সমস্ত ভর জড় করে রয়েছে + বিদ্যুৎ। কেন্দ্রের চারদিকে একটি খুব ছোট গোলকের মধ্যেই প্রায় সমস্ত ভরবস্তু আটকান। জানা যায় সে গোলকের ব্যাসার্ধ হবে $১০^{-১৩}$ সে. মি. পর্যায়ের। কেন্দ্রের +বিদ্যুতের আকর্ষণ বলে ঘুরে ঘুরে নিজের অক্ষের মধ্য ঘুরছে নির্দিষ্ট সংখ্যক ইলেকট্রন। তাদের কক্ষচ্যুত করতে, কেন্দ্রের শাসনের বাইরে আনতে কাজ করতে হয়—বিভিন্ন মাপের কাজের বিভিন্ন বলয়ে ইলেকট্রনের অবস্থান জানাচ্ছে।

একেবারে বাইরের ইলেকট্রন অল্প আয়াসেই বাইরে টানা যায়—রাসায়নিক সমন্বয়ের সময় বিভিন্ন পরমাণুর মধ্যে তাদেরই অদল বদল হয় কিংবা যোগসূত্র হিসাবে তারা দুই বিভিন্ন পরমাণুর যৌথ সম্পত্তি হয়ে থাকে। এই কারণেই বাইরের কোটায় ইলেকট্রনের একভাবী বিন্যাস ও সমান সংখ্যা রাসায়নিক ব্যবহারের সাদৃশ্য। তারাই বিভিন্ন গোত্র পর্যায়ের নির্দেশ দেয়। পরমাণুর সমস্ত ইলেকট্রনের বিদ্যুৎ-সমষ্টি কেন্দ্রের +বিদ্যুতের পরিমাণের সমান, এর জন্যই পরমাণুতে বিদ্যুৎসাম্য বজায় রয়েছে। বিদ্যুৎ-বিন্যাসই যদি রাসায়নিক ধর্মের কারণ হয়, তবে কেন্দ্রের ভরমানের বিষয় কোন সঠিক সিদ্ধান্ত করা গেল না। একই বিদ্যুৎমান বহন করে বিভিন্ন ভরের পরমাণু হ'তে পারে কিনা, যাদের ওজনে তফাৎ থেকেও রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় একই ব্যবহার দেখা যাবে, এরূপ প্রশ্ন উঠা খুবই স্বাভাবিক! একটি পরমাণুকে তৌল করা এখনও সম্ভব হয় নি, তবে পরমাণু-সমষ্টিকে বিভিন্ন ভারের পর্যায়ে বাছাই করবার যন্ত্র আজকাল বেরিয়েছে। এই ভরানুগ বিশ্লেষণকারী যন্ত্রের সাহায্যে একই রাসায়নিক মৌলিক পর্যায়ে যে বিভিন্ন ওজনের পরমাণু থাক্‌তে পারে, তার অকাট্য প্রমাণ আজ বেরিয়েছে! মেণ্ডেলইয়েফের ছকের ঘর জানাচ্ছে মাত্র কেন্দ্রের বিদ্যুৎমান কিংবা সমস্ত পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রন সংখ্যা। বিভিন্ন ভরের পরমাণু একই পর্যায়ে থাক্‌তে পারে, এ কথা আজ সকল বিজ্ঞানী স্বীকার করেছেন। তেজস্ক্রিয় মৌলিক বস্তুরাই এই সত্যের প্রথম সন্ধান দিয়েছিল। এই শ্রেণীর পরমাণু আপনা হ'তে বিদ্যুৎ, ভরকণা ও তেজ বিকিরণ ক'রে ভিন্ন প্রকৃতির পরমাণুতে রূপান্তরিত হয়। ব্যাক্‌রেলের পরীক্ষায় ইউরেনিয়মের এই ক্রিয়াশক্তি প্রথম জানা যায়। পরে ম্যাডাম কুরী ও রাদারফোর্ডের গবেষণার ফলে অনেক তেজস্ক্রিয় পদার্থের সন্ধান পাওয়া গেছে। এদের মধ্যেও একরকমের গোষ্ঠী বিভাগ করা যায়। আদি পরমাণু হতে বিকিরণ হলে সে একটা অন্য পরমাণুর জন্ম দেবে। দ্বিতীয়টি হয়ত তেজস্ক্রিয়ই রয়ে গেল—ফলে তৃতীয় একটি পরমাণু এল, এইভাবে আদি পরমাণুর পর্যায়ক্রমে রূপান্তর চল্‌তে থাকে, একটা গোষ্ঠী পর্যায়ের কল্পনাও ফুটে উঠে। ধাপে ধাপে কম্‌তে থাকে কেন্দ্রের ভরসংখ্যা, শেষে হয়ত একটি নিত্যপর্যায়ের ধাতুর সঙ্গে রাসায়নিক প্রকৃতিতে অভিন্ন অবস্থায় পৌঁছে এই তেজস্করী ক্ষমতা লোপ পায়। পর্যায়ক্রম থেমে যায়। কতগুলি ভরকণা এই পরিবর্তনে

ক্রমে বেরোলো, তার থেকে পাওয়া যায় শেষের অণুর ভরমান। কেননা, যে ভরকণার বিচ্যুতির কথা বলেছি, তা হিলিয়মের কেন্দ্রবস্তুর থেকে অভিন্ন, তারও মান জানা, অতএব আদিতে পরমাণুর ভর জানা থাকলে পর্যায়শেষের পরমাণুর ভর নির্দিষ্ট হ'য়ে গেল! ইউরেনিয়ম থেকে সুরু হয়ে তেজস্ক্রিয়ার ফলে ভিন্ন ভিন্ন পরমাণুর উৎপত্তি হয়ে এই পর্যায় থেমে যায় এক পরমাণুতে যা রাসায়নিক ব্যবহারে পরিচিত সীসার সমভাবী, অথচ হিসাবে তার ওজন দাঁড়ায় সাধারণ সীসার অণুর থেকে ভিন্ন। এতে সীসা পর্যায়ে দুটি ভিন্ন ভরের পরমাণু পাওয়া গেল। রসায়নের নিপুণ বিশ্লেষণও এই সত্যকে সমর্থন করলে।

অতীতে কোন এক সময়ে পৃথিবী ছিল সূর্যেরই অংশ। হঠাৎ কোন বিপর্যয়ের ফলে সূর্যপিণ্ড থেকে সে তফাৎ হয়েছে। সূর্যের সঙ্গে তার নাড়ীর যোগ ছিঁড়লো, সে স্বতন্ত্র হয়ে ঘুরতে লাগলো নিজের কক্ষে, আর উগ্র তেজ কম্‌তে কম্‌তে তার তরল বস্তুকায় কঠিন হয়ে গেল। আদিম উপাদানগুলি পাথরে ধরা রইল। এর মধ্যে ইউরেনিয়মও রয়ে গেল নানাখনিজের মধ্যে মিশে। তার তেজস্ক্রিয়ার নিবৃত্তি হল না, খনিজের মধ্যেই তার রূপান্তর চলতে লাগল। পরিণামী পরমাণুও জড় হতে থাকল একই খনিজের মধ্যে। আজ যদি সেই খনিজের বিশ্লেষণ করা হয় তবে মিল্‌বে ইউরেনিয়ম, সঙ্গে এই পরিণামের সীসার সন্ধান। যদি খনিজের সমস্ত সীসাই তেজস্ক্রিয়ার ফল হয় তবে বিশ্লেষণের ফলে দুটি কথা প্রমাণিত হবে। প্রথম—এই পরিণামী সীসার ভরসংখ্যা সাধারণ সীসার থেকে ভিন্ন। দ্বিতীয়—কতদিনের রূপান্তরের ফলে উক্ত পরিমাণ সীসা জমা হ'তে পারে তারও মোটামুটি একটা নির্দেশ। ফলে কতদিন আগে পৃথিবী তার স্বতন্ত্রতা পেয়েছিল, তারও একটা আন্দাজ পাওয়া অসম্ভব নয়। পরমাণুকে অন্য গোত্রের পর্যায়ে বদলান মানুষের বহু পুরানো কল্পনা। সোনা তৈরী করবার চেষ্টা করেছিল সে প্রচুর, যদিও সফলকাম হয়নি, তার নিস্ফলতাই পুঞ্জীভূত হয়ে বর্তমান কিমিয়াবিদ্যার প্রথম সূচনা করেছে। তেজস্ক্রিয় পদার্থ যখন ধরা পড়্‌লো, পরমাণু ভাঙ্গার চেষ্টায় মানুষ তখন বেশী জোর দিলে। অনেক পরীক্ষাগারেই এই গবেষণা চল্‌তে লাগলো। রাদারফোর্ড হলেন এই দলের অগ্রণী। এই প্রচেষ্টায় বাধা অনেক। কেন্দ্রস্থানে শক্তি প্রয়োগ করা অতীব দুঃসাধ্য ব্যাপার। বলয়িত ইলেকট্রন রাশি ভেদ করে লক্ষ্যে পৌঁছতে হ'বে। কেন্দ্রের উপর আঘাত করতে শীঘ্রগতি

ভরকণার দরকার, তাতে ভরবেগ অতিমাত্রায় বর্তমান থাকলেই তবে সাফল্যের আশা করা যায়। কেন্দ্রস্থানটি আয়তনে এত ছোট যে বহু লক্ষ অণুকণা এক সঙ্গে ছুড়লে মাত্র দুচারিটিরই লক্ষ্যস্থানে পৌঁছানর সম্ভাবনা। কেন্দ্রের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলও অনিশ্চিত। সাধারণ ভরকণায় আশ্রয় করে থাকে +বিদ্যুৎ, অর্থাৎ সব কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎই সমপর্যায়ের। বিদ্যুৎবিজ্ঞানের নিয়মে তাদের মধ্যে নৈকট্যের সঙ্গে যে বিপ্রকর্ষশক্তি দ্রুত হারে বাড়তে থাকবে তা বুঝতে দেরী হয় না। এর জন্য সংঘর্ষের ফলে প্রতিফলনের সম্ভাব্যতাই বেশী। আবার তীব্রবেগের পরমাণুস্রোত বহান, এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। বিদ্যুৎশক্তিই একমাত্র এই সূক্ষ্ম কণার উপর কাজ করতে পারে, আর সংঘর্ষের ফল আশানুযায়ী পেতে হ'লে কয়েক লক্ষ ভোল্ট বিদ্যুৎ চাপের প্রয়োজন। এইসব বাধার জন্য প্রথমে তেজস্ক্রিয় ধাতুর উৎক্ষিপ্ত ভরকণার দ্বারা পরমাণু ভাঙ্গবার চেষ্টা সুরু হয়। রাদারফোর্ড এভাবে নাইট্রোজেনের পরমাণু বিভক্ত ক'রে চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। আবার তাঁর বিজ্ঞানাগারেই তাঁর ছাত্রেরাই প্রথমে কৃত্রিম উপায়ে বিদ্যুৎ-চাপে হাইড্রোজেনের সার প্রোটনকে তীব্রভাবে চালিত করে লিথিয়মের পরমাণুকে দ্বিখণ্ডিত করলে। সঙ্গে সঙ্গে পরমাণু-ভাঙ্গা প্রচেষ্টার অধ্যায় সুরু হ'ল। এই প্রবন্ধে সব কথা হয়ত সমীচীন হ'বে না।

এই নবতম বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে সব অদ্ভূত সত্যের সাক্ষাৎ পাওয়া গেছে তাদের সম্যক আলোচনা এখানে অসম্ভব। শুধু এই সব পরীক্ষার ফলে মানুষ যে নতুন শক্তির উৎসের সন্ধান পেয়েছে তার সম্বন্ধে দু'চারটি কথা এইখানে বলে শেষ করা যাক। পরমাণুর মধ্যে প্রকৃতি ভেদের কথা ভাবা যাক। ইউরেনিয়ম আপনা আপনি ভাঙ্গছে। অথচ লঘু পর্যায়ের কণাকে ভাঙ্গা অনেক আয়াসসাপেক্ষ। এই ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা সুরু করেছেন মাত্র ৮।১০ বৎসর। তবে সাধারণ ভরকণা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির নিউট্রনের আবিষ্কারে আমাদের জ্ঞান খুব দ্রুততালে এগিয়ে চলেছে। এই কণাটি ওজনে প্রায় প্রোটন কণার সমান অথচ এতে বিদ্যুতের অস্তিত্ব নাই। রেডিয়ম হতে বিযুক্ত দ্রুতবেগ আল্‌ফা কণার আঘাতের ফলে বেরিলিয়ম নামক লঘু মৌলিক উপাদানের পরমাণু থেকে একে প্রথমে পাওয়া যায়। এর বিদ্যুৎ না থাকায় এটি অনায়াসেই যে কোন কেন্দ্রবস্তুতে প্রবেশ করে। এই বিপর্যয়ের নানারূপ বিস্ময়কর পরিণতি হয়। পরমাণুর রূপান্তর দ্রুত তালে হ'তে পারে। তাছাড়া

এই নিউট্রনেরই আঘাতে ইউরেনিয়মের কেন্দ্রবস্তুকে সম্পূর্ণ নূতন ভাবে দ্বিধাবিভক্ত করা সম্ভব হয়েছে। ভরানুযায়ী বিশ্লেষণ ক'রে ইউরেনিয়ম পর্যায়ের মৌলিক পদার্থের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ভরের পরমাণু পাওয়া গিয়েছে। ২৩৮ পরমাণুর পরিমাণই বেশী, ২৩৫ পরমাণু শতকরা একভাগেরও কম সাধারণ ইউরেনিয়মে পাওয়া যায়।

এই লঘু ইউরেনিয়ম মন্দগতি নিউট্রনের আঘাতের ফলে ভেঙ্গে যায়, হান ও স্ট্রেশেম্যান নামে দুইজন জার্মান বিজ্ঞানী প্রথমে নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেন। ঐ দুই খণ্ডের ভর অসমান। আবার প্রত্যেক বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে আসে গড়ে প্রায় তিনটি নিউট্রন। আর একটি আশ্চর্যের কথা দুই খণ্ডের ভরমানের সঙ্গে যদি তিনটি নিউট্রনের ভরমান যোগ করা যায় তা হলেও আদিম কণার ভরমানের সঙ্গে মেলে না। সকল রকম রাসায়নিক পরিবর্তনে ভরমান এক থাকার কথা, অতএব বাকী ভরের কি গতি হ'ল? আইনস্টাইনের বিশেষ আপেক্ষিকবাদের একটি সিদ্ধান্ত এই গরমিলের হিসাব দিল। আপেক্ষিকবাদের মতে বস্তুর ভর নিত্য নয়। বস্তুর তেজের পরিমাণের সঙ্গে তা কমে বাড়ে। রসায়নশালায় যে ধরণের তেজের হ্রাসবৃদ্ধি হয়, তার ফলে ভরমানের হ্রাসবৃদ্ধি অতি তুচ্ছ। কাজেই কোন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ভরসমষ্টির ব্যতিক্রম হয় না বললে ভুল হবে না। তবে পরমাণু ভাঙ্গবার সময় যে তেজ নির্গত হয়, তা' এত বেশী যে নিঃসৃত তেজের জন্য ভর কমা ধরা পড়বে। যে ক্ষেত্রে এই সংখ্যা বা ভরমান যত কমবে তেজ বিকিরণ অবশ্য সেই ক্ষেত্রে তত বেশী। যদি কল্পনা করা যায় যে আদিতে প্রোটনজাতীয় বস্তুকণার সমন্বয়ের ফলে নিখিল মৌলিক বস্তুকণার উদ্ভব হয়েছে, তবে মোটামুটি এই প্রক্রিয়া সম্ভব হলে বিশেষ কোন ব্যাপারে কত তেজ প্রকাশিত হ'বে তার গণনা করা খুব সোজা। আদি ও অন্তের ভরসমষ্টি তুলনায় তা পাওয়া যাবে। ইউরেনিয়ম বিস্ফোরণে যে প্রভুত তেজ বেরোচ্ছে তার একটা প্রমাণ যে বিস্ফোরণের ফলে ভরমাত্রা শেষে কমে যাচ্ছে। এই তেজের পরিমাণ বিস্ময়কর। মাত্র ১ গ্রাম ইউরেনিয়মের বিস্ফোরণে যে তেজ পাওয়া যায়, তা কয়েক মণ কয়লা দহনের সঙ্গে সমপর্যায়ের। নতুন শক্তির উৎসের সংবাদ হানের পরীক্ষার খবরের সঙ্গে সঙ্গে ছড়া'ল। ইউরেনিয়ম অণুর বিস্ফোরণের সময় ২।৩টি নিউট্রনও যে সঙ্গে সঙ্গে বাইরে আসে, এটা খুব আশার কথা বলে বিজ্ঞানীদের মনে হ'ল। কোন উপায়ে যদি নিঃসৃত নিউট্রনের গতিমান্দ্য

ঘটান যায় ও নতুন আর একটি ২৩৫-ইউরেনিয়মের সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটান যায়, তবে এক পরমাণুর বিস্ফোরণে, পর পর তিনটি পরমাণুর বিস্ফোরণ হতে পারে এবং সুবিধা পেলে এই তিনটি থেকে যে নয়টি নিউট্রন বেরোবে তা' আরও নটি পরমাণুকে ভাঙ্গবে। এইভাবে নিউট্রনের পরিমাণ বেড়ে যাবে দ্রুততালে, সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরণের তেজও দ্রুত মাত্রায় বেড়ে চল্‌বে। এই কাল্পনিক প্রক্রিয়াকে আংশিকভাবে বাস্তব কর্‌তে পার্‌লে যে তেজ প্রকট হবে, তা' বিরাট ও অপ্রমেয়। অবশ্য সিদ্ধির পথে অন্তরায়ও অনেক। প্রথম শীঘ্রগতি নিউট্রনের গতিমান্দ্য ঘটানর প্রয়োজন, অথচ তাতে যেন নিউট্রন সংখ্যা না ক'মে। অন্য কোন বস্তু যেন তাকে শোষণ করে প্রক্রিয়াকে বিপথে না চালিত করে। বেশী মাত্রায় ২৩৮ ইউরেনিয়ম পরমাণু তাই সিদ্ধির এক অন্তরায়। তা ছাড়া অল্পমাত্রায় অন্যজাতীয় পরমাণুর মিশ্রণ হ'লেও নিউট্রন বাঁধা পড়ে যাবে, তারা আর বিস্ফোরণের কাজে লাগবে না। ২৩৫ ইউরেনিয়মের হার মিশ্র ধাতুতে বাড়ান যায় কিনা, ইউরেনিয়ম ধাতুকে শুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায় কিনা, এমন কোন হালকা পদার্থ পাওয়া যায় কিনা, যার সঙ্গে সংঘর্ষ হয়ে বেগ মন্দীভূত হ'লেও নিউট্রন তাতে বাঁধা পড়বে না। এইসব সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান না হ'লে ইউরেনিয়ম বিস্ফোরণ কাজে লাগানো যাবে না। গত মহাযুদ্ধ বাধে বাধে এমন সময় হানের গবেষণার কথা ছড়িয়ে পড়ল। যুদ্ধবিগ্রহের সময়ই রাষ্ট্রশক্তি বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীদের পরামর্শ নেন। সভ্যতার যুগে বাহুবল, এমন কি বাক্যবলের চেয়ে বুদ্ধিবলের কদর বেশী। মরণ-বাঁচন পণ, নূতন নূতন মারণ-অস্ত্র কে কত দ্রুত তৈরী করতে পারে, এই হ'ল প্রতিযোগিতার বিষয়। কারণ যে যত বিভীষিকা সৃষ্টি করবে জয়ের আশা তার তত অধিক। মহাযুদ্ধের মধ্যে দুই প্রতিদ্বন্দ্বীই ইউরেনিয়ম বোমা তৈরী করতে বদ্ধপরিকর হ'লেন। ভাগ্যলক্ষ্মী এ্যাংলোস্যাক্‌সন্‌ জাতের উপর প্রসন্ন। প্রচুর অর্থব্যয়ে আমেরিকায় বহু শত বিজ্ঞানীর সমবেত চেষ্টায় প্রত্যেক সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান হ'ল। ২৩৫ ইউরেনিয়ম প্রায় বিশুদ্ধ অবস্থায় পাবার পদ্ধতি মিলেছে। কার্বনকে অতিশুদ্ধ অবস্থায় পেলে নিউট্রনের গতিমান্দ্য ঘটান যায়, তাতে নিউট্রন সংখ্যারও বিশেষ হ্রাস হয় না। এইসব বিশুদ্ধ দ্রব্যের ব্যবহারে ইউরেনিয়মকে বিশুদ্ধ অবস্থায় আনলে তার স্তূপ থেকে স্বতঃই তেজ ও নিউট্রন

স্রোতের উৎপাদন সম্ভব, তার প্রমাণ হয়েছে বহু দেশে। বিস্ফোরণের পথে যে ভীষণ মারণ-যন্ত্রের নির্মাণ সম্ভব, হিরোশিমা ও নাগাসাকী সহরের শোচনীয় অবসান তার জ্বলন্ত নিদর্শন।

নতুন এই তেজের প্রথম ব্যবহার এইরূপ লোকক্ষয়কারী হ'লেও ভবিষ্যতে তাকে মানুষের কল্যাণে লাগান যাবে, এই হ'ল বিজ্ঞানীদের আশা। অবশ্য এখন পরীক্ষা-প্রণালী ও ফল অনেকাংশে গোপন রয়েছে, তবে বেশীদিন এই বিদ্যাকে নিজস্ব সম্পত্তি করে রাখতে পারবে না—কোন এক জাতি বা দল। ফলেইউরেনিয়ম খনিজের অধিকার নিয়ে পরস্পরের কলহের সম্ভাবনা অদূর ভবিষ্যতে বেশ আছে।

মানুষের সভ্যতার নানারূপ যুগ-বিভাগ করা চলে। যেমন প্রস্তর যুগ, লৌহ যুগ, কয়লার যুগ, তেলের যুগ ইত্যাদি। গত মহাযুদ্ধে ইউরেনিয়ম যুগের সূচনা হ'ল বলা যেতে পারে।

পরমাণুর রূপান্তরে তেজ প্রকাশের মর্ম আজ জানাতে, বিজ্ঞানীরা একটা পুরানো সমস্যার উত্তর পেয়েছেন। সূর্য যে সহস্রকোটি বৎসর তেজ চতুর্দিকে বিকিরণ কর'ছে অথচ তার ঔজ্জ্বল্য হ্রাসের কোন লক্ষণই নেই। এই অন্তর-তেজের ক্ষতি পূরণের রহস্য আজ আমরা বুঝি। হাইড্রোজেনের কেন্দ্রবস্তু প্রোটন ও নিউট্রন এই দুই-ই হ'ল যাবতীয় মৌলিক বস্তুকেন্দ্রের প্রধান উপাদান। হাইড্রোজেন থেকে হিলিয়ম হওয়া সম্ভব হ'লে আইনস্টাইনের গণনা পদ্ধতিতে বুঝা যাবে, তার ফলে বিরাট তেজের বিকাশ সম্ভব। বিখ্যাত বিজ্ঞানী বেতে একটি চক্রবৃত্তের কল্পনা দিয়ে বুঝিয়েছেন—সূর্যকেন্দ্রে কোটি সেণ্টিগ্রেড উত্তাপমানের ফলে এইরূপ একটি প্রক্রিয়ার নিত্য প্রসার খুবই সম্ভব। সূর্যের আকৃতি ও প্রকৃতির মধ্যে সুসঙ্গতি আজ এই কল্পনার কল্যাণে পাওয়া গেছে।

ভারতবর্ষের খনিজ সম্পদের সম্পূর্ণ খবর আমাদের জানা নেই। শোনা যায় গত যুদ্ধের সময় কয়েক টন ইউরেনিয়াম অকসাইড আমরা সরবরাহ করেছিলাম। ত্রিবাঙ্কুরের সিন্ধুসৈকতে প্রচুর পরিমাণে তেজস্ক্রিয় খনিজের সন্ধান মেলে। ভারতীয় বিজ্ঞানীদের মধ্যে নতুন যুগে পরমাণু সংক্রান্ত গবেষণার প্রভূত প্রসার হবে আশা করা যায়। তার জন্য একনিষ্ঠ এবং অক্লান্ত চেষ্টার প্রয়োজন।

যে কোন জাতির পক্ষে আজ বিজ্ঞানকে তুচ্ছ করা কিংবা তার সম্ভাব্যতাকে অবহেলা করা একান্ত বিপজ্জনক। সাময়িক ইতিহাসের সঙ্গে যাঁর পরিচয় আছে তিনি একথা স্বীকার করবেন।

পাউলি ও তাঁর পরিবর্জন নীতি

মাঝে মাঝে দেশ-বিদেশে এমন সব প্রতিভাধর ব্যক্তি জন্মান, কৈশোরেই যাঁদের মননশক্তি পূর্ণভাবে স্ফূর্তিলাভ করে। বিজ্ঞানী হলে তাঁরা অনেক সময় এক-নিষ্ঠভাবে আদর্শের অনুসন্ধানে রত থাকেন। অল্প বয়সে তাঁদের তিরোধান ঘটলেও তাঁদের অমর অবদান মানব-সভ্যতা বা বিজ্ঞানকে অনেক দূর এগিয়ে দিয়ে যায়। উলফ্‌গাং পাউলির জীবনকথার মধ্যে তারই এক উজ্জ্বল উদাহরণ মেলে। পাউলি জন্মেছিলেন ভিয়েনা সহরে ১৫ই এপ্রিল, ১৯০০ সালে। তাঁর পিতা ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভৌত-রসায়নের অধ্যাপক। পাউলি যখন স্কুলের ছাত্র, সেই সময় আইনস্টাইনের সার্বিক আপেক্ষিকবাদের প্রবন্ধগুলি বের হলো। এই দুরূহ বিষয় নিয়ে বিজ্ঞানীমহলে আলোচনা চলেছে। তিনিও নিজে নিজে পড়তে সুরু করলেন এসব। দু'চার দিনের মধ্যে আইনস্টাইনের মর্ম-কথা তাঁর কাছে পরিষ্কার ঠেকলো। ভাবলেন সারাজীবন পদার্থবিদ্যার আলো-চনায় কাটাবেন। স্কুলের পরীক্ষা পাশ করে ভর্তি হলেন মিউনিকের বিশ্ব-বিদ্যালয়ে। অধ্যাপক সোমারফেল্ডের (Sommerfeld) সুনামে আকৃষ্ট হয়ে দেশ-বিদেশের ছাত্রেরা সেখানে জুটতো। প্রথম থেকেই প্রবীণ অধ্যাপক কিশোর ছাত্রের অদ্ভুত মেধায় চমৎকৃত হলেন। কোয়াণ্টামের নবযুগ, তাই নিয়ে সোমার-ফেল্ড বক্তৃতা দিচ্ছেন। ওদিকে সুইজারল্যাণ্ড থেকে অধ্যাপক ভেইল (Weyl) আইনস্টাইনের সার্বিকবাদকে নতুনভাবে ও নতুন দিকে বিস্তারের চেষ্টা করছেন। এই সময় পাউলি লিখলেন ভেইল-মতবাদের উপর দুটি প্রবন্ধ। সকলে পড়ে অবাক হলো। তখন তাঁর বয়স মাত্র ১৯ বছর। জার্মেনীর সকলে বুঝলে, জটিল গণনাসঙ্কুল নতুন মতবাদ পাউলি সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করেছেন। তাই জার্মান বিশ্বকোষে আপেক্ষিকবাদের বিবরণী লেখবার ভার তাঁর উপর পড়লো। শেষ অবধি এটি দাঁড়ালো ২০০ পাতার বই। আজও সব দেশের বিজ্ঞানী তার কদর করছেন। এই বিষয়ে নানাদেশে নানা ভাষায় যত তাথ্যিক প্রবন্ধ লেখা হয়েছিল, সবের সারসংগ্রহ ও যুক্তিযুক্ত সমালোচনা এতে পাওয়া যাবে। সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীতে

দুরূহ জিনিষের জটিলতা ভেদ করে তার মর্মকথা ব্যক্ত করবার যে অসাধারণ ক্ষমতা পাউলির মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে, বর্তমানে খুব কম বিজ্ঞানীর মধ্যেই এটি দেখতে পাওয়া যায়। তাঁরা বেশীর ভাগ নিজের বিশেষ ক্ষেত্রের খবর রাখেন ও সেই কথাই ভাবেন সব সময়। কোয়াণ্টামবাদের উপর এইভাবের দুটি মূল্যবান প্রবন্ধ Handbuch-d, Physik-এ লিখেছিলেন—পাউলির বয়স তখন ছাব্বিশ ছাড়ায় নি। সেগুলি বহু নব বিজ্ঞানব্রতীদের ভাবনার খোরাক ও আঁধারে আলো দেখিয়েছে। মিউনিকের পড়া শেষ হলো। পাউলি গেলেন বরের কাছে কোপেনহেগেনে। সেটি তখন উচ্চাভিলাষী নব যুব-বিজ্ঞানীদের তীর্থক্ষেত্র। মাত্র কয়েক বছর আগে নতুন ভাবে পরমাণু থেকে আলোর উৎপত্তির কারণ নির্ধারণ করে পদার্থবিদ্যার এক নতুন দিক খুলে দিয়েছিলেন বর। তাঁর আগে, অণু-কেন্দ্রের আকর্ষণে সংযত থেকে লঘু ইলেকট্রনগুলি কাঁপছে আর ঈথারে উঠছে তার বৈদ্যুতিক তরঙ্গ, নানা ছন্দের—মাত্রার তীব্রতা সুউচ্চ হলেই আলোর বিকিরণ হলো—এই ছিল সনাতনী মতবাদ। বর জানালেন, স্পন্দিত হলে বা নিয়ত প্রদক্ষিণ করতে থাকলেও বস্তুর অভ্যন্তরের ইলেকট্রন কার্যশক্তি ঈথারে অর্পণ করে না। তবে হঠাৎ কোন বিপর্যয়ে এক পথ ছেড়ে অন্য পথে পরিবেষ্টন সুরু করলে যদি আগের জমার থেকে অল্প কার্যশক্তিতে চলে, তবে বাড়তি যা, তা ঈথারে দিতে পারে। তখনই শুধু একছন্দা আলোকতরঙ্গের উৎপত্তি হয়। এই ভাবে হাইড্রোজেন নানাভাবে নানাস্থানে—এমন কি, দূর নক্ষত্রদেশে যে আলোর বর্ণালীর সৃষ্টি করছে, তার সম্পূর্ণ ও সন্তোষজনক কারণ নির্দেশ করে বর বিজ্ঞানের ইতিহাসে অমর হয়ে রইলেন। আরও এগিয়ে চললেন বর। যে কোন কেন্দ্রকে বেষ্টন করে পরমাণুর মধ্যে যে সব ইলেকট্রন ঘুরছে, তাদের সজ্জার বর্ণনা দেবার চেষ্টা করলেন। গতিপথ বর্ণিত হচ্ছিল নিউটনীয় গতি-সূত্রের সাহায্যে। ইলেকট্রনসমূহের পরস্পরের উপর প্রভাবের কথা আপাততঃ ছেড়ে দিয়ে পজিটিভ বিদ্যুৎকে ভাবলেন প্রধান নিয়ামক। তবে ভ্রমবেগ বা কার্যশক্তির পরিমাপ করতে যে নতুন কোয়াণ্টামবাদের অবতারণা করলেন, তার ফলে দুটি বিশেষ পূর্ণ সংখ্যা সব ক্ষেত্রেই এসে জুটলো (N এবং K) ও ক্লাসিকীয় পথের নিরবচ্ছিন্ন ও অশেষ সম্ভাবনার মধ্যে বিশেষ একজাতীয় পথের সারি এই ভাবে চিহ্নিত হলো। পরমাণুর কেন্দ্রস্থানে ভরবস্তু ও পজিটিভ বিদ্যুৎ একত্র সংহত হয়ে রয়েছে। চারদিকে ঘুরছে কতকগুলি ইলেকট্রন (N. K.) চিহ্নিত পথে। দুই ভিন্নধর্মী

বিদ্যুতের সমাবেশে—কণার বাইরে—বিদ্যুৎ-বলের বিশেষ প্রকাশ নেই। নির্দিষ্ট ইলেকট্রন-সংখ্যা দিয়ে প্রত্যেক পরমাণুর ক্ষেত্রে এটি ঘটছে। কেন্দ্রের নিকটের কয়েকটি গতিপথ (N. K. চিহ্নিত) এই ভাবে পূর্ণ হয়ে রইলেও চিহ্নিত গতি-পথগুলি সংখ্যায় অসীম। বিশেষ তাড়নে কোন ইলেকট্রন বেশী শক্তিমান হয়ে ক্ষণিকের জন্যে বাইরের কোন শূন্য পথ অধিকার করলেও আবার শেষ অবধি নিজের জায়গায় ফিরে যায়—উত্তেজনার অবসান হলে বাড়তি শক্তি ঈথারে অর্পিত হয়। আলোকের তরঙ্গ বের হয়। আবার এরই উল্টো হলো আলোকতরঙ্গ থেকে শক্তি শোষণের কথা—উপযুক্ত শক্তি পেয়ে ভিতরের ইলেকট্রন বাইরের খালি পথে চলে যায়।

পদার্থবিদ্যার এই বিশেষ প্রয়োজনীয় মতবাদ প্রচার করে বর ক্ষান্ত রইলেন না। পরমাণুর সাধারণ গঠন-পদ্ধতি কি ভাবে বস্তুর ব্যবহার বা গুণের কারণ হতে পারে, তারই নির্দেশ খুঁজতে লাগলেন। রসায়নশাস্ত্র অনুশীলন করে বিজ্ঞানীরা ভিন্ন ভিন্ন মৌলিক বস্তুর মধ্যে গুণের সাদৃশ্য লক্ষ্য করে অবাক হতেন। নিজেদের সুবিধার জন্যে পরমাণুগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করতেন—যেমন তীব্র-ক্ষার (Alkali), মৃদু-ক্ষার (Alkaline earth) হ্যালোজেন (Halogen), গন্ধকগোষ্ঠী (Sulpher group) ইত্যাদি। বহু বছরের অভিজ্ঞতায় অর্জিত পদার্থসমূহের মধ্যে বিভিন্ন গুণের অভিব্যক্তির তথ্য বুঝাতে বিখ্যাত রুশবিজ্ঞানী মেণ্ডেলইয়েফ এক ছক প্রস্তুত করেছিলেন। ছকে আটটি কলাম ও অনেক সারি। ভরসংখ্যায় বৃদ্ধির ক্রম অনুসারে হাইড্রোজেন থেকে সুরু করে শুদ্ধ বস্তুগুলিকে সাজিয়ে মেণ্ডেলইয়েফ দেখালেন, ছকে সদৃশ মৌলিক বস্তুগুলি একই কলামে স্থান পাচ্ছে। তবে মধ্যে মধ্যে ঘর খালি রয়ে গেল ছকে। বিজ্ঞানী বললেন—মৌলিক পদার্থগুলি, যাদের এই সব ঘরে স্থান—তারা এখনো আবিষ্কৃত হয় নি। তবে অবস্থানের দিকে দৃষ্টি করে অনাগতদের গুণের ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়। বর ভাবলেন, পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রনগুলি যে ভাবে সজ্জিত আছে—তাই প্রতিফলিত হচ্ছে ছকটিতে, ইলেকট্রন-সজ্জার সঙ্গে বস্তুর গুণের যে সম্পর্কের নির্দেশ পাচ্ছি—সেটি আবিষ্কার করা দরকার।

১৯২১ সালে এই প্রসঙ্গের অবতারণা করে বর বলেছিলেন, কেন্দ্র থেকে দূর পথে যে ইলেকট্রনগুলি ঘুরছে, অপেক্ষাকৃত অল্পায়াসেই তাদের গতিপথ থেকে বিচ্যুত করা সম্ভব। উত্তেজিত হয়ে তখন তারা আলো বিকিরণ করবে, আবার

ভিন্ন কণাগুলি কাছে আসলে—বস্তুর মধ্যে রাসায়নিক আসক্তি বা সংযুক্তি তারাই ঘটাবে। মেণ্ডেলইয়েফের একই কলামে অবস্থিত পরমাণুর সারির বহিরঙ্গটি সচল ইলেকট্রন দিয়ে একই ভাবে সজ্জিত রয়েছে। এই ভাবনাই যুক্তিযুক্ত তাঁর মনে হলো।

১৯২১-এর পর থেকে বরের বিজ্ঞানী ছাত্রেরা পরমাণু থেকে উদ্ভূত বর্ণালীর মধ্যে রেখা-সজ্জার বৈচিত্র্যের কথা ভাবছিলেন। এবার তথ্যগুলি অপেক্ষাকৃত জটিল শ্রেণীর। কোথাও পাচ্ছিলেন রেখাযুগ্মের শ্রেণী, কোথাও রেখাত্রয়ীদের বা আরও বহুল রেখামালার সুসম্বদ্ধ শ্রেণী। ঐ বৈচিত্র্যের সঙ্গে মেণ্ডেলইয়েফের বিভিন্ন কলামের সম্পর্ক স্থির করা তাঁদের লক্ষ্য ছিল। পাউলি যখন গিয়ে পৌঁছলেন, তখন Zeeman (জেমান) সাহেবের আবিষ্কৃত এক ঘটনার সমালোচনা চলছিল। শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে পড়লে পরমাণুর বর্ণ-রেখাগুলি নানাভাবে রূপান্তরিত হতে দেখেছেন জেমান। সনাতনী প্রথায় তার কারণ নির্ণয়ের প্রয়াসও হয়েছিল। বর সাধারণভাবে বুঝেছিলেন, পরমাণুর ইলেকট্রন-সজ্জার পরিবর্তন আসবে এই নতুন অবস্থায়। তার ফল বর্ণনা করতে একটা নতুন কোয়াণ্টাম-সংখ্যা আনবার দরকার। সেটি জ্ঞাপন করবে চৌম্বক ক্ষেত্রের শক্তি-তলের সঙ্গে গতি-তলের সম্পর্ক। এইবার পথগুলিচিহ্নিত করতে লাগবে তিনটি পূর্ণসংখ্যা (n, k,m) এবং $n \geqslant k \geqslant m$.। চৌম্বক ক্ষেত্র Larmor-নিয়ম অনুসারে গতিপথে অপেক্ষাকৃত (ইলেকট্রন পথে যে বেগে ঘুরছে তার থেকে) মৃদু ঘূর্ণন সৃষ্টি করবে। এটিকে Larmor-Precession বা লারমরের কথিত অয়ন-চলন বলা যাবে। এর ফলে গতিপথের কার্যশক্তি একটি সরল নিয়মে বৃদ্ধি পাবে। বাড়তি কার্যশক্তি হবে $\triangle E = m\frac{H.h}{2\pi}$। তার পরে গতি-বিপর্যয়ের ফলে যে শক্তি ঈথারে অর্পিত হবে, তার আলোচনা করে তিনি বলেছিলেন—প্রত্যেক রেখার পরিবর্তে তিনটি সমান্তরালে অবস্থিত রেখাত্রয়ী আমরা পাব—যার অন্তর-শক্তি বৃদ্ধি হলে নির্দিষ্টভাবে বৃদ্ধি পাবে। ব্যাপারটি বস্তুতঃ অনেক বেশী জটিল দাঁড়ালো। মাঝে মাঝে বরের কথামত রেখাত্রয়ীর সাক্ষাৎ মিললেও সাধারণতঃ বর্ণরেখার পরিবর্তে ঘনসম্বদ্ধ নানাবিধ প্যাটার্ণের সৃষ্টি হতো। এই প্যাটার্ণের রেখার সংখ্যা ও বিন্যাসের নিয়ম সকলে ব্যগ্র হয়ে অনুসন্ধান করছিলেন। তাঁরা ভাবছিলেন, N-সংখ্যা 1, 2, 3—এইভাবে বৃদ্ধি পেয়ে K-L-M ইত্যাদি অন্তর বলয়ের নির্দেশ দিয়েছে। X-ray পরীক্ষার

দ্বারা একথা Mosely প্রমাণ করেছেন। হয়তো অন্তরের পূর্ণচক্রে অবস্থিত ইলেকট্রন ভিতর থেকে প্রভাব বিস্তার করে এক চৌম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি করছে, যার ফলে বর্ণালীর মধ্যে বহু রেখামালার সমাবেশ দেখছি—আবার হয়তো Zeeman পরীক্ষার সময় এই অন্তর শক্তিক্ষেত্র বাইরের শক্তিমান H-ক্ষেত্রকে ঈষৎ পরিবর্তিত করে জটিল প্যাটার্ণেরও সৃষ্টি করছে। পাউলি ভাবতে ভাবতে কোপেনহেগেন থেকে হামবুর্গে ফিরলেন। এখানে তাঁর চিন্তাধারা গেল সম্পূর্ণ নতুন পথে। তিনি বললেন, অন্তর চক্রদের ভ্রমবেগকে এই সব বিষয়ে দায়ী করলে চলবে না। উদাহরণস্বরূপ পাড়লেন ক্ষারীয় ধাতুশ্রেণীর কথা। Preston আবিষ্কার করেছিলেন, যেমন এদের বর্ণালীর মধ্যে দেখা যায়, একই ধরণের রেখাযুগ্মের শ্রেণী, তেমনি এদের উপর বাইরের চৌম্বক শক্তির প্রক্রিয়ায় একই ধরণের প্যাটার্ণের সৃষ্টি হয়—যার বিন্যাস (লঘু-গুরু নির্বিশেষে সব পরমাণুর সময়) শুধু বাইরের ক্ষেত্রবলের উপরই নির্ভর করছে। অন্যভাবে কার্যশক্তির বিচারে গুরু ও লঘু একই শ্রেণীর ইলেকট্রনগুলির বিভিন্ন ক্ষারীয় ধাতুর মধ্যে অন্তর অনেক বেশী। তাদের কোন প্রভাব থাকলে নিশ্চয়ই Preston-এর পরীক্ষায় ধরা পড়তো। শেষ অবধি বাইরের ইলেকট্রনটিকেই দায়ী করতে হবে। বর্ণালীর মধ্যে যুগ্মরেখার বিন্যাস বা Larmor-এর অয়ন নীতিভঙ্গের একই কারণ। কোয়াণ্টাম-নির্দিষ্ট গতিপথের দ্বৈতভাব কোয়াণ্টামবাদ থেকেই উদ্ভুত হয়েছে বলতে হবে। সনাতন রীতিতে এই বৈচিত্র্য হৃদয়ঙ্গম হবে না। এই দ্বৈতভাব প্রকাশ করতে পরিচিত কোয়াণ্টাম-সংখ্যা (N,K.M)-এর সঙ্গে যুক্ত হলো আর একটি s, যার মান কোন এক বিশেষ ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট দুইয়ের মধ্যে মাত্র একটি হতে পারে। পাউলি শিক্ষা দিলেন এইভাবে—যে পথকে আমরা চারটি সংখ্যা (N. K. m. s) দিয়ে নির্দিষ্ট করতে পারবো, সেই পথে ঘুরতে দেখবো মাত্র একটি ইলেকট্রনকে। তার চক্র সে একলাই পূর্ণ রাখবে। এই হলো বিখ্যাত পরিবর্জন নীতি (Exclusion Principle)। পাউলির এই পরিকল্পনায় বস্তুর মধ্যে ইলেকট্রনের সমাবেশের একটা যুক্তিযুক্ত কারণ মিললো। মেণ্ডেলইয়েফের ছকের বৈশিষ্ট্য এইভাবে ইলেকট্রন-সংখ্যা ও সমাবেশের সঙ্গে সংযুক্ত করা সম্ভব হয়েছে। এই ভাবে Spin-এর পরিকল্পনা কোয়াণ্টামবাদে এসে পড়লো। পরে এই Spin আর শুধু ইলেকট্রনকে আশ্রয় করে নেই। নানা মৌলিক-কণা, যথা—প্রোটোন ও নিউট্রনের মধ্যে এর প্রকাশ আমরা দেখতে পাচ্ছি। পদার্থ-বিজ্ঞানে একটা বিশেষ সংখ্যায়ন-রীতির উদ্ভব হয়েছে। পাউলির পরিবর্জন রীতি তার

প্রাণস্বরূপ। উজ্জ্বল প্রতিভাদীপ্ত দৃষ্টিতে পাউলি অনেক নতুন সত্যদর্শন করেছেন। অনেক নতুন কথা তুলেছেন, যা খুব গুরুত্বপূর্ণ ও নানা সূক্ষ্ম পরীক্ষার ফলে তাঁর মতই সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তেজক্রিয়ার ক্ষেত্রে নিউট্রিনোর পরিকল্পনা এর এক উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা চলতে পারে। এক সময়ে হাইসেনবর্গ (Heisenberg), জরদানের (Jordan) সঙ্গে একত্র হয়ে পাউলি বৈদ্যুতিক তরঙ্গ-ক্ষেত্রের কোয়াণ্টামরূপের সঙ্গে আপেক্ষিকবাদের সমন্বয় করতে চেয়েছিলেন। পাউলি প্রথমে আপেক্ষিকবাদকে বরণ করে পদার্থবিদ্যার অনুশীলনের ক্ষেত্রে নেমেছিলেন। পরে কোয়াণ্টাম ও আপেক্ষিকবাদের ভিত্তিমূলক পার্থক্য আইনস্টাইন একভাবে দেখেছিলেন, বর এবং পাউলি অন্যভাবে দেখতেন এবং ক্রমশঃ সেই ভাবনাই আইনস্টাইনকে বর ও পাউলি থেকে দূরে নিয়ে গিয়েছিল।

১৯৫৫ সালে বার্ণে এক আন্তর্জাতিক সভা আহূত হয়। আইনস্টাইন এখানে আসতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। বার্ণে থেকেই ১৯০৫ সালে আপেক্ষিকবাদ তিনি প্রচার করেছিলেন—সেটি ওই মতবাদের প্রথম ও বিশেষ রূপ। পঞ্চাশ বছর অতীত হবার পর বিজ্ঞানীরা সকলে, যাঁরা এই মতবাদ নিয়ে নানা অনুসন্ধান করছিলেন—তাঁরা সকলে সমবেত হয়েছিলেন আইনস্টাইনকে সম্বর্ধনা জানাতে। দুঃখের বিষয় সভা বসবার আগেই আইনস্টাইনের দেহান্তর ঘটলো। এই সভায় পাউলি ছিলেন মূল সভাপতি। তাঁর ভাষণ কোয়াণ্টামবাদ ও আপেক্ষিকবাদের অনৈক্য নিয়ে। এর মধ্যে অনেক ভাববার কথা আছে। এটি আমি স্বতন্ত্র অনুবাদ করেছি।

১৯২৮ সাল থেকে সুরু আর জীবনের শেষ পর্যন্ত পাউলি জুরিখে টেক্‌নিক্যাল কলেজে অধ্যাপনা করতেন। ১৯৪৫ সালে তাঁকে Nobel Prize দিয়ে অভিনন্দিত করা হয়। ১৯৫৮ সালের ১৫ই ডিসেম্বর এই ক্ষণজন্মা বিজ্ঞানীর তিরোধান ঘটলো। তাঁর ছাত্র Fierz তাঁর জীবনকথা আলোচনা করেছেন (Nuclear Physics, Vol. 10)। তাথেকে এই প্রবন্ধ লিখতে অনেক সাহায্য পেয়েছি।

দেশ-বিদেশে বেতার চর্চা

আদিপর্ব

বসু বিজ্ঞান মন্দিরে অগ্নিকাণ্ডের খবর বেতারে শুনলাম দিল্লী থেকে। ছাত্রজীবনে অহরহ যে বিজ্ঞানসাধকের সাক্ষাৎ পেলে নিজেকে ধন্য মনে করতাম তাঁরই সৌম্য মূর্তি চোখের সামনে ভেসে উঠলো।

প্রায় ষাট বছর হতে চললো। প্রেসিডেন্সি কলেজের দোতলার গ্যালারীতে আমরা জুটেছি সকলে। সেদিন প্রোফেসর বসু* তাঁর নিজস্ব অনুসন্ধান ও আবিষ্কারের কথা বলবেন। সামনের লম্বা টেবিলে সাজান রয়েছে সব যান্ত্রিক সরঞ্জাম! নাম ডাকা শেষ করে খাতাপত্র গুটিয়ে পাশের ছোট কামরায় গিয়ে বসেছেন বরদাবাবু। এবার এসে উপস্থিত হলেন জগদীশচন্দ্র।

অমরা মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনে চলেছি। ম্যাক্সওয়েল তাঁর থিয়োরী থেকে অঙ্ক কষে বলে গেছেন, আলোকতরঙ্গ আসলে চুম্বক ও বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের জড়াজড়ি করে ঈথারে যুগপৎ প্রসারন। এতদিন আসর জুড়ে ছিল ঈথারের কথা! বলা হত এটি বিশ্বব্যাপী মাধ্যম—আলোক তারই তরঙ্গ! তবে আলোর প্রসার বুঝাতে ঈথারে আরোপ করা হত নানা গুণ যার সমন্বয় ও একত্র অবস্থান অসম্ভব ঠেকবে। স্থিতিস্থাপকতায় সে ইস্পাতকেও ছাড়িয়ে যায়, আবার এদিকে এত পাতলা, ক্ষীণভার যে, জগতের গ্রহ-তারকা সবাই অবাধে বিচরণ করে তার ভিতরে। এইসব পরস্পর বিরোধী গুণের সহবাসের ফলে আলোক সৃষ্টি। উদাহরণস্বরূপ জলের ঢেউয়ের প্রসাররীতির কথা উঠতো। ম্যাক্সওয়েল এবার আনলেন সম্পুর্ন নতুন ধরনের কল্পনা। মহাকাশে বিদ্যুৎ-শক্তি ক্ষেত্রের দ্রুত পরিবর্তন, তারই ফলে চুম্বক ক্ষেত্রের উৎপত্তি, ও এই দুই মিলে বৈদ্যুতিক তরঙ্গের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করলেন—ম্যাক্সওয়েল। তাঁর সমীকরণের মধ্যে প্রচ্ছন্ন রইল আলোর রেখাচ্ছবি! এই থিয়োরির প্রাণ প্রতিষ্ঠা করলেন হাইন্‌রিক হার্ৎস, নিপুণ পরীক্ষা চালালেন ১৮৮৫-৮৭ সালে। আলোক সহজে আয়নায় প্রতিফলিত হয়! ত্রিশির কাচে আমরা সূর্য্য কিরণকে বিচ্ছুরিত করি—লাল থেকে বেগুনীর বর্ণালীছত্র বেরিয়ে আসে। এ সব পরীক্ষা আমরা নিজেরাই করেছি কলেজের পরীক্ষাশালায়। বর্ণালী-বিশ্লেষণ, ব্যতিচার-প্রতিফলন সবই চলে Spectro-Meter এর ওপর! ছোট যন্ত্রটি অনায়াসে এক হাতে তুলে

* আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু

ঘরের এক কোণ থেকে অন্যখানে নিয়ে নতুন করে সাজান চলে। Collimeter Telescope, কাচের ত্রিশিরখণ্ড পকেটে নিয়ে বেড়ান চলে।

বিদ্যুৎতরঙ্গে ওইরূপ গুণাবলী প্রমাণ করতে হার্ৎসকে প্রকাণ্ড হলে বড় বড় যন্ত্র সাজাতে হয়েছিল। কাচের প্রকাণ্ড ত্রিশির ঢালাই করতে হয়েছিল যাকে ঘোরাতে নাড়াতে তিনজন লোকের দরকার হয়। যে সব তরঙ্গ হার্ৎস উঠালেন—তার দৈর্ঘ ছিল কয়েক মিটার। আলোক তরঙ্গের দৈর্ঘ্য অবশ্য মাপতে এক মিলিমিটারকেও দশ হাজার ভাগ করে নিতে হয়। সারা বিশ্বের বিজ্ঞানী মহলে হার্ৎসের সাফল্যে সাড়া পড়ে গেল। চেষ্টা চল্‌তে লাগলো তরঙ্গের উৎপত্তি ও তার আগমনের সঙ্কেত, আরও সন্তোষজনকভাবে কি ভাবে করা বা ধরা যায়। তারই ব্যবস্থা করতে আসরে নামলেন—Lodge Branley প্রমুখ নানা দেশের নানা বিজ্ঞানী এদিকে হার্ৎস মারা গেলেন ১লা জানুয়ারী ১৮৯৪। তখনি বৈদ্যুতিক তরঙ্গের বিষয়ে নানা পরীক্ষা হয়েছে নানা দেশে। তরুণ বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র কৃতবিদ্য হয়ে লণ্ডন থেকে ফিরে কলকাতায় শিক্ষকতা করছেন। কয়েক বৎসর নতুন বিজ্ঞান ক্ষেত্র উদ্ভাসিত হয়েছে। এর আকর্ষণে তিনিও মেতে উঠলেন। ১৮৯৫ সালে এশিয়াটিক সোসাইটির সাময়িকীতে প্রকাশিত হ'ল—তাঁর পরীক্ষার কথা।

দেশের লাটের সভাপতিত্বে যে বিদ্বৎ মণ্ডলীর আবাহন করা হয়েছিল—তাঁদের চমকৃত করলেন, এক ঘর থেকে অনেক দূরে সঙ্কেত পাঠালেন বেতারের সাহায্যে। লাটের সামনে দাঁড়িয়ে চাবি টিপলেন—দূরে পিস্তলের বিস্ফোরণ ঘটলো। তারপর নানাভাবে যন্ত্রের অনেক উন্নতি হ'ল। শুনাযায় মাইলখানেক দূরে কলেজ থেকে নিজের বাসভবনে তিনি বেতারে সঙ্কেত পাঠাবার চেষ্টা করেছিলেন। অবশ্য বেশী মনোযোগ দিয়েছিলেন ছোট চালের তরঙ্গ সৃষ্টি করতে—তাঁর প্রেরকযন্ত্রে ২ মিলি মিটর তরঙ্গের উৎপত্তি হ'ত আর সঙ্কেত ধরতেন বিশেষ ধরনের আহরক যন্ত্রে। সবই তাঁর নিজস্ব সৃষ্টি। আলোকের সুপরিচিত সমস্ত গুণই যে বৈদ্যুতিক তরঙ্গে বর্তমান তা যন্ত্রের সাহায্যে অনায়াসে দেখাতে পারতেন জগদীশচন্দ্র। ১৮৯৬ সালে লণ্ডনে রয়্যাল সোসাইটিতে বক্তৃতা দিয়ে বিজ্ঞানী মহলে সমাদর পেয়েছিলেন। দেশে ফিরে এসে কিছুদিন পরীক্ষা চালালেন—উন্নত ধরনের সঙ্কেতগ্রাহক তৈরী করতে। ছোট চালেরও তরঙ্গ নিয়ে পরীক্ষা করতে আজও তাঁর পদ্ধতি অনুসৃত হচ্ছে। শেষে অনুসন্ধিৎসা তাঁকে নিয়ে গেল জৈব ও অজৈব সম্মেলন ক্ষেত্রের সীমানায়। রাসায়নিক, যান্ত্রিক বা বৈদ্যুতিক

উত্তেজকের তাড়নায় প্রাণী বা উদ্ভিদের তন্তু সাড়া দেয়—যতক্ষণ সে বাঁচে —পরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে উপর্যুপরি উত্তেজনার দৌরাত্ম্যে—এসব জানতেন জৈব বিজ্ঞানী—যন্ত্রে তার নিদর্শন রেখা ফুটিয়ে তোলা যেত। জগদীশচন্দ্র সেইভাবে জড়বস্তু থেকে উত্তেজনার পরে সাড়ার সঙ্কেত খুঁজে পেলেন—তাঁর যন্ত্রে লেখা হল সে সব কথা। এই নিয়ে তিনি মেতে রইলেন ও ক্রমে ক্রমে পদার্থ বিদ্যার থেকে অনেক দূরে সরে গেলেন। আমরা যখন ছাত্র হিসেবে কলেজে যোগ দিয়েছি—তখন তাঁর উদ্ভিদ নিয়ে পরীক্ষার মরশুম চলছে। তবু বিজ্ঞানের তরুণ ছাত্রদের কাছে প্রাথমিক আবিষ্কারের কথা বলতে তাঁর ভাল লাগত। নানা কাজে ব্যস্ত থাকলেও ফিজিক্সের চতুর্থ বার্ষিকী শ্রেণী ছাত্রদের জন্য তিনি নিজের হাতে বৈদ্যুতিক তরঙ্গের নানা গুণের চাক্ষুস প্রমাণ দেখাতেন। সেই বক্তৃতার কুহক আমাদের সম্মোহিত করত। স্মৃতিতে আজও তাঁর কথা খোদা রয়েছে।

এরই কিছুদিন আগে থেকে সকলের মুখে মার্কণীর নাম শোনা যাচ্ছে। দেশ থেকে দেশান্তরে—আয়ার্লণ্ড থেকে আমেরিকায় খবর প্রথমে পাঠিয়েছেন—বড় বড় বিজ্ঞানীরা কেউই এ সম্ভাবনায় তখন বিশ্বাস করত না। তারপর অনেক উন্নতি হ'ল তাঁর প্রেরকের। জাহাজে জাহাজে বসল সে সব যন্ত্র। ১৯০৯ সালে নোবেল প্রাইজ অর্জন করে সারা বিশ্বে বিখ্যাত হলেন মার্কণী। দেশে তখন স্বাদেশিকতার বিপুল বন্যা ডেকেছে। আমরা বসুর বক্তৃতার পর আলোচনা করছি— জগদীশ বোস ইচ্ছা করলেই মার্কণীর মত দেশে বিদেশে বেতারে বার্তা পাঠাতে পারতেন, বিদেশী সরকার তাঁকে যদি একটু বেশী সুযোগ-সুবিধা দিত। অবশ্য এভাবে নিজের বিদ্যাকে অর্থাগমের উপায়ে পরিণত করার কোন প্রয়াস বা আকাঙ্খা ছিল না তাঁর—বোসের জীবনীকার এই কথার ওপর বেশী জোর দিয়েছেন। নিপুণ বিজ্ঞানী যে সব যন্ত্র গড়ে তুলেছিলেন, পেটেন্ট নিয়ে তার সর্বসত্ব সংরক্ষণ করতেও তিনি ছিলেন বীতরাগ। শেষ বয়সে তাঁর মন চেয়েছিল জড় ও জীবের মধ্যে একই চৈতন্যের বিকাশের মুলসূত্র খুঁজে বের করতে। তারই জন্য বসু বিজ্ঞান মন্দিরের প্রতিষ্ঠা। তাঁরই নির্দেশে তাঁরই প্রস্থিত পথেই এখনো নানাভাবে পরীক্ষা চলছে সেখানে। তাঁর শিষ্যেরা অনেক অমূল্য তথ্য সঞ্চয় করেছেন। দুর্ভাগ্যের বিষয়, আকস্মিক অগ্নির উৎপাতে অনেক দামী কাগজ, বই, নথিপত্র ও গবেষণার যন্ত্রপাতি নষ্ট হয়ে গেল। এর কিছুদিন আগে ছাত্রদের প্রগল্ভ তাণ্ডবে প্রেসিডেন্সি কলেজে যে সব কক্ষে গবেষণা চালাতেন জগদীশচন্দ্র তারও অনেক ক্ষতি হয়েছে শুনেছি।

জৈব বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার

জৈববিজ্ঞানে মৌলিক গবেষণার জন্যে এবছর (১৯৬৫) ফ্রান্সের তিনজন বিজ্ঞানী নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। এঁদের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ—আঁদ্রে লুয়ফ (Andre' Lwoff) জন্মেছেন ১৯০২ সালে। জ্যাক মনো (Jacques Monod) বয়সে এখন পঞ্চাশ পার হয়েছেন। সর্বকনিষ্ঠ, ফ্রাঁসোয়া জ্যাকব (Francoias Jacob), বয়স মাত্র ৪৫।

লুয়ফের পিতা রুশদেশ থেকে এসে ফ্রান্সে বসতি করেছিলেন। তিনি মানসিক বিকারের চিকিৎসক। পুত্র আঁদ্রে যথারীতি চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন করে ১৯২১সালে পাস্তুর ইনস্টিটিউটে যোগ দিয়েছিলেন। জীবাণু, ছত্রাক ইত্যাদি প্রাথমিক স্তরের প্রাণী, যাদের প্রাণবৃত্তি ও বংশবৃদ্ধি অপেক্ষাকৃত সহজবোধ্য ও সরলভাবে সম্পন্ন হচ্ছে, তারাই হলো লুয়ফের গবেষণার বস্তু। অণুবীক্ষণ ছাড়া এই জগতের খবর পাওয়া যায় না। তা ছাড়া ব্যাক্টিরিয়ার শত্রু ফাজ্ নিয়েও অনেক কাজ আছে লুয়ফের। জীবাণুর বৃদ্ধি, পুষ্টি ও বিনাশ নিয়েই এযাবৎ নানাবিধ পরীক্ষার ফলে লুয়ফ অনেক তথ্য আবিষ্কার করে যশস্বী হয়েছেন। প্রাণশক্তির অভিব্যক্তি বুঝতে বিজ্ঞানীদের কাছে এককোষী জীবাণুর দাম অসামান্য। প্রাণের প্রয়োজনীয় সব প্রক্রিয়াই এদের অণুকোষের মধ্যে সম্পন্ন হচ্ছে। উচ্চাঙ্গের প্রাণীর শরীরও অগণিত জীবকোষের সমষ্টি। তিনজন ফরাসী বিজ্ঞানীর পরীক্ষার বস্তু বেশীর ভাগ সময় একপ্রকার জীবাণু—(Coli bacillus) হলেও তাঁরা প্রাণের অভিব্যক্তির বিষয়ে যে সব মৌলিক তত্ত্ব আবিষ্কার করেছেন, অতিকায় প্রাণীদের শারীরতত্ত্ব বুঝতেও সেগুলি বিশেষ কার্যকরী হবে।

১৯৩০ সালের মধ্যেই লুয়ফ যশস্বী হয়েছিলেন আণুবীক্ষণিক প্রাণীদের পরিপাক সম্পর্কিত কয়েকটি আবিষ্কারে। আজকাল আমরা উচ্চাঙ্গের প্রাণীর পুষ্টি ও বৃদ্ধির ব্যাপারে নানাবিধ খাদ্যপ্রাণের (Vitamin) একান্ত প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পেরেছি। খাদ্যের প্রাচুর্য সত্ত্বেও অনেক সময় জীব তার খাদ্যের সম্যক পরিপাক

ও ব্যবহার করতে পারে না এদের অভাবে। কণা-প্রমাণ ভিটামিনের অভাবে আমরা অনেক সময় নানাবিধ রোগের কবলে পড়ি, সে তথ্যও আজকাল প্রায় সকলেই বুঝেছি। লুয়ফের কৃতিত্ব ছিল—বৃদ্ধি ও পুষ্টির জন্যে জীবাণুদের খাদ্য ছাড়াও যে এরূপ অতি প্রয়োজনীয় কণা-প্রমাণ নানা দ্রব্যের আবশ্যক আছে, তা হৃদয়ঙ্গম ও সপ্রমাণ করা। নানাবিধ পরীক্ষা করে তিনি দেখিয়েছিলেন, খাদ্যকে পরিপাক করে শরীরের উপযোগী বস্তুতে রূপান্তরিত করতে যে সব বিশেষ বিশেষ অনুঘটক (Catalyst) বা জারকের (Enzyme) আবশ্যক, জীবাণুকোষ সেগুলি তৈরী করতে সক্ষম হলেও তাদের গুণ ও শক্তিবর্ধক কতকগুলি সহকারী বস্তুর অভাব পড়লে জীবাণুর স্বাভাবিক প্রাণবৃত্তি বা বংশবৃদ্ধির ব্যাঘাত জন্মে। অনুসন্ধানের ফলে লুয়ফ স্থির করলেন, যেগুলিকে জীবকোষ নিজে তৈরী করতে পারে না, সেগুলিকে খাদ্যরসের সঙ্গে বাইরে থেকে সংগ্রহ করতে হয়। এদের অভাবে খাদ্যের প্রাচুর্য সত্ত্বেও জীবাণুকোষগুলির দ্রুত বর্ধন বা প্রজনন হয় না। যখন ভাবা যায় উচ্চশ্রেণীর প্রাণীর পক্ষে ভিটামিনের কার্যকারিতা ১৯৩০ সালে সবেমাত্র উন্মেষ হতে সুরু হয়েছে বিজ্ঞানীমহলে, তখন লুয়ফের এই আবিষ্কার আমাদের সত্যই বিস্মিত করে।

জ্যাক মনো ১৯৪৫ সালে পাস্তুর ইনস্টিটিউটে যোগ দিয়েছিলেন। এর আগে ১৯৪১ সালে পারী বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি থিসিস উপস্থাপিত করেছিলেন—সংক্রামিত মাধ্যমে (culturemedia) আণুবীক্ষণিক মাইক্রোবের পালন, তাদের পরিপাক ও পুষ্টিই ছিল তাঁর এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু। আণুবীক্ষণিক প্রাণীর জীবন-কথা সাধারণ মানুষের কৌতুহল উদ্রেক করতে পারে না—এই ছিল সেই সময় তাঁর পরীক্ষক পণ্ডিতগণের অভিমত। কিন্তু আজকাল যাঁরাই জৈবরসায়ন ও বংশ-ধারা সংরক্ষণ সংক্রান্ত নানা গবেষণার কাজে নিযুক্ত রয়েছেন, তাঁদের কাছে মনোর এই আদি থিসিসটি অতি প্রয়োজনীয় প্রাথমিক জ্ঞানের ভাণ্ডার ও বিচিত্র পরীক্ষা পদ্ধতির নির্দেশক হিসাবে সমাদৃত হচ্ছে।

ফ্রাঁসোয়া জ্যাকব হচ্ছেন মুলতঃ প্রজননবিদ্যার গবেষক। কিভাবে জীবাণু-দের বিশেষ ধর্ম বংশানুক্রমে সংরক্ষিত হচ্ছে। জীবাণুদের সঙ্গমের ফলে কিভাবে বংশধরদের প্রকৃতির অদল-বদল হচ্ছে, এই নিয়েই তিনি বরাবর অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছেন। ইনি পাস্তুর ইনস্টিটিউটে যোগ দিয়েছেন ১৯৫০ সালে। এই

তিনজন বিজ্ঞানীর প্রাথমিক চিন্তা দৃশ্যতঃ ভিন্নধর্মী হলেও তাঁদের মধ্যে মূলগত ঐক্য রয়েছে। তাঁদের যৌথ কাজ ও ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে অনুসন্ধানের ফলে জীবকোষ, তার ধর্ম ও আচরণের বিষয়ে আমরা অনেক নতুন কথা জানতে পেরেছি।

এঁদের অনুসন্ধানের তাৎপর্য আলোচনা করবার আগে জৈব বিজ্ঞানের কতক গুলি মৌলিক কথা স্মরণ করা দরকার। প্রত্যেক জীবকোষের বাইরের প্রাকারের মধ্যে রয়েছে Cytoplasm, আবার তারই মধ্যে কোন একদেশে ভাসমান রয়েছে ক্ষুদ্রকায় নিউক্লিয়াস। গঠনে ও ধর্মে এটি Cytoplasm থেকে পৃথক। বিজ্ঞানী নানারূপ প্রক্রিয়ার দ্বারা কোষের ভিতরের নিউক্লিয়াসের অস্তিত্ব ও তার গঠনবৈচিত্র্য ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন।

এমন সব রঞ্জক পদার্থ আছে, যা জীবাণু সংক্রামিত মাধ্যমের সঙ্গে মিশিয়ে দিলে তার রং নিউক্লিয়াসকেই দৃঢ়ভাবে আশ্রয় করে, ফলে অণুবীক্ষণের নীচে প্রকাশিত হয়ে পড়ে নিউক্লিয়াস ও তার মধ্যের ক্রোমোজোমগুলি (Chromosome)। জীবকোষের নানা অবস্থা অণুবীক্ষণে দেখা যায়। কোষ পুষ্ট হয়ে বিশেষ অবস্থায় উপনীত হলে প্রত্যেক কোষ বিভক্ত হয়ে প্রথমে নতুন ২টি কোষ পরে নতুন কোষের প্রত্যেকটি আবার ওই ভাবেই দ্বিধা বিভক্ত হয়ে যায়। এইভাবে তাথেকে ২-৪-৮-১৬ ইত্যাদি করে বহু নতুন কোষের উদ্ভব হয়। জ্যামিতিক হারে বেড়ে যায় কোষসংখ্যা ও সংক্রামিত মাধ্যমের স্থানে স্থানে গড়ে ওঠে জীবাণুর উপনিবেশ। জীবাণুজড়িত মাধ্যম অণুবীক্ষণের তলায় রাখলে কোষ-বিভাজনের নানা অবস্থা ও বৈশিষ্ট্য চোখে পড়বে। প্রত্যেক কোষ-বিভাজনের সময় নিউক্লিয়াস ও তার মধ্যে দৃশ্যতঃ তন্তুপ্রায় কতকগুলি জিনিষের (Chromosome) বিভাজনও হয়তো দেখতে পাওয়া যাবে। পূর্ব-কোষ থেকে উত্থিত উত্তর-কোষ দুটিতেই এই Chromosome-সূত্রগুলি সমানভাবে পরি-বেশিত হয়।

বিজ্ঞানীরা অনুসন্ধান করে প্রমাণ করেছেন, এই Chromosome প্রাণশক্তির উৎসস্বরূপ। জীবের বংশগত বৃত্তি ও ধর্ম এই Chromosome-গুলিতেই নিবদ্ধ রয়েছে। এই কথা যে শুধু এককোষী জীবাণুর বেলায়ই খাটবে তা নয়, সব প্রাণীর দেহের কোষেরই এই সাধারণ ধর্ম। উচ্চশ্রেণীর জীবের দেহের সর্বত্র এইভাবে কোষের বৃদ্ধি, পুষ্টি ও বিভাজন ঘটে। সঙ্গে সঙ্গে প্রতি অঙ্গের বিবর্ধন ও বয়সের সঙ্গে জীবের গঠন প্রৌঢ়ত্বে উপনীত হয়।

আমরা আজ কাল জেনেছি, ক্ষুদ্রাকার নানারকম জীবাণু সময় সময় মানব বা অন্য প্রাণীর দেহে শত্রুরূপে প্রবেশ করে সেখানে নানা রোগের সৃষ্টি করে এবং পরিশেষে তার নিধন ঘটায়। এরাই ব্যাক্টীরিয়া।

মানুষের নানা রোগের নিদান যে ব্যাক্টীরিয়া, একথা অধুনা চিকিৎসাবিজ্ঞান সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেছে এবং ব্যাক্টীরিয়া থেকে আত্মরক্ষা করবার নানারূপ উপায়ও নিত্য আবিষ্কৃত হচ্ছে।

তবে প্রকৃতির রাজ্যে ব্যাক্টীরিয়ারও সহজ শত্রু বর্তমান রয়েছে। যে মাধ্যমে ব্যাক্টীরিয়া জীবাণু অনায়াসে বেঁচে থাকে ও বংশ বৃদ্ধি করে, কিছু দিন বাদে কোন কারণে সেই মাধ্যমই ব্যাক্টীরিয়ার জীবনযাত্রার পরিপন্থী হয়ে ওঠে। তাদের উপনিবেশগুলি কোন অজ্ঞাত প্রভাবে বিগলিত ও অন্তর্হিত হতে সুরু করে। ওই দূষিত মাধ্যমের নির্যাস টাট্‌কা জীবাণু-সক্রামিত মাধ্যমে মিশালে সেখানেও জীবাণুর মড়ক সুরু হয়। এইভাবে রহস্যময় ব্যাক্টীরিয়োফাজ (Bacteriophage)-এর ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে বিজ্ঞানীর প্রথম পরিচয় ঘটেছিল। পরে ফাজের আকৃতি ইলেক্‌ট্রনমাইক্রস্‌কোপের (Electron microscope) সাহায্যে জানতে পারা গেছে।

জীবাণু-কোষ থেকে অনেক ক্ষুদ্র এর মুণ্ডটি এবং সঙ্গে সরু লম্বা পুচ্ছ। ওরই সাহায্যে ব্যাক্টীরিয়ার গায়ে এরা সংলগ্ন হয়ে যায়। তখন ফাজের বস্তু পুচ্ছ বেয়ে ব্যাক্টীরিয়ার দেহে প্রবেশ করে। ১৫-২০ মিনিটের মধ্যে বাইরের প্রাকার ভেঙ্গে পড়ে, ব্যাক্টীরিয়ার অস্তিত্ব লোপ পায় ও তার বদলে মাধ্যমে বহু সংখ্যক নতুন ফাজ-কণার সৃষ্টি হয়। ফাজের আক্রমণে এভাবে মাধ্যমের ব্যাক্টীরিয়াসমূহের দ্রুত বিলোপ সাধিত হলেও মধ্যে মধ্যে কয়েকটি জীবাণু হয়তো ওই দূষিত মাধ্যমের মধ্যেও টিকে থাকে। তাদের উঠিয়ে নিয়ে আবার নতুন মাধ্যমের মধ্যে ছেড়ে দিলে তারা স্বাভাবিকভাবে পুষ্ট ও পুনঃ পুনঃ বিভক্ত হয়ে এক নতুন জীবাণু-বংশ সৃষ্টি করে, যারা ফাজের আক্রমণ প্রতিরোধ করবার ক্ষমতা কোন অজ্ঞাত উপায়ে অর্জন করেছে বলে মনে হয়।

কেউ কেউ ভাবতেন, এই নতুন ধারার সন্তান-জীবাণুগুলি এক হিসাবে পূর্ব-জীবাণু থেকে পৃথকধর্মী, কারণ এদের প্রত্যেকটির মধ্যেই ফাজ কোন একরূপে প্রচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। কোন কারণে জীবাণুর ফাজ-প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস পেলে লুকানো ফাজ আবার বলবান হয়ে সেই জীবাণুকে ধ্বংস করে বিপুলভাবে আত্ম-প্রকাশ করতে পারে। এইরূপ প্রচ্ছন্ন ফাজ—প্রো-ফাজ (Prophage)-এর সম্ভাবনা

কল্পনা করেছিলেন বর্দে (Bordet') ১৯২১ সালে এবং তার সপক্ষে যুক্তিও দিয়েছিলেন বারনেট (Burnet) ১৯২৯ সালে। সকল বিজ্ঞানীরা কিন্তু এই প্রো-ফাজ বিশ্বাস করতেন না এবং বহু বছর এই নিয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক চলেছিল। লুয়ফ এই বিষয়ে বহু রকমের পরীক্ষা করে ১৯৫০ সালে প্রবন্ধ ছাপালেন। নব উদ্ভাবিত সূক্ষ্ম যন্ত্রের সাহায্যে প্রত্যেকটি জীবাণুকে পৃথক করতে সক্ষম হলেন—সেগুলিকে আবার পুষ্ট ও পালন করে তাদের সন্ততিদের পুনঃপৃথক করে পরীক্ষা করেচললেন। এইভাবে তিনি প্রমাণ করলেন যে, প্রত্যেকটি জীবাণুর মধ্যে প্রো-ফাজ সত্যই অবস্থান করছে এবং কোষ-বিভাজনের সঙ্গে সঙ্গে প্রো-ফাজও নবজাত কোষাণুতে গোপনে আশ্রয় নিয়েছে। তাঁর যুক্তিধারা মোটামুটি এইরূপ—মাধ্যমের মধ্যে কখনও কখনও কোন একটি জীবকোষ লুপ্ত হয়ে বিমুক্ত ফাজ সৃষ্টি করে। আবার মাধ্যমকে সযত্নে পরিশুদ্ধ করে নিলেও রঞ্জেন রশ্মি, অতিবেগুনী আলো বা রাসায়নিক নানা দ্রব্যের সংস্পর্শে আনলে প্রত্যেকটি কোষের মধ্যেই ফাজের প্রাদুর্ভাব ঘটানো যায়—যার ফল হয় জীবাণুর বিনাশ ও প্রচুর ফাজের পুনঃপ্রকাশ। লুয়ফ এইভাবে নিঃসন্দেহে প্রমাণ করলেন, নববংশে ব্যাক্টীরিয়ার শরীরে প্রো-ফাজ গোপন থাকতে পারে। এর পরে প্রো-ফাজ বস্তুতঃ কি—তাই নিয়ে নানা অনুসন্ধান চলতে লাগলো। চেজ (Chase), লেডরমান (Lederman) প্রমুখ বহু বিজ্ঞানী নানা পরীক্ষা করে স্থির করলেন—প্রো-ফাজ একটি বিশেষ ধরনের D.N.A. (Deoxy Ribonucleic Acid) molecule। এই জাতীয় D.N.A., বিজ্ঞানীরা Chromosome-এর জিনের অভ্যন্তরে ইতিমধ্যে নানা স্থানে আবিষ্কার করেছেন। প্রত্যেক Chromosome-সূত্রের মধ্যে সারি সারি নানা Gene-এর সমাবেশে, প্রত্যেক Gene কোষের বিশিষ্ট জাতি-ধর্মের কারণ ও তার জীবনযাত্রার নানা কার্য নিয়ন্ত্রণ করছে—এটি বর্তমানে সকল বিজ্ঞানীরা মেনে নিয়েছেন। সারি সারি সজ্জিত জিনগুলির (Genes) প্রত্যেকটির অভ্যন্তরে নানাভাবে গঠিত D.N.A.। পূর্ব-বর্ণিত ব্যাক্টীরিয়ার কোন একটি বিশেষ জিনের মধ্যে প্রো-ফাজ-এর D. N. A. সংলগ্ন হয়ে গেছে। কোষ-বিভাজনের সময় যেভাবে অন্যান্য D. N. A. কণা বিভক্ত হয়ে পরে প্রাণক্রিয়ার প্রভাবে পূর্ণাঙ্গ হয়ে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করে, প্রোটিন-প্রস্তুতি নিয়ন্ত্রণ করে সন্তান-জীবাণু-কণায়—সেইরূপ প্রো-ফাজের D. N. A. বিভক্ত হয়ে আবার নব নব কোষ সন্ততির মধ্যে পূর্ণাঙ্গ হয়ে বিরাজ করে। ফ্রাঁসোয়া জ্যাকব ও তাঁর সহকর্মী নানা

ভাবের পরীক্ষা করে Coli ব্যাসিলাসের Chromosome-এর ঠিক কোন্ স্থানে এই প্রো-ফাজ অবস্থান করছে, তাও প্রায় নিরূপণ করতে সক্ষম হয়েছেন। Coli-bacillus-এর মাত্রএকটি Chromosome-সূত্র, তাই নানা পরীক্ষা অপেক্ষাকৃত সহজে সম্পন্ন হয়েছিল। প্রজননবিদ্ জ্যাকবের কাজ এইভাবে অগ্রসর হতে লাগলো তবে যে প্রশ্নের সদুত্তর তখনও পাওয়া যায় নি, সেটি এই—যদি প্রো-ফাজের D. N. A. সময়মত পূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে ব্যাক্টিরিয়ার প্রাকার ভেঙ্গে গলিয়ে ফেলে, আবার কোষের সেই সব মশলা নিয়ে ফাজের আবরণ তৈরি করে পূর্ণ ফাজের প্রকাশে কৃতকার্য হয়, তবে তারা কোষের মধ্যে সাধারণ D.N.A.-এর মত সব সময়ে সেই ক্রিয়াকলাপ প্রকট করে না কেন?

লুয়ফ London-এ Royal Society-র সামনে বক্তৃতার সময় বললেন—কোন এক নিরোধক বস্তু রয়েছে প্রো-ফাজ-দুষ্ট কোষগুলির মধ্যে; তারই প্রভাবে প্রো-ফাজের সর্বনাশা ক্রিয়া স্থগিত থাকছে। যদি সেটি না থাকতো তাহলে কোষগুলি নিশ্চয়ই বিনষ্ট হতো। জ্যাকবের সুচিন্তিত পরীক্ষাগুলি লুয়ফের মতের সমর্থন করলো। Coli bacillus-এর মধ্যে জনক ও স্ত্রী-ধর্মী দুই রকমের কোষই বর্তমান আছে। তাদের সঙ্গম হলে জনকের Chromosome-সূত্র (Coli-এ মাত্র একটি সূত্র বর্তমান) আস্তে আস্তে স্ত্রী-কোষের শরীরে প্রবিষ্ট হয়—পূর্ণপ্রবেশ ঘটতে লাগে প্রায় ½ ঘণ্টা—ওর মধ্যে যে কোন মুহূর্তে সূক্ষ্ম যন্ত্রের সাহায্যে কোষ দুটিকে তফাৎ করা যায়—তখনও হয়তো পুং-Chromosome-এর সবটি স্ত্রী-কোষের মধ্যে চলে যায় নি। নানাভাবে সঙ্গম স্থগিত করে এইভাবে পরীক্ষা চালিয়ে জ্যাকব দেখাতে পারলেন, Chromosome-এর কোন এক বিশেষ স্থানে প্রো-ফাজ আশ্রয় করে আছে। আবার সঙ্গত-স্ত্রীকোষ কখনও কখনও প্রো-ফাজ প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হয়ে যায়—আবার কখনও বা শরীরের মধ্যে পূর্ব থেকেই প্রো-ফাজ D.N.A. থাকলে স্ত্রীকোষ পুং-Chromosome-কে ধারণ করে সাধারণ ভাবে পুনঃ পুনঃ বিভক্ত হয়ে সন্তান-কোষরাশির জন্ম দিতে পারে। শেষোক্ত ঘটনা লুয়ফের কল্পনাকে সমর্থন করছে বলা যায়। সঙ্গমের ফল ভিন্ন হবার কারণ—স্ত্রীকোষে যখন নিরোধক বস্তু থাকে না, তখন তার বিনাশ ঘটে। পক্ষান্তরে প্রো-ফাজ নিঃসন্দেহে অবস্থান করলে ওই ধরণের সঙ্গমে স্ত্রীকোষ বিলুপ্ত হয়ে যায় না, কারণ তার শরীরে আগে থেকেই নিরোধক বস্তু বিরাজ করছিল।

এর কয়েক বছর আগে থেকেই জ্যাক মনো কোষের খাদ্য পরিপাক ও পুষ্টি

নিয়ে কতকগুলি পরীক্ষা করছিলেন। তাঁর প্রথম প্রবন্ধেই উল্লেখ আছে যে, Coli ব্যাসিলাসের পুষ্টির মাধ্যমে একযোগে গ্লুকোস (Glucose) ও ল্যাক্টোস (Lactose), শর্করা জাতীয় এই দুই জিনিষ মিশিয়ে দিলে Coli-এর বংশবৃদ্ধি হতে থাকে, কলেবরের প্রোটিন ইত্যাদির সৃষ্টি হয়। গ্লুকোস পরিপাক হয়ে যায়, তবে Lactose-এর কোন পরিবর্তন হয় না। এভাবে কিছুক্ষণ চললে মাধ্যমের গ্লুকোস একেবারে নিঃশেষিত হয়ে যায়। তখন কিছুক্ষণ স্থগিত থাকে বৃদ্ধি ও জীবাণুর উপনিবেশের প্রাণ-তৎপরতা। পরে আবার ল্যাক্টোসের (Lactose) পরিপাক সুরু হয় এবং বংশবৃদ্ধি ও পালনের কাজও অবাধে পুনঃপ্রবর্তিত হয়। এই রহস্যের মর্মকথা মনো প্রথমে সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন নি। তিনি ভেবে-ছিলেন, কোষের মধ্যে কতকগুলি জারক (Enzyme) প্রথম থেকেই অবস্থান করে, আবার কতকগুলি অবস্থা অনুযায়ী নতুন করে তৈরি হয়। গ্লুকোস-জারক (Enzyme) সব কোষের মধ্যেই আছে, কিন্তু গ্লুকোসের অভাবে পুষ্টির তাগিদে নতুন এক ধরণের জারক কোষের মধ্যে তৈরি হতে পারে, যা প্রথমে কোষের মধ্যে বর্তমান ছিল না। শুধু ল্যাক্টোস মাধ্যমে বর্তমান থাকায় এই নতুন জারকের সৃষ্টি করে জীবকোষ তার প্রাণবৃত্তির প্রয়োজন মেটাবার ব্যবস্থা করলো। কোষে প্রয়োজনমত ব্যবস্থা হওয়া সম্ভব এবং তার ফলে নতুন ধরণের প্রোটিন সৃষ্টি হতে পারে, যা প্রথমে কোষ-শরীরে বর্তমান থাকেনা। তার উদাহরণস্বরূপ এক রকমের পরীক্ষা ও তার ফলের কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। এক ধরণের বন্য E. Coli ব্যাসিলাস পাওয়া যায়, যার মধ্যে জারক-B-Galacto Galactosidase খুব অল্প মাত্রায় বর্তমান। শর্করাজাতীয় Lactose-এর জারকটি মূলতঃ একটি প্রোটিন, যার মৌল তৌল ১৩৫,০০০। বিশ্লেষণ করে পাওয়া যায় যে ওই ধরণের বন্য E. Coli-র পালনে মাধ্যমে কার্যকরী কোন বস্তু বাইরে থেকে না মিশালে গণনায় প্রতি কোষের অনুপাতে এই বিশেষ জারকের একটি অণুও আছে কিনা সন্দেহ। যদি Lactose কিংবা ওই ধরণের জিনিষ মাধ্যমে মিশিয়ে ওই বিশেষ জারকের চাহিদা বৃদ্ধি করা যায়, তবে দেখা যাবে ওই জারকের পরিমাণ প্রায় ১০০০ গুণ বেড়ে গিয়েছে ; অর্থাৎ এই প্রোটিনটি আবশ্যক মত সৃষ্টি হয়ে পড়লো কোষের রসায়নাগারে। আবার যখন প্রয়োজন অন্তর্হিত হয়, তখন সঙ্গে সঙ্গে জারকও মাধ্যম থেকে তাড়াতাড়ি অন্তর্হিত হয়ে যায়। অন্যান্য জিনিষ নিয়ে এই ধরণের পরীক্ষা অন্য জীবাণু নিয়ে করে অনুরূপ ফল পাওয়া গিয়েছে।

আবার এর পাল্টা খবরও রয়েছে। জারকের সাহায্যে খাদ্যবস্তু থেকে যে ধরণের, প্রোটিন তৈরি হয়, তা যদি প্রথম থেকেই মাধ্যমে উপযুক্ত পরিমাণে মেশানো যায়, তবে কার্যকরী বিশেষ জারকের (Enzyme) সৃষ্টি বন্ধ হয়ে যাবে এবং প্রাথমিক মশলা মিশলেও খাদ্যবস্তু অব্যবহৃত ও অপরিবর্তিত থাকবে।

Azoto-bacter কে (এক ধরণের ব্যাক্টিরিয়া) নানাস্থানে পাওয়া যায়। যে মাধ্যমে নাইট্রোজেনঘটিত কোন যৌগিক পদার্থ বর্তমান নেই, সেখানে Azoto-bacter বাতাস থেকে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে যৌগিক পদার্থে আবদ্ধ করে রাখে। আবার সেই শ্রেণীর Azoto-bacter-কে যদি এমন মাধ্যমে পালন করা যায়, যেখানে প্রথম থেকেই নাইট্রোজেন-ঘটিত পদার্থ বর্তমান, তা হলে তাদের বাতাস থেকে নাইট্রোজেন আবদ্ধ করবার প্রবৃত্তি বন্ধ থাকবে। বহু বিজ্ঞানীর অনুসন্ধানের ফলে উদ্‌ঘাটিত জীবাণু-লোকের এই প্রকার অদ্ভুত চর্যাবৃত্তি আমাদের কৌতুহল জাগিয়ে তুলেছে। বিশেষ বিশেষ অবস্থার সঙ্গে মিল রেখে নিজের প্রাণশক্তি পরিমিত ব্যয় করে জীবকোষ কিভাবে বৃদ্ধি, পুষ্টি ও বংশরক্ষার চাহিদা মেটায়, সেটি সত্যই গভীর অনুসন্ধানের বিষয়। নিউক্লিয়াস, ক্রোমোজোম ও জিনের কথা দিয়ে এই প্রসঙ্গের অবতারণা করেছি। তবে কোষ পূর্ণ করে যে জেলীপ্রায় Cytoplasm রয়েছে, তার মধ্যে পরিপাক ও নতুন প্রোটিনের সৃষ্টি চলছে—তা আমাদের ভুললে চলবে না। জীবন-বৃত্তির জন্যে প্রতিপদে কোষের নানা জারকের (Enzyme) দরকার হয়, তাদের সাহায্যেই খাদ্যরসকে রূপান্তরিত করে কোষ-দেহের পুষ্টি সাধিত হয়। এই জারক বস্তুগুলি বিশেষ বিশেষ ধরণের প্রোটিন।

জীবনবৃত্তির বিশ্লেষণ করে আমরা শেষ অবধি বুঝেছি, কয়েকটি প্রধান অ্যামিনো অম্ল (Amino acid)থেকে নানাভাবে সংযোজন করে ভিন্ন ভিন্ন কার্যের উপযোগী প্রোটিন সৃষ্টিই কোষের প্রধান কাজ। হর-রকমের প্রোটিনকে রাসায়নিক প্রথায় ভেঙ্গেচুরে আমরা প্রায় ২০টি মুখ্য অ্যামিনো অম্ল (Amino acid) পেয়ে থাকি। সব রকমের জীবদেহে বিভিন্ন প্রকার প্রোটিনের আদিম উপাদান এই ন্যূনাধিক বিশটি অ্যামিনো অম্ল। সব জীবের দেহের মধ্যেই এরা রয়েছে। সংযোজন সজ্জার অদল-বদল করে এই বিশটি আদিম উপাদান থেকে অসংখ্য প্রকারে প্রোটিনবস্তু তৈরি হতে পারে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ প্রকারের প্রোটিন বিশেষ জীবাণুর দেহের উপাদান এবং কোন একপ্রকারের জীবদেহে এই সব বিশেষ

ধরনের প্রোটিন তৈরি হয়ে যায় বংশ পরম্পরায় অভিন্ন ভাবে। প্রজাতির ঐতিহ্য নিহিত রয়েছে এর মধ্যে। যদিও রাসায়নিক প্রক্রিয়া চলতে থাকে Cytoplasm এর নানাস্থানে, তবু তাকে নিয়ন্ত্রণ করছে Chromosome-এর মধ্যের জিনগুলি—মূলতঃ এই কথা মেনে নিয়েই আমরা বংশরীতির সংরক্ষণ-প্রণালী বুঝতে পারি। জিনগুলিই যে সৃষ্টির নিয়ামক, নানাভাবের পরীক্ষার ফলে আমরা এই ধারণায় উপনীত হয়েছি। যদি কোন উপায়ে জিনকে প্রভাবিত করে তাদের উপাদান বা গঠন-বৈচিত্র্যে আমরা রূপান্তর ঘটাতে পারি, তবে তার ফল প্রকাশ পায় জীব-বংশের বাহ্যিক আকৃতিভেদে (যেমন Drosophila বা Neurospora-র মধ্যে লক্ষ্য করেছি)। তাই বিজ্ঞানীরা এখন স্থির করেছেন যে, বিশেষ বিশেষ জিন বিশেষ-বিশেষ রকমের জারক সৃষ্টির মূলে রয়েছে। জারকগুলি কিন্তু কোষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উদ্ভূত হয়ে থাকে। জিনগুলি সেই সব প্রক্রিয়াকে কিভাবে স্ববশে রাখতে পারে—এইটিই কোষ-ধর্ম আলোচনার প্রধান সমস্যা। পর পর ২টি প্রধান আবিষ্কার আমাদের এই সমস্যার মর্ম উদ্ঘাটন করতে সাহায্য করেছে। প্রথম Watson ও Crick দেখালেন—জিনের D.N.A-গুলির মধ্যে এক বিশেষ রকমের রচনা রয়েছে, যাকে ভাবা যায় প্রোটিন সৃষ্টির সঙ্কেতবাণী। Guanine, Adenine, Uracil বা Thymine ও Cytosine যেভাবে D.N.A-এতে সজ্জিত রয়েছে, তার মধ্যেই এই সঙ্কেতবাণী খুঁজতে হবে।

এর পরে মনো ও জ্যাকব দেখালেন যে, D.N.A.—মৌল দ্বিত্ব হয়ে একভাবে R.N.A. উপাদানের সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে একটি নতুন ধরণের বস্তু তৈরি করতে পারে, যাকে মনে করা যেতে পারে জিন থেকে Cytoplasm-এ বিশেষ স্থানে অবস্থিত রসায়নাগারের একটি বিশেষ আদেশের বার্তাবহ।

এই আদেশ এসে পৌঁছে গেলে—যে ছাঁচ দূত বহন করে নিয়ে এলো—সেই মত অ্যামিনো অম্লের সজ্জা নিয়ন্ত্রণ করে এক বিশেষ ধরণের প্রোটিনের সৃষ্টি হলো। বিশেষ ধরণের বস্তুর সৃষ্টি এইভাবে চলতে লাগলো। Cytoplasm-এর কার্যকলাপ Chromosome-এর জিনগুলির দ্বারা এইভাবে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। এই দৌত্যকার্যে ব্রতী R.N.A.-এর (Messenger) অস্তিত্ব প্রমাণ ও প্রকাশ করে জ্যাকব ও মনো যশস্বী হয়েছেন। Chromosome-এর মধ্যে অবস্থিত জিনগুলি শুধু যে ছাঁচ তৈরি করবার জন্যে বর্তমান তা নয়, বিশেষ বিশেষ জিনসংলগ্ন Chromosome-এর মধ্যে এমন কেন্দ্রস্থানের কথা মনো ও জ্যাকব কল্পনা করেছেন, যারা

আদেশ দিলেই তবে ছাঁচ তৈরির কাজ সন্নিহিত জিনগুলির মধ্যে চলতে পারে। এরাই জ্যাকব ও মনোর কল্পিত Operon। আবার Operon-এর আদেশবাণীতে প্রেরণকার্য বন্ধ হয়ে থাকে নিরোধক বস্তুর প্রভাবে।

এই নিরোধক বস্তু যেন Operon-এর আদেশ নির্গমনের পথ অর্গলবদ্ধ করে রেখেছে। বস্তুর অভাব পড়লেই এই নিরোধকের প্রভাব নিস্তেজ হয়ে পড়ে। তখনই আদেশবাণী নির্গত হয়ে জিনগুলিকে প্রবৃত্ত করে তাদের নির্দিষ্ট কর্মে। আবার অভাব পূর্ণ হয়ে গেলে সৃষ্ট প্রোটিনের বাহুল্য ঘটলেই নিরোধকের প্রভাব পুনঃপ্রকটিত হয়ে পড়ে, তখন আদেশবাণী আর নিঃসৃত হতে পারে না এবং জিনগুলির তৎপরতা তখন বন্ধ হয়ে যায়।

লুয়ফ যে নিরোধক বস্তুর কল্পনা করে প্রো-ফাজের সর্বনাশা প্রবৃত্তির সংযম সম্ভব ভেবেছিলেন, ফাজ দুষ্ট জীবকোষসমূহে জ্যাকব ও মনো নানাবিধ পরীক্ষা করে দেখালেন, অন্যান্য জিনের D.N.A.-র কাজ স্থগিত রাখতে ঠিক একধরণের নিরোধক বস্তুর কল্পনা করতে হয়। মনো জ্যাকব ও লুয়ফের কল্পনা নানাবিধ পরীক্ষার ফলে সমর্থিত হয়েছে। জীবকোষের প্রাণবৃত্তিকে এখন এক স্বয়ংক্রিয় কারুশালার সঙ্গে তুলনা করা চলে। বর্তমান যুগে এমন সব স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র উদ্ভাবিত হয়েছে, যাদের সুষ্ঠু তৎপরতা ম্যনবকর্মীর উপর নির্ভর করে না। বিশেষ কোন কর্মপদ্ধতির উপযুক্ত যন্ত্র উদ্ভাবিত হলে নানা জটিল পরিস্থিতির মধ্যে যন্ত্রই নিজের ক্রিয়াকলাপ সুপথে চালিত ও নিয়ন্ত্রিত করে অল্প সময়ের মধ্যে এমন ফলপ্রসূ হতে পারে, যা মানুষ সাধারণ হাতিয়ার ও নিজেদের কর্মক্ষমতার উপর নির্ভর করলে বহু দিন, মাস বা বছর পরিশ্রমের পর অনুরূপ ফল হস্তগত করতে পারতো।

Chromosome-এর মধ্যে জিনসমূহের বিষয় আমরা এতদিন ভেবে এসেছি যে, সেগুলি জীবের বিশেষ বিশেষ চরিত্র বা কর্মপদ্ধতির সঙ্গে জড়িত রয়েছে। লুয়ফ, মনো ও জ্যাকব প্রমাণ করেছেন যে, জিনগুলির মধ্যে এমন সব সত্ত্বাও রয়েছে, যারা অন্য জিনসমুহের প্রবৃত্তি বা কার্যকলাপ উদ্রেক বা প্রতিরোধ করে। বৈদ্যুতিক যন্ত্রচালিত কারখানার চাবি ঘরের (Switch-board) মত তাদের তাঁরা Operon বলেছেন। নিউক্লিয়াসের মধ্যে যেন এক বিদ্যুৎ-চালিত কৃত্রিম মস্তিষ্ক বর্তমান রয়েছে। সেখান থেকে আদেশমত বস্তুসৃষ্টি সুরু হয় বা স্থগিত থাকে—ওই সব বস্তু-সৃষ্টিই কোষের জীবনযাত্রায় একান্ত প্রয়োজন। কোষদেহের স্থানে স্থানে সে সবের প্রস্তুতি চলেছে। তবে নিউক্লিয়াসই নির্দেশক,

সে আদেশ পাঠাবে কোষের Cytoplasm-এ স্থিত কারুশালে—বস্তুর অভাব পড়লে কাজ সুরু করতে বা যখন বস্তু উপযুক্ত পরিমাণে তৈরী হয়ে রইলো,তখন তারই আদেশে কাজ বন্ধ হয়ে যাবে।

এইভাবে কোষের কার্যকলাপের রহস্যের মর্ম উদ্ঘাটিত করে ফরাসী বিজ্ঞানীত্রয় প্রমাণ করেছেন, প্রকৃতি যেভাবে কাজ করেছেন কোষের মধ্যে, আমাদের সমাজের অর্থনীতিবিদ বা পথ-নির্দেশকেরা সেগুলিকে অধ্যয়ন করে কিভাবে প্রয়োজনমত বস্তুর সৃষ্টি ও তার ব্যবহারের মধ্যে সমীচীন সাম্য আনা যায়, তারই পথ-নির্দেশ পাবেন। এই সব সত্য আবিষ্কারের জন্যে লুয়ফ, মনো ও জ্যাকব নোবেল পুরস্কাররূপ জয়মাল্যে ভূষিত হয়েছেন। স্টকহল্‌মের বিচারকেরা বলেছেন—প্রোফেসর মনো, জ্যাকব ও লুয়ফ প্রাণশক্তি কিভাবে সর্বত্র কাজ করছে সে বিষয়ে নানা আবিষ্কার করে আমাদের জ্ঞান-ভাণ্ডার বিশেষভবে সমৃদ্ধ করেছেন। প্রাণ কিভাবে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে চলে, বংশরক্ষা করে বা প্রগতির পথে চলে, তাঁদের অনুসন্ধানের ফলে আমরা আজ অনেকখানি বোঝবার পথে এগিয়ে গিয়েছি।

বহু বছর বাদে ফ্রান্সের বিজ্ঞানীরা নোবেল পুরস্কার অর্জন করলেন। ১৯৩৫ সালে ফ্রেডরিক জোলিওর পর অনেক দিন ফ্রান্সের ঘরে এই পুরস্কার আসে নি। দ্যগল নাকি একবার বলেছিলেন, বহু অনুসন্ধানশালা তো চলছে, কিন্তু তার চাক্ষুষ ফল কই? এখন এই পুরস্কারের খবরে তাঁরা আনন্দ করছেন। সারা দেশ তাঁদের চেনে এবং এই খবরে ফরাসী মাত্রেই আনন্দিত হয়েছেন। বর্তমান যুগে আমেরিকায় প্রতিষ্ঠিত নানা অনুসন্ধানাগারের তুলনায় পাস্তুর ইনষ্টিউটের যন্ত্র ও অর্থ সামর্থ্য খুবই সাধারণ। তবু উজ্জ্বল মনস্বিতা ও ঐকান্তিক সাধনার ফলেই এই অসাধ্য সাধন সম্ভব হয়েছে। তা ছাড়া রাজনৈতিক মতবাদে ভিন্ন দিকে ঝুঁকলেও (মনোকে বামপন্থী বলা চলে) আমেরিকা থেকে এই কয়েক বছর অনুসন্ধানের জন্যে তাঁরা যে যথেষ্ট আর্থিক সাহায্য পেয়েছেন, ফরাসী বিজ্ঞানীরা এও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন।

জল-সন্ধানী যাদুকর

মাঝে মাঝে শোনা যায় অনেক পয়সা খরচ করে কূপ খনন করা হলো, বহুদূর পর্যন্ত মাটির নীচে নেমেও কপালের দোষে জলের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল না। তাই আগের কালে মানুষ নদীর ধারে বসতি করতে যেত—আজও সে পুষ্করিণী খুঁড়ে বর্ষার জল ধরে রাখে শুক্‌নো ডাঙ্গায়। এখন অবশ্য মাটির ভেতরে বহুদূর নল চালিয়ে জল তোলার ব্যবস্থা হয়েছে। পয়সা খরচ করতে পারলে হাজার ফুটের তলা থেকেও বৈদ্যুতিক পাম্প চালিয়ে জল তোলা যায়। কলকাতার মধ্যেই সে রকম দু'তিনটি গভীর নলকূপের খবর পাই। প্রায় চল্লিশ বৎসর আগেকার কথা আজ মনে হচ্ছে। আমার ইন্‌জিনিয়র বন্ধু গল্প করছিলেন—তাঁর উপর প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ভার পড়েছিল অন্তরীণ যুবকদের জন্য হিজলীতে জেল গড়ে তোলার। ঘরবাড়ী তৈরী হলো, জেলের বিরাট পাঁচিল উঠলো, কিন্তু সরকারের সামনে উঠলো এক নতুন সমস্যা। বহু পয়সা খরচ করেও মাটি খুঁড়ে সেখানে প্রথমবার জল পাওয়া গেল না। সেখানে তাই হয়ত মানুষে বসত করেনি—বিশাল ভূ-ভাগ জঙ্গল হয়েই ছিল। সরকার হয়ত সেইজন্যই ওখানেই জেল বানাতে চাচ্ছিলেন। স্বদেশী ছেলেরা যেন গ্রামের লোকের সংস্পর্শে না আসতে পায়—দেশপ্রেমের বিষ যেন চারিদিকে না ছড়ায়। হিজলী গ্রাম হয়ত সেই জন্যই নির্বাচিত হয়েছে। কাগজে পড়া যেত, এক শ্রেণীর যাদুকর নাকি আছে যারা কোথায় খুঁড়লে জল মিলবে ঠিক আন্দাজ করতে পারে। কেউ কেউ বলতো ও সব বুজরুকী—তবে সেই সময় কলকাতার বিলাতী এক কোম্পানী প্রচার করতো মোটা ফী পেলে তারা জল খুঁজে দেবার দায়িত্ব নিতে পারে। শেষ অবধি তাদেরই শরণ নিতে হলো। কোম্পানীর লোক জল খুঁজতে এল। দেখা গেল কর্মপদ্ধতি নুতন ধরনের কিন্তু কোন দামী যন্ত্রের বালাই নেই। কোন এক তাজা গাছের ডাল যেখানে দুটি শাখায় বিভক্ত হয়েছে সেই Y-অনুকরণের একটি অংশ গাছ থেকে কেটে নিয়ে দুই হাতের তালুর মধ্যে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়ে ঈষৎ চেপে সে এদিক-ওদিক ঘুরতে লাগলো—অবশেষে এক জায়গায় দেখা গেল বার বার

যাদুদণ্ডের সোজা অংশ ক্রমাগত একই স্থানে এলে ঝুঁকে পড়ছে। লোকটি বল্লে এইখানে কূপ খুঁড়লে নিশ্চয়ই জল মিলবে। সেবার ঘটলোও তাই। জেলখানার জলের বন্দোবস্ত সন্তোষজনকভাবে হয়ে গেলো। আমি নতুন যুগের নবীন বিজ্ঞানী, অলৌকিক শক্তির খবরে মন সাড়া দেয় না। যদিও বন্ধু আরও অনেক নজীর দিয়ে আমাকে বুঝাতে চেষ্টা করলেন যে এমন অঘটন আজও ঘট্‌ছে—বিজ্ঞানীরা যা স্বপ্নেও ভাবতে পারবেন না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার সময় পদার্থের সাধারণ গুণাবলীর আলোচনা আমাকেই করতে হতো। মহাকর্ষ বস্তুর সাধারণ গুণ। নিউটন কবে গাছ থেকে আপেল ফল পড়তে দেখেছিলেন সেই থেকেই পৃথিবীর চারিদিকে যে অদৃশ্য শক্তিক্ষেত্র রয়েছে—g-ক্ষেত্র—কৌতূহলী বিজ্ঞানীরা তার মর্ম ও ধর্ম নানাভাবে পরীক্ষা করে চলেছেন। হাঙ্গারীর বিজ্ঞানী ব্যারণ ইয়োটভস্ (Eotvos) g-ক্ষেত্রের ভিন্ন ভিন্ন দিকে তার আপেক্ষিক মানের হ্রাসবৃদ্ধি নির্ণয় করবার এক সূক্ষ্ম তুলাযন্ত্র উদ্ভাবন করেছেন, তারই খবর দিতে হচ্ছিল ছাত্রদের। জটিল গণিতের তথ্য জুগিয়ে ছাত্রদের মন পাওয়া ভার। আবার তখন গান্ধীজির নন-কোঅপরেশনের যুগ। ছেলেরা কলেজ পালাবার ও পরীক্ষা ফাঁকি দেবার সুন্দর অজুহাত খুঁজে পেয়েছে। কাজেই হঠাৎ প্রচুর অবসর মিললো। ভারী ভারী বিরাট প্রামাণ্য গ্রন্থের পাতা উলটিয়ে জানা গেল অনেক নতুন কথা। ইয়টভোসের মানদণ্ড ভূতত্ত্ববিদ্‌রা তাঁদের কাজে লাগাতেন মাটির অনেক নীচে তেলের নদী কোথায় বহমান, কোথায় বা ধাতুর আকর স্তরে স্তরে বিছান রয়েছে মাটির তলায়। ফলে g-শক্তি ক্ষেত্রের যে অল্প বিকৃতি ঘটছে তা হয়ত বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত থাকবে। অনুসন্ধানীর মানদণ্ডে তার হ্রাসবৃদ্ধির নিশানা পাওয়া যাচ্ছে। এই-ভাবে এই সূক্ষ্মযন্ত্রের সাহায্যে অনেক আকর বা পেট্রোলিয়ম উৎস আবিষ্কৃত হয়েছে পৃথিবীর নানা জায়গায়। অষ্ট্রেলিয়ায় বা সাহারায় মরুপ্রান্তরে তেলের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে এর কল্যাণে—বলে জনশ্রুতি। মনে হলো আমাদের দেশেও এই দামী যন্ত্রটির কোথায়ও থাকার কথা। তবে হয়ত সেটি অতিযত্নে কাচের আলমারীতে রক্ষিত থেকে সঞ্চয়ী বিজ্ঞানীর ভাণ্ডার পূর্ণ করছে। তাকে নিয়ে বনজঙ্গল ঘুরবার অসম সাহস এদেশী বিজ্ঞানীর তখনও হয় নি। যান্ত্রিক দণ্ড মাটির নীচে বহতা জলের খবর দিতে পারে তবে এই সূক্ষ্ম তুলামাপকের সঙ্গে-Y-যাদুদণ্ডের তো কোন সাদৃশ্যই নেই। তাই Y-যাদুদণ্ডে সহজেই মানুষ এত গভীর তলের খবর পায় এ বিশ্বাস করতে মন চাইল না। সমস্যা রয়েই গেল।

কয়েক বৎসর পরে শোন নদীর ধারে এক মনোরম স্থানে ঘুরতে ঘুরতে পৌঁছে গেছি। এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি তখনই দিনে বেলার দুদণ্ড বাড়লে সূর্যের তেজ অসহ্য ঠেকছে। বিরাট আবাদের মধ্যে সামনে একটা বাংলো প্যাটার্ন বাড়ী। মালিকবন্ধু ইংরাজ। এক সময়ে ঘাটওয়াল রাজার কর্মচারী হয়ে এদেশে এসেছিলেন। পরে রাজার অনুগ্রহে বহু শতবিঘা জমি নিয়ে চাষ সুরু করেছেন—আধুনিক প্রথায় তাঁরই ছেলে ও বন্ধুরা ট্রাক্টার চালিয়ে জমি চাষ করছে। আমি যখন হাজির হলাম কোন বিশেষ কারণে সকাল থেকেই সেদিন অতিথি আপ্যায়নের আয়োজন হয়েছিল। সকালেই বাড়ীর বারান্দায় বহু লোক। তাঁরা একটা তামার তার বেঁকিয়ে Y-দণ্ড করেছেন ও প্রত্যেকে তাই নিয়ে পরীক্ষা করছেন জলের সন্ধান মেলে কিনা। কৌতূকের কারণ হল এই বারান্দার উপর বিশেষ কোন এক পথে চললে কারোর কারোর হাতে Y-দণ্ডটি ঝুঁকে পড়েছে তবে সকলের হা'তে সাড়া পাওয়া যায় না। আমি নিজের হাতে পরীক্ষা করে দেখলাম কিছুই হলো না। তখন ক্ষেতের সেচের জন্য জলের খুবই দরকার। তবে বাড়ীর ভিত্তি ভেদ করে ওই ইঙ্গিতের যাথার্থ্য তো যাচাই করা চলে না। কাজেই ব্যাপারটি অমীমাংসিত রয়ে গেল সেদিন।

পরের খবর স্বাধীন ভারতের দিল্লী সহরের। তখন রাজ্যসভার সভ্য, গিয়ে শুনি রাজপুতানায় এক পানিওয়ালা মহারাজের আবির্ভাব হয়েছে। নানাস্থানে উৎসের সন্ধান দিয়ে তিনি দেশের লোককে উপকৃত ও চমৎকৃত করেছেন। সরকার তাঁকে কোনভাবে বিপুল কোন প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারেন কিনা তারই আলোচনা উঠেছিল সেবারে সে সভায়।

অতি প্রাচীন কালে রাজপুতানার পশ্চিম ভূ-ভাগের মধ্য দিয়ে এক খরস্রোতানদী প্রবাহিত হয়ে সাগরে গিয়ে মিশতো। দুই তীর আশ্রয় করে বহু লোকের বসতি ছিল সে সময় সে অঞ্চলে। তখন নগরকেন্দ্রিক যে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল তার ধ্বংসাবশেষ উৎখননের ফলে মধ্যে মধ্যে আজও প্রকাশ পাচ্ছে। অভিজ্ঞরা মনে করেন বৈদিক যুগের আগে—আর্যরা এ দেশে আসার বহু পূর্ব থেকে যে সভ্যজাতি এখানে বাস করতো, তারা প্রাচীন মহেন্‌জদারো ও হারাপ্পার অধিবাসীদের নিকট-জ্ঞাতি। চার হাজার বছরে এ প্রদেশের জলবায়ুর অনেক পরিবর্তন হয়েছে। মরু প্রান্তর অল্পে অল্পে এগিয়ে উর্বর ভূমিকে সম্পূর্ণভাবে গ্রাস করেছে। নদী নিশ্চিহ্ন হয়ে বালুর মধ্যে লুকিয়েছে। কেউ কেউ বললেন পানিওয়ালা

মহারাজের কৃপায় হারানো নদীখাতের পুনরুদ্ধার সম্ভব এবং তাহলে এই প্রদেশে ফিরে আসবে অধুনালুপ্ত পুরানো শ্রীসমৃদ্ধি। শেষ অবধি সে আশা ফলবতী হলো না। মাটির মধ্যে জলের সন্ধান পেলেও তাকে সুমিষ্ট জলের উৎসের খোঁজ বলে পরিগণিত হতো না। প্রচুর লবণজাতীয় বস্তু দ্রবীভূত হয়ে জল বিস্বাদ করে রেখেছে—সে জল চাষ-আবাদের অযোগ্য। কাজেই দিল্লীতে একসময় পানি-মহারাজের নাম দিকে দিকে বিঘোষিত হলেও আজ তাঁর কথা লোকে ভুলেছে।

১৯৬২ সালে, একটি ছোট বই হাতে এলো। লিখেছেন বন্ধু প্রাফেসর রোকার (Rocard)। দেখলাম এ বিষয় অনেক খবর আছে যা আমার অজানা ছিল। মধ্যযুগ বা তার অনেক আগে থেকেই যাদুকর-দণ্ডের সাহায্যে জল বা যখের ধনের খোঁজাখুজি চলতো। এখন অনেক সময় বিপথে চালিত হচ্চে এই নিপুণতা। বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে মানুষ অনেক সময় ভাবে এটি কুসংস্কার বিশেষ—এ নিয়ে মাথা ঘামাবার কোন দরকার নেই। তবুও এই নিয়ে প্রোফেসর রোকার অনেক দিন ধরে পরীক্ষা করেছেন। তাঁর অনেক ছাত্র তাঁকে সাহায্য করেছে। এদের মধ্যে কারোর কারোর হাতে যাদুদণ্ড সাড়া দেয়, এবং জলসন্ধানে তাঁরা অনেক সফল হতেন। নানাভাবে পরীক্ষা করে রোকার সাহেব এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, মাটির মধ্যে জল যখন পরিশ্রুত হয় তখন উপল বন্ধুর স্থানের মধ্যে দিয়ে যেতে এক বিদ্যুৎ প্রবাহের সৃষ্টি হতে পারে যা বিজ্ঞানী Quincke (কুউইনকে) অনেক দিন লক্ষ্য করেছিলেন। এর ফলে এক বিশেষ রকমের চৌম্বক ক্ষেত্রেও সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি হয় যা কোন অজ্ঞাত উপায়ে মানুষের দেহের উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং মানুষ যদি নিজের মন ও দেহ সুস্থির করতে পারে তা হলে অসমবিস্তৃত এই চৌম্বক ক্ষেত্র গতিশীল মানুষকে এমন অবস্থায় আনতে পারে যার বহির্নিদেশ হল এই যাদুদণ্ডের বিনমন। বিশেষভাবে নিজের মাংসপেশীকে স্তম্ভিত করতে শিখলে দেখা যায় প্রায় শতকরা পঞ্চাশের কাছাকাছি লোক এভাবে সাড়া দিতে পারেন। প্রোফেসর রোকার যন্ত্র তৈরী করে মৃদু চৌম্বক ক্ষেত্রের শক্তি নিরূপণ করেছেন যার থেকে শরীরের উপর প্রভাব বিস্তার করতে ন্যূনতম কি পরিমাণ শক্তিমাত্রার প্রয়োজন তার একটা মাপ করার চেষ্টা করেছেন। বিদ্যুৎ-চৌম্বক ক্ষেত্র কোন অজ্ঞাত উপায়ে মানুষের শরীরের উপর প্রভাব চালায় যার ফলে এই যাদুকরী বিদ্যার উদ্ভব হয়েছে, এ বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ।

সহরের ছেলেমেয়েরা তো বনে জঙ্গলে Y-দণ্ড নিয়ে অনুসন্ধান করতে পারবে না—তবে তাদের শরীরে এইভাবের কোন অতীন্দ্রিয় অনুভূতি সুপ্ত আছে কিনা দেখতে, প্রোফেসর একটি পরীক্ষার উল্লেখ করেছেন যেটি সব সহরেই সহজেই হবে। তিনি দেখেছেন যে, বিশেষ ধরনের মোটর গাড়ীর যন্ত্র থেকে যে বিদ্যুৎ-চৌম্বক ক্ষেত্র বিকীর্ণ হয় তা অল্প দূর থেকে যাদুদণ্ডের সাহায্যে মানুষে অনুভব করতে পারে। এর জন্য দণ্ডটি ধরবার একটি বিশেষ কায়দা আছে সেটি কয়েকবার চেষ্টা করে সকলেই আয়ত্ত করতে পারে।

বিজ্ঞান প্রসঙ্গ

প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞানে অগ্রগতি

সারা ভারতে এখন পাশ্চাত্য জাতিদের কাছে বিজ্ঞান শিক্ষা করার হুড়োহুড়ি পড়ে গিয়েছে। চারিদিকে কল-কারখানা গড়ে উঠছে, দেশের ছেলেরা বিদেশে গিয়ে সাধনা করছে, এই বিদ্যা আয়ত্ত করতে যাতে তারা ফিরে এসে দেশের শ্রীবৃদ্ধি করতে পারে। সরকার ঝুঁকেছেন ও চাইছেন, বিদেশের শিক্ষাবিদ্‌রা এসে এ দেশের শিক্ষারীতির সংস্কার ও সংশোধন করুন যাতে আমরা সকল বিষয়ে বর্তমান কালের উপযুক্ত মনোভাব গড়ে তুলি। এ সময়ে প্রাচীনকালে আমাদের দেশ বিজ্ঞানে কতদূর অগ্রসর হয়েছিল তা জানবার কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। পলাশীর যুদ্ধের অল্প-দিন পরেই ইংরাজ বাংলার শাসন হস্তগত করলে। এরও প্রায় একশ বছর আগে থেকে সমুদ্র পথে এসেছিল পর্তুগীজ, ইংরাজ-ফরাসী, ওলন্দাজ-দিনেমার বণিকরা। তারা ভারতে উৎপন্ন রেশম-মসলীন ও নানাবিধ পণ্যদ্রব্য সস্তায় কিনে ইউরোপে চড়া দামে বিক্রি করে পয়সা করতো। ভারত-শিল্পের বিদেশে আদর ছিল, এবং ব্যবহারিক বিজ্ঞানের নানাবিধ প্রয়োগও নিশ্চয়ই তখন নানাদেশে দেখা যেত।

তবে দেশের দুর্ভাগ্য যে, ইংরাজের প্রাদুর্ভাবের পর সে সবই আস্তে আস্তে লোপ পেয়ে গেল। সিপাহী-বিদ্রোহ হয়েছিল ১৮৫৭ সালে। তখনই দেখি ইংরাজ সারা ভারতে সার্বভৌম হ'য়ে বসেছে। দেশীয় রাজারা যাঁরা তখনও গদীচ্যুত হন নি, তখন সব বিষয়ে ইংরাজকে প্রভু বলে মেনে নিয়েছেন। তাঁরা হয়ে পড়েছেন রাজদূতের খেলার পুতুল। দাসত্বের নিদারুণ দৈন্যের মধ্যেও হয়ত ভাগ্যবিধাতার আশীর্বাদের ইঙ্গিত ছিল। তাই বিদেশী সভ্যতার সংস্পর্শে এসে দেশের লোকের নবজাগরণ হল বহু শতাব্দীর কাল-ঘুম থেকে। প্রথমে দেশের চিন্তাশীলরা সারা পৃথিবীর খবর, বিজ্ঞানে, সম্পদে, শিল্পে, বাণিজ্যে ইউরোপের বিস্ময়কর প্রগতির কথা জানতে পেলেন। সকল প্রগতিশীলের মন তখন বিদেশী শিক্ষাদীক্ষার দিকে ঝুঁকলো। তখনও এ দেশে সনাতনী পদ্ধতিতে সংস্কৃতের উপর ভিত্তি করে শিক্ষাদীক্ষা প্রচলিত ছিল হিন্দু সমাজের উচ্চ শ্রেণীতে। তা' ছাড়া মুসলমানরা পড়তেন মাদ্রাসায় এবং দেশের সকলে মুসলমান আমলে রাজভাষা পারসী বলে তারই আলোচনা ও শিক্ষায় মগ্ন থাক্‌তেন, হিন্দু—কি মুসলমান।

বহু সময় ও পরিশ্রম এতে ব্যয় করেও যুগের উপযোগী জ্ঞান অর্জন করা যাচ্ছে না—এ কথা বহু লোকে ভাবতে সুরু করলেন। ব্যাকরণ, ধর্মশাস্ত্র, ন্যায়, জ্যোতিষ শাস্ত্রের পরিবর্তে তাঁরা চাইলেন আধুনিক বিজ্ঞানের প্রসার—উচ্চাঙ্গের গণিত, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, ভাষাতত্ত্ব বা স্থাপত্য-বিজ্ঞান। এ সবই অবশ্য ইংরাজীর মাধ্যমে শিক্ষা করা ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না তখন। সনাতনী মনোভাব তখনও দেশজুড়ে রয়েছে। অনেক তর্ক হবার পর রাজা রামমোহন প্রমুখ প্রগতিকামীদের পরামর্শই গ্রাহ্য হলো। নতুন বিশ্ববিদ্যালয় যে সব খোলা হলো তার মধ্যে পাশ্চাত্য জ্ঞান বিতরণের আয়োজন হলো। দেশের বেশীর ভাগ লোক তখন দেশের পুরানো ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়েছে। এ দেশে ইতিহাস ধারাবাহিকভাবে লেখার রীতিই ছিল না। তা ছাড়া রাজনৈতিক নানা বিপর্যয়ের মধ্যে পুঁথি-পত্র অনেক লোপ পেয়েছিল। দেশের সাধারণ লোকে সংস্কৃত বুঝতো না। তার চর্চা ছিল শুধু ব্রাহ্মণ জাতির মধ্যে। দেবমন্দিরের পুরোহিতরাই দেশীয় সমাজের নিয়মবিধাতা। তাঁদের মধ্যে আলোচনা ধর্মশাস্ত্র নিয়েই হতো। সাধারণ লোকের বেশীর ভাগ নিরক্ষর—যেটুকু নীতি-শিক্ষা বা জ্ঞান তারা আহরণ করতো তা বেশীর ভাগই মুখে মুখে পূজাপার্বণে গান কথকতা বা যাত্রার মাধ্যমে।

দেশের এই দুর্দিনে কৃষ্টির অধঃস্তলে যখন আমরা নেমে গেছি, সৌভাগ্যবশতঃ বিদেশী শাসক-সম্প্রদায়ের সঙ্গে এলেন কয়জন অনুসন্ধানী—যাঁরা মানবজাতির অতীত ইতিহাস জানতে ব্যগ্র। তাঁরাই আবিষ্কার করলেন অনেক নতুন তথ্য; দেশের পণ্ডিতদের কাছে শিখলেন সংস্কৃত, আরবী বা পারসী। এদেশের লুপ্ত ইতিহাস পুনরুদ্ধারে তাঁরা যত্নবান হ'লেন। এঁদের চেষ্টায় কলকাতায় এসিয়াটিক সোসাইটির স্থাপনা হলো। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের খবর তাঁরা ইউরোপে নিয়ে গেলেন। এ দেশে নানা জায়গায় আবিষ্কার করলেন পুরানো মুদ্রা, শিলা-লেখন, তাম্রশাসন, আরও কত কি! বিদ্যার্জনের এক নতুন দিক খুলে গেল—ইউরোপে। ভাষাবিদ্‌রা আবিষ্কার করলেন সংস্কৃতের সঙ্গে পুরানো গ্রীক, ল্যাটিন ও ইউরোপীয় নানা প্রাচীন ভাষার নিকট সম্পর্ক। আগের দিনেও এ দেশের সঙ্গে গ্রীক, রোমক, আরব ও মিশর জাতির যে সম্পর্ক ছিল—তা আবিষ্কার করে প্রাচীন যুগের নব ইতিহাস রচনায় ব্যস্ত হয়ে রইলেন। এ খবর এ দেশে প্রচার হলো। আমাদের পুরানো সাহিত্য, পুরাণ বা ধর্মশাস্ত্রের মধ্যে এত সব জ্ঞাতব্য তথ্য নিহিত

রয়েছে যা বিদেশী পণ্ডিতদের শ্রদ্ধা অর্জন করেছে, সম্ভ্রম জাগিয়েছে ও কৌতূহল চরিতার্থ করেছে, এই সংবাদ আমরা পেলাম বিদেশী শিক্ষার দৌলতে। দেশের মন আবার পুরানো ঐতিহ্যের দিকে ঝুঁকলো। তখন শিক্ষিতরা কেউ কেউ সর্বতোভাবে বিদেশীর মত ও নির্দেশ মানতে লাগলেন। বিদেশী ভাষায় যে বিরাট অনুবাদ সম্ভার গড়ে উঠেছিল ইতিমধ্যে তারই সাহায্যে ও তারই মধ্যে খুঁজতে লাগ্‌লেন—এ দেশের কৃষ্টির ইতিহাস ও বৈশিষ্ট্য। আবার বিশ্ববিদ্যালয় যখন স্থাপিত হলো, তখনই দেশের ভাবুকদের মনে জাতীয়তাবাদ জেগে উঠেছে। উচ্চশিক্ষিত যাঁরা তাঁরা ভাবলেন, আমরাই লিখব আমাদের সভ্যতার ইতিহাস। একাজে দেশের শিক্ষিতদেরই এগিয়ে আসতে হবে। বিদেশীরা সব সময় আমাদের সভ্যতার প্রকৃত রূপ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। তাদের ভাষা ভিন্ন, তাদের ধর্ম অন্য। পরের কৃষ্টি আয়ত্ত করা সকলেরই কষ্টসাধ্য—কাজেই বিদেশীর কাছে ভারত-কৃষ্টির প্রতি অবিচারের সম্ভাবনা যথেষ্ট আছে।

ইউরোপীয় চিত্তমানস গ্রীক রোমক সভ্যতার প্রতি শ্রদ্ধায় ভরপুর। তারা এ দেশের কৃষ্টির আলোচনা করতে গিয়ে অনেক সময় ভাবতেন আমাদের দেশের অনেক বিষয়ের প্রগতি, গ্রীকদের সম্পর্কে আসার পরবর্তীকালে আরম্ভ হয়েছে। আলেকজাণ্ডার এ দেশে এসে যে বীজ বপন করেছিলেন—যে সম্পর্কের ভিত্তি স্থাপনা করেছিলেন—তাই হয়ত ভারতের প্রাচীন কৃষ্টিকে গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করেছে।

বঙ্কিমের যুগ থেকেই আমাদের মনে বর্তমান জাতীয়তাবাদ বেশ শিকড় গেঁথেছে। বঙ্কিম নিজে নানা প্রবন্ধে ও তাঁর 'কৃষ্ণ-চরিত্রে' বিদেশী পণ্ডিতদের মতবাদ খণ্ডনের চেষ্টা করেছেন। নিজেদের সাহিত্যের মূল্যায়নে দেখি, রমেশচন্দ্র দত্ত এগিয়ে এসেছেন। তার ইংরাজীতে লিখিত সভ্যতার ইতিহাস আমরা পড়ে আজও চমৎকৃত হই। তাঁর ঋক্‌বেদের বাংলা অনুবাদ প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগের নিদর্শন হয়ে রয়েছে। রাধাকান্ত দেবের শব্দকল্পদ্রুম বা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের ভারত সঙ্গীতের ইতিহাসের কথাও আমাদের মনে পড়বে। ওদিকে বালগঙ্গাধর তিলক লিখেছেন—প্রাচীন হিন্দু জাতির আদি নিবাসের বিষয়—তিনি বেদ অধ্যয়ন করে ও জ্যোতিষশাস্ত্র আলোচনা করে সকলকে বুঝাতে চাইলেন যে, আর্যজাতি প্রথমে উত্তর মেরু দেশের অধিবাসী ছিলেন—সেই সময়ের অভিজ্ঞতার খবর এখনো বৈদিক সাহিত্যের মধ্যে খুঁজলে বের করা যাবে।

এ সবই সাহিত্য ধর্ম ও ইতিহাসের আলোচনা। এ দেশে অবশ্য বিজ্ঞানের প্রগতির কথা জানতে আগ্রহ হয়েছে অনেক আগে থেকেই। তখনও, দেশে সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে চলে আসছিল জ্যোতিষশাস্ত্র ও হিন্দু গণিতের আলোচনা—বৈদ্যক জাতিও বাঁচিয়ে রেখেছিলেন আয়ুর্বেদকে। চরক-সুশ্রুত ও তাদের অনুগামী ভেষকদের অনুসরণে রোগের নিদান ও চিকিৎসা করে কবিরাজেরা দেশের একটা বড় অভাব দূর করতেন। প্রথমে গণিতের আলোচনায় প্রাচীন হিন্দুরা যে উৎকর্ষ লাভ করেছিলেন, তার খবর দিলেন বিদেশী পণ্ডিত কোলব্রুক (Colebrooke)। ১৮১৭ সালে ব্রহ্মগুপ্ত ও ভাস্করের লেখা বীজগণিত ও পাটীগণিতের ইংরাজী তর্জমা ছাপালেন ও নানা তথ্য আলোচনা করে লিখলেন তার এক গভীর পাণ্ডিত্য-পূর্ণ উপক্রমণিকা। কোলব্রুক সাহেবের উদ্দেশ্য ছিল হিন্দুরা প্রাচীনকালে গণিত ও জ্যোতিষ শাস্ত্রের গবেষণায় যে স্তরে উপনীত হয়েছিলেন—তার স্বরূপ নির্ধারণ করা। ভাস্করাচার্যের লীলাবতী ও বীজগণিত, ব্রহ্মগুপ্তের সিদ্ধান্ত হতে গণিতাধ্যায়, কুট্টকাধ্যায়—এদেরই একাধিক সংস্কৃত মূল পুঁথি ও টীকা একত্র করে তিনি পরীক্ষা করেছেন। তিনি প্রমাণ করলেন যে, ভাস্কর প্রায় ১১৫০ খৃষ্টাব্দে লীলাবতী ও সিদ্ধান্তশিরোমণি রচনা করেছিলেন। তাঁরই লেখা থেকে পেলেন গণিতের পূর্বাচার্যদের খবর। কোলব্রুকের আগে ডাঃ উইলিয়ম হাণ্টার উজ্জয়িনীতে কিছুকাল অবস্থান করে সেখানকার জ্যোতির্বিদের সঙ্গে আলোচনা করে স্থির করেছিলেন যে, ব্রহ্মগুপ্ত ৬২৮ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি বর্তমান ছিলেন। তা ছাড়া এর আগেও যে এক বিখ্যাত গণিতবিদ এ দেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তার খবর পেলেন—নানা টীকাকারের রচনা থেকে—ইনি আর্যভট্ট। তাঁর লেখা পুঁথি উদ্ধার হয়নি তবে পরের লেখকরা তাঁর মত উদ্ধৃত করে অনেকস্থলে তাঁর স্বপক্ষে ও বিপক্ষে অনেক যুক্তিতর্কের অবতারণা করেছেন। তা থেকে আর্যভট্টের মতের কিছু আভাস পাওয়া যায়। আর্যভট্ট নাকি শিক্ষা দিতেন পৃথিবী দৈনিক তার অক্ষের চারিদিকে ঘুরছে। তিনি সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের কারণ সঠিক নিরূপণ করেছিলেন এবং বলেছিলেন, চন্দ্র কি গ্রহ'রা কেউই নিজে আলোক বিকিরণ করে না, তাদের উদ্ভাসিত করে বস্তুত সূর্যের আলো। আর্যভট্টের বইয়ে নাকি পৃথিবীর ব্যাস ১০৫০ যোজন ও তার থেকে পরিধি ও ব্যাসের অনুপাত $\frac{২২}{৭}$ ধরে পৃথিবীর পরিধি ৩৩০০ যোজন দাঁড়ায়। এই নির্ধারণ সত্য-পরিমাপের খুব কাছাকাছি—কারণ যোজনকে চার ক্রোশের সমান ধরে যদি ভাবা যায় বর্তমানে যে মান

চলিত রয়েছে এ দেশে তা'তে এক ক্রোশের মান হবে ১'৯ মাইল। আর এই হিসাবে পৃথিবীর পরিধি দাঁড়াবে ২৫০৮০ মাইল।

হিন্দু বীজগণিত ও জ্যামিতির নানা তথ্যপূর্ণ খবর দিয়েছেন কোলব্রুক। তিনি দেখিয়েছেন হিন্দুরা করণী (Surd)-এর গুণ জানতেন। ঋণাত্মক সংখ্যার ব্যবহার করতেন তাদের বিশ্লেষণে। দ্বিঘাত সমীকরণের সাধারণ উত্তর তাঁরা নিরূপণ করেছিলেন এবং কখনও কখনও আরও জটিল সমীকরণের সমাধান করেছেন। বিশেষ করে কতকগুলি প্রশ্নের সমাধান করতে এমন উচ্চস্তরের বিশ্লেষণে উপনীত হয়েছিলেন—যা ইউরোপে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পুনরাবিষ্কৃত হয়েছিল। উত্তরকালে ভারতীয় বিজ্ঞানীরা এইসব প্রশ্নের বিশেষ করে আলোচনা করেছেন। কোলব্রুকের একশ বৎসরেরও বেশী পরে ভারতীয় গণিতশাস্ত্রের একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ ইতিহাস লিখেছেন ডঃ বিভূতি দত্ত ও আয়ুধেশ-নারায়ণ। তার মধ্যে উপরের অনেক কথার ওপর গবেষণা নিবদ্ধ আছে।

এর পরে বিজ্ঞানের ইতিহাসের আলোচনা এদেশীয়রাই সুরু করলেন। পথিকৃৎ হিসাবে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের নাম মনে করতে হবে। আচার্য রায় বিদেশে রসায়নে কৃতবিদ্য হয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে দেশে ফিরে এসে গবেষণায় ও অধ্যাপনায় নিজেকে উৎসর্গ করলেন। এ দিকে যেমন ভাবছেন দেশে কি ভাবে নতুন করে রাসায়নিক শিল্পের পুনরুজ্জীবন করা যায়, আবার অন্যদিকে অন্বেষণ আরম্ভ করলেন প্রাচীন পুঁথি ইত্যাদি, যার মধ্যে প্রাচীন-কালের খবর পাওয়া যাবে।

নিজের অধ্যাপনা ও গবেষণা চালিয়ে পরে যে অবসর মিলতো, তা সব ব্যয় করতেন পুরাতন পুঁথি থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে। সংস্কৃত পণ্ডিতদের সাহায্যে অনেক পুরানো তথ্য উদ্ঘাটিত হলো। বৈদ্যক শাস্ত্রের আদি গ্রন্থগুলি পরীক্ষা করে অনেক প্রয়োজনীয় খবর পেলেন। পুরাকাল থেকেই হিন্দুরা ক্ষার ও অম্লকের প্রস্তুত প্রণালী আবিষ্কার করেছিলেন। লোহা, সীসা, তামা, রঙ্গ (টিন), পারদ ইত্যাদি ধাতুদের বিশুদ্ধ অবস্থায় আনতে পারতেন। নানা শোধনক্রিয়া তাঁরা অনুসরণ করতেন। ধাতুভস্ম প্রস্তুত করার অনেক উন্নত প্রণালী তাঁদের জানা ছিল। স্বল্পায়াসেই রাসায়নিক নানা প্রক্রিয়ার জন্য তাঁরা নানা যন্ত্রের উদ্ভাবন করেছিলেন। ঊর্ধ-পাতন, অধঃপাতন তির্যকপাতন প্রক্রিয়ার ফলে তাঁরা যে সব রাসায়নিক তথ্যে উপনীত হয়েছিলেন, তা সত্যিই আমাদের সকলকে বিস্মিত করবে। পুঁথির

অনেকগুলি পারদের নানা রূপান্তর বর্ণনা করেছে। গন্ধকের সঙ্গে নানা ধাতুর যৌগিক পদার্থ অনেকগুলি তাঁরা আবিষ্কার করেছিলেন। হিন্দু রসায়ন ইতিহাসের প্রথম খণ্ড প্রকাশ হল ১৯০২ সালে। পরে দ্বিতীয় খণ্ড লেখা শেষ হল ১৯০৮ সালে। বহু বৎসর পরিশ্রম করে হিন্দুদের বিজ্ঞানচর্চার এক নতুন অধ্যায়ের খবর দিয়ে বিশ্বের পণ্ডিত মহলে এক বরেণ্য স্থান অধিকার করলেন আচার্য রায়। এ দেশ থেকে গণিতের অনেক আবিষ্কার যে আরবজাতির মাধ্যমে পাশ্চাত্য দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল তা কোলব্রুক সাহেব আগেই দেখিয়েছিলেন। আচার্য রায় দেখালেন—প্রাচীনকালে রসায়নের অনেক তথ্য ভারতে প্রথমে আবিষ্কৃত হয়ে পরে মুসলমানদের মাধ্যমে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের নানাস্থানে ছড়িয়ে পড়ে। চরক ও সুশ্রুতের অনুবাদের সঙ্গে রাসায়নিক অনেক ভারতীয় প্রক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশে ছড়িয়ে গিয়েছিল। অল্প কিছু দিন আগে আচার্য রায়ের সুযোগ্য ছাত্র অধ্যাপক প্রিয়দা-রঞ্জন রায় বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য আচার্য রায়ের হিন্দু-রসায়নের ইতিহাসের একটা সংশোধিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ ছাপিয়েছেন।

গত চল্লিশ বৎসরে নানাবিধ আবিষ্কারের ফলে আমরা প্রাচীন আর্যজাতির জ্ঞানের পরিধির একটা নির্ভরযোগ্য বর্ণনা পাচ্ছি। মহেঞ্জদাড়োর যুগ প্রায় আজ থেকে চার হাজার বৎসর আগে। উৎখননে সেই সময়কার নানা শিল্পদ্রব্য আজ আবিষ্কৃত হয়েছে। আমরা জেনেছি এ দেশেই প্রথমে নানা রং-এর কাচ প্রস্তুত হত। ব্রোঞ্জ ও কাংস্য ধাতুর তৈরী নানা উপকরণও আমরা পেয়েছি। পরে নানা স্থানে তার ব্যবহার আজ চলেছে দেখতে পাই। এদেশেই যে বিশুদ্ধ লোহা প্রস্তুত হত ও নানাদেশে রপ্তানী হতো তার খবরও মিলেছে। ইস্পাত তৈরীর রহস্যও ভারতের আবিষ্কার। বিখ্যাত দামাস্কাস ও টলেডোর তরবারি নির্মাণে যে ভারতীয় ইস্পাত ব্যবহার হতো এ জেনে দেশের সকলের গর্ব অনুভব করার কথা।

আমরা এখন স্বদেশীর যুগে এসে পড়েছি। আচার্য শীলের গবেষণার কথা বলে এই প্রবন্ধের শেষ করবো। ইনি বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক। জন্মেছিলেন ১৮৬৪ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর। অলোকসামান্য প্রতিভাধর ইনি। অল্প বয়সের মধ্যেই গণিত, বিজ্ঞান, নানা ভাষা, কাব্য ও দর্শনের চর্চা করে যশস্বী হয়েছিলেন। আচার্য রায় যখন হিন্দুরসায়নের ইতিহাস লিখছেন, আচার্য শীল তখন তাঁকে নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন। তাঁর পুস্তকের শেষে এক অধ্যায় বর্ণনা ছিল প্রাচীন হিন্দুদের বস্তু-উৎপত্তি ও গুণের বিষয়ে নানা তত্ত্বকথা। সাংখ্য দর্শনে, যে সাধারণ নিয়মে

বিশ্বের বিবর্তন হয়েছে, আবার বেদান্ত, মীমাংসা ও বৌদ্ধশাস্ত্র বা চরকের মতবাদে যে বস্তুর রাসায়নিক ও ভৌমিক গুণের উৎপত্তি নিয়ে যে সব জল্পনা-কল্পনা আছে তার একটা চিন্তামূলক বিবৃতি দিয়েছেন আচার্য শীল। ব্যাসভাষ্য, চরকসংহিতা, উদ্দ্যোৎকারের বর্তিকা, প্রশস্তপাদের ভাষ্য ও বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতার উপর মূখ্যতঃ নির্ভর করেছিলেন তিনি। অরূপ প্রকৃতি থেকে কি ভাবে সত্ত্ব, রজঃ ও তম গুণের বৈষম্যের ফলে সারা বিশ্বের প্রকাশ হলো! পঞ্চভূতের তন্মাত্র থেকে কি ভাবে স্থূল কণায় এসে ঠেকলো সৃষ্টি! আবার স্থূলকণা সংযোগ ও বিশ্লেষণের ফলে কি ভাবে আপাতদৃশ্যতঃ বস্তুর মধ্যে রূপ, রস, গন্ধ প্রকাশ পেয়েছে—হিন্দু, বৌদ্ধ দার্শনিকরা কি ভাবে দৃশ্য জগতের আকাশ-বাতাস-জল-স্থলের অবস্থান ও ব্যবহার বুঝতে চেষ্টা করেছেন তার বর্ণনা দিয়েছেন। তার মধ্যে কল্পনায় আমরা বর্তমান কণাবাদের প্রাথমিক সূচনা হয়ত দেখতে পাবো বা কণা-দের মধ্যে আকর্ষণ ও বিকর্ষণের যে ভাবে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে বর্তমানের রাসায়নিক আসক্তির প্রথম রূপ দেখতে পাওয়া যায়—এই সব কথা অনেকের এই অধ্যায় পড়ে মনে হবে। পরে আরও অনেক গবেষণা করে ১৯১৫ সালে ডঃ শীল প্রকাশ করলেন তাঁর মূল্যবান গ্রন্থ—"The Positive Sciences of the Ancient Hindus". গ্রন্থের মুখবন্ধ লিখলেন—ভবিষ্যতে বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞানের ঐতিহাসিকদের জন্য এই পুস্তকে নানা তথ্য সন্নিবেশিত করলেন। গ্রীক ও হিন্দু—এই দুই জাতি, বর্তমানে প্রকৃতির বর্ণনা ও অনুসন্ধানে যে সব বৈজ্ঞানিক রীতি অনুসৃত হচ্ছে—তারই গোড়াপত্তন করেছেন—তা ছাড়া, বস্তুর গুণ বিষয়ে প্রাথমিক যে সব তত্ত্ব সংগ্রহ করেছেন, তাদের বর্তমান শিল্প-বিজ্ঞানে প্রয়োগও হচ্ছে। হিন্দুদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ও স্থির-জ্ঞানে উপনীত হবার যে নীতি চলিত ছিল তা সারা বিশ্বের প্রাচ্য ও প্রতীচ্যকে গভীর ভাবে প্রাভাবান্বিত করেছে—চীন ও জাপানের কথা বা সারাসীন সাম্রাজ্যের কথা মনে করলে সে বিষয়ের সত্যতা সহজেই উপলব্ধি হবে। তাই গ্রীক ও হিন্দু দৃষ্টিভঙ্গীর একটা তৌল নির্ধারণ বিশেষ কাম্য এবং পুস্তকের মধ্যে তাতে গ্রন্থকার অনেকাংশে সফল হয়েছেন।

বিভিন্ন জাতীয় দর্শনবাদের তুলনামূলক পর্যালোচনাই আচার্য শীলের কাম্য—তাই যে সব স্থূল জ্ঞানসমষ্টির উপর দর্শনের উৎপত্তি হয়েছে—যেমন ভাষাতত্ত্ব বা শারীরবৃত্ত বা জ্যামিতিক বা গাণিতিক পরিকল্পনা—সবই দর্শনে প্রতিফলিত হয়। আমরা আজ যেমন একদিকে গ্রীক জাতির জ্ঞান সংগ্রহের পরিচয় পেয়েছি তেমনি

হিন্দু জাতির এই সব বুনিয়াদী জ্ঞানের সঙ্গে পরিচয় করানই তাঁর বই লেখার প্রধান উদ্দেশ্য। নজীর হিসাবে সর্বত্র সংস্কৃত মূল উদ্ধৃত করে আচার্য শীল চেয়েছিলেন লোকের মনে বিশ্বাস আনতে যে একটি কথাও তাঁর স্বকপোলকল্পিত নয়। তাই হিন্দু শাস্ত্রের তুলনামূলক আলোচনা করতে এই বই-এর প্রয়োজনীয়তা সকলেই অনুভব করবেন।

বইয়ের মধ্যে আছে নানা খবর। রসায়নশাস্ত্র থেকে নানাজাতীয় পদার্থের বর্ণনা, তাদের সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ—পারদ, তাম্র, রঙ্গ, অভ্র, নাগভস্মের কথা। দূরত্ব ও কালের মান নির্ণয়ের খবর। জ্যোতিষ্কের ক্ষণিকী গতি গণনার খবর। ডঃ শীল বলছেন, নিউটনের অনেক আগেই হিন্দুরা বিভেদ-কলনের (Differential Calculus) কয়েকটি সূত্র আবিষ্কার করেছিলেন। যেমন $d(\sin\theta)=\cos\theta\, d\theta$, এবং এই বিষয়ে Spottis Woode-কে যুক্তির সাহায্যে তাঁর উক্তির যাথার্থ্য স্বীকার করিয়েছিলেন।

আবার বলেছেন, রঞ্জনশিল্পের কথা—কি ভাবে উদ্ভিজ্জ দ্রব্য ও ফিটকিরীর সাহায্যে হিন্দুরা রেশম বা কাপড়ে স্থায়ী রং করবার পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন এবং এর জন্য দেশ-বিদেশে হিন্দুপণ্যের তাই এত আদর ও চাহিদা হয়েছিল।

আবার খবর দিচ্ছেন উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতে হিন্দুরা কি ভাবে শ্রেণীবিন্যাস করেছিলেন। শেষে বৈদ্যকশাস্ত্র থেকে শরীরের গঠন ও নাড়ী সমাবেশের পরিকল্পনার বর্ণনা দিয়েছেন। আবার তন্ত্র থেকে উদ্ধৃত করেছেন—ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্নার কথা। শেষে চার্বাক থেকে সুরু করে, সাংখ্য ও বেদান্তবাদের প্রাণ ও আত্মার কথা এতে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন। সর্বশেষে আচার্য শীল হিন্দুদের তর্ক ও প্রমাণের রীতির বিশ্লেষণ করেছেন—এর মধ্যে আছে বৌদ্ধের কথা ও বেদান্তবাদীর উত্তর ও আরও অনেক কথা। হিন্দুরা সত্যে উপনীত হবার জন্যে যে বিতর্ক ও বিশ্লষেণ পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন—নানা মতবাদীরা কি ভাবে পরস্পরের কথা খণ্ডন করে স্বীয় বিশিষ্ট মতের প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করতেন তারও এক মনোজ্ঞ বর্ণনা। শেষ বয়সে নিজের আত্মকথায় তিনি লিখেছেন—এই অধ্যায়টি সব বই-এর মধ্যে বিশেষ মূল্যবান ভাবতে হবে।

আচার্য শীলের প্রকাশিত বিজ্ঞানের ইতিহাস আর কিছু নেই। তবে তিনি সব সময় নানা জিজ্ঞাসুদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে আলাপ-আলোচনা করতে ভালবাসতেন। অনেককে তিনি মূল্যবান উপদেশ দিয়ে উৎসাহিত করতেন—অনু-

সন্ধানের পথ নির্দেশ করতেন। শোনা যায় স্বর্গীয় ডাঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় তাঁর বিখ্যাত "History of Ancient Indian shipping" লেখবার সময় আচার্য শীলের কাছ থেকে অনেক মূল্যবান প্রেরণা পান ও স্বনামধন্য ডঃ প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ তাঁর কাছ থেকে সংখ্যায়নে কাজ করার উৎসাহ ও অনেক মূল্যবান উপদেশ পান।

প্রাচীন কালের হিন্দুদের বিজ্ঞানচর্চার কথা আলোচনা করতে শেষ অবধি বর্তমান যুগে পৌঁছে গিয়েছি। আগে কি ছিল—তার আলোচনা করেছি—ভবিষ্যতের ভাবনা মনে হচ্ছে এখন। আজকের দিনে দেশব্যাপী আন্দোলন চলেছে ভারতকে অন্যান্য দেশের মত বিজ্ঞানের ভিত্তিতে মুখ্যতঃ শিল্পাশ্রয়ী করে তুলতে। কৃষিপ্রাণ ভারতবর্ষকে কি সত্যিই অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশের মত শিল্পের উপর নির্ভর করে ভবিষ্যতের জীবনযাত্রার পরিকল্পনা করতে হবে? এ বিষয়ে আচার্য শীলের অপ্রকাশিত আত্মজীবনী থেকে কয়েকটি লাইনের অনুবাদ করে তাঁর মত সকলের কাছে পৌঁছে দিয়ে এই প্রবন্ধ শেষ করি।

"জাতীয় জীবনে কৃষি ও শিল্পের প্রতিযোগিতার কথা যে ভাবে আমরা সচরাচর ভাবতে বসি তা মূলতঃ ভ্রমাত্মক। দুইই মৌলিক ও প্রয়োজনীয় কর্তব্য। ইংলণ্ডে এখন একটি রব উঠেছে—'মাটির দিকে ফিরে চল'—এটা আমি স্বাস্থ্যকর ভঙ্গী বলে মনে করি। চীনের মত ভারতবর্ষে কৃষি চিরকাল লোকের বুনিয়াদী ও প্রধান পেশা হয়ে থাকবে। আমি মনে করি কৃষি ও শিল্পে প্রচেষ্টার অনুপাত এ দেশে ৩ ঃ ১ এই হারে হওয়া উচিত। কৃষিকে করে তুলতে হবে আরও উন্নত ধরণের ও বিজ্ঞান-সম্মতভাবে যন্ত্রের ব্যবহার করতে হবে। সৌর ও বৈদ্যুতিক শক্তির আরও বেশী ব্যবহার বাঞ্ছনীয় বলে মনে হয়। উৎপাদনের হার এই ভাবে উচ্চাঙ্গের করে তুলে, এর বিপক্ষে যে অর্থনীতিমূলক আপত্তি তুলে বলা হয় বার বার কৃষি প্রচেষ্টার ফলে জমি থেকে ক্রমশঃ উৎপাদনের ও মুনাফার হার কমে যাবে—এটাকে খণ্ডন করতে হবে। সচরাচর বলা হয় শিল্পের তুলনায় কৃষির বিপক্ষে এইটি প্রধান কথা। এই ভাবে ভারতে কৃষি প্রবর্তন করলে ও যন্ত্রের ব্যবহার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করতে পারলে ভারতবর্ষের যে প্রকাণ্ড পুঁজি—তার লোকসংখ্যা ও তার বিস্তৃত ভূ-সম্পদ—তার সম্যক ব্যবহার করে আমরা পৃথিবীর মধ্যে প্রথম লাইনে স্থান বজায় রাখতে পারবো।"

চেম্বারলেন বলেছিলেন, প্রত্যেকের চাইই—তিন একর জমি ও একটি গাভী।

এদেশেও এইভাবের একটা জিগির তোলা উচিত। তবু বলতেহবে শিল্প প্রতিষ্ঠানের কাজে আরও অগ্রসর হওয়া চাই। এখন উৎপাদনের ক্ষেত্রে কৃষির তুলনায় আমাদের শিল্পযোজনা শতকের চারি ভাগ মাত্র স্থান নিতে পেরেছে মনে হয়। এইটি অস্বাভাবিক ও তাই আমরা দারিদ্র্যে ডুবে আছি।

আজিকার খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহের সঙ্কটের মধ্যে আচার্য শীলের উপদেশের সারবত্তা আমরা সকলে হৃদয়ঙ্গম করবো।

বৈজ্ঞানিকের সাফাই

কিছুদিন আগে বিজ্ঞান কলেজে রবীন্দ্রনাথের শতবার্ষিকী উৎসবের আয়োজন হয়েছিল। শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করার সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের তখনকার উপাচার্য মশায় শ্রীসুরজিত লাহিড়ী। রবীন্দ্রনাথের কবি-মানসের ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে তিনি যে সব কথা বলেছিলেন, তার ভাবটি কতকটা এইরূপ দাঁড়ায়—আজকাল এ দেশে ও অন্যত্র বিজ্ঞানশিক্ষা ও বিজ্ঞানচর্চার উপর যে অস্বাভাবিক গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে, তার ফল হয়তো শেষ অবধি মানবসমাজের পক্ষে মঙ্গলময় হবে না। রবীন্দ্রনাথের লেখার মধ্যে যে আদর্শের ছবি ফুটে উঠেছে তার সঙ্গে মূলতঃ বিজ্ঞানপন্থীদের কল্পনার কোন আন্তরিক যোগ খুঁজে পাওয়া যাবে না। বিজ্ঞান হয়তো শেষ অবধি আমাদের ভুল পথে নিয়ে যাচ্ছে। শ্রেয়-র আসনে সে প্রেয়কে বসাচ্ছে, ইত্যাদি। ফলে সেদিনের অলোচনা ভিন্নপথে চালিত হলো—দার্শনিক যেসব কুটিল প্রশ্নের অবতরণা করলেন বিজ্ঞানীদের সাধ্যমত তার জবাব দেওয়ার ডাক পড়ল। সভাপতি হিসাবে ,ও বিজ্ঞানী গোষ্ঠীর প্রতিনিধি হিসাবে আমাকে অনেক কিছু বলতে হয়েছিল। এতদিন বাদে সে সব কথা কারও মনে থাকা সম্ভব নয়। সম্প্রতি ছাত্রেরা আবিষ্কার করেছেন যে,সভার বিবরণী যথাযথভাবে ধরে রাখবার জন্য একটি যন্ত্রেরও আমদানী হয়েছিল সেদিন। বহুদিন বাদে কৌতূহল চরিতার্থ করবার জন্য চৌম্বক ফিতার থেকে পাঠোদ্ধার করবার চেষ্টা তাঁরা করেছেন। এতে কিন্তু তাঁরা পুরোপুরি সফলকাম হননি। উপাচার্য মশায়ের কথাগুলির পাঠোদ্ধার করা যায় নি, এটি খুব দুঃখের কথা। আমার ভাষণটিও পুরোপুরি ফেরত পাওয়া যায় নি। তাঁরা যতটুকু পেরেছে, লিখেছে ও আমার কাছে পৌঁছে দিয়ে জানতে চেয়েছে—বৈজ্ঞানিকের সাফাই হিসাবে আমি যা বলতে চেয়েছিলুম,—ঐ আংশিক বিবরণীর সাহায্যে তার কোন পরিচ্ছন্ন রূপ দিতে পারি কিনা। সেই চেষ্টার ফল এই আকার নিলে।

আমাদের দার্শনিক উপাচার্য একটা খুব জটিল প্রশ্ন করেছেন। অবশ্য আমাদের আলোচনার মধ্যে এসব কথা উঠতে পারে তা আমরা আগে ভাবিনি। তাহলেও বিজ্ঞানীদের এ বিষয়ে কিছু বলার দরকার বলে মনে হয়। কারণ উপাচার্যের মনে যে

প্রশ্ন উঠেছে, এ ধরনের ভাবনা হয়তো আমাদের নেতৃস্থানীয় অনেকের মনেই উঠতে পারে—বিশেষ করে যখন এদেশের অনেকেই জাত-দার্শনিক। বিজ্ঞানীদের সম্বন্ধে তাঁদের মনোভাব কতকটা এইরকম—বিজ্ঞানীরা রেলগাড়ী চালিয়েছে, ফলে আমরা সহজে দূর-দূরান্তরে যেতে পারি ; কালিঝুলি মেখে কয়লা ভেঙ্গে সে প্রকৃতির কাছ থেকে কিছু শক্তি সংগ্রহ করেছে, তাতে হয়তো আমাদের সভ্যতার বাইরের রূপ কতকটা বদ্‌লেছে। কিন্তু এইসব জিনিস নিয়ে মেতে থেকে বিজ্ঞানী হারিয়েছে সত্যিকারের দার্শনিক মনোভাব। এই সৃষ্টির পিছনে যে একটা স্রষ্টার মন রয়েছে, সে বোধ হয় কোনকালেই এ কথা ভাবেনা মানুষের আত্মা ও ভগবানের কথা, যা নিয়ে দেশ-বিদেশে বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদ গড়ে উঠেছে সে বিষয়ে সে একেবারেই কোন খবর জানতে চায় না।

আমরা বিজ্ঞানীরা হয়তো স্বীকার করবো যে, এ সব বিষয় আমরা বুঝি না ও তাই জন্য এসব প্রশ্ন আমরা এড়িয়ে চলি, হয়তো বা ভাবি যার সৃষ্টি তিনিই একমাত্র এর মর্ম ও স্বধর্ম বুঝবেন। দার্শনিক মতবাদ এতরকম উঠেছ তার মধ্যে আমরা কোন আশ্বাসবাণী হয়তো খুঁজে পাই না। আমাদের দার্শনিক অতিথির দার্শনিক মতবাদ কি, তাও আমরা জানি না। তবু জানতে ইচ্ছে হয় তাঁর মতবাদটি কি। তিনি কি শুধু ভগবান বিশ্বাস করেন কিংবা শয়তানও সেই সঙ্গে পিছনে থেকে উঁকি মারে তাঁর মনেতে।

সৃষ্টির রহস্য বুঝতে মানুষ সব সময় চেষ্টা করছে, বিজ্ঞানীরাও করে থাকেন। কিন্তু তার সামান্য আধারে কি পূর্ণ শক্তিকে সত্য করে ধরা যাবে। এটা বিজ্ঞানীর ভাবধারণার অতীত, তবে দার্শনিকেরা হয়তো তাও সম্ভব মনে করতে পারেন। কিন্তু সে অবস্থায় পৌঁছলে তাঁকে মনে করতে হবে এই শারীরিক আধারও একটা মায়া এবং বস্তুতঃ নিজেও সেই মহাশক্তির সঙ্গে অভিন্ন। অবশ্য আমাদের দেশে এইভাবে অনেক মত প্রচার হয়েছে—হয়তো বা এখনও পর্যন্ত অনেক লোক এটা কায়মনো-বাক্যে বিশ্বাস করেন। সেই বোধ হলেই কথাচ্ছলে আমরা বলি "তার একদম মুক্তি হয়ে গেলো।" বিজ্ঞানী ভাবে, তাহলে তিনি কোথায় গেলেন? তার সঙ্গে আমাদের পৃথিবীর কোন সম্পর্কই রইল না।

শোনা যায় আমাদর দেশের অনেক মহর্ষির জীবনকথা। তাঁরা একেবারে নিজেকে—নিজের মনকে পর্যন্ত বলি দিয়ে থাকেন। সেইভাবে থাকাটাই কি শ্রীভগবানের ইচ্ছা? অবশ্য তাঁর কাছে প্রশ্নটা পৌঁছে দিতে আমাদের

দার্শনিকের শরণ নিতে হবে, কারণ, বিজ্ঞানীরা এখানে অন্ধ, ভগবানের সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎ হবে না।

বিবর্তনের ফলে মানুষ ক্রমশঃ উপরের দিকে চলেছে। তার সভ্যতা ক্রমশঃ ঊর্ধ্বপথে চলেছে। এটা বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করে। কাজেই, সে ভাবে নিছক কল্পনার উপর নির্ভর করলে মানুষের জয়রথ এগোবে না। প্রকৃতির শক্তির ভাণ্ডার থেকে সংগ্রহ করা জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে মানবের সভ্যতা। তাই সে শুধু দর্শনশাস্ত্র আঁকড়ে ধরে বসে থাকতে চায় না। অন্যদিকে শুধু দর্শনশাস্ত্রের দোহাই দিয়ে আমরা ভাবি যে আমরা মানুষ, সকলে এক ও এইভাবে হিংসাদ্বেষ বিসর্জন দিয়ে আমরা সারা জীবন কাটাতে পারবো, তাহলে এতদিন পর্যন্ত সে কথা কেবল বৃথা মনোভাবেই পর্যবসিত হয়েছে—একথা অবশ্য হাজার হাজার বছরের ইতিহাস আলোচনা করলে বুঝতে পারবো। যে সব পরাতত্ত্বের কথা আমাদের দার্শনিক অতিথি বলেছেন, সে সবই আমাদের দেশে নূতন নয়। নিতান্ত ঘরোয়ানা জিনিস এই ভারতে—অন্তত আমাদের গর্বই এই। কবি ডি, এল, রায় একবার লিখেছিলেন যে "আমাদের তোমরা অনেক লাঠি মেরো কিন্তু বাবা একবার গীতাখানা পড়ে দেখতে পার।" কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও বলতে ইচ্ছা করে যে এই ভাবের দার্শনিক ব্যাখ্যা যেখানে যেদেশে পূর্ণভাবে বিদ্যমান ছিল বলে আমরা মনে করি, সেখানেও কোনকালে হিংসা দ্বেষ সংঘাতের বিরাম হয় নি। অবশ্য যাঁরা খাঁটি ব্যক্তি, তাঁরা এর চমৎকার কাটান দিয়ে গেছেন। সে গল্প এখানে করতে ইচ্ছা করছে। বশিষ্ঠ ঋষি চিরকাল বলতেন যে, ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা। রাজা দিলেন তাঁর পিছনে হাতি দিয়ে তাড়া, বশিষ্ঠ অবশ্য টিকি না বেঁধেই দৌড়াতে আরম্ভ করলেন। তখন শিষ্য রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, "একি মহামুনি, আপনি যাচ্ছেন কোথায়? কিছুই নয়, এ তো সব মিথ্যা।" ঋষি এর উত্তরে বললেন, "আমি যে যাচ্ছি, এটাও তো মিথ্যা।" অবশ্য এই ভাবে আমাদের সভায় মিথ্যা ও সত্যের স্বরূপ নিয়ে আলোচনা চালালেও জগতের মধ্যে বিরাট দারিদ্র্য ও অজ্ঞতার যে রূপ প্রকট রয়েছে, সেটাকে শুধু মায়া বলে কাটিয়ে দিলে চলবে না। অন্তত পৃথিবীতে মানুষ যতদিন আছে, তার মনে এই দ্বৈতভাব থাকবেই। মানুষ যতদিন আছে, ততদিন সে চেষ্টা করবে এই সমস্ত জিনিস কবে মানুষের জীবন থেকে মুছে ফেলা যায়। কি করে এমন এক সমাজ গড়া যায় যার মধ্যে এইসব আকস্মিক বিপদ্‌পাত যেন একেবারে না থাকে। তার জন্য চাই জ্ঞান, চাই বিরাট কল্পনা। আজকের দিনে বিজ্ঞানীরা বলতে পারেন

যে, শুধু দার্শনিক দিয়ে যদি পৃথিবী চলে থাকত (এই রকম নাকি এক সময়ে ভারতে ছিল) তাহলে বোধ হয় পৃথিবী থেকে দ্বেষ, হিংসা তাতে লোপ পেতনা। বিজ্ঞানচর্চা থাকত না, কাজেই আণবিক বোমার আবিষ্কার হোত না। তবুও নিপাত করার ও উৎসন্ন দেবার যে সব সাধারণ অস্ত্র ছিল সে সব অস্ত্রের ব্যবহার চলত এবং সেগুলি ঠিক সেইরকমই নির্মম ও সর্বনেশে। মানুষকে মানুষ ভেবে মানুষ যে বিশেষ সম্মান করে এসেছে এতকাল, তা আমার মনে হয় না। শুধু আজকের বিংশ শতাব্দীতে মানুষ সেইভাবে সাধনার পথে সবে এগোতে সুরু করেছে। অবশ্য উপা-চার্য মশায় যা বলেছেন, সেটা খুবই ঠিক। মানুষের মধ্যে সেই মনোভাব না এলে আমাদের নিস্তার নেই। বিজ্ঞানীরাও তা বিশ্বাস করে, কিন্তু দুঃখের কথা এই যে যাঁরা দেশে দেশে হাল ধরেছেন, তাঁরা বিজ্ঞানী নন। অনেক সময় তাঁরা ধার্মিক, অনেক সময় তাঁরা জাতীয়তাবাদী। অনেক সময় তাঁরা বিশ্বাস করেন একটা বিশেষ লক্ষ্য নিয়ে তাঁর স্বজাতির সৃষ্টি হয়েছে এই পৃথিবীতে এবং তাঁর বিশেষ কর্তব্য হচ্ছে জমি দুরমুস করে ঐ অন্য সকলের উপর এই এক সভ্যতার গাড়ী চালিয়ে দেওয়া। আমি জানি (কিন্তু আপনারা কেউ এ কথা জানেন কিনা বলতে পারব না) যে সম্প্রতি যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ হয়ে গেল তার জন্যে দায়ী বলে সবার উপর প্রধান আসামী করে যাঁকে কাঠগড়ায় পুরতে চেয়েছিলাম (অবশ্য তিনি নিজে আত্মহত্যা করলেন বলে পারলাম না) সেই ডিক্টেটর হিটলার সত্যিকারের খুব ধার্মিক লোক ছিলেন। তাঁর জীবন নিয়ে আলোচনা করলে দেখবো যে তিনি আমিষ কখনও ছুঁতেন না, ইত্যাদি অনেক কিছু। যে সব বাইরের অঙ্গ থেকে আমরা বিচার করি তাই থেকে আমাদের মনে হতো ধার্মিক ঐ লোকের কাছ থেকে যা পাওয়া যাবে তা সত্যি করেই মানুষের পক্ষে ভাল। জার্মান জাতি বিপদের কবলে একেবারে যখন রসাতলের অধঃস্থলে যেতে বসেছিল তখন তিনি এগিয়ে এসেছিলেন দেশের 'ত্রাতা' হিসাবে। এবং যাঁরা আমার মত যুদ্ধের মধ্যে রেডিও শুনতেন— তাঁরাও লক্ষ্য করতেন হিটলারের সতর্কতা। বলেছেন যে, "যদি এ যুদ্ধে আমরা হারি তা'হলে জার্মান জাতি হাজার বছরের মধ্যে আর উঠতে পারবে না।" আরও কত কি ঘটে গেল জার্মানীর ভাগ্যে। আজ শুধু এইটুকু বলতে হচ্ছে করে— আজকের দিনে সেই অত্যন্ত নিম্ন রসাতলে পতিত জাতি যদি আবার উঠে আসে তাহলে সেটা বিজ্ঞানের জোরেই। বিজ্ঞানীরাই আবার তাকে টেনে তুলেছে। জার্মান জাতির মধ্যে যা কিছু দেবার ছিল সে শুধু দর্শনশাস্ত্র নয়, বিশেষ করে সে

দেশের মানুষ তার জীবনের সর্বক্ষণ কাজে লাগিয়ে যে জ্ঞান সংগ্রহ করেছিল, মহাযুদ্ধের মধ্যে তার স্বর্বস্ব বিধ্বস্ত হয়ে গেলেও, মানুষের সেবায় লাগিয়ে সেই জ্ঞানের সাহায্যে অল্প সময়ের মধ্যেই সেই বিনষ্ট সমৃদ্ধি পুনরায় গড়ে তুলেছে। বিজ্ঞানীর মনে এইটে ধ্রুব বিশ্বাস কেবলমাত্র ধর্মশাস্ত্র চর্চা করলে কিছু করা যাবে না। ধর্মশাস্ত্রে মানুষ কি, বা জীবনদেবতার পক্ষে মানুষের যে সম্পর্ক তার চর্চা ও অনুশীলন নিভৃতে হওয়া দরকার। তার ভেতর থেকে, মানুষ হয়তো পাবে কাজের প্রেরণা, কাজে যখন সে নামবে তাকে সম্পূর্ণভাবে উদ্বুদ্ধ মন নিয়েই কাজ করতে হবে; যেটা দড়ি সেটাকে সাপ বললে চলবে না। নানারকমের মনের কল্পনা নিয়ে সমস্ত জিনিসকে যদি 'নাস্তি' বলে প্রমাণ করে দেওয়া যায় তাহলেও প্রতিদিন থেকে যাবে বহুশত লোক, বহুসহস্র বহু লক্ষ লোক যারা রোগে কষ্ট পাচ্ছে—যারা দুঃখে ম্লান হয়ে রয়েছে, যারা নানারকমের বিপদের ভয়ে চিরকাল সশঙ্কিত, যারা জানে না কি করে দেশের জমিতে দুমুঠো চালের জায়গায় চারমুঠো চাল উৎপন্ন হবে। তাদের সাহায্য করবে অল্পপ্রমাণ জ্ঞান—এই জ্ঞান তাকে হয়তো বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টার বিষয়ে একটা পরিপূর্ণ ছবি না দিলেও, এই অল্পজ্ঞানের কল্যাণে মানুষ অনেক বিভীষিকা থেকে যে ত্রাণ পেয়েছে—একথা আমাদের উপাচার্য মশায় বোধ হয় স্বীকার করবেন।

আজকের দিনে আমরা অবশ্য এসব কথা পাড়তে চাই না। আমরা চেয়েছিলাম বলতে রবীন্দ্রনাথ নিজে বিজ্ঞানকে কি আসন দিয়েছিলেন—তাঁর লেখা, তাঁর জীবন—শুধু কেবলমাত্র কবিতার মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল না—অনেক জায়গায় তিনি অনেক বক্তৃতা করেছেন, বই লিখেছেন অনেক, যার মধ্যে বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী পরিস্ফুট রয়েছে, এগুলোই অবশ্য আমাদের এই সভায় আলোচনার বিষয় ছিল। এই রকম ভীষণ দার্শনিক প্রশ্নের জন্য আমরা প্রস্তুত হই নি। তবে এইটুকু বলে রাখি, কেবলমাত্র প্রাচ্যের শাশ্বত মনোভাবের কথা বলে থেমে গেলে চলবে না—কারণ তিনিও নিশ্চয়ই জানেন যে অন্ততঃ ৩।৪ শত বৎসর আগেও আর্মিসির সেন্ট ফ্রান্সিস এই ধরণের কথা বলতেন যে, জল আমার বোন ও বাতাস আমার ভাই। এরকম করে সারা জীবন ধরে নিজের মধ্যে যা কিছু সৃষ্টি, সকলকে তা দিয়ে আপন করতে চেয়েছিলেন—এরকম মনোভাব যেমন এদেশে ছিল, তেমনি পূর্ব বা পশ্চিম সব জায়গাতেই ছিল। কিন্তু কোথাও দেখা যায় না মানুষ এইটাকেই সত্যভাবে আপন করতে পেরেছে সারা দেশের মানুষকে। তবে আশা হয়, দুই

প্রবল প্রতিপক্ষের হাতেই যখন সমান রকমের শক্তিশালী অস্ত্র থাকবে তখন হয়তো এই মনোভাবের সার্থকতা তার মনে আসতে শুরু করবে।

একসময়ে মনে হয় যে, তেল পাওয়া যায় বলে হয়ত ভারতবর্ষের দিকে ঝোঁক সকলেরই বেশী—কিন্তু আজ ভীষণ মারণাস্ত্রের মশলা যদি সামান্য জল থেকে বার করা যায় তখন জোর দখলের জন্য এই ভীষণ প্রতিযোগিতার ভাবটা হয়ত অনেকটা কেটে যাবে। যখন হাইড্রোজেন থেকে বোমা সৃষ্টি হল, তার বিস্ফোরক ক্ষমতা আণবিক বোমার থেকে দু'শহাজার গুণ বেশী। এইএক আণবিক বোমার দ্বারা হিরোসিমা ছারখার হয়েছিলো, তখন আমাকে এক বিজ্ঞানী বন্ধু বলেছিলেন ভালোই হলো। কেন না, এখন তো আর বলা যাবে না যে কোন একটা জায়গা থেকে খুব একটা দুষ্প্রাপ্য জিনিস সংগ্রহ করতে তাক্ করছে লোকে। যদি বুদ্ধি থাকে তো হয়ত সাধারণ জিনিস থেকেই মানুষকে একেবারে শেষ করার অস্ত্র তৈরী হতে পারে। অবশ্য এই বুদ্ধি বিজ্ঞানীর মনোভাব থেকে আলাদা। তার জন্য প্রচার করতে হলে যারা মানুষকে চালাবে, যে নেতারা প্রতিদিনের প্রচারকার্য সত্যকে মিথ্যা ও মিথ্যাকে সত্য বলে প্রতিপন্ন করে—তাদেরই নিজের বুকে হাত দিয়ে চলতে হবে। কারণ মারণাস্ত্র আর কোন একজাতির হাতে রইল না। যুদ্ধ বাধলে এই ধরণের মারণাস্ত্র ব্যবহার করে দুই প্রতিপক্ষই মানুষকে ধ্বংসের পথে টেনে নিয়ে যাবে। এক সময়ে কোলকাতায় এক বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী বলেছিলেন আকাশের দিকে তাকালেই চোখে পড়বে মাঝে মাঝে হঠাৎ নতুন ধরণের একটা নতুন উজ্জ্বল তারার উদ্ভব হল, আবার দিনকতক বাদে সেটি নিষ্প্রভ হয়ে মিলিয়ে গেল। এইটুকু খবর দিয়ে তিনি বলেছিলেন এই দেখে আমাদের মানুষের একটু সতর্ক হওয়া দরকার—যদি আমাদের মনোভাব না বদ্লায়—তাহলে হয়ত এই পৃথিবী একদিন আর থাকবে না, আমরা এই ধরণের একটা দু' দিনের তারা হয়ে উড়ে যাবো। এই তারাবাজী হবে কিনা, সে তো যিনি এই সৃষ্টি করেছেন তিনিই জানেন। মানুষ জাতির মনোভাব আজকের দিনে কোন্ পথে চলছে কে বলবে? তবে এইটুকু আশার কথা, যে সব ছোট ছোট দেশ জাতীয়তাবাদের মধ্যেই নিজেদের ডুবিয়ে রাখতো আজকের দিনে তারা সারা মানুষের জন্য ভাবতে শিখেছে। কাজেই নানা সময়ে বারবার সকলে মিলে এইটেই আলোচনা করছে—ভবিষ্যতে মানবসমাজে আমাদের কী কর্তব্য! মানুষকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে, একে আরও উন্নত করতে হলে আমাদের মনোভাব সেইভাবে বদলাতে হবে। এই যে সম্ভব

হলো—একদিকে আমেরিকা অন্যদিকে সোভিয়েত দু'জনেই এক কথা ভাবছে। দক্ষিণ আফ্রিকা অবশ্য এখনো এসে পৌঁছান নি—যদিও দক্ষিণ দেশের লোকেরা সাধারণতঃ একটু আলাদা থাকতেই চান, তবুও বহু দেশবাসী একত্র হয়ে ভাবতে চাচ্ছে। এক হিসাবে বিজ্ঞান না থাকলে এটা কখনও সম্ভব হত না। আমি তাই মনে ভাবি সমস্ত দুর্যোগ ও সমস্ত বিপৎপাতের মধ্য দিয়ে বিজ্ঞানী যদি নিজের কাজ চালিয়ে যায়, তবে সে একটা বলিষ্ঠ মনোভাবেরই পরিচয় দিচ্ছে—সে সত্য করেই মানবিকতায় বিশ্বাসী। সে মনে করবেনা গোষ্ঠী ছাড়া আমার কিছুই কর্তব্য নেই, সে মানুষকে ভালোবাসে। সেই তার প্রতিদিনের ভাবনার কেন্দ্র।

প্রত্যেক প্রকৃত বিজ্ঞানী—সে যে শুধু আত্মপ্রসাদ বা আত্মাভিমানের জন্য বিশ্লেষণে ব্যস্ত থাকে তা নয়— সেই বিশ্লেষণের পরে যে মূলসূত্রকে ধরতে পারবে সেই নীতি বা রীতিকে অবলম্বন করলে কত প্রকাণ্ড মানব-সমৃদ্ধির সৌধ রচনা করা যাবে সেই স্বপ্ন সে সব সময়েই দেখে। আবার যে বিজ্ঞানী পরীক্ষার টিউব হাতে নিয়ে চেষ্টা করে অজ্ঞাত রোগের হদিশ করতে—সেও সেই সঙ্গে চেষ্টা করে এই ভাবে হয়ত অনেক মহামারীকে নিশ্চিহ্ন করে দেবার উপায় আবিষ্কার হবে। একে সত্যকারের বিজ্ঞানীর মনোভাব বলা যেতে পারে। আমার এই বিন্যাসে হয়ত সকল বিজ্ঞানীই আমার পক্ষে একমত হবেন।

রবীন্দ্রনাথ যদি শুধু নিজের কাব্যের কথাই ভাবতেন তাহলে তিনি শ্রীনিকেতনও করতেন না, কিংবা চেষ্টা করতেন না গ্রামে দেশে গিয়ে কৃষি ও কুটিরশিল্পের উন্নতিসাধন করতে। তিনি চেয়েছিলেন যে মানুষের সব জ্ঞান মানুষ যাতে শ্রদ্ধার সঙ্গে জীবনদেবতাকে প্রথমে সমর্পণ করে, তার পরে সেই জ্ঞানকে মানুষ তার কাজে শুভবুদ্ধি খাটিয়ে লাগাতে পারে।

(ডায়েরী থেকে) ২২শে জুলাই ১৯৬৯

আমেরিকার অভিযাত্রীরা চাঁদে পৌঁছে গেলেন, তখন আমাদের দেশে নিশুতি রাত। তবে এখনেও অনেক উৎসাহী বন্ধুরা ব্যগ্র হয়ে রাত জেগে বেতারে খবর শুনছিলেন—তাঁদের কানে মানববাহী যানের চাঁদের মাটিতে প্রথম স্পর্শের খবরও নাকি বেতারে ভেসে এসে পৌঁচেছিল। অন্যান্য দেশে টেলিভিশনে ছায়াছবিতে দেখা গিয়েছিল অভিযাত্রী আর্মস্ট্রং সিঁড়ি বেয়ে চাঁদে নেমে পড়লেন। যন্ত্রসভ্যতার যুগে প্রয়োগবিদ্যার এই চূড়ান্ত সাফল্যে সারা পৃথিবী জয়োল্লাসে উচ্ছল হয়ে উঠেছে। বহু বৎসর ধরে হাজার হাজার বিজ্ঞানীদের সমবেত সহযোগিতা ও গবেষণার ফলে মানুষ চাঁদে পৌঁচেছে। রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, জীব-বিজ্ঞানের অনেক রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে এই প্রয়াসের সঙ্গে সঙ্গে—যার কল্যাণে অবাধে বায়ুমণ্ডল ভেদ করে মহাশূন্যে রকেট-যানে মানুষের এই প্রয়াস সম্ভব হয়েছে। কে নাকি বলেছিলেন, চাঁদের মাটিতে অনেক হীরা-জহরৎ ছড়ানো আছে। অভিযাত্রীরা বস্তা ভরে সে সব নিয়ে ফিরবেন। বাজারে বিক্রী হলে তা থেকেই এই অভিযানের সব খরচ উঠে আসবে। ছবিতে দেখা গেল, তাঁরা আড়াই ঘণ্টা ধরে বেড়িয়েছেন—বস্তা ভরে তুলে আনছেন পাথর, উপলখণ্ড ও মাটির রাশি, যা এখানে বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখবেন—তার উপাদানে কোন অজনা বস্তুর সন্ধান মিলবে কিনা। সৃষ্টির রহস্য নিয়ে যাঁরা মাথা ঘামান, তাঁরা ভাবছেন, সৃষ্টির আদিতে আমাদের গ্রহ কেমন ছিল—তার সন্ধান হয়তো এই চাঁদের মাটিতে মিলতে পারে—এই পৃথিবীতে তো নানা প্রাকৃতিক বিপ্লবে সে সব আদিকথার কোন চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাবে না। প্রকৃতির বিপর্যয়, তা ছাড়া প্রাণের অভিযান ও দৌরাত্ম্য তো আছেই। শুধু বিশ্লেষণে অবশ্য বেশীকিছু নতুন উপাদানের সন্ধান তাঁরা আশা করেন না। কারণ পৃথিবীতে উড়ে এসেছে, উল্কাপাতে পড়েছে অনেক শিলা—যা সংগ্রহ করে তাঁরা দেখেছেন, আমাদের চিরপরিচিত পৃথিবীর উপাদান দিয়েই সে সব গড়া—কাজেই চাঁদে সংগৃহীত মশলা থেকে এমন কিছু নতুন খবর পাওয়া যাবে না, যা আগে থেকেই বিজ্ঞানীরা আন্দাজ করেন নি।

অবশ্য সংগ্রহ অপেক্ষাকৃত তুচ্ছ হলেও এর জন্যে যে প্রচণ্ড পরিশ্রম ও জ্ঞানসমুদ্র মন্থন করতে হয়েছে, তাতেই বিজ্ঞান-ভাণ্ডারে বিপুল সঞ্চয় জমেছে এত বছরে। সব তথ্য এখনো আমেরিকান বা রুশ বিজ্ঞানীমহল খোলা বাজারে ছাড়েন নি—সব কথা হয়তো আজ থেকে শতবর্ষ পরে প্রকাশ হবে।

২৩ শে জুলাই ঃ চাঁদের অভিযানে প্রতিযোগিতা করে আসছেন রাশিয়া। এবারও তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে লুনা-১৫ ছেড়েছেন। আজকের খবর—সেও নাকি ধীরে ধীরে চাঁদের কুলে ঠেকেছে। অবশ্য সবটাই দূরথেকে যন্ত্রবশে নিয়ন্ত্রিত ওচালিত—চালকবিহীন এই যান। হয়তো তথ্য সংগ্রহ করছে, ছবি তুলছে, হয়তো বা সেও চাঁদের মাটি সংগ্রহ করে পৃথিবীতে ফিরবে। ইংরেজ বিজ্ঞানীরা কেউ ভেবেছেন—হয়তো যাত্রী পুনর্বার বোঝাই করে অ্যাপোলো-১১-এর ফিরতে একটু দেরী হতে পারে, তার আগে লুনা যদি ফিরে আসে—তো বিজয়ের গৌরব অনেকটা ম্লান হয়ে যাবে আমেরিকানদের।

২৪শে জুলাই ঃ দুই মহাশক্তির মধ্যে মহাকাশ অভিযান নিয়ে খুব রেষারেষি। তবে এইবার বোধ হয় জয়মাল্য আমেরিকায় রয়ে গেল। নানা দেশ থেকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন—সকলে বলছেন—অভিযাত্রীদের নাম ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে রইল। কেউবা ১লা জানুয়ারীর বদলে ২১শে জুলাই থেকে বর্ষ গণনা সুরু করতে চান। আজ সকলে উৎকণ্ঠায় অপেক্ষা করে রয়েছেন। আমেরিকার রাষ্ট্রপতি স্বয়ং এগিয়ে চলেছেন অভিযাত্রীদের স্বাগত জানাতে—প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে, যেখানে তাঁদের আজ রাতে নামবার কথা। তারপরে কিছুদিন তাঁরা নতুন ধরনের আবাসে নজরবন্দী হয়ে থাকবেন—কারো যেন ছোঁয়াচ না লাগে। যাতে তাঁদের সঙ্গে চাঁদ থেকে কোন অজানা জীবাণু না এসে পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। বোধহয় মানুষ যাতে পৃথিবীতে বহুযুগ ধরে ঠিক থাকে, তার জন্যে এই সতর্কতা। অবশ্য চাঁদ থেকে আমদানী না হলেও মারণযজ্ঞের যথেষ্ট ইন্ধন মজুত রয়েছে এই পৃথিবীতেই। কি বোমা, কি বিষাক্ত গ্যাস, কোনটারই অভাব নেই। তা ছাড়া শত্রুর রাজ্যে ইচ্ছামত রোগের জীবাণু ছড়িয়ে দেবার কৌশলও মানুষের অজানা নেই। মাঝে মাঝ এই নিয়ে পরীক্ষা হয়ে গেছে—এই রকম কানাঘুষাও শোনা যায় মাঝে মাঝে। অবশ্য বিশ্বশান্তির ঢাকের বাজনায় তা অনেকটা চাপা পড়ে গেছে। ভারতের মত দরিদ্র অনেক দেশের নিরক্ষর মানুষ ভাবছে, প্রগতির এই প্রচণ্ড পদক্ষেপে তাদের কি লাভ হলো। মহকাশচারীরা তো চাঁদে তারাখচিত পতাকা উড়িয়ে এলেন—আর ভাবলেন বিশ্বশান্তি আনবার এবং চিরস্থায়ী করবার জন্যে সব মানুষের সমবেত চেষ্টার প্রতীক হয়ে রইলো এটি।

এদেশে বয়সের ভারে যাঁদের স্মৃতির বিলুপ্ত হয়নি, তাঁরা শৈশবে যে স্কুলে Pax Britannica-র কথা শুনতেন—তার বিষয় মনে পড়বে। আর মনে পড়বে ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইরেজের Union Jack-এর আওতায় বিশ্বশান্তি

স্থাপনের দারুণ আকাঙ্ক্ষা। সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার কথা এখনো শুনছি, ভ্রাতৃভাবের উচ্ছ্বসিত ধ্বনি বাতাস কাঁপাচ্ছে নানা কনফারেন্সে, তবে উপনিষদের কথার সময়োপযোগী টীকা করে নিলে দাঁড়ায়— এসব দুর্বলের লভ্য নয়।

যন্ত্র-বিজ্ঞানের উন্নতি এতদূর এগিয়েছে যে, আজ স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রগুলি মানুষকে ভাবনার দায় থেকে রেহাই দিয়েছে। যন্ত্রের হাতে নির্ভাবনায় নিজেকে সঁপে দেওয়া —ব্যক্তিত্বকে বিসর্জন দিয়ে অকুতোভয়ে অজানা সমুদ্রে ঝাঁপ দেওয়াই হলো আজকের দিনের নির্দেশ। এটিতে ফল ভালই দাঁড়ায়—২১শে জুলাইয়ের অভিযান থেকে প্রমাণ হলো। ভবিষ্যৎ নিয়ে অনেক জল্পনা-কল্পনা চলছে। এদেশে জ্যোতিষীরা মাঝে মাঝে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন—চেতাবাণী মাঝে মাঝে আমেরিকার কাগজেও দেখি। অবশ্য জ্যোতিষ যে নির্ভুল নয়, তার প্রমাণ অনেক আছে। তবুও এদেশ থেকে রাজজ্যোতিষীদের তাড়ানো যাবে না। বিজ্ঞানীরা এখন নবযুগের ভবিষ্যৎ-বক্তা, তাঁরা বলছেন, এখন রাস্তা খুঁজে পেয়েছেন—এই বছরের মধ্যেই আবার চাঁদে যাবার তোড়জোড় চলছে। তা ছাড়া শীঘ্রই এই শতক শেষ হবার আগেই মানুষ হয়তো মঙ্গলগ্রহে গিয়ে পৌঁছবে এমন ভবিষ্যদ্বাণীও শুনছি।

সেকেলে আমরা ভাবতাম, আমাদের চিরসুন্দর পৃথিবী, যার ধুলায় পিতৃপিতামহের দেহভস্ম মিশিয়ে রয়েছে—এই সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা পৃথিবীকে মানুষ ভালবাসে। বিজ্ঞানের প্রগতির ফলে সারা মানবজাতির সমবেত চেষ্টায় এই ধরায় স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করবে সে। কল্পনাপ্রবণ বিজ্ঞানী ভাবে, যুগ যুগ ধরে প্রাণ নানাভাবে ঘুরছে—এই মর্তে নিজেকে বিকশিত করবার চেষ্টা করেছে—নানা জীবদেহের আবরণের মধ্যে খুঁজছে সে তার সার্থকতা। বিবর্তনের শেষ ধাপে বুঝি পৌঁচেছে সে—তাই মানুষের আবির্ভাব। এইবার বিজ্ঞানের সাধনার পথে সে হয়তো খুঁজে পাবে চিরন্তন প্রশ্নের সদুত্তর। বিজ্ঞান মেটাবে সহজে মানুষের প্রতিদিনের চাহিদা, ফলে তার মনে জাগবে সন্তোষ, কুসংস্কার ঘুচে যাবে, পৃথিবীতে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-বৈষম্য লোপ পাবে—পরিপূর্ণ জ্ঞানের আলোকে সত্যস্বরূপ খুঁজে পাবে মানুষ। মানুষের ভাগ্যে সেদিন কখনো আসবে কিনা, জানি না। তবে আমার বিশ্বাস, চাঁদের অভিযান থেকে সেপথের নির্দেশ পাওয় যায়নি। কাজেই—ততঃ কিম্!

শিক্ষা চিন্তা

শিক্ষা ও বিজ্ঞান

ভারতবর্ষ থেকে বিভিন্ন দেশে—বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়, কারখানা ও শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিতে ছাত্র পাঠানো হয় বছরে বছরে। এরা বিদেশে যায় মেকানিক্যাল ও ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যার বিবিধ শাখায় জ্ঞানলাভের জন্য। কিন্তু প্রায়ই এটা লক্ষ্য করা যায় যে, ভারতীয় শিক্ষানবিসদের সেই প্রাথমিক শিক্ষার অভাব রয়েছে যা থাকলে পরে তাদের পক্ষে সম্ভব হত আধুনিক কর্মপদ্ধতি দ্রুত আয়ত্ত করা। সম্প্রতি আমেরিকা প্রত্যাগত একজন বিশিষ্ট ভারতীয় শিক্ষাবিদ্ জানিয়েছেন যে, আধুনিক ইঞ্জিন বা যন্ত্রপাতি চালাতে বললে আমাদের ছেলেরা অনেক সময় খুবই ত্রস্ত বোধ করে প্রস্তুতির অভাবে। আমাদের দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলির ফলাফল বিশ্লেষণে বিপুল অনুপাতে ব্যর্থতা প্রকট হয়ে ওঠে প্রতিটি পরীক্ষায়। কি বিপুল অপচয় আমাদের জাতীয় প্রয়াসের। অনেক সময়ে আমার মনে হয়েছে যে, এই সব ত্রুটি ও ব্যর্থতার জন্য আসলে আমরা ছাত্র-সমাজের যে উপাদান নিয়ে কাজ করি তার উৎকর্ষের নিজস্ব অভাবই দায়ী নয়। বরঞ্চ যথাযথ পরিচালনা ও সুযোগ লাভ করলে ভারতীয় ছাত্র সত্যই কৃতিত্ব অর্জন করে এবং সব দিকে প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাদের ব্যুৎপত্তি ও দক্ষতা দেখায়। আমার বোধ হয় সময় ও প্রয়াসের এই অপচয় এড়ানো সম্ভব, একমাত্র যদি আমরা আমাদের শিক্ষণপদ্ধতির অসম্পূর্ণতার সন্ধান ও বিশ্লেষণ করি এবং আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়-গুলি থেকে তা অপসারণের কাজে দৃঢ়ভাবে ব্রতী হই। কিছুদিন আগে এই প্রস্তাব আমি এনেছিলাম যে, আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি পরিবর্তনের এবং স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় সর্বস্তরেই শিক্ষার বাহন হিসাবে মাতৃভাষা ব্যবহারের সময় এসে গেছে। শত শত ছাত্রের সংস্পর্শে আসার সুযোগ ঘটেছে এমন একজন শিক্ষক হিসাবে আমার স্থির অভিমত এই যে, যথেষ্ট সময় বাঁচানো ও ছাত্রদের মনে বৈজ্ঞানিক চিন্তার দৃঢ়তর ভিত্তি গাঁথা সম্ভব, যদি প্রতিটি শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষক ও ছাত্রেরা সহযোগিতা করেন, তাঁদের সমস্যার খোলাখুলি আলোচনা ও তার সমাধানের জন্য একযোগে কাজ করেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে কোন বিদেশী ভাষা এসে

দাঁড়ালে মস্ত অসুবিধা দেখা দেবেই। কথাবার্তা ও শিক্ষার বাহন হিসাবে সর্বদাই ইংরেজী ভাষা ব্যবহার করতে হলে অনুসন্ধিৎসু ছাত্র অনেক সময়েই ঠিকমত মনের কথা বলতে পারে না এবং শিক্ষকও নিশ্চিত হতে পারেন না যে, ছাত্রকে যা তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন সে তার সবটাই বুঝতে পেরেছে কি-না। বর্তমান পদ্ধতি যে মুখস্থ করতে প্ররোচনা যোগায়, এতে যে শিক্ষণীয় বিষয়ের সারতত্ত্ব সম্পর্কে সম্যক ধারণা জন্মায় না—এ সম্বন্ধে আমি নিঃসংশয়। কিছুটা সতর্ককার সঙ্গে প্রকাশ করা সত্ত্বেও আমার এই মত দেশের সর্বত্র বাদানুবাদের উদ্রেক করেছে এবং অনেকেই আছেন যাঁরা মনে করেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার বাহন হিসাবে ইংরাজীকে বাদ দেওয়া দেশের প্রকৃত স্বার্থের অনুকূল নয়। একজন অত্যন্ত বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এই অভিমত জ্ঞাপন করেছেন যে, ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি বিভিন্ন ভাষা ব্যবহৃত হয় তাহলে তার ফলে 'বিদ্যায়তনিক চলাচল' (academic mobility) ব্যাহত হবে এবং তার দরুণ উগ্র প্রাদেশিকতার একমাত্র প্রতিষেধক চিন্তা ও আদর্শের অবাধ লেনদেনও বাধাপ্রাপ্ত হবে। অনেকেই এখন সাহসে ভর করে বলছেন যে, আমাদের দাসত্বশৃঙ্খল স্খলিত হলেও তা ইংরেজী ভাষার স্বর্ণসূত্রটিকে পিছনে রেখে গেছে, যা নাকি আমাদের সংহতির স্বপক্ষেই কাজ করেছে ও সহায়তা করেছে আমাদের আত্মার পুনরাবিষ্কারে। এই সব লোক এখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসঙ্গে মধ্যযুগীয় আদর্শেই বিশ্বাসী। তাঁদের মতে সমসাময়িকতার বাস্তব চাহিদাকে অযথা বিরাট করে দেখা ঠিক নয় এবং তার চাপে আমরা যেন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের চরিত্র ও আমাদের পাঠ্যবিষয়াদি পরিবর্তন করতে বাধ্য না হই। তাঁরা মনে করেন যে আমাদের উচিত, শাশ্বত সত্যকে, আমাদের পিতৃপুরুষ যে দর্শনের অধিকারী ছিলেন—তাকেই শ্রেয়জ্ঞান করে চলা। আমাদের সব ছাত্রদের পক্ষেই জ্ঞানার্জনের সাধারণ পৃষ্টপট রচনার প্রধান উপাদান হিসাবে তাঁরা নির্ভর করে চলেছেন ক্লাসিকস্ চর্চা, প্লেটো ও অ্যারিস্টটল, হিউম্যানিটিজ, ভাষা ও আইন শিক্ষার উপরেই। বিজ্ঞানচর্চার গুরুত্ব নির্দিষ্ট সীমার চাইতে বেশী মনে করা ঠিক নয়। বিজ্ঞানের উপযোগিতা তাঁরা স্বীকার করেন। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানীকে তাঁরা দেখেন সন্দেহের চোখে। তাঁরা বিশ্বাস করেন পুরাণো আদর্শের স্থান নিতে পারে বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে এমন কিছুই নেই। কল্যাণরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উপযোগী কার্যকর হাতিয়ার তৈরীর ব্যাপারে হয়ত তাঁরা কাজে লাগেন তবুও তাঁরা মনে করেন যে, ওই রাষ্ট্রে সংস্কৃতি ও উদ্দেশ্যমুখীন জীবন সঠিকভাবে গড়ে

তোলা সম্ভব প্রাচীন দর্শনের ভিত্তিতেই—অনেকেরই মতে সে দর্শন হল প্রধানতঃ অহিংসা।

গণতান্ত্রিক দেশে ইতিহাসের শিক্ষা সম্পর্কে প্রত্যেকেরই নিজস্ব মতামত পোষণের এবং নিজস্ব ভঙ্গীতে তার পাঠ ও ব্যাখ্যার স্বাধীনতা থাকে। অতএব ভারতীয় সভ্যতার অবনতির কারণ সম্বন্ধে একাধিক ব্যাখ্যার অবকাশ আছে।

নালন্দা ও তক্ষশীলার মতো আমাদের শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে ধারাবাহিকভাবে যে পারলৌকিকতার পোষকতা করা হত—যা ছিল আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতির মেরুদণ্ডস্বরূপ—তাতে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হত শাশ্বত সত্যের অতন্দ্র মনন, চিন্তন, নিদিধ্যাসনের উপরে। এরই ফলে ব্যক্তিবিশেষ আত্মজ্ঞান লাভ করতে এবং পৃথিবীকে দু-দিনের পান্থশালা মনে করতে সক্ষম হতেন। আর এই উপলব্ধি তাঁকে ব্যাকুল করে তুলত এই জীবনের দুর্ভোগ ও পরীক্ষা থেকে মুক্তিলাভের জন্যে। এ ধরণের মনন চিন্তনের দার্শনিক উৎকর্ষের আমরা যতই তারিফ করি না কেন এ কথা অস্বীকার করবার যো নেই যে, এ জগৎ দু-দিনের পান্থশালা, ক্রমাগত এই প্রচার পার্থিব ব্যাপারে ঔদাসীন্যের উদ্রেক করেছে। ভারতীয়রা এরই জন্য শীঘ্রই জাগতিক ব্যাপারে আধিপত্য হারাল এবং অনতিবিলম্বে পরাস্ত ও পর্যুদস্ত হয়ে গেল বর্বরদের হাতে।

বহু শতাব্দীর শিক্ষা থেকে আধুনিক কালের ভারতীয়কে ব্যক্তিগত মোক্ষলাভের উপরে অতিরিক্ত গুরুত্ব না দেওয়ার পাঠ গ্রহণ করা উচিত। হয়ত জীবনকে অন্য দৃষ্টিতে দেখাই ভালো। ব্যক্তিগত সুখদুঃখকেই দর্শনের প্রধান বিষয় করা ঠিক নয়। বরং সাধারণ ঐতিহ্যের ঘনিষ্ঠ সূত্রে গ্রথিত দেশবিদেশের মানুষকে মনে করা যেতে পারে যেন এক 'রিলে দৌড়ের' প্রতিযোগী, যেখানে ব্যক্তিগত দৌড়বাজের ভাগ্যের চাইতে দেশের উন্নতি, জাতীয় পতাকার অগ্রগতি ঢের বেশী গুরুত্বপূর্ণ। পুরুষপরম্পরা ধরে যদিও মানুষ পরিশ্রম করে যায় আর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের এবং দারিদ্র্য, রোগ ও মৃত্যুর উপরে জয়ী হওয়ার চেষ্টা করতে করতেই তার জীবনাবসান হয়, তবু ওই সব প্রয়াস দেশের ও জগতের কতটা কল্যাণ করতে পেরেছে এইটেই হচ্ছে আসল কথা। বলা যেতে পারে যে, এই ভিন্ন ধরণের দৃষ্টিটিও ভারতীয়, যদিও এতে হয়ত ব্যক্তির আত্মাকে পরামার্থ জ্ঞান করতে অস্বীকার করা হয় এবং প্রচারিত হয় কর্মের সার্বভৌম কর্তৃত্বের কথাই। বস্তুবাদী দার্শনিক এও বলতে পারেন যে, এই পারলৌকিকতা আসলে জড়ত্ব, স্বার্থপরতা ও লোভেরই

প্রকৃষ্ট জন্মভূমি। মানুষের উদ্বেগ যখন তার নিজস্ব মোক্ষলাভের জন্যেই তখন সে লোকালয় ছেড়ে আশ্রয় খোঁজে গুহা কন্দরে। এরই মধ্য দিয়ে সে মুক্তি পায়, আর যারা পিছনে পড়ে থেকে সংসারের অশুভ অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করে এবং সমাজ ও দেশের বৈষয়িক সমৃদ্ধির জন্যে চেষ্টা করে তাদের ছেড়ে দেয় শয়তানের কবলে।

আমাদের এই দর্শনের আধিপত্য যখন কায়েম ছিল তখন আমাদের প্রথম সারির চিন্তাবিদেরা জীবনের গুরুত্ব স্বীকার করতে অবহেলা করতেন। এরই দরুণ দ্বিতীয় সারির সেই সব ক্ষুদে মানুষেরাই প্রাধান্য পায়—যারা মৌখিক আনুগত্য জানাত দর্শনের প্রতি, অথচ কার্যত মাতামাতি করত—হিংসা, ঝগড়াঝাঁটি ও আভ্যন্তরীণ বিবাদবিসংবাদ নিয়েই। ফলে এল বিদেশী হানাদারের দল—অনেক ক্ষেত্রে আমন্ত্রিত হয়েই এল—আর ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠা করল শতাব্দীর পর শতাব্দী জোড়া দাসত্ব। তবু আমাদের যে ঘুম ভাঙ্গছে এটা একটা সুলক্ষণ। সমাধান ভিন্ন ধরনের হওয়া সম্ভব, সম্ভব পারলৌকিকতার সঙ্গে পার্থিব দায়িত্ব পালনের সুসংগতি। আমাদের দেশে সম্প্রতি মহান্ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশতবার্ষিক উৎসব উদযাপিত হয়ে গেল। তিনি মোক্ষেরও উপরে স্থান দিয়েছিলেন দুর্গত মানবের সেবাকে।

সম্প্রতি আমার সুযোগ ঘটেছিল জাপান যাত্রার। সেখানেও প্রায় ভারতবর্ষের কাছাকাছি সময়েই পাশ্চাত্য শিক্ষা-পদ্ধতি প্রবর্তনের চেষ্টা শুরু হয়। জাপান এখন একটি আধুনিক রাষ্ট্রে রূপান্তরিত, তার অগ্রগতি সারা পৃথিবীর বিস্ময় ও প্রশংসার বস্তু। আমি তাই সাগ্রহে এ সুযোগ গ্রহণ করি এবং টোকিও বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পদার্থ বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত আধুনিক জীবনে বিজ্ঞানের স্থান বিষয়ক আলোচনা সভায় যোগ দিতে যাই।

সেখানে গণিতবিদ, পদার্থবিদ, জীববিদ ও দার্শনিক এবং বহু বিজ্ঞানীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। এঁদের অধিকাংশই জাপানী, কিছু ছিলেন বিদেশী, যেমন আমেরিকার এক দার্শনিক ও যুগোস্লাভিয়ার এক গণিতবিদ। আমি ভেবেছিলাম এ ধরণের আলোচনা সভায় আমরা কোন বিদেশী ভাষারই শরণাপন্ন হব। কিন্তু পৌঁছানোর পর আমাকে বলা হল যে, অধিকাংশ জাপানী বিজ্ঞানীরা ইংরেজী, হয়ত বা তার উপরেও আরও কয়েকটা ভাষা বুঝতে পারলেও, (অনেক সময়েই তাঁদের সব ভাষার বই পড়তে হয়) সারা দেশ জুড়ে শিক্ষা চলে জাপানী ভাষার ভিত্তিতে এবং আমাকে তৈরী থাকতে হবে আলোচনা সভায় প্রধানত জাপানী

শোনার জন্যই। আমি অবশ্য একজন দোভাষীর সাহায্য পাব, যাঁর কাজ হবে আলোচনা সভায় বিভিন্ন বক্তা যা বলবেন তার ভাষান্তর করে দেওয়া এবং আমার পালা যখন আসবে, তখন জাপানী ভাষায় আমার বক্তব্য সহযোগী সদস্যদের কাছে উপস্থিত করা। স্পষ্টতই এই পদ্ধতি বেশ ফলপ্রসূ এবং আমি অবাক হলাম দেখে যে, আধুনিক রাষ্ট্রে বিজ্ঞানের প্রয়োগ সম্পর্কে এক বিশেষ জটিল ও বিমূর্ত আলোচনা অনায়াসেই চালানো হল জাপানী ভাষায়, আর আমরা বিদেশীরা যখন বললাম তখন তাঁরা বেশ ভালোভাবেই আমাদের চিন্তাসূত্রটি ধরতে পারলেন ও আমাদের নিবন্ধ সম্পর্কে তাঁদের অনুমোদন বা প্রতিবাদজ্ঞাপক সমালোচনা উপস্থিত করলেন বেশ ধারালোভাবেই।

জাপানে ভারতীয় ছাত্রদের সঙ্গেও দেখা হল। গেলাম বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে, সেখানে পদার্থবিদ্যার আধুনিকতম দিকগুলিও পড়ানো হচ্ছে জাপানী ভাষায় আর তারই পাশাপাশি জাপানী ছাত্রেরা চালাচ্ছেন বহু দুঃসাহসী ও অভিনব গবেষণা। বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষকেরা নিজেদের মধ্যে বিজ্ঞানের আলোচনা করেন মাতৃভাষায়।

নিশ্চয়ই তাঁরা বহু ধারকরা শব্দ (loan words) ব্যবহার করেন কিন্তু তার জন্য তাঁরা মোটেই কুণ্ঠিত নন। খবর পেলাম যে, পারমাণবিক বিস্ফোরণের ফলাফল সম্পর্কে দু-জন ভারতীয় বিজ্ঞানীর ইংরাজীতে লেখা একটি বইয়ের জাপানী তর্জমা হয়েছে। আমায় জানানো হল ওই বইটি বেশ ভালোই বিক্রী হয়েছে ছয় মাসে, প্রায় তিন হাজারের মত। শুধু জাপানী ভাষাই পড়তে পারেন এমন সাধারণ জাপানীরা পারমাণবিক বিস্ফোরণের ফলাফল জানবার জন্য বিশেষ উদ্বিগ্ন এবং হয়ত তাঁরা এ ব্যাপারে নিরপেক্ষ ভারতীয় মতামতকেই বেশী বিশ্বাস করেন অন্যদের চাইতে। তবু আমাদের দেশে ওই বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরা ইংরাজীতেই লিখে চলেছেন ও তার ফলে তাঁদের দেশবাসীরা শতকরা ৮০ ভাগকেই অজ্ঞ রেখেছেন পারমাণবিক ভস্মপাতের বিপদ সম্পর্কে।

অনেক সময়ে বলা হয় যে, ভারতীয় ভাষাগুলিতে উপযুক্ত পরিভাষার অভাব বাধা সৃষ্টি করতে পারে বিজ্ঞানচর্চার। আমি বিশুদ্ধবাদী নই; তাই ইংরেজী টেকনিক্যাল ও বৈজ্ঞানিক শব্দের ব্যবহার চালিয়ে যাওয়ার প্রস্তাবকে অভিনন্দন জানাই। আমাদের ছেলেরা যদি ওই শব্দ সহজেই বোঝে তবে ধার-করা শব্দ হিসাবেই তা টিঁকে থাকবে ও সমৃদ্ধ করবে আমাদের জাতীয় শব্দভাণ্ডার। গোড়ায় বিদেশী উৎস থেকে উদ্ভূত হয়েছে এমন বহু শব্দ এখন সমস্ত ভারতীয় ভাষাতেই

চালু রয়েছে এবং সেগুলি সহজেই বোধগম্য আমাদের সাধারণ মানুষের কাছেও। আশা করি বিজ্ঞানশিক্ষার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বহু শব্দ এমনিভাবে কাজে লাগানো হবে এবং আমাদের দেশবাসীর বৈশিষ্ট্য অনুসারেই তাদের রূপান্তর ঘটবে শেষ পর্যন্ত।

অনেক সময়েই বৈজ্ঞানিক শব্দের তর্জমা পণ্ডশ্রমমাত্র হয়ে দাঁড়াবে—রেলওয়ে, রেস্তোরাঁ, কিলোগ্রাম, সেন্টিমিটার, হুইল, লেদ, থার্মোমিটার, বয়লার, কাটার, ইলেকট্রন, অ্যাটম, ব্যাক্‌টেরিয়া, ফাঙ্গাস, ডিফারেনসিয়াল কোইফিসিয়াণ্ট, ইণ্টিগ্রেশন,—এ প্রায় সকলেই বোঝেন। পেপার, চেয়ার, টেবিল তো এখন প্রাত্যহিক ব্যবহার্য জিনিস। দৃষ্টান্ত বাড়ানোর দরকার নেই। আশা করি শিক্ষক ছাত্ররা কোন বিষয় আলোচনার সময় এ ব্যাপারে অনায়াসেই একটা বোঝাপড়া করে নেবেন আর শিক্ষকের দায়িত্ব হবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রসারের কাজে ভাষা প্রয়োগের এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে হালের অবস্থান্তর সম্পর্কে নিজেকে ওয়াকিবহাল রাখা।

প্রতিপক্ষের সঙ্গে অনেক সময়ে বিজ্ঞানীকে বাধ্য হয়ে বিতর্কে নামতে হয়—লড়াই চালাতে হয় শব্দের হাতিয়ারযোগে। কিন্তু তিনি খুশী হন যখন তাঁর পক্ষে এমন যথাযথ পরীক্ষা চালনার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় যার ফলাফল তাঁর অভিমতের যাথার্থ্য যাচাই করতে পারে।

আমাদের দেশে এমন একটি বিশ্ববিদ্যালয় গড়বার পরীক্ষা খুবই বাঞ্ছনীয় যার বিশেষ ঝোঁক থাকবে বিজ্ঞান ও সমাজতত্ত্বের উপরে এবং যেটি চালানো হবে কোন ভারতীয় ভাষার মাধ্যমে।

আমার বিশেষ আশা যে, একজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানীর সভাপতিত্বে মঞ্জুরী কমিশন এই প্রস্তাবটির প্রতি সদয় হবেন ও একে পূর্ণ সমর্থন জানাবেন।

আমাদের জাতীয় পতাকা জীবনের সর্বক্ষেত্রে উচ্চে তুলে ধরার জন্য যদি আমরা মিলিতভাবে চেষ্টা করি তাহলে ছোটখাটো ভুল বোঝাবুঝি ও নির্বোধ ঈর্ষা নিশ্চিতই সহজে দূর করা যাবে। কেবলমাত্র বিদ্যা অর্জন ও জ্ঞানের অগ্রগতিতে সহায়তা করা বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ হতে পারে না। জাতি, ধর্ম, মতবাদ, ধনী, দরিদ্র এবং সামাজিক ও বংশমর্যাদা নির্বিশেষে প্রত্যেক মানুষ যে মূলত এক, এই শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রচার করতে হবে। শেষ পর্যন্ত মানুষই যে পরম সত্য আমাদের সেই জ্ঞান হোক।

আমি আশা করি, আধুনিক ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় একটি দীর্ঘকালস্থায়ী এমন যজ্ঞক্ষেত্র হবে যেখানে শিক্ষক ঋষিরা এবং ছাত্র ঋত্বিকগণ মিলিত হয়ে প্রচার করবেন, সবার উপরে মানুষ সত্য এবং তাঁরা যেন উপলব্ধি করেন আমাদের কবিগুরুর অন্তরের প্রার্থনা ঃ

চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গণ তলে দিবস শর্বরী
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি,
... ...
নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি, পিতঃ,
ভারতের সেই স্বর্গে করো জাগরিত।

শিশু ও বিজ্ঞান

জ্ঞান উন্মেষের পর শিশু যখন তার চারপাশের জগতের দিকে তাকিয়ে দেখে, তখন মন তার পরম বিস্ময়ে ভরে ওঠে। চারপাশে যা কিছু সে দেখে, সবই তার কাছে রহস্যময় বলে মনে হয়, তার কৌতূহলী মনে কত প্রশ্নই না জাগে। এজন্যে শিশুদের শিক্ষার ভার যাদের হাতে আছে, তাদের উচিত সাধারণত হাতের কাছে যে সব জিনিস পাওয়া যায়, যা ছোট ছেলেমেয়েদের মনকে আকর্ষণ করে—যেমন ফুল, লতাপাতা, পাখি, এমনি সব টুকরো-জিনিসের ওপর নজর দিতে শেখানো। কাজ অবশ্য শক্ত। শিক্ষকদের নিজেদের মনকে ছোটদের কৌতূহলী মনের রসে রসিয়ে নিতে হবে। তার জন্য চাই শিক্ষকদের একটা স্বাভাবিক ক্ষমতা অর্জন-করা, যাতে তাঁরা ছাত্রদের সঙ্গে সহজে মিশতে পারেন।

এই জন্যে আমি বলি, আমাদের দেশে বিজ্ঞানের যা শেখানো হচ্ছে—এই যেমন ছোট ছেলেমেয়েদের শ্রেণীতে ভারী ভারী বই পড়ানো, তাতে তাদের কতটুকু লাভ হয়? বই-এর ভেতরের কথাগুলোর মানে করতেই তাদের সময় চলে যায় এবং বোধ হয় সেই মানেগুলো শেখা ছাড়া আর বেশী কিছু তারা গ্রহণ করতে পারে না।

প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয় রাখতে গেলে শিশুর মনে সবার আগে জাগিয়ে তুলতে হবে কৌতূহল। তাদের নতুন নতুন জিনিস সংগ্রহ করার ভার দিতে হবে। হয়তো একটু আধটু রেষারেষির মধ্যেই সে সব জিনিসের চলবে সংগ্রহ, আর এমনি করেই প্রকৃতির সঙ্গে যোগটা তাদের ঘনিয়ে উঠবে।

পল্লীগ্রামের ইস্কুলে আরও একটু সুবিধে হতে পারে। এই সব ছোট ছোট কাজ সারা হওয়ার পর পেঁয়াজ ছোলা মটর—যে যেমন ভালবাসে তাকে তার বাগান তৈরী করবার ভার দেওয়া।

আমি দেখি বিজ্ঞান সম্পর্কে অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়েদের এমন সব বড় বড় কথা বলা হয়, যা শুনলে আমাদেরই প্রাণে আতঙ্ক আসে। সেদিন একটা ছোটদের পাঠ্য বিজ্ঞান বইতে দেখছিলুম—থার্মোমিটার কেমন করে তৈরী করা হয়, সে

সম্পর্কে বোঝাতে গিয়ে লেখক ছোটদের কাছে এমন সব কথা বলেছেন যা হচ্ছে মাধ্যমিক পরীক্ষার বিষয়বস্তু। কিন্তু সাধারণ তথ্যগুলোর সঙ্গে যাতে সোজাসুজি ছাত্রদের পরিচয় হয়, তারই চেষ্টা করা উচিত।

আসল কথা, বিজ্ঞান কেন আমাদের শিক্ষা দেওয়া হয়? বাস্তব সম্পর্কে আমাদের ধারণাটা খাঁটি হবে বলে। তা বলে এ কথা আমি বলছি না যে আমাদের জীবন থেকে কল্পনাকে একেবার ছেঁটে ফেলতে হবে। কল্পনা থাকা ভালো। কিন্তু বস্তু এবং সংসার সম্পর্কে যদি উদ্ভট অলৌকিক ধারণা থাকে, তবে পদে পদে আমাদের জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়। বেঁচে থাকতে হলে প্রত্যেকের দাবিদাওয়া সম্পর্কে সজাগ ও সচেতন থাকা উচিত। বিজ্ঞান আমাদের এটুকু শিখতে সাহায্য করে, প্রকৃতির মধ্যে যে সত্য লুকিয়ে আছে, বিজ্ঞান সে সত্যকেই উদঘাটিত করে দেয়। আমাদের মনের নাগালের বাইরে কোন কিছু ঘটে গেলেই সেটা কোন দেবদানবের কীর্তি হবে এমন কথা মনে করার কোন কারণ নেই। একটু বিশ্লেষণ করে দেখলে নিশ্চয়ই তার মূল কারণটা বেরিয়ে পড়বে। অসুখ করলেই যদি আমরা মনে করি যে, এ নিতান্ত দৈবের ঘটনা, দেবতার সন্তুষ্টি সাধন ছাড়া আমাদের আর কিছুই করবার নেই এতে, তবে আমাদের টিকে থাকা শক্ত হবে।

গাছপালা, জন্তুজানোয়ার সবের মধ্যেই শিক্ষণীয় জিনিস রয়েছে। প্রত্যেকেই আমাদের সত্যস্বরূপে পৌঁছে দিতে চায়। আমাদের মধ্যে যদি শ্রদ্ধার উদ্রেক হয়, অজানাকে জানবার আকাঙ্ক্ষা যদি জাগ্রত হয়, তবে আর সব কিছুই সহজ হয়ে আসবে। তখন শিক্ষা দেবার পদ্ধতি নিয়ে আর গোলে পড়তে হবে না।

সমস্যা হল এই যে, আমাদের ইস্কুলে পণ্ডিতদের এ বিষয়ে কোন দৃষ্টি নেই। কোন রকমে কাজ চালিয়ে নাম বজায় রেখে তাঁরা কর্তব্য সমাপন করেন। বেশী বয়সের ছেলেমেয়েরা কেন শিক্ষার প্রতি বিতৃষ্ণা পোষণ করে? তারা নোট মুখস্থ করে, প্রশ্নপত্র চুরি করে কোন রকমে দায়িত্ব মিটিয়ে দিতে চায়। কেন তাদের এ মনোভাব? এর জন্যে দায়ী কে?

দায়ী আমরা শিক্ষকরা, আমরা তাদের সামনে বস্তুর পাহাড় তুলে ধরেছি আর চেয়েছি সেই পাহাড়ই তারা উদিগরণ করুক। বস্তুর মর্মে যে সত্য নিহিত আছে, সেই সত্যের দ্বারে তো আমরা ছাত্রদের পৌঁছে দিতে পারি নি। তাই তাদের মনও আমরা পাই নি, ফলে ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে সম্পর্ক দাঁড়িয়েছে শ্রমিক ও

কারখানার কর্তাদের সম্পর্কের মত। পদে পদেই তাই ছাত্ররা আজ বিদ্রোহ করে।

ছেলেমেয়েদের আমি বলি নিজে মনটাকে তোমরা তৈরী কর। কারুর বলা কারুর শেখানো কথায় তোমারা নির্ভর করো না, নিজেই জান।

কিন্তু দুঃখের ।বষয় আমাদের ছেলেমেয়েরা তা করে না। শিক্ষার বন্দোবস্তুই আমাদের সেরকম নয়। আমাদের দেশের বর্তমান শিক্ষা হাসির খোরাক জোগায় মাত্র।

অন্য অন্য দেশের শিক্ষাধারাও আমাদের দেখতে হবে। ও সব দেশে ছোটদের মনে শিক্ষার বিষয়কে গেঁথে বসিয়ে দেবার জন্যে, একটা চিরকালের ছাপ দেবার মত নানা বন্দোবস্ত রয়েছে। যেমন ছায়াচিত্র, ভ্রমণ ইত্যাদি। আমাদের দেশে যাঁরা শিক্ষা দেবার কর্তা এবং যাঁরা শিক্ষা বিষয়ে উৎসাহী, তাঁদের উচিত অন্য দেশের কিছু ধারাকে চালু করবার চেষ্টা করা। কিন্তু এ বিষয়ে আমরা এখনও অল্প সচেতন। আমরা এখনও ব্যস্ত ছাত্রদের পরীক্ষা ও পাশের হার নিয়ে, প্রশ্নপত্রের আলোচনা নিয়ে। সমস্ত জিনিসটা যেন একটা অলীক ব্যাপার চলছে। কিন্তু সরকারী ও শিক্ষাবিভাগের কর্তাদের এ বিষয়ে বলেও কোন ফল হয় নি। তাঁরা বলেন, সামনে এখন নানা সমস্যা—বাস্তুহারার সমস্যা, দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি, এমনি আরও কত সমস্যা, এ সবের জন্যেই ব্যস্ত তাঁরা। তবু সব সমস্যাকে সমাধান করবার জন্যে আমার অনুরোধ, শিক্ষা বিষয়ে সচেতনতা জাগ্রত করতে হবে।

আর তা প্রথমেই অর্জন করতে হবে শিক্ষকদের। অর্থের বিনিময়ে এটা একটা কাজ মাত্র নয়। ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ তাঁদের হাতে। ছেলেমেয়েদের ভালবেসে, তাদের বড় ভাই-এর আসন অধিকার করে আদর্শের পথে তাদের নিয়ে যেতে হবে। জানি, বড় কাজ করার সুযোগ পান না আমাদের শিক্ষকরা। কিন্তু ছোট ব্যাপারেও আমাদের কিছু করবার আছে। যা সত্যস্বরূপ সে বিষয় যদি আমরা দৃষ্টি দিই এবং ছেলেমেয়েদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারি, তাহলে দেশের ও সমাজের অনেকখানি কল্যাণ সাধিত হবে।

শিক্ষা ও নতুন যুগ

প্রথমেই শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলি আজকের দিনে আপানাদের মধ্যে আসতে পেরে নিজেকে সম্মানিত মনে করছি। অভিভূত হয়ে পড়েছি আমার এই বৃদ্ধ বয়সে আপনাদের এ ডাক শুনে। আগের থেকে দিন তো অনেক বদলে গিয়েছে আজকে। আমাদের যখন অল্প বয়স ছিল তখন দেশমাতৃকাকে এক ভাবে দেখতাম, আদর্শও একরকম খাড়া করেছিলাম। জীবনে যা কিছু পণ্য ছিল সবই উৎসর্গ ক'রে সেই আদর্শের পথে চলবার চেষ্টা করেছিলাম আমরা। সে সব ভাব-ভাবনা আজকের দিনে কত বদলেছে—তাই অভিভূত হবার কথা।

*শ্রদ্ধেয়া উপাচার্য মহোদয়া বলেছেন অনেক কথা। প্রথমেই আনন্দ থেকে উদ্ভূত হয়েছে—এই সব কিছু। নিশ্চয়ই।

কিন্তু এই আনন্দকে আমরা খুঁজে বেড়াই নানাভাবে। রবীন্দ্রনাথ হয়ত এই সামাজিক ও সাংসারিক পরিবেশে 'আনন্দকে' খুঁজে পান নি—তাই এ-সব ছেড়ে গিয়েছিলেন শান্তিনিকেতনের মাঠে। সেখানে গিয়ে চেষ্টা করেছিলেন নতুনভাবে, শিক্ষাদীক্ষার আমূল সংস্কার ; যাতে বিশ্বজনের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে আমরা ভবিষ্যৎজীবন গড়ে তুলতে পারি—সেই চেষ্টায়।

আমাদের ঋষিদের কথা (মনে পড়বে) পুরাকালে তাঁরা এই আনন্দের জন্য সব কিছু ত্যাগ করেছিলেন। তাঁরা বলতেন যা কিছুতে আমাদের টান সেগুলির বন্ধন থেকে আমরা যদি না মুক্ত হতে পারি, তা হলে আনন্দের বিকাশ পূর্ণভাবে হবে না।

কাজেই সেই আনন্দের বিকাশ এ শহরের মাঝে কতটা হবে—একথা বলা বড় দুষ্কর।

রবীন্দ্রনাথ এই জায়গায় হেঁটে চলে গেছেন। তাঁর পিতা-পিতামহের প্রচলিত বনেদী-কেতায় এই সব ঘরে বসেছিলেন একদিন। আবার তারই ভেতর দিয়ে

---

* ডঃ রমা চৌধুরী

ভেসে এসেছিল নতুন ধরণের কথা—তার প্রথম পাতা উড়ে এসেছিল—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের হাতে—তার পরে আর্বিভাব হয়েছিল যে মহাকবির—তাঁর সঙ্গে আজ আমরা নিজেদের সুর মিলিয়ে নেবার চেষ্টা কর্‌ছি।

তবে আজকালকার সুর বৃদ্ধদের কানে ঠিক চেনা সুরের মতো লাগবে না। আমাদের সামনে যে বিশ্বভারতী বা রবীন্দ্রভারতী তার লক্ষ্য হ'ল—মানুষের সংস্কৃতি! মানুষের উপর ভরসা রেখে যদি আমরা এগিয়ে চলি—তা হলে সেই যে নিত্য-পেটের ক্ষুধা—সেটা ততো বড় করে কারো মনে আসে না অন্ততঃ এই ভেবেই আমরা এতদিন চলে এসেছি। মানব-সংস্কৃতির মূলে কি আছে বলা যায় না। আজকাল-কার যুগে বর্তমানে সংস্কৃতির মূলে উদরকে হিসাবের মধ্যে ধরা হয়েছে। তা হলেও আমরা এই বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত এই ভরসা রেখে আস্‌ছি যে শেষ অবধি হয়ত আরও একটু উপরের থেকে আমাদের প্রেরণা আসছে ও সংস্কৃতির প্রেরণা আসবে। যার ফলে (মনে করতে পারি) আমরা আবার গড়ে তুলবো নূতন পৃথিবী।

উদরের আরো একটু উপরেই হ'ল হৃদয়—এই হৃদয়ের কথা আজকাল অনেক বলা হচ্ছে। বলি প্রাণের আহ্বান এবং মানুষে মানুষে ভাই ভাই, মুখে এই কথা ও পরস্পরকে জড়িয়ে ধরা চল্‌ছে কিন্তু সারা বিশ্বের দিকে নজর দিলে মনে হবে যা—তা মহাকবির ভাষায় বল্‌তে—'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী' দাঁড়াবে।

আজকাল আমাদের ছাত্ররা নানা ভাবে নিজেদের মধ্যে খুঁজে পাবার চেষ্টা করছে—বাঙালী জাতিকে। এই জাতীয়তা কোথায়—বাঙালী স্বকীয়ত্ব কোনখানে? এই বাঙালীর বিষয়ে এ দেশের অনেক ঐতিহাসিক, অনেক চারণ—নানা সঙ্গীতজ্ঞ নানা কথা বলে গেছেন।

আমরা ছেলেবেলায় ইংরাজি কেতাবে বাঙালীর গুণগান পড়তাম তখন রেগে উঠতাম—চটে যেতাম। কত সব কথা সেকালের ইতিহাসে লেখা ছিল পড়েশুনে আমরা তখন ভয়ানক রাগ করতাম—আর ভাবতাম আমরা সত্যি একটা কিছু গড়বো এবার—এদের দেখিয়ে দেব! হিসাবের ভুল। সেইভাবেই সেইদিনকার সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে—নানারকম অভাবের মধ্যে নানারকম অভিযোগ শুনতে শুনতে তবু ভাবতুম—মনে করতুম একটা কিছু গড়ে তুলবো আমরা।

আজকের দিনে শ্রদ্ধেয়া উপাচার্য মহোদয়ার বক্তৃতা শুনে মনে আশা হয়েছে—এই রবীন্দ্রভারতীর মধ্য দিয়ে যে শিক্ষার বিতরণ হচ্ছে তারি মধ্যে হয়তো নতুন

যুগের কথা, শোনা যাবে—এবং তাতে ছেলেদের মনে যে প্রতিধ্বনি উঠবে সেটা সত্য সত্য আমাদের জানবার কথা, ভাববার কথা। কাজেই আমিও একটু বিশেষ রকম কৌতূহল রাখি জানতে—কিভাবে আমাদের ছাত্ররা ভাবছে—তারা নূতন ঊষার আলোকে পথ দেখে নিজেদের কিভাবে গড়ে তুলতে চাইছে।

আমার বাড়ি স্কুলের পাশেই—সেখানে প্রতিদিন নানাভাবের গোলমালের মধ্যে থেকে ও দেখে অনেকটা হতাশ হয়ে পড়ছি। মনে হচ্ছে আজকের শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে আমরা বিশেষ কিছু করতে পারি নি—তারই জন্যে হয়ত এত বেশি বিক্ষোভ।

যাইহোক, কেউ কিছু বলার আগেই আমি স্বীকার করবো যে স্বাধীনতা পেয়ে পর্যন্ত এতদিনে আমরা বিশেষ কিছু গড়ে তুলতে পারি নি—তার জন্য আজ এই এত গোলমাল। কিন্তু গোলমাল তো আরও অনেক আগে হওয়া উচিত ছিল। অল্প কিছু দিনের স্বাধীনতার মধ্য দিয়েই যদি এই গোলমাল এসে থাকে তা হলে স্বাধীনতা আবাহন করে বলতে হবে—'জয় স্বাধীনতার জয়'।

এতদিন পরাধীন থেকে—সাতশ বছরেও আমাদের চোখ খোলে নি। আজকে স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে নূতন এক আঙ্গিনায় আমরা এসে পৌঁছেছি—আর তার আলোকে নূতন পথের রেখা দেখতে পেয়েছি। এই আদর্শের, এই স্বাধীনতার জন্য অনেক বৃদ্ধই আজীবন সব উৎসর্গ করেছিলেন—এই কথা বৃদ্ধদের অনেকের মনে জেগে উঠবে। তবে তাঁরা অবশ্য মামুলী শিক্ষাই পেয়েছিলেন। যদি অবশ্য শিক্ষাদীক্ষার একটা নূতন আদর্শ হওয়া উচিৎ যাতে করে যারা আজ এই শিক্ষা নেবার জন্য এগিয়ে আসছে অথচ মনে করেছে প্রতিদিন—জীবন যাপনের জন্য এই ধরণের শিক্ষার দরকার নেই—তাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা হওয়া উচিৎ। এমনভাবে আজ শিক্ষাদীক্ষার বন্দোবস্ত করা চাই—যাতে শিক্ষান্তের সঙ্গে সঙ্গে দেশের কাজের জন্য তাদের ডাক আসে। অবশ্য কাজের জন্য যাদের ডাক আছেই—তারা একবার কাজে বসে পড়লে—সেই বিশেষ কাজ থেকে সরে যেতে চাইবে না। কাজে কাজেই একটা ভয় আছে যে যারা বসবে—তাদের আবার টেনে নামাবার জন্য হয়ত নূতন ভাবে একটি আন্দোলন শুরু করতে হবে। যা হোক্ আজকে এই শিক্ষা, এই সংস্কৃতি—এই দেশের পোড়া কপালের কথা অনেক শোনা যাচ্ছে ও বহুদূর থেকে ভেসে-আসা গানের মতো—তার সব কথা বা মর্ম পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না। আজকের

দিনে দেশের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর বরাৎ পড়েছে যে, ছাত্রদের অন্ন সংস্থান করো। আজ আর আগেকার দিনের আদর্শ ইত্যাদি নানারকম ভাঁওতা ছাত্রমহলে চলবে না।

আদর্শ! শুধু আদর্শের ভেতর দিয়ে ওপারে একটা সত্যকারের পৃথিবী দেখা যায়—সেইটাই লোক আজকাল বিশ্বাস করছে না। কাজে-কাজে এই অবস্থায় আপনাদের কি কর্তব্য শুনতে—আমার মতো লোককে ডেকে নিয়ে এসে আপনারা বিব্রত হয়ে পড়েছেন, যার জন্যে আমিও নিজেকে বিশেষ বিব্রত মনে কর্‌ছি। আপনাদের তবু ভরসা আছে বলবার—যে সব সংস্কৃতি চলে এসেছে এতদিন, আর আজকের এই বিশেষ সমাবর্তন উৎসবের মধ্যে যাঁদের ডেকে নিয়ে এসে সম্মানিত করেছেন—তাঁরা আমারই মতন—একই যুগের মানুষ, যে যুগ এখন তিরোহিত হতে চল্‌লো।

প্রায়ই শোনা যায় আজকাল 'পুরাকালের লোকদের সঙ্গে বর্তমান আমাদের মতের মিল হতে পারে না। কারণ একটা পর্যায়ের তফাৎ হয়ে গিয়েছে। আজকের দিনে ভাবি দেখি চোখের সামনে বিদ্যমান —যত নিরাশা বুভুক্ষা, এই সমস্ত দেখে আমরা বুঝেছি আমাদের কি করতে হবে।' এই করার মধ্যে কি আছে তা ভগবান জানেন। এর মধ্যে আনন্দ আছে কি না জানি না। মহারুদ্রের সংহার লীলার মধ্যে নটরাজের নৃত্যের ছন্দ বাজছে কি না কে শুনে বল্‌বে?

আমি আশাবাদী—আশা কর্‌ছি এর ভেতর দিয়েই আমরা এগিয়ে চল্‌বো। আজকে যাঁরা নূতন উপাধিতে ভূষিত হচ্ছেন তাঁদের কাছে আমার অনুরোধ অন্ততঃ নতুন কথা কিছু বলো। নতুন কথা যদি বলার থাকে তখন শুধু কথা বল্‌লেই হবে না, করতে হবে কিছু এবং সে কাজ যে কেবলমাত্র ভাঙ্গা নয় সেটাও দেখাতে হবে।

আজ তাই এই রবীন্দ্র-ভারতীতে যাঁরা উৎসুক হয়েছেন, যাঁরা আত্মপ্রকাশের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন তাঁদের অনুরোধ শুধু এইমাত্র, শুধু বিপ্লবের জয় গাইলেই বিপ্লব হবে তা নয়—নিজেদের মানুষ করতে পারব সে চেষ্টাও করতে হবে। শুধু হিংসাদ্বেষের মধ্য দিয়েই বিপ্লবের শেষ কথাটুকু প্রকাশ পেল, তা নয়।

এতদিন পর্যন্ত পৃথিবীতে নানাভাবে বিপ্লব হয়ে এসেছে, সর্বত্রই হিংসাদ্বেষ বলবান। এই হিংসাদ্বেষের মধ্যে মানবসভ্যতার শেষ কথা বলা হ'ল, এ ভাবতে ইচ্ছা করে না। এরই পরে সব সময়েই মানুষের মনে ঘুরে ঘুরে একটা কথা জাগ্‌ছে সে

এই—এই সব যা করেছি—তা ঠিক হয় নি সব। আজকের দিনে সব কিছু ঘটনার মধ্যে আমার কালের মানুষ বল্‌বে—আগেকার দিনে সেই যে আদর্শ ছিল তাতে পরস্পরকে ভালোবাসা যেত। সেইটাই ঠিক পথের ইঙ্গিত দিয়েছে। কিন্তু যাদের ভালোবাসতে পারবো না, আগে তাদের উচ্ছেদ করো—এইটেই কি নতুন বিচার? এইভাবে উচ্ছেদ করে চল্‌লে মনের এমন অবস্থা দাঁড়াবে তার মধ্যে হিংসা ছাড়া সমতার আর কোনো জায়গা থাকবে না ভবিষ্যতে।

যা হোক আর বেশি কিছু বলবো না, আপনাদের সঙ্গে আজকে নিজেকে মিলিয়ে নিতে চেষ্টা করেছি এবং আশা করছি এত সব কর্মীদের মধ্যে একনিষ্ঠ-ভাবে যে জিনিস গড়ে তোলার চেষ্টা চলেছে তার মধ্যে সফলতা আসুক, পরস্পরের স্নেহ বর্ষিত হোক, ভগবানের আশীর্বাদ এসে পড়ুক! এরই মতো বাংলাদেশের যে কোনো প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সর্বত্র যেন সফলতা আসে।

আজ সেই সব দিনের কথা বেশি করে মনে হচ্ছে বহু বৎসর আগে এক সময় আমার মতো অনেকে ছুটে গিয়েছিলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে, আর যে সফলতার স্বপ্ন তখন দেখেছিলাম হয়ত আজকে রুদ্রের যে বিষাণধ্বনি সেখানে বেজেছে তার মধ্যে সেই সফলতার কিছু খবরও ভেসে এসেছে। আমরা যারা গিয়েছিলাম, আমরা চেয়েছিলাম জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে মানুষ মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে বলতে পারে আমরা ভাই ভাই। এই বেচারী তোমাদের ভাই—এর দুঃখেতে তোমারও মন গলা উচিৎ। এর চেষ্টা হয়েছিল (সে সব দিনের কথা আজ মনে পড়ে) প্রচুর ও বহুদিন ধরে—এই আদর্শ নিয়ে আমাদের যুদ্ধ করে আসতে হয়েছে সেই এক বাংলার যে আদর্শ আজকে সর্বত্র শোনা যাচ্ছে তখনও সামনে ছিল সে সবই। কিন্তু খোঁজাখুঁজির মধ্যে যারা এটি চেয়েছিল—তারা হায়রাণ হয়েছিল অনেক। এই হায়রাণির জন্য কাউকে কাউকে নানাদিকে দৌড়াদৌড়ি করতে হয়েছে।

আমার জীবনে যে সব জায়গায় আজ মুক্তিকামী মানুষেরা যুদ্ধ করছে সে সব জায়গায়ও যেতে হয়েছিল, অবশ্য সেদিনের বিশেষ রকমের অবস্থার মধ্যে—যাক সব কথা আর বলার দরকার নেই—কারণ সে যুগ তো অতীত হয়েছে। শুধু এইটুকু বলতে চাই—যে বীজ আমরা মাটিতে পুঁতেছিলাম বহুদিন বাদে আজকে তার ফসল উঠছে, তাতেই বীজ বোনার আনন্দ।

কাজে-কাজেই আপাতদৃষ্টিতে সংহারের মধ্য দিয়েও হয়ত পরে, আজ যে সৃজনের বীজ বুনে চল্‌ছি তার ফসল উঠবে—এটাই হয়ত ঠিক কথা।

এই সব কথা ভেবে আজকের দিনে আপনাদের বল্‌ছি যাঁরা কর্মী, বাধা অনেক কিছু সামনে থাকলেও আপনারা আদর্শ ছাড়বেন না। ছাত্রেরা অনেক সময় অনেক কিছু বল্‌বে—দেয়ালে অনেক কিছু লিখবে কিন্তু সব জিনিস তো দেখা যায় না, সে সবের সঙ্গে মহাকালের পাতাতেও লেখা হয়ে চলেছে সবই এবং যথারীতি বোনা-বীজ তার ফসল ফলাবেই।

এই আশা রেখে আমি শেষ অবধি শেষ দিনের জন্য অপেক্ষা কর্‌ছি।

আমাদের উচ্চশিক্ষা

সে আজ একশ' বছরেরও আগের কথা। রাজা রামমোহন রায় এদেশে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শিক্ষার প্রবর্তন করবার জন্য লর্ড আমহার্স্ট'কে অনুরোধ করেছিলেন। কয়েক বছর পর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু প্রথম পঞ্চাশ বছর পাঠ্যতালিকায় ইংরেজী শিক্ষার উপরেই প্রধানত জোর দেওয়া হল। কলেজ ও ইংরেজী স্কুলগুলিতে কলা ও বিজ্ঞান শিক্ষা দেবার বাহনরূপে বহাল রইল ইংরেজী। দেশে জ্ঞান-বিস্তারে তাই শ্রেষ্ঠ উপায় বলে বিবেচিত হল।

আমাদের বিদেশী শাসকরা রাজ্য চালনায় এদেশের বুদ্ধিমানদের সাহায্য চেয়েছিলেন। তাঁদের আপিসগুলি যাতে অল্প ব্যয়ে চালানো যায় তাও ছিল তাঁদের কাম্য। এ অবস্থায় শহরবাসী অভিভাবকেরা দেখলেন, তাঁদের সন্তান সন্ততিদের সহজে চাকরি পেয়ে আরামে জীবনযাপন করবার প্রশস্ত পথ গেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সদর দরজার মধ্য দিয়ে। কিন্তু এটি যে জ্ঞানবিস্তারের প্রশস্ত পথ নয় তার প্রমাণ পাওয়া যায় দেশে শিক্ষিতের হার বিগত এক শতাব্দী যাবৎ কি হারে বেড়েছে তার হিসাব নিলে।

এর প্রায় অর্ধ শতাব্দী পূর্বে শ্রীরামপুরে মিশনারী সাহেবরা শিক্ষাবিস্তারের জন্য এর চেয়ে অনেক ভালো ব্যবস্থা কল্পনা করেছিলেন। তাঁরা বাংলা হরফ তৈরী করে নিজেদের ছাপাখানায় অনেক বই ছেপে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের পথ সহজ করেছিলেন। প্রাথমিক শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য বাংলায় বিজ্ঞান ও গণিতের বই প্রকাশ করেছিল শ্রীরামপুর মিশন।

শীঘ্রই এদেশের শিক্ষাবিদেরা জ্ঞানপ্রচারের কাজে প্রবৃত্ত হলেন। ঈশ্বরচন্দ্রের কাছ থেকে আমরা পেলাম সংস্কৃত শিক্ষার বই; অক্ষয়চন্দ্র সৃষ্টির লীলাবৈচিত্র্য প্রকাশ করে সমৃদ্ধ করলেন মাতৃভাষাকে এবং কয়েক বছর পরেই দেখা গেল, প্রায় সকল বিষয়ের উপরেই বাংলা ভাষায় বই পাওয়া যাচ্ছে। বাংলায় লেখা ডাক্তারী বই ছাত্রেরা ব্যবহার করতেন তত দিন যত দিন না বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রবর্তিত হয়েছিল।

বিদেশী ভাষায় সৃষ্টিধর্মী সাহিত্য রচনায় কিছুদিন ব্যর্থ চেষ্টা করবার পর

মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্র উপলব্ধি করলেন যে জনসাধারণের সমর্থন এবং তাদের হৃদয়ে স্থান পেতে হলে হৃদয়নিঃসৃত রক্ত দিয়েই তা হবে ; লিখতে হবে মাতৃভাষায় অন্তরের অন্তস্তলে যার উৎস, যা আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষা ও কর্মের পরিপোষক। মাতৃভাষায় শিক্ষাপ্রদানের নীতি যদি তখন বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষণা করতেন, তবে এই প্রাচীন দেশে নবযুগ-অভ্যুদয়ের স্বপ্ন অনেক আগেই সফল হত।

মাতৃ ভাষায় এই শুভ সূচনা দেখা দিলেও শিক্ষা পরিচালনার দায়িত্ব যাঁদের উপর ছিল তাঁরা এর সুযোগ গ্রহণ করবার জন্য এগিয়ে আসেন নি। শিক্ষাদানের প্রধান দায়িত্ব রইল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির পরিদর্শন এবং পরীক্ষা গ্রহণই হল বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য কর্তব্য। এবং উচ্চ-শিক্ষার কেন্দ্রগুলিতে অটল রইল ইংরেজী আসন। ১৯০৫ সনে জাতীয় আন্দোলনের তীব্র সংঘাতে আর্থিক পরাধীনতা থেকে মুক্তি লাভের জন্য জনগণের মনে আকাঙ্খা জাগল। নষ্ট বাণিজ্যের পুনরুদ্ধার করতে হবে, শুরু করতে হবে নতুন নতুন শিল্প। কিন্তু এই আকাঙ্খা পূরণের অনুকূল ছিল না বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতি। বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষায় দক্ষ মানুষের তখন যে চাহিদা হল তা মেটাবার সাধ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ছিল না। তখনই এর জন্য নতুন ব্যবস্থা অবলম্বন করাও ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধ্যাতীত। কিন্তু দেশের লোক ক্রমাগত দাবী করতে লাগল তাদের আকাঙ্খার অনুবর্তী নতুন শিক্ষার জন্য। এ দাবী পূরণ করতে না পারায় জনসভায় বিশ্ববিদ্যালয়কে গোলাম তৈরীর কারখানা বলে নিন্দা করা হতে লাগল। নতুন শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য সরকারী আওতার বাইরে প্রতিষ্ঠিত হল জাতীয় শিক্ষা পর্ষদ্। স্থির হল, কলা ও বিজ্ঞান উভয়ই বাংলা ভাষায় পড়ানো হবে। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কাছ থেকে সাড়া না পেয়ে শিক্ষার ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরতার জন্য দেশের লোকের এই প্রথম প্রচেষ্টা। জাতীয়তার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ দাতাদের কাছ থেকে অর্থ পাওয়া গেল ; কিন্তু কারিগরি শিক্ষার জন্য একটি কলেজ করা ছাড়া জাতীয় শিক্ষা পর্ষদ আর বিশেষ কিছু করতে পারেনি।

ক্রমে ক্রমে জাতীয় আন্দোলনের ধারা শিক্ষার ক্ষেত্র থেকে দূরে সরে গেল। পুরাণো শিক্ষাপদ্ধতির বিরূপ সমালোচনা অব্যাহত থাকল। সরকারী আওতার বাইরে শিক্ষাসংস্কারের কাজ অসমাপ্ত রয়ে গেল। বহুনিন্দিত শিক্ষাপদ্ধতির পরিবর্তে নতুন কিছু পাওয়া গেল না। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের

কর্ণধার হয়ে আসবার পর শিক্ষার ক্ষেত্রে নতুন যুগের সূত্রপাত হল। তিনি প্রথম থেকেই বুঝতে পেরেছিলেন যে দেশের শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে অবিলম্বে সন্তোষজনক পরিবর্তন আনতে হবে। তাঁর অসামান্য প্রতিভা ও কর্মদক্ষতা দ্বারা তিনি জন-সাধারণের শিক্ষা সংস্কারের দাবী অনেকটা পূরণ করতে পেরেছিলেন। সিলেবাস ও পঠনের ক্রম নতুন করে লেখা হল। বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যেই হাতে কলমে বিজ্ঞানশিক্ষাকে একটি বিশিষ্ট স্থান দেওয়া হল।

১৯০৮ সনের আগে অল্প কয়েকটি কলেজে বিজ্ঞান পড়ানো হত। নতুন সংস্কারের ফলে শহরে ও মফঃস্বলে বহু কলেজে বিজ্ঞানের পরীক্ষাগার খোলা হল। এইভাবে তাঁরা বিজ্ঞানে হাতে কলমে শিক্ষা দেবার জন্য তহবিলও সংগ্রহ করলেন। অস্নাতকদের (under graduate) পড়াশুনার দায় কলেজগুলি নিলেন ; আর বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতকদের উচ্চতর কলা, বিজ্ঞান ও আইন পড়াবার দায় নিজেই গ্রহণ করলেন। পরীক্ষকের সংস্থা হতে এমনি করে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাপ্রদান ও গবেষণার একটি উদ্যোগী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হল। এই নতুন আন্দোলনে স্যার আশুতোষ হলেন প্রধান ব্যবস্থাপক ও প্রভাবশালী ব্যক্তি। কিছুদিন বেশ চলল। গভর্ণমেণ্ট তাঁর কার্যক্রম অনুমোদন করলেন এবং তাঁর বিচারশক্তি ও দূরদৃষ্টির প্রতি দেশের জনগণের আস্থা হল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজের সংস্কার করা হল। নানা বিষয়ে বিশ্ব-বিদ্যলয়ের অধ্যাপক-পদ সৃষ্টির জন্য দান পাওয়া গেল, অঙ্ক, অর্থনীতি, ইতিহাস ও দর্শন। এই কয় বৎসরে যা সৃষ্টি হল তাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি জনসাধারণের সম্ভ্রম হল। দুইজন বাঙালী আইনজীবী—স্যার তারকনাথ পালিত ও স্যার রাসবিহারী ঘোষের কাছ হতে মস্ত দান এল—জমি, বাড়ী ও নগদ টাকা। স্যার আশুতোষ তখন অনেকখানি এগিয়ে গেলেন ; কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজ-এর ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করলেন। কিন্তু ঘোষ ও পালিতের দানের সঙ্গে এক বিচিত্র শর্ত ছিল। অধ্যাপকদের হতে হবে ভারতীয় বিজ্ঞানী।

বিজ্ঞান কলেজের সব বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপকদের আসনে বসবার মত উপযুক্ত ব্যক্তি তখনই পাওয়া গেল না। পদার্থবিজ্ঞানের পালিত অধ্যাপক পদের জন্য সি. ভি. রমন নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি তখন ভারতসরকারের অর্থব্যবস্থা (Finance) বিভাগের কর্মচারী ছিলেন। তিনি মনস্থির করার জন্য সময় চাইলেন, অধ্যাপনার ঝঞ্ঝাট তিনি চাচ্ছিলেন না। তাঁর ইচ্ছা ছিল অবসর মত ইণ্ডিয়ান

অ্যাসোসিয়েসনে গবেষণা চালিয়ে যাওয়া। ১৯১৫ সনে স্যার পি. সি. রায়ের অবসর নেবার কথা। তারপর তিনি রসায়নের পালিত অধ্যাপক হয়ে রসায়ন পরীক্ষাগারগুলির দায়িত্ব নিতে রাজী হলেন।

অধ্যাপক ডি. এম. বসু ও আখরকর যথাক্রমে পদার্থবিদ্যা ও উদ্ভিদবিদ্যার ঘোষ অধ্যাপক-পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু নিজেদের গবেষণার জন্য জার্মানীতে প্রেরিত হবার অনুরোধ জানালেন। এ অবস্থায় বিজ্ঞান শিক্ষা দেবার বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিপ্রায় বিলম্বিত হল।

এদিকে প্রথম পৃথিবী যুদ্ধ ১৯১৪ সনে শুরু হয়েছিল। তারই ফলে অধ্যাপক বসু ও আখরকর জার্মানীতে অন্তরীণ হলেন। দেশের স্কুলের পরিচালনা কে করবেন, গভর্ণমেণ্ট না বিশ্ববিদ্যালয়—তাই নিয়ে বিতণ্ডা শুরু হল। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদান ব্যাপারে হস্তক্ষেপে স্যার আশুতোষ এক নির্ভীক প্রতিবাদী হয়ে দাঁড়ালেন। ১৯১৭ সনে তিনি ভাইস-চ্যান্সেলার রইলেন না বটে কিন্তু পালিত ও ঘোষের দানের অছিসভার সভাপতি রইলেন।

জাতীয়তার এই আন্দোলন বহু আদর্শবাদীকে দুঃসাহসী করেছিল। কয়েকজন তরুণ স্নাতক তখন বিজ্ঞানের চর্চায়ই আত্মনিয়োগ করবেন বলে স্থির করেছিলেন। ১৯১৫ সনের এম্. এস. সি. পরীক্ষার পরই তাঁরা উপদেশের জন্য স্যার আশুতোষের কাছে গেলেন। ভিন্ন প্রদেশের এক সরকারী কলেজের লেক্‌চারারের পদের জন্য তাঁদের মধ্যে একজনের নাম প্রেরিত হয়েছিল। কিন্তু তিনি অত্যধিক গুণসম্পন্ন বলে বিবেচিত হয়েছিলেন, এবং সে জন্যই তিনি নিযুক্ত হলেন না। তিনি ভাবছিলেন, তাঁর বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় জ্ঞান বৃদ্ধির কি উপায় হবে।

তাঁদের মধ্যে একজন সাহস করে প্রস্তাব করলেন যে, বিজ্ঞানের বিবিধ শাখায় পড়াবার জন্য যে সিলেবাস রচিত হয়েছে তার অনেকগুলি গভর্ণমেণ্ট কলেজেও পড়ানো হয় না। সেই বিষয়গুলি যদি বিশ্ববিদ্যালয় পড়ানোর ভার নেন তবে বেশ হয়। এই প্রস্তাব শক্তিমান আশুতোষ কিভাবে নেবেন তা এই তরুণদের কল্পনায় ছিল না। কিন্তু দেখা গেল, কয়েকজন বিশেষ বৃত্তি পেলেন এবং তাঁদের বলা হল যে সম্প্রতি বিজ্ঞানের যে কয়টি বিভাগ অধিকতর উন্নত হয়েছে সেগুলি যেন আয়ত্ত করা হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের কথা বিবেচনা করে একজনকে ভার দেওয়া হল তিনি যেন বিশেষ অনুসন্ধান করে রিপোর্ট দেন, এদেশেই প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি পাওয়া যাবে কি-না। তাঁকেই বলা হল যে বিশ্ববিদ্যালয়

যদি পদার্থবিদ্যার বিভিন্ন বিভাগে ক্লাশ খোলার ইচ্ছা করেন তবে ল্যাবরেটরির সরঞ্জামের জন্য প্রথম বৎসরেই কত টাকা লাগবে তার রিপোর্টও যেন দেওয়া হয়। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই বোঝা গেল যে, বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞানের বিবিধ বিষয় পড়াবেন। স্যার আশুতোষ সমর্থন পেয়েছিলেন অনেকের কাছ থেকে। তবে কারো কারো মনে তখনও সংশয় ছিল। এত বড় কাজে সব দিক না ভেবে হাত দেওয়া হয়ত হঠকারিতা হবে। তরুণ বিজ্ঞানীরা ভেবেছিলেন, আগে সি. ভি. রমন যোগ দিন ; যে অধ্যাপকরা বিদেশে অন্তরীণ আছেন তাঁরা ফিরে আসুন। অবশ্য শেষ পর্যন্ত তাঁদের সংশয় দূর হল ; তাঁরা এসে দাঁড়ালেন স্যার আশুতোষের পাশে। স্যাড্‌লার কমিশনের রিপোর্ট পেশ হবার আগেই রসায়ন, পদার্থবিদ্যা ও গণিতের স্নাতকোত্তর বিভাগ খোলা হল। কমিশনের সভ্যরা বিভিন্ন বিভাগের কাজকর্ম দেখে খুশীই হয়েছেন মনে হল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ স্নাতকদের পক্ষে এটা ছিল দুঃসাহসের কাজ। তাঁরা নতুন পরিকল্পনা সফল করবার জন্য গুরুতর পরিশ্রম করেছিলেন। এঁরাই স্থির করেছিলেন পদার্থবিদ্যার পাঠ্যসূচী। কয়েক মাস পরে সি. ভি রমন অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করে দেখলেন পড়ানোর কাজ নিয়ম অনুসারে বেশ চলছে। তিনি ক্লাশে অল্প কয়েকটি বক্তৃতা দিতেন ; তাঁর অধিকাংশ সময়ই কাটত ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর কালটিভেশন অব সায়েন্স-এ। এখানে তাঁর গবেষণা চলত ; পালিতের দান ব্যয় হত এখানেই। তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী কয়েকজন লেক্‌চারার অ্যাসোসিয়েশনের পরীক্ষাগারে গবেষণা করে ডক্টরেট ডিগ্রি পেলেন।

আমার ব্যক্তিগত জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে সম্পূর্ণ বিবরণের খানিকটা মাত্র বললাম। কলা ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায়, তা সে বালিগঞ্জেই হোক বা দ্বারভাঙ্গা ভবনেই হোক, উচ্চশিক্ষার আরম্ভ এভাবেই হয়েছিল। স্নাতকোত্তর বিভাগ খোলা হলে নতুন কাজের আসল দায়িত্ব এই সব তরুণ অধ্যাপকেরাই নিয়েছিলেন। নায়ক দেখলেন, শুভদিন সমাগত। এই নতুন জ্ঞানান্বেষীদের উপর তাঁর আস্থা ছিল যে, এই গুরুদায়িত্বের ব্যাপারে আবশ্যকীয় নব নব পন্থা আবিষ্কারের জন্য কঠোর পরিশ্রম করতেও এঁরা কুণ্ঠিত হবেন না। স্যার আশুতোষের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তরুণ শিক্ষাব্রতীরা দুঃসাহসিক কার্যক্রমকে সফলতার পথে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন। উচ্চশিক্ষা বিস্তারের এই উদ্যমকে সরকার কিন্তু সুনজরে দেখতে পারেননি। বিজ্ঞানের বিভাগগুলির জন্য সরকারী সাহায্য পাওয়া গেল না।

ছাত্রদের বেতনের উপরেই বিশ্ববিদ্যালয়কে নির্ভর করতে হল। অবশ্য তখন সদাশয় ব্যক্তিদের দান কাজের সহায়ক হয়েছে। উপযুক্ত সরকারী সাহায্য ব্যতীত বিশ্ববিদ্যালয় যে শিক্ষাপ্রসারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হল তা জাতির আত্মনির্ভরতার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগে ক্রমশঃ ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পেল। শিক্ষা লাভ করবার পর ছাত্ররা নানা শিল্পপ্রতিষ্ঠানে যোগ দিল। অনেকে নতুন শিল্পের প্রবর্তন করল। মৌলিক গবেষণাও পিছিয়ে রইলো না। Conductivity of Electrolytes সম্বন্ধে জ্ঞানচন্দ্র ঘোষের গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হল ১৯১৯ সনে। Temperature Ionisation of Stars সম্বন্ধে মেঘনাদ সাহার বিখ্যাত তত্ত্ব ১৯২২ সালের মধ্যেই প্রচারিত হল। তার পর থেকে বিভিন্ন বিষয়ে বহু তত্ত্ব ও তথ্য একে একে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগার থেকে বিশ্বের পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে প্রচারিত হয়েছে।

সফল হল স্যার আশুতোষের আশা ; কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম বিজ্ঞান জগতে শীঘ্রই শ্রদ্ধার আসন লাভ করল। এই শ্রদ্ধা অক্ষুণ্ণ আছে। প্রায় পঞ্চাশ বছর যাবৎ নবাগত বিদ্যার্থীরা অনেক ভালো কাজ করেছেন। কিন্তু একাজ সহজ ছিল না। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় শিক্ষার স্থান ছিল অনেক কিছুর পরে। দরকার হলেই ছাত্রদের ডাক আসত, আর তাঁরা স্কুল-কলেজ ছেড়ে বেরিয়ে পড়তেন। শিক্ষকদের আর বিশ্বস্ত পথপ্রদর্শক বলে গণ্য করা হত না ; ছাত্ররা জাতীয় আন্দোলনের নেতাদেরই অনুসরণ করা সংগত মনে করলেন। নেতারা তাঁদের আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, একবার স্বাধীনতা এলেই সব অসুবিধা দূর হবে এবং আর কোনো সমস্যাই থাকবে না।

স্বাধীনতার পর দেশে নতুন যুগ এসেছে। কিন্তু বাংলা আনন্দের পরিবর্তে পেয়েছে দুঃখ ও তিক্ততা। সংস্কৃতি ও শিক্ষা-দীক্ষায় যে দেশ ছিল এক, তা এখন বিভক্ত হয়ে গেছে। তার ফলে বহু লোক ভিটা ছেড়ে চলে এসেছে। এদের পুনর্বাসনের বিপুল কাজ দেশের শাসনকর্তাদের কর্মক্ষমতা ও সংগতির উপর গুরুতর চাপ দিচ্ছে। আর সঙ্গে সঙ্গে এসেছে কারিগরি ও বিজ্ঞান শিক্ষার মস্ত দাবী।

মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থাপনা এখন আর বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে নেই। মাধ্যমিক শিক্ষারও আমূল সংস্কারের পরিকল্পনা আছে। কিন্তু এই পরিকল্পনা

সুষ্ঠুরূপে কার্যকর করতে হলে চাই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক। বিশ্ববিদ্যালয়কেই সেরূপ শিক্ষক স্কুলগুলিকে যোগাতে হবে। তাছাড়া বহু স্নাতক বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য উৎসুক। এই উচ্চশিক্ষার সঙ্গে নানা জটিল প্রশ্ন জড়িত আছে। স্থানাভাবের জন্য অনেক ছাত্রকে ফিরিয়ে দিতে হয়। প্রতি বৎসর আমরা পরীক্ষার হলে হাঙ্গামার কথা শুনতে পাই।

সহানুভূতিহীন কোনো পরীক্ষক হয়ত খুব কঠিন প্রশ্ন করেছেন; অথবা, হয়ত সিলেবাসের বহির্ভূত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছেন। কেন এমন হয় সে বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সযত্নে অনুসন্ধান করা দরকার। শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে সম্প্রীতি থাকা একান্ত আবশ্যক।

ত্রিশটিরও বেশী বিশ্ববিদ্যালয় এখন দেশে উচ্চশিক্ষা দান করছে। শীঘ্রই আরও নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবে। উচ্চশিক্ষা যখন কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব, তখন অনেকে ভাবছেন সব বিশ্ববিদ্যালয়ের মান এক হওয়া উচিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁরা একটি সর্বজনগ্রাহ্য নীতি গ্রহণের পক্ষপাতী। এক মান ও এক নীতি রক্ষা করতে হলে এক ভাষা শিক্ষার বাহন হিসাবে গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক। এই মতের সমর্থকরা কার্যত ইংরেজীকেই অনির্দিষ্ট কালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদানের ভাষা হিসাবে রাখতে চান।

আমি চিরদিনই গতানুগতিক পথে চলার মনোভাবকে অবিবেচনার কাজ বলে প্রতিবাদ করে থাকি। বিদেশী ভাষাই আমাদের দেশে সাক্ষরের সংখ্যা বৃদ্ধির অন্তরায়। বিদেশী ভাষা শিক্ষার বাহন হলে মুখস্থ করবার প্ররোচনা দেয় ছাত্রদের এবং এর ফলে তাঁদের মৌলিক চিন্তার প্রসার ঘটতে বাধার সৃষ্টি হয়।

এখন সময় এসেছে। আর বিলম্ব না করে আঞ্চলিক ভাষার মাধ্যমে সকল বিষয়ের শিক্ষা দিতে হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শ্রেণীতে। পঞ্চাশ বছরেরও আগে আমাদের চিন্তানায়কদের নিকট এটি সম্ভবপর প্রস্তাব বলে মনে হয়েছিল। এখন মাতৃভাষাকে শিক্ষার ক্ষেত্রে উপযুক্ত মর্যাদা দেবার প্রশ্নটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের সভ্যগণ ও আইনসভার সভ্যগণকে বিশেষরূপে বিবেচনা করে দেখতে হবে।

মাতৃভাষা

আমি প্রায় সারা জীবন শিক্ষা নিয়ে কাটিয়েছি। যখন আমরা ছাত্র ছিলাম তখন মনের মধ্যে একটা উন্মাদনা ছিল যে,—যে-বিজ্ঞানের চর্চা করে প্রতীচ্য এত উন্নতি করছে, আমাদের দেশে সেটা শীঘ্র চালু হবে, এবং আমরা জীবন উৎসর্গ করবো সে সব জিনিস দেশের মধ্যে আনতে।

প্রায় ষাট বছর আগে যখন দেশে স্বদেশী আন্দোলন হয় তখন দেশের মনীষী এবং যাঁরা দেশকে ভালবাসেন সেই সব নায়করা মনে করেছিলেন যে জাতীয় বিদ্যালয়ের মাধ্যমে অন্তত বাংলা দেশের মধ্যে স্বদেশী শিক্ষা ব্যবস্থা স্থাপন করবেন। বহু বৎসর চলে গিয়েছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত আমাদের দেশে শিক্ষা-বিস্তার অনেক সংকীর্ণ হয়ে রয়েছে।

অন্য দেশে গেলে একটা জিনিস চোখে পড়ে। সব দেশেই চেষ্টা চলছে মাতৃভাষার মাধ্যমে, যে ভাষা সবাই বোঝে তার উপর বনিয়াদ করে, শিক্ষার ব্যবস্থা করবার। সব জায়গাই এই রীতি চালু রয়েছে। মধ্যযুগে অবশ্য অন্য ভাষা অবলম্বন করে শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা ছিল; জ্ঞানী-গুণী লোকরাই তার সুযোগ পেতেন। এর অসুবিধা ছিল এই যে, সাধারণ লোকে বুঝতে পারত না। তার জন্য অন্য লোকের দরকার হত। তারা যেমন বুঝত সেই রকম সাধারণ লোককে বুঝিয়ে দিত।

এইভাবে কিন্তু দেশের মধ্যে জ্ঞানের বিস্তার বড্ড আস্তে আস্তে হত। আজকের যুগে একদিকে যেমন লোকে চেষ্টা করছে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আশ্রয় নিয়ে দেশকে বড় করতে, মানুষকে নানা রকম সুখ-সুবিধা দিতে,—তেমনি আবার এটাও বুঝেছে যে কেবল একটা শ্রেণীর মধ্যে জ্ঞান যদি আবদ্ধ থাকে তাহলে উন্নতি তত দ্রুত হয় না। কাজেই আজ যখন আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি তখন আমাদের ভাল করে ভেবে দেখতে হবে কি করে দেশের ভিতর তাড়াতাড়ি শিক্ষার বিস্তার হবে। যদি চেষ্টা করা যায় তবে এ দেশের মধ্যে থেকে অজ্ঞতা এবং নিরক্ষরতা দূর করা যেতে পারে—এটা যাঁরা ইতিহাস চর্চা করেন, তাঁরাই জানেন।

আমার জাপান ভ্রমণের অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ছে। সে অভিজ্ঞতার কথা সংক্ষেপে আপনাদের বলব।

প্রায় এক-শ' বছর হল পাশ্চাত্য জাতের হাতে ঘা খেয়ে জাপান ঠিক করল, যে বিদ্যা ও জ্ঞানের জন্য প্রতীচ্য এত শক্তিমান হয়েছে সে জ্ঞান ও সেসমস্ত বিদ্যা আয়ত্ত করতে হবে। এখনও এক-শ' বছর হয় নি। এরই মধ্যে জাপানের কীর্তি-কলাপের কথা সকলেই জানেন। বিশ বছর আগে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যখন জাপানের হার হল তখন জাপানের দুরবস্থার শেষ ছিল না, আজ কিন্তু জাপানে গেলে মনে হবে না যে এ রকম কোন অবস্থার মধ্য দিয়ে তাকে যেতে হয়েছিল।

স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে—এত অল্প সময়ে দেশের সেই দুরবস্থা থেকে বর্তমান এই অতি সম্পদের মধ্যে কি করে জাপান আবার উঠে দাঁড়াল। শিক্ষা ও উন্নতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আমি তাই চেষ্টা করেছিলাম জানতে যে, সেখানে শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা কি রকম ভাবে হয়েছে। জাপানে কম করে নয় বৎসর শিক্ষার জন্য প্রত্যেক ছেলে ও মেয়েকে স্কুলে পাঠানো হয়। প্রায় সকলেরই স্কুলে যাওয়া বাধ্যতামূলক। এর জন্য কারুর পয়সা লাগে না। নীচের দিকে খরচ যোগায় দেশের মিউনিসিপ্যালিটি কিংবা আমাদের দেশের মতোই জেলা অথবা রাজ্যসরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ। তারাই খরচার বেশীর ভাগ দিয়ে থাকে। শিল্পকলা শিক্ষার বন্দোবস্ত আছে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানে, সেগুলির ভার নিয়েছেন সরকার। তাছাড়া উপরের দিকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির বেশীর ভাগ সরকারী পয়সায় চলছে।

আমার প্রথমে ধারণা ছিল যে হয়ত কোনও একটা বিদেশী ভাষার উপর নির্ভর করে জাপানে বিজ্ঞান কিংবা শিল্পকলা শেখানো হয়। কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখলাম যে আমার ধারণা ভুল। আমি অনেক বই যোগাড় করেছিলাম। তার অধিকাংশই জাপানীতে লেখা। তাই পাঠোদ্ধার হয় নি। অবশ্য দু' চারখানা ইংরেজী বইও তার সঙ্গে পেয়েছি।

একটি সম্মেলন আহ্বান করেছিলেন জাপানীরা। সেখানে শিক্ষিত লোকেরা —যাঁরা দার্শনিক, বিজ্ঞানী কিংবা শিক্ষক, তাঁরা সকলে একত্র হয়েছিলেন আলোচনা করতে যে আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে মানুষের কি করা উচিত এবং মানুষের ভবিষ্যৎই বা কি হবে। সম্মেলনে আমি এবং আরও দু'একজন বিদেশী

ছিলেন কিন্তু বেশীর ভাগই জাপানের লোক এবং আলোচনা যা হয়েছিল তা সমস্তই জাপানীতে। তাঁদের দু'একজন ইংরেজী ভাষাতে কিছু কথা বললেও পরে আলোচনা যা হল সবই জাপানী ভাষায়। এটা বললে ভুল হবে যে, তাঁরা ইংরেজী জানেন না। কেননা, আমরা যখন ইংরেজী বলি তখন তাঁরা প্রায় সকলেই বোঝেন। তবে তাঁদের মনে এমন বিশ্বাস ছিল না যে, ইংরেজী বললে নিজের মনের ভাব স্পষ্ট করে বোঝাতে পারবেন। সেইজন্য যে সব বিজ্ঞানী ও দার্শনিক সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাঁরা সকলেই জাপানী ভাষাতেই নিজের মনোভাব প্রকাশ করছিলেন। দেখা গেল শুদ্ধ দার্শনিক তত্ত্ব কিংবা বর্তমান বিজ্ঞানের উচ্চস্তরের কথা সবই জাপানী ভাষার বলা সম্ভব এবং জাপানী কথায় তা বলবার জন্য লোকে ব্যগ্র।

আমাদের ভারতীর ভাষাগুলির তুলনার জাপানী ভাষার কতকগুলি অসুবিধা আছে। যাঁরা একটু খবর রাখেন তাঁরাই তা জানেন। একটা অসুবিধা হল এই যে, আমাদের যেমন অল্পসংখ্যক অক্ষর দ্বারাই সব বাক্য লেখাও যায়, বইতেও ছাপানো যায়, জাপানী ভাষাতে সে ব্যবস্থা নেই। আছে নিজেদের অক্ষর এবং চৈনিক অক্ষর প্রায় হাজার তিনেক। যাঁরা উচ্চশিক্ষায় ইচ্ছুক তাঁদের এ সবকটাকেই শিখতে হয়। এর জন্য আমাদের দেশে যেখানে মাতৃভাষা বছরখানেক বা বছর দু'য়েকের মধ্যে চলনসই আয়ত্তের মধ্যে এসে যায়, ছেলেমেয়েদের সেখানে জাপানী ভাষা শিখতে গড়ে লাগে প্রায় ছয় বছর। এত অসুবিধা সত্ত্বেও এমন অবস্থা জাপানী ভাষার যে প্রত্যেক জাপানী বিজ্ঞানী, জাপানী দার্শনিক নিজেদের মনের প্রত্যেকটি কথা জাপানীতে প্রকাশ করতে পারেন। এতে সুবিধা হয়েছে এই যে, দেশের মধ্যে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা যখন চালু হয়েছিল তখন তার জন্য শিক্ষক পাবার কোনও অসুবিধা হয়নি,—এমন শিক্ষক যিনি জাপানী ভাষায় বিজ্ঞান কিংবা দর্শন কিংবা অন্যান্য কলাবিদ্যা আয়ত্ত করে নিয়েছেন ও পড়াতে পারেন।

এইজন্য জাপানে তাড়াতাড়ি শিক্ষাবিস্তার হয়েছে। ফলে জাপান অতি সহজেই সমস্ত জ্ঞান আয়ত্তের মধ্যে আনতে পেরেছে। যদি আমরা জাপানী ও জার্মান জাত দু'টিকে দেখি—পৃথিবীতে যে দু'টি জাত তাড়াতাড়ি জ্ঞানের স্বল্পাবস্থা থেকে আজ একেবারে শীর্ষস্থানে চলে গিয়েছে—তাদের উভয়ের মধ্যে শিক্ষিত অথবা অক্ষর পরিচয় আছে এরকম লোকের সংখ্যা শতকরা নব্বইয়ের উপরে।

এটা ঠিক যে দেশ বলতে যদি দেশের লোককে বুঝায়, শুধু শিক্ষিত বা নায়ক সম্প্রদায় না হয়, যদি মনে হয়, দেশের সাধারণ লোকই দেশ, তবে এরা শিক্ষিত হলেই তো দেশকে উন্নত বলা যাবে, এবং দেশকে সকল বিপদ থেকে রক্ষা করবার জন্য সমূহ শক্তিই তাদের হাতের মধ্যে থাকবে। আমাদের দেশে অনেক ভাষা আছে। কিন্তু প্রতিটি ভাষায়—বিশেষ করে যেগুলি সংবিধানে গণ্য হয়েছে মুখ্য ভাষা বলে—শিক্ষিতের সংখ্যা সর্বমোটে জাপানীদের কিছু কম বা বেশী।

আমার মনে হয় যে প্রথমেই আমরা সারা দেশের কথা না ভেবে যদি আমাদের নিজেদের ঘর তৈরী করি, অর্থাৎ আমরা যে প্রদেশে থাকি সেই প্রদেশের লোকের শিক্ষা এমন ভাবেই বন্দোবস্ত করি যাতে বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রত্যেক শিশুর কাছে পৌঁছায়, তাহলে আমাদের সামনে নতুন যে সমস্ত অসুবিধা দেখা যাচ্ছে সেটা সহজেই চলে যায়।

আজকের দিনে পৃথিবীতে একথা চলেছে যে, মানবজাতি একত্র হয়ে একটা মহামানব সমাজ গড়ে তুলবে। কিন্তু এটা কেউ ভাবেন না যে, তার জন্য নিজ নিজ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা একটা বিশেষ কোন ভাষায় চালাতে হবে। কারণ মনে যদি থাকে ভালবাসা, তাহলে ভাষার অসুবিধা থাকলেও মানসিক যে মিল সেটা রাখতে অসুবিধা হয় না।

অনেক সময় এই কথাটাই বলা হয় যে, ইংরেজী ভাষা না হলে আমাদের দেশে একতা থাকবে না। বলা হয়, আমরা যখন পরাধীনতার শৃঙ্খল দিয়ে একত্র বাঁধা ছিলাম তখনই আমাদের মনে ছিল যে, আমরা একই জাতি। অতএব বর্তমানে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমেই সেই যোগসূত্র বজায় রাখা হোক। কিন্তু এ কথা বললে ভুল হবে যে, ওই শৃঙ্খল পরবার আগে আমাদের জাতীয়তা বোধ ছিল না।

আমাদের দেশের মধ্যে যাঁরা নেতৃস্থানে আছেন দেশের ঐক্য তাঁরা নিজেদের মনের মধ্যে ততটা হয়তো অনুভব করেন না। আমাদের নেতারা সব সময় অবহিত নন যে সত্যিই পরস্পরের মধ্যে ঐক্যসূত্র কত নিবিড় ভাবে জড়িয়ে রয়েছে। দেশ থেকে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের লোকেরা যখন বিদেশে গিয়ে একত্র হন তখন তাঁদের চোখে ঠেকে তাঁদের মনের গঠন এবং আচার-ব্যবহার কত এক অথচ বিদেশী থেকে কত তফাৎ। সেইজন্য আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, প্রাদেশিক ভাষার নিজ নিজ

প্রদেশে যদি শিক্ষা শতকরা পুরাপুরি চালানো যায় তাহলে দেশের ঐক্য ভেঙ্গে যাবে না।

দেশের সাম্প্রতিক ইতিহাসের মধ্যে যেমন অনেক গৌরবময় কথা আছে, তেমনি অনেক কলঙ্কের কথাও আছে। এই কলঙ্কের ইতিহাস যদি আলোচনা করা যায় তাহলে দেখা যাবে, যাঁদের সূত্রে এই কলঙ্ক ছড়িয়েছে তাঁরা সকলেই ইংরেজী শিক্ষিত। আমি এইটুকু বলতে চাইছি যে, দেশের সাম্প্রতিক ইতিহাসে আমাদের যেমন গর্ব করবার অনেক কথা আছে তেমনি আমাদের দুঃখ করবার, লজ্জিত হবার কথাও আছে। কিন্তু সেই সকলের মূল যদি অনুসন্ধান করা যায় তাহলে এই সমস্ত শোচনীয় ঘটনার মূলে অনেক সময় দেখা যাবে ইংরেজী শিক্ষিত গর্বিত ও স্বার্থপর লোকের কীর্তিকলাপ।

অতএব আমার মনে হয়, ইংরেজী যে দেশের ঐক্যের কারণ তা নয়। একতার কারণ আমাদের নিজেদের মনের মিল। আমরা যদি দরদী হই তাহলে বিদেশী ভাষাভাষীদেরও আমরা আপন করে নিতে পারি, অপর পক্ষে আমাদের মনের মধ্যে যদি ভ্রাতৃবোধ না থাকে তাহলে পাকিস্তান হতে বেশী দেরী হয় না। আর এই দুই দেশ যাঁরা গড়ে তুলেছেন তাঁরা দু'জন একই প্রদেশবাসী, এবং দু'জনেই ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত। ইংরেজী ভাষার দ্বারা বহুদিন চেষ্টা করলেও আমাদের দেশে জনজাগরণ হয়নি। তারপর আমাদের জাতীয়তার পিতা যখন দেশের কাছে এসে দাঁড়ালেন—যদিও তিনি ইংরেজী অনেকের থেকে ভালো বলতে ও লিখতে পারতেন—তিনি চেয়েছিলেন এমন ভাষায় কথা বলতে যা সকলেই বুঝতে পারে। স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে একটা নতুন দায়িত্ব আমরা লাভ করেছি। এই স্বাধীনতার যা কিছু সুফল তা যেন শুধু অল্পসংখ্যক ইংরেজী ভাষায় শিক্ষিতের আয়ত্তের মধ্যে না থাকে, সেগুলি যেন দেশের সকল লোকের কাছে পৌঁছে যায়।

যাঁরা বলেন, ইংরেজী যদি কম শেখানো হয় তাহলে আমাদের দেশের জানলা বন্ধ করে দেওয়া হবে—যার মধ্যে দিয়ে আসে জ্ঞানের আলোক ও স্বাধীনতার বাতাস, তাঁরা ভুল ধারণা করেছেন যে, চিরকাল ভারতবর্ষের চতুর্দিকে কারাগারের উঁচু পাঁচিল থাকবে এবং আলো আসবে উপর থেকে যেটা কেবলমাত্র উপরতলার শিক্ষিত লোকের কাছে পৌঁছবে এবং সেটা তাঁরা যেমন বুঝবেন সেই রকম নীচের অজ্ঞ লোকদের কাছে পৌঁছে দেবেন। এইভাবে দেশের উন্নতি করা কষ্টদায়ক। তাছাড়া সকলের দায়িত্ব অল্পসংখ্যক লোকের একটি শ্রেণীর উপর চিরকালের

জন্য চাপানো উচিত নয়। দেশের লোকের উচিত নিজেদের বোঝা নিজেদের বওয়া। আমরা পনেরো বছরেও এ কাজে বিশেষ এগোতে পারিনি।

তাই আমার মনে হয় আজকে যে আপনারা বলছেন, ইংরেজী যে প্রধান স্থান অধিকার করে আছে সেখান থেকে তাকে হঠানো হোক—এই কথাটা ভাল করে বিচার করে দেখুন। ভেবে দেখুন বিভিন্ন প্রদেশে কি ভাবে এটা কার্যে পরিণত করা যায়। আমি এই হঠানোর জন্য যা বলেছি সেটা শুধু আমাদের আত্মরক্ষার তাগিদেই। কেননা, আমি মনে করি যে ইংরেজীর উপর এত বেশী জোর দিলে দেশে শিক্ষাবিস্তারের অন্তরায় সৃষ্টি হবে। যাঁরা শিক্ষকের বৃত্তি গ্রহণ করবেন তাঁদের সারাজীবন চেষ্টা করা দরকার মনের সমস্ত কথা কি করে মাতৃভাষায় প্রকাশ করা যায়।

আমাদের দাবী হল শিক্ষিতদের উপর। তাঁরা চেষ্টা করুন দেশে নতুন যুগ যাতে আসে। শিক্ষার নতুন বাহন তাঁরা স্থির করুন। প্রদেশে প্রদেশে এমন ধরণের ব্যবস্থা চালু করুন যাতে তাড়াতাড়ি আমাদের দেশ থেকে অশিক্ষা অজ্ঞানতা দূর হয়ে যায়। এই সূত্রে ভাবোন্মাদীদের একটু সাবধান করে দিচ্ছি যে, শুধু একটা নাম খারিজ করে, একটা নাম কেটে দিয়ে, আর একটা নাম চালালেই আমাদের নতুন যুগের আহ্বান সার্থক হয়ে উঠবে না।

আমাদের প্রয়োজন দেশের লোকদের শিক্ষিত করা, যে সমস্ত বস্তু-জ্ঞান তাদের কাজে লাগে, তাদের নীরোগ রাখে, বিত্তশালী করে, তাদের মুখের খাবার যোগায়,—সেই জ্ঞান দেশের সর্বত্র স্বল্প আয়াসেই যেন পাওয়া যায়, এটাই আমি চাই।

এর জন্য বহুদিন চেষ্টা করতে হবে। শুধু একত্র হয়ে আলোচনা করলেই কাজ শেষ হবে না। আমার আশা আছে আপনাদের এই সম্মেলন থেকে বিভিন্ন ভাষা-ভাষীরা দেশে গিয়ে এই কথাটা মনে রাখবেন। এই সম্মেলন সার্থক হবে যদি আমরা সকলের সঙ্গে আলোচনা করে দুটি কথা উপলব্ধি করতে পারি। সে দুটি কথা এই ঃ এক, মাতৃভাষা শিক্ষার বাহন হলে তাড়াতাড়ি কাজ হাসিল হবে ; দুই, আমাদের আঞ্চলিক প্রেম ভাষার উপর নির্ভর করে না, সেটা আমাদের মনের কথা। এই দুটি কথা যদি আপনারা নিয়ে যান তাহলেই মনে করব আপনাদের আয়োজন সফল হল। পারস্পরিক আলোচনার দ্বারা আরও দুটি বিষয়ে সচেতন হব বলে আশা করি। প্রথমত, আমাদের একতা অনেকটা নীচুতে, কেবলমাত্র ওপরে ওপরে,—

এক ভাষা বলছি বলেই একতার বন্ধন আসেনি। দ্বিতীয়ত, এমন কোনও সমস্যা নেই যা সমবেত ঐকান্তিক চেষ্টা দ্বারা সমাধান করা যায় না।

আমি পূর্বে বলেছি যে, জাতির ঐক্যবর্ধন হবে কোনও এক বিশেষ ভাষার পন্থায় নয়। মানুষের মনের মিলের উপর যে, জাতির একতা প্রতিষ্ঠিত একথা বিশদভাবে বলবার প্রয়োজন আছে। আমরা যদি কিছু গড়ে তুলতে চাই তাহলে কর্মীদের মধ্যে পরস্পরের মানসিক মিল থাকা একান্ত দরকার। তা না হলে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ থেকে আমরা যে চেষ্টা করব, সেটা যে ইমারতের অংশবিশেষ, তা বোধ হয় সব সময় এক ভাবে জুড়বে না।

একটি বিদেশী ভাষা, একটি বিদেশী শাসন, আমরা অনেক দিন সহ্য করেছি। যদি এর দ্বারাই ঐক্যসাধন হোতো, সে ঐক্যসাধন এতদিনে হওয়া উচিত ছিল। তা হয়নি বলেই সংবিধানের স্বীকৃতি ও নির্দেশের বিরুদ্ধে আজ নানা রকম কথা উঠেছে।

আমাদের দেশের ঐতিহ্য বহু শত বৎসরের সাধনার ফল এবং তা যত পুরানোই হোক না কেন, সে সবই আমরা জীবনের মধ্যে আঁকড়ে রাখতে চাই। ঐতিহ্যের প্রতি আর্কষণই জাতীয় ঐক্যের ভিত্তিস্বরূপ। আমি অন্ততঃ নিজের মন থেকে অনুভব করেছি যে রাজনীতির ক্ষেত্রে যদি ঐক্য নাও থেকে থাকে, মনের ঐক্য যে ছিল সেটা নিজের স্বার্থবোধ কিছুটা দমিয়ে রেখে দেশের মধ্যে কেউ ভ্রমণ করলেই বুঝতে পারবেন। আমাদের দেশের সন্ন্যাসীরা, আমাদের তীর্থ যাত্রীরা, আমাদের সাধারণ হিন্দু ছেলেমেয়েরা, এমন কি গ্রামের ভিন্ন ধর্মের লোকেরা যারা এক সঙ্গে থাকেন তাঁরা সকলেই অনুভব করেছেন যে, আমাদের পরস্পরে মধ্যে যে বন্ধন আছে সেটা সহজে ছিন্ন হবার নয়। তবে স্বার্থের সংঘাত কখনও ঐক্যবোধকে আচ্ছন্ন করে রাখে। ঐক্যানুভূতিকে জাগিয়ে রাখা সাধনা বিশেষ। মুখের কথায় ঐক্য হবে না।

এই সাধনার পথ কি ? আমার মনে হয়, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের লোকের নিজেদের ভাষার মধ্য দিয়ে বুঝতে হবে আমাদের ঐতিহ্য কি এবং কি ভাবে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের লোকের সঙ্গে আমাদের মিলন ছিল। পৃথিবীর এই বৈচিত্র্য যে, প্রতি মুহূর্তে মানুষের কাছে দাবী আসে সে একটা নতুন কিছু করুক। তাই আমাদের দেশের ঐক্য আগে যে ভাবে অনুভূত হত তার তুলনায় আজকের দিনে যা আমরা গড়ে তুলব সেটা আরও বিশেষ বৈচিত্র্যসম্পন্ন হবে ; আরও গভীর, এবং তার মধ্যে শক্তি হবে আরও বেশী। এটা আমি বিশ্বাস করি।

আমাদের কাছে ডাক এসেছে—এবার নিজেকে চিনতে হবে। বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসীরা উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের সমস্ত লোককে—আঁকড়ে নিয়ে জানতে শিখুক যে, স্বাধীনতার স্বাদ কি, কি আমরা হারিয়েছিলাম এবং আজকের দিনে কি আমরা পেয়েছি।

আমাদের সেই সব রাস্তা দিয়ে যেতে হবে, যে রাস্তা অনুসরণ করে অন্যান্য জাতিরা উন্নতির শিখরে উঠেছে। এই রাস্তায় আমাদের তাড়াআড়ি যেতে হবে। এইজন্য দেশের লোকের সকলের মনের মধ্যে বর্তমান যুগের যে প্রধান কথা তা পৌঁছে দিতে হবে। প্রাগৈতিহাসিক যুগের মনোভাব এখন আর রাখলে চলবে না। মানুষ যে শক্তি অর্জন করেছে প্রকৃতির উপর, তার যে প্রভাব হয়েছে নানা দেশে, সেটা অনুভব করতে হবে শুধু আজকে আমরা যাঁদের শিক্ষাভিমানী বলি তাঁদের নয়, দেশের প্রত্যেককে।

এ না হলে অন্যান্য দেশ যে দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে তার সঙ্গে তাল রাখতে পারব না। আর সত্যি ভারতবর্ষ বলতে যদি আমাদের মনের মধ্যে একটা বিশেষ ধ্বনি ওঠে, যদি আমাদের প্রাণ কাঁদে স্বদেশবাসীর জন্য, তাহলে একটি বিদেশী ভাষার দরকার হবে না পরস্পরের মধ্যে বন্ধন দৃঢ় করবার জন্য। যে ইংরেজীশিক্ষিত ব্যক্তিরা বিদেশী শক্তিকে দেশ থেকে বের করবার জন্য সংগ্রাম করেছিল তারা যখন নিজেরা ক্ষমতা হাতে পেল তখন তাদের মধ্যে পরস্পর থেকে দূরে সরে যাবার একটা প্রবণতা দেখা দিতে লাগল।

বিচ্ছিন্ন মনোভাবকে দূর করে সংহতি সৃষ্টির কাজ, মাতৃভাষার মাধ্যমে সহজেই হতে পারে। কেবল মাত্র রাজকীয় মঞ্চ থেকে একতার কথা বললে চলবে না। আমাদের বলতে হবে প্রত্যেক ঘরের কোণ থেকে এই একতার বাণী। কেবল বললে চলবে না যে, আমরা শিক্ষার বিধান করেছি। সত্যি করে সকলকে মনে করতে হবে যে এটা আমাদের সকলের দায়িত্ব। এই জন্যই মাতৃভাষার দরকার, সাধনার দরকার এবং মনকে শুদ্ধ করবার দরকার। তাই পরস্পরের মধ্যে সংঘাতের সৃষ্টি না করে পরস্পরের মধ্যে প্রেমের আলোচনা করা উচিত।

আপনারা যাঁরা এটা অনুধাবন করেন তাঁরা ধৈর্য ধরে আপনার সীমার মধ্যে কাজ চালিয়ে যান। আমরা ছেলেবেলায় বলতাম, এগিয়ে চল, কেননা উপরে ভগবান আছেন এবং আমাদের ভয় করবার কিছু নেই। আপনাদের মনের মধ্যে যদি একতার ছবি ফুটে ওঠে থাকে তাহলে আপনাদের ভয় করবার কিছু নেই।

আপনারা সকলে মিলে যে আন্দোলন শুরু করেছেন তা ক্রমশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হোক, আমাদের দেশের লোকেরা জানুক আমাদের উপর কতটা দায়িত্ব রয়েছে। আমরা যেন অল্প দিনের মধ্যে বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারি,—যার ফলে প্রত্যেক শিশু, প্রত্যেক যুবক-যুবতী মানুষ হয়ে উঠতে পারে। আমরা যেন বুঝতে পারি যে, এই বর্তমান যুগে যেখানে আমরা জন্মেছি সেখানে অল্পশিক্ষায় ভীষণ বিপদ আছে।

আর আমার বিশেষ কিছু বলবার নেই। কারণ, কথা বলে যে সব সময় আমরা মনকে স্পর্শ করতে পারি তা ঠিক নয়। একজন লেখক বলেছিলেন যে, ভাষার কাজই হচ্ছে লোকের মনের ভাব গোপন রাখা। আমাদের দেশে একটা বিশ্বাস আছে যে পরস্পরের বিষয়ে যদি মনোযোগ সহকারে ভাবি তাহলে নিজের মন থেকে যে উত্তর নির্ভুল ইঙ্গিত দেয় তা আপনিই খুঁজে পাব। আমি তাই আশা করি যে আপনাদের আন্দোলন শেষ পর্যন্ত সর্বতোভাবে সাফল্য লাভ করবে।

বাংলা ভাষা চালুর ব্যাপারে

যাতে শিক্ষার সর্বস্তরে ও সর্ববিষয়ে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা একটা নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে প্রবর্তিত হয়, সেই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়-সংক্রান্ত আইনের প্রয়োজন হলে, সংশোধন করা দরকার।

এই উদ্দেশ্যকে সার্থক করতে হলে বাঙলায় পাঠ্যবই রচনার সুনির্দিষ্ট একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। পাঠ্যবই রচনার মেয়াদ আগে থেকে ঠিক করা থাকবে। সবার আগে সেই বিষয়গুলির উপর বই লেখা হবে, যা শিক্ষা করা হয় প্রধানতঃ প্রয়োগের প্রয়োজনে। এই বিষয়গুলির মধ্যে পড়ে আইন, চিকিৎসা ও যন্ত্রনির্ভর নানাপ্রকার প্রয়োগবিদ্যা। প্রয়োগবিদ্যার বিষয় নির্বাচনে আইন ও চিকিৎসাকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। এই দুটি বিষয় মানুষের সুস্থ ও নিরাপদভাবে জীবন যাপনের সহায়ক বলে অধিকাংশ মানুষের এই দুটি বিষয় সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসা স্বাভাবিক।

নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে পাঠ্যবই লেখা না হলে শিক্ষককে পাঠ্যবই-এর সাহায্য ছাড়াই বাঙলায় শিক্ষা দিতে হবে। কোন কারণেই এই নির্দিষ্ট তারিখ পিছিয়ে দেওয়া চলবে না। পাঠ্যবই শিক্ষার্থীর সুবিধার জন্য। শিক্ষার্থী এই সুবিধা না পেলে শিক্ষককেই সেই অভাব পূরণের জন্য সচেষ্ট হতে হবে।

এই প্রসঙ্গে পরিভাষা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা একটা অজুহাত হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরিভাষার প্রয়োজন ক্ষেত্র বিশেষে আছে, ঠিকই, তবে পরিভাষাকে নিমিত্ত করে শিক্ষা পরিকল্পনাকে স্থগিত রাখাও অনুচিত। গত দেড়শ বছর ধরে পরিভাষা রচনার চেষ্টা কম হয়নি। সে মূলধন নিয়েই আপাততঃ কাজে নেমে যাওয়া যেতে পারে। তাছাড়া পরিভাষার উপর যতটা গুরুত্ব আরোপ করা হয় তার আদৌ কোন যুক্তি আছে কিনা ভেবে দেখা দরকার। পরিভাষা অনেকটা নামধাতুর মত। তার ব্যুৎপত্তিগত অর্থের চেয়ে ব্যবহারিক অর্থই অধিক গণ্য। আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রয়োগবিদ্যা সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের অনেকাংশ পাশ্চাত্য দেশ থেকে নেওয়া। তারা বৈজ্ঞানিক তথ্য, যন্ত্র বা ধারণাকে যে নামে চিহ্নিত করছে, সেই তথ্য, যন্ত্র বা ধারণাকে আমরা সেই নাম-সমেত গ্রহণ করেছি। সেই নামের প্রতিশব্দ

সন্ধান করা অনেকটা টেলিফোনকে দূরভাষ যন্ত্র বলার মতই বাতুলতা। অপরের কাছ থেকে নেওয়া জিনিস অপরের দেওয়া নামেই ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। বাঙলাভাষায় বিভিন্ন বিদ্যার ও বৃত্তির নিয়মিত চর্চার ফলে বাঙলা পরিভাষা যথাকালে দেখা দেবে। ততদিন পর্যন্ত ইংরেজী পরিভাষাকে অন্ত্যজ জ্ঞান করার কোন কারণ নেই। শেষ পর্যন্ত প্রচলিত ইংরেজী পরিভাষা যদি বাঙলায় সাজবদল করে, তাতে বাঙলারই লাভ। কোন ভাষাই চারদিকে দেওয়াল তুলে সমৃদ্ধ হতে পারে না।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় যা বাঙলা ভাষাকে শিক্ষার সর্বস্তরের মাধ্যম হিসাবে স্বীকার করে নিয়েছে। ভেবে দেখা দরকার বাঙলা ভাষার সর্বতোপ্রয়োগের কাজে কতখানি সাহচর্য এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছ থেকে পাওয়া সম্ভব। যদি পাওয়া যায়, তাহলে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর কয়েকটি ভার অর্পণ করা যেতে পারে। আশা করা যায়, এই সব দায়িত্ব পালন করতে গেলে বিশ্ববিদ্যালয়টির চারুকলা সম্পর্কিত বর্তমান বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা ব্যাহত হবে না।

(ক) এই বিশ্ববিদ্যালয় যত শীঘ্র সম্ভব একটি অনুবাদ ফ্যাকাল্টি খুলবে। এই বিভাগে বিভিন্ন ভারতীয় ও অভারতীয়, প্রাচীন ও আধুনিক ভাষা থেকে নানা বিষয়ে বাঙলায় অনুবাদ করার রীতি ও পদ্ধতি শেখানো হবে। এই শিক্ষালাভের সুযোগ পাবে স্নাতকোত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীরা। এই পাঠক্রমে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী উপাধিলাভ করবে।

বর্তমানে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে ভাষাতত্ত্ব (linguistics) পড়ান হয়। এই বিদ্যায় পারদর্শী ছাত্রদের কর্মক্ষেত্র বর্তমানে খুবই সীমাবদ্ধ। এরা যাতে অনুবাদ চর্চায় পারদর্শিতা অর্জন করতে পারে, সেইজন্য স্নাতকোত্তর স্তরে বিশেষ জ্ঞানলাভের সুযোগ থাকা দরকার। রাজ্যের সর্বক্ষেত্রে বাঙলাভাষার যথোচিত মর্যাদালাভের সঙ্গে সঙ্গে অনুবাদে বিশেষজ্ঞ ভাষাবিদ্‌দের প্রয়োজন বাড়বে বলেই মনে হয়।

(খ) অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদ, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ করে এবং তাঁদের সক্রিয় সহযোগিতায় নানা বিষয়ে নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচী অনুযায়ী পাঠ্যবই রচনার দায়িত্ব থাকবে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে, যেমন বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ। পাঠ্যপুস্তক রচনা ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য ব্যাপারে

এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা লাভ বিশেষভাবে কাম্য, কারণ এই প্রতিষ্ঠান-গুলি নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে থেকেও বাঙলা ভাষায় জ্ঞানবিজ্ঞান অনুশীলন ও প্রচারের ব্রত একনিষ্ঠভাবে পালন করে চলেছে।

(গ) বিশ্ববিদ্যালয়টির অন্যতম নিয়মিত কাজ হবে বিভিন্ন বিদেশী ও ভারতীয় ভাষার নানা বিষয়ক ক্লাসিক গ্রন্থ অনুবাদ করা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশন বিভাগ থেকে সস্তা দামে সেগুলি প্রকাশ করা।

(ঘ) প্রয়োগ বিদ্যায় বাঙলা প্রচলনের প্রাথমিক প্রয়াস হিসেবে এই বিশ্ব-বিদ্যালয় আইন শিক্ষার একটি ফ্যাকাল্টি খুলবে। বাঙলা ভাষায় শিক্ষিত এখানকার আইনবিদরা এল. এল. বি উপাধিধারীদের সমমর্যাদা লাভ করবে, হাইকোর্টের বিশেষ বিজ্ঞপ্তি দ্বারা তা ঘোষণা করতে হবে। আদালতে বাঙলা প্রচলনের প্রয়াস সার্থক করতে হলে বাঙলায় আইন শিক্ষার প্রবর্তন একান্ত ভাবে দরকার। কারণ শিক্ষার্থী যে ভাষায় শিক্ষালাভ করে অধীত বিদ্যা প্রয়োগের সময় সেই ভাষাই ব্যবহার করে। অনেক সদিচ্ছা থাকা সত্বেও আমারা যে এখনও ইংরেজীর দায়ভার থেকে মুক্ত হতে পারছি না, তার মূল কারণও এই যে, আমাদের শিক্ষাকাণ্ডের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা ছিল ওই বিদেশী ভাষা।

(ঙ) বিভিন্ন মেডিকেল কলেজের অন্ততঃ একটির পরিচালনার ভার নেবে এই বিশ্ববিদ্যালয়, অবশ্য এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়টির আইনগত কোন বাধা থাকলে তা অপসারণ করবার ব্যবস্থা করতে হবে। ঐ মেডিকেল কলেজে চিকিৎসা বিদ্যা অধ্যয়ন ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে বাঙলা প্রচলনের দায়িত্ব থাকবে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের।

পরিশেষে বলা দরকার, শিক্ষাক্ষেত্রে মাতৃভাষা প্রয়োগ ও প্রচলনের এই প্রয়াসটি একান্তভাবে শিক্ষা বিভাগের দায় ও দায়িত্ব বলে গণ্য না করলে এবং সরকারী ও বেসরকারী দৈনন্দিন ব্যবহারের ব্যাপক ক্ষেত্রে বাঙলা ভাষাকে যথোচিত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠার জন্যে সচেতনভাবে একই সঙ্গে চেষ্টা না করলে, শিক্ষাক্ষেত্রেও তেমন কোন পরিবর্তন আনা সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। শিক্ষার্থী যদি তার পারিপার্শ্বিক জগতে নিয়ত দেখে যে ইংরেজীনবীশের বাজার দর বাঙলানবীশের তুলনায় অনেকগুণ বেশী, তাহলে ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে, সে বা তার অভিভাবকরা ইংরেজীর দিকে ঝুঁকবেই, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। পারিপার্শ্বিকের এই প্রতিকূল ও বিভ্রান্তিকর প্রভাবকে দূর না করা অবধি মাতৃ-ভাষায় সর্বাঙ্গীণ শিক্ষার উপযোগী ক্ষেত্র প্রস্তুত হবে না। অতএব উপযুক্ত

পরিবেশ সৃষ্টির জন্যে সচেতন প্রয়াস করতে হবে এবং সরকার-প্রণোদিত না হলে, সে প্রয়াস সার্থকও হবে না। অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্যে সরকারের তরফ থেকে কয়েকটি ব্যবস্থা অবলম্বন করা একান্ত দরকার ঃ

(ক) সরকারী ভাষা আইন অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি প্রচার করে, সরকার প্রশাসনিক দপ্তরগুলির সব স্তরে যেন জানিয়ে দেন যে, একটি নির্দিষ্ট তারিখের পর বাঙলায় ছাড়া অন্যভাবে বক্তব্য পেশ করলে তা গ্রাহ্য করা হবে না। এই সঙ্গে সরকার যেন হাইকোর্টকে অনুরোধ করেন, যাতে তাঁরা আপাততঃ মফঃস্বল স্তরের আদালতের সব কাজকর্ম বাঙলায় চালাবার অনুমতি দেন।

(খ) রাজ্য পাবলিক সার্ভিস কমিশনে বাঙলায় পরীক্ষা গ্রহণ প্রবর্তন করার নির্দেশ দিতে হবে।

(গ) রাজ্যে বেসরকারী সওদাগরী ও অনুরূপ প্রতিষ্ঠানের আভ্যন্তরিক কার্যকলাপের ক্ষেত্রে বাঙলার প্রাধান্য যাতে সুরক্ষিত হয়, তার জন্যে যথাবিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(ঘ) আইন প্রণয়ণ করে সমস্ত সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশ দিতে হবে তারা যেন একটি নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে প্রতিষ্ঠানের পরিচয় জ্ঞাপক সাইনবোর্ড, নোটিশ, প্রচারপত্র ইত্যাদি বাঙলায় রূপান্তরিত করে। অন্য ভাষা যদি রাখতে হয় সেই ভাষা বাঙলারপরে থাকবে। এই আইনের প্রাথমিক প্রয়োগক্ষেত্র হবে কলিকাতা।

(ঙ) রজ্যের প্রচার দপ্তর থেকে বাঙলা গ্রহণের সপক্ষে নিয়মিত প্রচার চালাতে হবে। এই কাজে আকাশবাণীর পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন কেন্দ্রগুলিকেও নিয়োগ করতে হবে।

(চ) দেখা যাচ্ছে শিক্ষাক্ষেত্রে মাতৃভাষা প্রচলনের প্রয়াসের সঙ্গে আনুষঙ্গিকভাবে আরও অনেক কিছু কর্তব্য জড়িত এবং সেই সব কর্তব্য প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষা বিভাগের আওতায় আসে না। শিক্ষার সঙ্গে সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্ন ক্ষেত্রের ভাষাগত সামঞ্জস্য বিধানের জন্য এবং ভাষা সংক্রান্ত কার্যকলাপে সম্পূর্ণরূপে ব্যাপৃত থাকার জন্যে একটি স্বতন্ত্র সংস্থা বা কমিশনের প্রয়োজন। এই সংস্থা বা কমিশন এমনভাবে গঠিত হবে যাতে তা কোন একটি সরকারী বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকবে না, অথচ সরকারের সকল বিভাগে ও বেসরকারী সব মহলে বাঙালা ভাষা প্রচলন করার জন্যে প্রয়োজনীয় নির্দেশ ও উপদেশ দিতে পারবে।

বাঙ্গলার শিক্ষা সমস্যা ও আশুতোষ

আমাদের বাঙ্গলাদেশ বরাবরই শাসকদের শিরঃপীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। পুরানো ইতিহাসের কথা বাদ দেওয়া যাক, ইংরাজ আমলেও শাসক ও শাসিতদের মধ্যে দ্বন্দ্বের অন্ত ছিল না। দেশবাসীর লাঞ্ছনা ও নির্যাতনের কথায় সে সময়কার ইতিহাসের পাতা ভর্তি। স্বদেশীয়ানার উন্মেষ অন্যান্য প্রদেশ থেকে বহু আগেই এখানে হয়েছিল। বর্তমান যুগের উপযোগী শিক্ষা ও শাসন প্রথা প্রবর্তন করতে চাইতেন এ-দেশের মনীষীরা। তবে দুঃখের বিষয় সে বিষয়ে মতের ঐক্য হোত না। দলাদলি-বিবাদ-বিসম্বাদ লেগে ছিল সব সময়। আজ বিদেশীর হাত থেকে রাজদণ্ড খসে পড়েছে। এখন আমারা বাস করছি গণতন্ত্রের যুগে—শাসকের তাড়ন, নির্যাতন নেই। তবু বাংলার সুদিন এখনও আসেনি। নানা দুঃখের বোঝা মাথায় করে বাঙ্গালী চলেছে। আজও ভাবনার অন্ত নেই, ঝগড়াঝাটিরও শেষ নেই। ইংরাজ রাজত্বের শুরু থেকেই, সমাজ, ধর্ম শিক্ষার আদর্শ ও মাধ্যম এ সবই ছিল বাঙ্গলার মনীষিদের ভাবনার বিষয়। কেউ কেউ প্রাচীন শাস্ত্র থেকে চয়ন করে তত্ত্ব কথা শুনোচ্ছেন, আবার অদ্ভুতকর্মা, কেউ কেউ চাচ্ছেন নিজের মনের মত সমাজনীতি বা শিক্ষাদীক্ষার প্রবর্তন করতে। ধর্মের কথাও বাদ যাচ্ছে না। সকলের টানাটানিতে এ দেশে জগন্নাথের রথ কতদূর এগিয়েছে তার হিসাব মাঝে মাঝে করা দরকার। স্যর আশুতোষের জন্মশতবর্ষ পূর্তির সময়, তাঁকেই স্মরণ করে, যে কটি কথা শিক্ষার বিষয়ে মনে জাগছে তাই প্রবন্ধে বলবার চেষ্টা করব। স্থিতিস্থাপকতা বোধ হয় প্রাচীন জাতির সমাজের একটা বিশেষ ধর্ম। আন্দোলনের উৎসাহে কতক পথ এক মুখে চলবার পর, তার মধ্যেই বিপরীত দিকে গড়িয়ে আসার প্রবৃত্তি প্রকাশ পায়। এই টানা-পড়েনের মধ্যে কোন স্থায়ী পরিবর্তন ধরে রাখা শক্ত ; শেষ অবধি ভাগ্যদেবতাই জানেন মানবসভ্যতার পটে বাঙালী কি মূর্তিতে অঙ্কিত থাকবে।

স্যর আশুতোষের জন্মেরও বহু আগের কথা ভাবা যাক। তখনই শিক্ষা নিয়ে বাগবিতণ্ডা বহুবার তুমুল আকার নিয়েছিল। খ্রীষ্টীয় পাদরীরা, রামমোহন বা রাধাকান্ত দেব চেয়েছিলেন প্রতীচ্যের শিক্ষা এদেশে চালাতে, তার ঠাণ্ডা হাওয়ায়

বহু শত বৎসরের ঘুমের ঘোর যেন কেটে যায়। সাবেকী পন্থীদের কাছ থেকে বাধাও এসেছিল প্রচুর। এক সময়ে বাংলা ভাষার মাধ্যমে পশ্চিমী জ্ঞানবিজ্ঞানও চালাবার চেষ্টা হয়েছিল। অবশ্য এ সবই বিশ্ববিদ্যালয় খোলার আগের কথা। প্রতীচ্য দেশের ইংরাজী শিক্ষা ও আচারের উন্মাদিনী মদিরা দিশী হাঁড়িতে ঢালার ফলে যে অমৃত-গরল পাত্র ছাপিয়ে দেশে প্লাবনের ভয় দেখিয়েছিল, তা' শেষ অবধি সমাজের অন্তর-তলে বেশী দূর পৌঁছতে পারেনি। অবশ্য কিছু লোক খৃষ্টান হল। হিন্দু কলেজের ছেলেরা ব্রাহ্মণের টিকি কেটে নিষিদ্ধ খাদ্য খেয়ে দেশের মধ্যে হুলুস্থূল বাধাবার চেষ্টা করলে। তবে শেষ পর্যন্ত এই বীরাচারীরা অনেকেই উত্তেজনার অবসান হ'লে বাংলা মায়ের কোলে যখন ফিরে এসেছিল তখন ছুঁৎমার্গীরা সমাজের কোলে তাদের কোন স্থান দেয় নাই। উন্মার্গে চলতে চলতে নানা কণ্টক ক্ষতবিক্ষত করেছিল তাদের শরীর। তবে কখনও কখনও সেই সব কণ্টকই গোলাপে রূপান্তরিত হয়ে বাঙ্গলার সাহিত্য-বাগিচায় অপূর্ব বাহার দিয়েছে। মধুসূদনের কথা মনে পড়বে ও তার শেষ আশা ও আকাঙ্খা—"রেখো মা দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে" ইত্যাদি।

আবার বিজ্ঞানী রাধানাথ শিকদারকে দেশ হয়ত মনে রাখে নি। হিন্দু কলেজের মেধাবী ছাত্র। গণিতে অসামান্য দক্ষতা ছিল তাঁর। তিনিই নাকি সর্ব প্রথম এভারেষ্ট গিরিচূড়ার অনন্যসাধারণ উচ্চতা নিরূপণ করেছিলেন! তাঁর প্রবর্তিত হিসাব ও গণনা পদ্ধতি সরকারী জরীপ বিভাগে চলত। রাধানাথ ভাবতেন প্রতীচ্য দেশের লোকে সংখ্যায় অল্প হয়েও কি করে পৃথিবীর সর্বত্র আজকাল রাজত্ব করছে? শেষ অবধি ভাবলেন, সুতীব্র খাদ্যরসের কল্যাণেই এ আমোঘ বীর্য তারা সংগ্রহ করছে। তাই দিশী দৈনিক আহারের নিয়ম পাল্টাতে চাইলেন ও তার ফল নিজের মধ্যে অনুভব করতে চাইলেন, নিজেকে সেই পরীক্ষার জীব বানিয়ে। ইনিও দেখি ডেরাডুন থেকে বাংলায় ফিরে এসে চাইছেন নিরক্ষরতা দূর করতে। বাংলায় লিখছেন বইও প্রবন্ধ, যা' পড়ে দেশের ছেলেমেয়েরা একালের উপযোগী মনোভাব অর্জন করতে পারে।

এ রকম মাতামাতির পর বাঙ্গালী অনেকটা ঠাণ্ডা হয়ে পড়ল। ইংরাজ শাসকেরা তখন ভাবছেন, তাঁদের প্রধান কর্তব্য হল ইংরাজী শিক্ষা মধ্যবিত্তদের মধেই সীমিত রাখা। এরাই তো সরকারী দপ্তরে চাকরী খুঁজবে। সমাজের অন্য স্তরের লোকেরা নিজেরাই ভাবুক নিজেদের সমস্যার কথা, যেভাবে চলতে চায় চলুক। ফলে

গঙ্গানদীর উভয় তীরে বিলাতী শিক্ষার জন্য সুযোগের কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। তাতে এগিয়ে এলেন ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্যকুল। মুসলমান বেশির ভাগ মাদ্রাসা ও মক্তব ঘিরে বসে রইল। ব্রাহ্মণেরা আবার টোলের শিক্ষাও বজায় রাখতে চাইলেন। এঁরা ইংরাজী শিখতেন জাত বাঁচিয়ে (যেমন ভুদেব মুখোপাধ্যায়) এবং মাথা গুণলে তাঁরাই বেশি হবেন। স্বর্ণলতার গদাধরচন্দ্রের মত "দুধ ও তামাকে"র উপর এঁদের সমান প্রীতি। সদর ও অন্দর মহল এইভাবে আলাদা রইল বেশির ভাগ বাঙ্গালীর ঘরে।

সেই সময় উপরের কোটার শিক্ষিত বাঙ্গালী নিজেকে ছোট সাহেবের পর্যায়ে বসিয়েছে। দেশ বিদেশে চলেছে ইংরাজী প্রভুর সঙ্গে, তবে সেখানকার সাবেকী লোকদের থেকে নিজেকে তফাৎ রাখে, তাদের সঙ্গে মিশতে চায় না।

এমন সময় সিপাহী বিদ্রোহ ঘটল। সংঘর্ষ ও অশান্তির কালোছায়া সারা দেশের উপর বিছিয়ে পড়ল। বাঙ্গলাদেশে প্রথমে একটু গোলমাল হলেও ঝঞ্ঝার দাপট বেশি করে পড়ল উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে। শেষ অবধি অবশ্য ইংরাজ জিতল। বৃদ্ধ দিল্লীর বাদশাহ বন্দী হলেন। তাঁর পুত্র আর পৌত্রের মৃতদেহ খুনী দরওয়াজার সামনে লুটিয়ে পড়ল। ঝান্সী গেল, নানা সাহেব নিরুদ্দেশ হলেন। জেতারা নৃশংসভাবে প্রতিশোধ নিয়ে চলল; গ্রামে গ্রামে জোয়ান ছেলেদের সারি গাছে লটকাতে লাগল—যাতে ভারতবাসী বৃটিশ সিংহের পরাক্রম ও নির্মম প্রতিহিংসার কথা যুগ যুগ ধরে মনে রাখে।

তবে ইংরাজ বুদ্ধিমান জাতি। এদেশের লোককে ভোলান যে সহজ তা তারা জানত। তাই শীঘ্রই কোম্পানীর নাম খারিজ করে খাতায় লিখলে মহারানীর নাম। মহিমময়ী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার শাসন এদেশে শুরু হল। তাঁর নামে বিজ্ঞপ্তির প্রচার হল, তাতে মিষ্টি কথার ছড়াছড়ি। এ-দেশের উকীল ও শিক্ষিত সমাজ ধরে নিলে এটি তাদের ম্যাগনাকার্টা। ইংলণ্ডের ইতিহাস তাদের কণ্ঠস্থ। ভাবলে, সবুরে মেওয়া ফলবে। আগে একদল ইংরাজ বলতো এ-দেশের যারা চাকরী করবে না, তাদের শিক্ষার জন্য কোম্পানীর ভাবার কি দরকার। ১৮৬১ সালে সবে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবর্তন করে রাজপ্রতিনিধি (Canning) কিন্তু বললেন —এ নীতি ঠিক নয়, এর ফল অত্যন্ত সর্বনেশে ও ক্ষতিকর হতে পারে (হয়ত সিপাহী বিদ্রোহের সময় নানা স্থানের জমিদার ও বর্গাদারদের বিশ্বাসঘাতকতার

গল্প তখনও তাঁর মনে তাজা রয়েছে)। বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্চ থেকে রাজপ্রতিনিধি বলে চলেছেন—"আশা হয় ইংরাজ এখন শিখেছে যে, প্রতিদান হিসাবে তারও ভারতকে কিছু দেবার আছে ; তারা যদি চায় এ-দেশবাসীকে বন্ধুত্বের জন্য হাত এগিয়ে দিতে তা হলে প্রতীচ্যের অর্থাৎ তাদেরই ঘরোয়ানা শিক্ষার কিছু অংশ এ-দেশের অধিবাসীদের বেঁটে দেওয়া তাদের কর্তব্য। তাই বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্তন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যাদুবলে কোন সুফল পাব আশা করছি না। তবে আমি ভাবছি, অনেক বৎসর গড়িয়ে গেলে, আজ যে সম্মান আমি বিতরণ করছি—তা এ-দেশের ভদ্রলোকেরা খুবই আগ্রহের সঙ্গে নিজেরাই খুঁজবেন। এগুলি বলছি 'খেতাব' কেন না পরে নিজের চেষ্টায় অর্জন করার উচ্চাভিলাষেরও লক্ষ্য হবে এগুলি সব বড়লোকদের, যারা শুধু চাকুরীই খোঁজে না।"

(১৯১৭ সালে সমাবর্তনে সর্বাধিকারীর ভাষণ থেকে অনূদিত)

এইভাবে কলকাতার বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হল। "সিপাহীবিদ্রোহ দমনের পিঠপিঠই, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা।" আশুতোষের মতে, "বৃটিশ জাতির মনের উদারতা ঠাণ্ডা মাথা ও যা ধরে তাই করার সাহস ও কর্মশক্তির চিরস্থায়ী স্মৃতিস্তম্ভ হয়ে বিরাজ করবে", আবার "ইউরোপীয় শিক্ষা আমাদের জনগণের মধ্যে বিস্তারের কাজে এরা বিফলকাম হয় নি, বৃটিশদের কাজ আমাদের দেশে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা নয় ; সঙ্গে সঙ্গে এদেশে সভ্যতার মান বৃদ্ধি তারা কর্তব্য হিসাবে করে চলেছে। আর শিক্ষাবিস্তার ছাড়া বেশী সভ্য করা যায়—এ অতি অশ্রদ্ধেয় কথা।" অবশ্য এই কাজে সরকার বেশী পয়সা খরচ করতে চাইলেন না। কলেজ স্কুল যেমন চলছিল চলল। বিশ্ববিদ্যালয় নিজে শিক্ষাদানের ঝক্কি নিলেন না। লর্ড ক্যানিং-এর নির্দেশ মতো তক্‌মা বিতরণ চলল সমাবর্তন সভায়। কী মাতৃভাষা, কী প্রাচ্যবিদ্যা কারোরই কদর নেই সেখানে ; তক্‌মার জন্য বিজ্ঞানশিক্ষারও বেশী দরকার নেই। তবে ইংরাজী বুক্‌নি কে কত ভাল কাটতে পারে, তারই প্রতিযোগিতা এখানে। কিছুদিন বাদে আবার স্যর হেনরী মেইন বলছেন "উত্তর প্রদেশের দুই হাইকোর্টের প্রবীণ জজ আমরা। নিজেরাই সময় সময় অপ্রস্তুত হই এ-দেশী ছোকরা সহকারীদের ভাষার উৎকর্ষ ও দৌড় দেখে। তাই বাড়িয়ে বলছি না, এরা তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসছে, শীঘ্রই ইউরোপীয় মনে পৌঁছে যাবে। নবীন জজেরা তাই এখনো বিদেশী ভাষার দৌড় দেখাবার মোহ কাটিয়ে উঠেন নি। তাদের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। দেশীয় অধ্যাপকেরা আজও অনেক সময় ভাবেন ইংরাজী ভাল লিখলেই হয়ত তাঁদের

ভঙ্গুর থিয়োরীর শক্ত ঠেক্‌নো দিতে পারলেন। অর্থাৎ "ইংরাজী যেই দেখা" অমনি তাঁর কথার সারগর্ভতা হালবিলাতী-জজেরা মেনে নেবেন। তাই ইংরাজী চলল ও দেশ উকীল-হাকিমে ভরে গেল। সকলেই নথি নজীর দেখিয়ে তর্ক-করা বিদ্যাটা আয়ত্ত করে ফেললেন। কংগ্রেসের সৃষ্টি হল। নানা প্রদেশের শিক্ষিত লোক একত্র হয়ে মহারাণীর বিজ্ঞপ্তিকে নজীর খাড়া করে চাইতে শুরু করলেন "Home Rule"। জনসাধারণ থেকে দূরে সরে চললেন দেশের শিক্ষিত লোকেরা ইংরাজের প্রদর্শিত পথে, এই পথেই যে পরমার্থ লাভ হবে তখন ইংরাজী-নবিশরা সকলে বিশ্বাস করতেন। যখন এ-বিষয়ে সন্দেহে প্রকাশ করে একদল জাতীয়তা-বাদী, শিক্ষার রীতি আমূল পরিবর্তন করতে চাইলেন, তখনও রাজনীতিবিদ্ নরম-পন্থীদের মুখপাত্র হয়ে এক সমাবর্তন সভায় আশুতোষ বলেছিলেন ছাত্রদের—"তোমরা প্রতীচ্যের সভ্যতা প্রাচ্য মানবের কাছে বুঝাবার অধিকারী হয়েছ—কত বড় গর্বের কথা। সর্বকিছু শেখো, হজম করো পশ্চিমের দর্শন, বিজ্ঞান—আবার সেগুলি দেশবাসীদের জানাও, যারা তোমাদের মত ইংরাজী শিক্ষার সুযোগ পায় নাই। তা বলে দেশের ভাবনা ধারণাকে অবজ্ঞা করো না—দেশাত্মবোধ ভুলো না। নিজেরা পরিশ্রম করে মাতৃভাষার চর্চা করো (বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন মাতৃভাষা শিক্ষা চালু হয় নি) কারণ যে রত্ন তোমরা শিক্ষাক্ষেত্রে সংগ্রহ করছ, মাতৃভাষার মাধ্যমেই তা তোমার দেশবাসীদের সকলকে দিতে পারবে।" এইভাবে শিক্ষিত দেশবাসীদের মধ্যে প্রায় সকলেই ভাবতেন। এমন সময় এলেন বড়লাট লর্ড কার্জন। বিদেশী যুবক বাদশাহীতক্তে বসে মনে করলেন, তিনিই ভারতে বিধাতার নির্বাচিত নবী। ইংলণ্ডে খাস আমীর-সন্তানদের কলেজে লেখাপড়া শিখে এসেছেন—এ-দেশের "কলেজ স্কোয়ার" মার্কা বিদ্যার প্রতি কৃপাকটাক্ষে তাকালেন। বসালেন এ-দেশে শিক্ষার মানের উন্নতির জন্য কমিশন। আবার ভাবলেন, বাংলা সুবাই যত নষ্টের নীড়। সুদূর বিস্তৃত বলে একে সায়েস্তা করায় অনেক অসুবিধা, তাই শাসনকার্যে সৌকর্যের জন্য বাংলাদেশকে দু'ভাগ করতে উদ্যত হলেন। কার্যত করেও ফেললেন। জবরদস্ত লাট কারো কথাই শুনলেন না। বাংলায় তুমুল আন্দোলনের ঢেউ উঠল। চিন্তাশীল লোকেরা নতুন করে ভাবতে শুরু করলেন "কেন এমন হল!" এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন 'ব্যাধি ও তার প্রতিকার' প্রবন্ধে—"কিছুকাল হইতে বাংলাদেশের মনটা বঙ্গবিভাগ উপলক্ষে খুবই একটা নাড়া পাইয়াছে। এইবার প্রথম দেশের লোক একটা কথা খুব স্পষ্ট

করিয়া বুঝিয়াছে, আমরা যতই গভীরভাবে বেদনা পাই না কেন সে বেদনার বেগ আমাদের গবর্মেণ্টের নাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাকে কিছুমাত্র বিচলিত করিতে পারে না। গবর্মেণ্ট আমাদের হইতে যে কতদূর পর—তাহা আমাদের দেশের সর্বসাধারণ ইতিপূর্বে এমন স্পষ্ট করিয়া কোনদিন বুঝিতে পারে নাই। কর্তৃপক্ষ সমস্ত দেশের লোকের চিত্তকে এমন কঠোর ঔদ্ধত্যের সহিত অবজ্ঞা করিতে পারিল কোন্ সাহসে, এই প্রশ্ন আমাদের মনকে কিছুকাল হইতে কেবলি পীড়িত করিয়াছে, * * * রাষ্ট্রনীতি কি দেশের সমুদায় লোককে একেবারে নগণ্য করিয়া চলিতে পারে? যখন দেখি পারে, তখন মনের মধ্যে শুধু অপমানের ব্যথা নয় একটা আতঙ্ক জাগিয়া উঠে।" সারা দেশের লোক তাই প্রথমে স্বদেশী মন্ত্রের দিকে ঝুঁকে পড়ল। সুরেন্দ্রনাথ-রবীন্দ্রনাথ-আশুচৌধুরী-হীরেনদত্ত-ব্রহ্মবান্ধব-বিপিন পাল ও আরও অনেকে। এঁরা সকলেই শাসকদের উপর বিশ্বাস হারিয়েছেন। তাই নানা জায়গায় সভাসমিতি হতে লাগল, বিদেশী কাপড়ের সম্ভার পুড়িয়ে স্বদেশী-যজ্ঞে আহুতি দেওয়া হল। ৩০শে আশ্বিন (১৬ই অক্টোবর ১৯০৫) প্রথম রাখীবন্ধন ব্রত উদ্‌যাপন হল। বাংলার ছেলেমেয়ে স্বদেশী-মন্ত্র "ভাই ভাই এক ঠাঁই, ভেদ নাই ভেদ নাই" পড়ে পরস্পরের হাতে রাখী বেঁধে দিলে। এ-দিনের কিছু আগেই (১৯০৪) ভারত বিশ্ববিদ্যালয়-সক্রান্ত নতুন আইন পাশ হয়ে গেছে। কিভাবে চালু করতে হবে এ নববিধান, তার জন্য বাছাই করা সভ্য নিয়ে একটা সভা বসছে। এইখানে আশুতোষ প্রথমে বাংলার শিক্ষাগগনে উদিত হলেন। চিন্তাশীল ও কৃতবিদ্য তিনি অল্প-বয়সেই গণিতে মৌলিক প্রবন্ধ লিখে যশস্বী হয়েছেন। ১৯২৪-এ তাঁর স্মৃতিকীর্তন করতে প্রফেসার গণেশ প্রসাদ লিখেছেন, "আশুতোষের প্রবন্ধগুলি দেখে মনে হয় অনেক দামী তথ্য আবিষ্কার করতে পারতেন তিনি শুদ্ধ গণিতের ক্ষেত্রে, তবে তাঁকে ঠিক রাস্তা দেখাবার লোক কেউ ছিল না এ-দেশে। ইংলণ্ডেই লোকেরা গণিতজ্ঞেরা, এ-বিষয়ের (যা নিয়ে আশুতোষ ভাবতেন) প্রধান কথাগুলি (ইউরোপীয় মহাদেশে অবশ্য ১৮৫৯ সাল থেকেই চালু ছিল) অনেক পরেই জানতে পেরেছিলেন। গণেশ প্রসাদ আরও বললেন যে, ভাস্করাচার্যের পরেই আশুতোষকে বলতে হবে প্রথম ভারতীয় যিনি গণিতের অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে প্রবেশ করে সত্যকারের মৌলিক অবদান রেখে গেছেন। অবশ্য শেষ অবধি আশুতোষ আইনের দিকেই ঝুঁকলেন। হলেন আইনের D. L (১৮৯৪)ঃ ও (১৯০৪) সালে দেখি তিনি হাইকোর্টের জজ।

কিছুদিন মৌলিক গবেষণা তাঁর খুব ভাল লেগেছিল। মহেন্দ্রলালের প্রতিষ্ঠিত 'বিজ্ঞানসভায়' তাঁকে নিজের কাজ নিয়ে বক্তৃতা দিতে দেখেছি। আবার গ্রীকদের পদানুসরণ করে লিখেছেন, বৃত্তাভাস, পরাবোল ও অতিবোলের তত্ত্বকথা (Conic Section)—যা বহুদিন এ-দেশের পাঠ্যপুস্তক হিসাবে চলত। তবে অল্পবয়সেই গণিতের সংকীর্ণ-গণ্ডী কাটিয়ে প্রবেশ করেছেন দেশের বিধানসভায় (১৮৯৯ থেকে)। অবশ্য ১৮৮৯ থেকে হয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো। বুদ্ধিমত্তায়, বাগ্মিতায়, সংস্কার সভায় সহযোগিতা ও বিচক্ষণভাবে অংশগ্রহণ করে তিনি সরকারী মহলের বিশ্বাস অর্জন করেছেন। লর্ড কার্জন তারিফ করলেন তাঁর দেশসেবার ঐকান্তিকতা। শেষ অবধি ১৯০৬ সালে তাঁর উপর ভার পড়ল নতুন আইন চালু করতে। তখনও কর্মবিধি সুনির্দিষ্ট হয় নি। কার্জন চলে গেলেন, তার পরে এলেন লর্ড মিণ্টো। এঁরও আশুতোষের উপর ছিল অগাধ বিশ্বাস। ভাইস-চ্যানসেলর হিসাবে ১৯০৬ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাগ্যনিয়ন্তা হয়ে বসলেন। এ-দেশে তখন "স্বদেশী" আন্দোলনের পুরো জোয়ার। প্রথিতনামা ও চিন্তাশীল দেশনায়কদের অনেকেই শিক্ষার আমূল পরিবর্তন করতে চাইলেন, তাঁরা বললেন, দেশের শিক্ষার ভার দেশবাসীর হাতেই থাকা উচিত। শিক্ষার মধ্যে থাকবে একদিকে যেমন জীবন, দর্শন ও আদর্শের কথা, অন্যদিকে প্রতীচ্যের ইতিহাস, সাহিত্য ও দর্শন এবং এসব বিষয়ে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সমন্বয়ের কাহিনী। দেশের বস্তুসম্পদ যাতে বৃদ্ধি পায় এবং লোকের অভাব ও দারিদ্র্য দূর হয়, তার জন্য চাই প্রতীচ্য বিজ্ঞান ও শিল্পশিক্ষার যথারীতি প্রবর্তন ও উন্নতিকরণ এবং সর্বোপরি মাতৃভাষার মাধ্যমে যাতে শিক্ষাদান সুগম হয় তারই ব্যবস্থা করা। সে সময় নতুন বিধি চালু হবার আগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসব কিছুই সম্ভব ছিল না, তা সকলেই স্বীকার করবেন। কাজেই নেতারা বললেন—"বিশ্ববিদ্যালয় —'গোলামখানা', এখানে দাসত্বভাবই ভাল করে শিক্ষা দেওয়া হয়। ইংরাজ শাসকদের উপর আমাদের বিশ্বাস একেবারে চলে গিয়েছে। আমরা নিজেরাই আমাদের মনের মত জাতীয় বিদ্যালয় ও জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গড়ে তুলব। ছেলেদের পাঠাব দেশ-বিদেশে—জার্মানী, জাপান কিংবা আমেরিকায়। তারা বিদেশ থেকে কৃতবিদ্য হয়ে এসে দেশের শিল্প গড়ে তুলবে ও বলিষ্ঠ আত্ম-নির্ভরশীল জাতি গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করবে।"

দেশের আত্মসম্মান বজায় রাখবার জন্য এইভাবে প্রতিষ্ঠিত রাজশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ

ঘোষণা করা হল। .আশুতোষ স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিলেন না বরং এই প্রবল প্রতিকূল আন্দোলনের বিরূদ্ধে অসমসাহসিকতার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার হয়ে বসে রইলেন। তাঁর মনোভাব ও চিন্তাধারার একটা সুন্দর ছবি পাওয়া যায় তাঁর সমাবর্তন উৎসবগুলির ভাষণ থেকে—যেমন ১৯১৪ সালের ভাষণে তিনি বলেছেন, কেন এই বিরাট দায়িত্বপূর্ণ ও বিপদ্‌সঙ্কুল কাজে তিনি নেমেছিলেন ৮ বৎসর আগে। তিনি বলেছেন—"এই ভাইস-চ্যানসেলরী যে শুধু অসাধারণ লম্বা সময় ধরে করতে হয়েছে তাই নয়, আমাকে যে গুরুভার ও দায়িত্ব বইতে হয়েছে তা সত্যই এর আগে কখনও কাউকে কাঁধে করতে হয় নি। যখন কাজ নিলাম তখন নতুন কর্মপদ্ধতিই নির্দিষ্ট হয় নি। অনেক মাস ধরে বহু বিচক্ষণ সহ-কর্মীদের সাহায্যে যখন কর্মধারা একটা রূপ পেল তখন এলো আরও দায়িত্বপূর্ণ ও শক্ত কাজ। নিয়ম যা তৈরি হল, সেই অনুসরণ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবন পুন-র্গঠন করা। এই কাজ হাতে নিতে হয়ত বহু সাহসী ও উচ্চাভিলাষী লোকের হৃদ্‌কম্প হত এবং হয়ত অনেকে ভাবতেন তাঁরা এই রাস্তায় নামবেন কি না। গুরুত্বের সব দিকগুলি বিশদ্‌ভাবে ব্যক্ত করার দরকার নেই। তবু আমার ভরসা ছিল নিজের ক্ষমতার উপর। ওই সঙ্গীন সময়ে কর্ণধার হবার ডাক পেয়ে এটা একটা মস্ত সম্মান ভেবেই আমি আনন্দের সঙ্গে এগিয়ে এসেছিলাম। তা ছাড়া সারাজীবন ভেবে এসেছি আমার জ্ঞানপ্রদায়িনী মা-র (Alma Mater) জন্য চিরস্থায়ী কিছু করতে পারব—তার ছবি আমার কল্পনাকে উত্তেজিত ও আমাকে মুগ্ধ করত। বাধা যতই বেশী ঠেকত কাজের স্পৃহা ও মনের বল ততই বেশী হত। এ কাজে বহু বন্ধুর উৎসাহ ও সহানুভূতি পেয়েছি এতদিন। পরের পর চ্যান্সেলর ও রেক্টর মহোদয়দের প্রশংসা অর্জন ও বিশ্বাস উপভোগ করেছি। তা ছাড়া আর একটা জিনিস অবশ্যই মনে ছিল—যাকে বলা যায় প্রতিদ্বন্দ্বী ও প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে বিপদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আনন্দ।' এইভাবে ইংরাজ সরকার আশুতোষের মত আদর্শবাদী কর্মবীরকে নিজেদের দলে টানতে পেরেছিলেন।

প্রথমবার ১৯০৬ থেকে ১৯১৪ আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের কাণ্ডারী হয়ে রইলেন। এই কয় বৎসর নানা সমাবর্তন উৎসবে যেসব ভাষণ দিয়েছেন—তার মধ্যে তাঁর শিক্ষার আদর্শ ও কল্পনার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি ভাবলেন, এই ভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার করে, একে তাড়াতাড়ি নতুন পথে এগিয়ে দিতে পারলে দেশে নতুন যুগ আনতে পারবেন। এবং এইভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি দেশের

শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ফিরে আসবে। কাজের প্রথম বৎসরে, দেশে আন্দোলন পুরাদমে চলছে। আশুতোষ ১৯০৭ সালের ভাষণে বলছেন, "অবশ্য হয়ত দেরী হবে (উপযুক্ত) প্রফেসর পেতে, আর খুব অল্প সংখ্যক রীডার বা লেক্‌চারার পাওয়া যাবে এখন—তবু নতুন আইনের তাৎপর্য ও আদর্শ খুব উচ্চমানের। এখন থেকে বিশ্ববিদ্যালয় তক্‌মা বিলোবার পরীক্ষাশালা মাত্র নয়, এমন কি শুধু কলেজগুলির সমষ্টিমাত্রও নয়। এরা তো সব থাকবেই তা ছাড়া আরও অনেক বেশী কিছু নতুন ধরনের করতে হবে। জ্ঞানচর্চা ও জ্ঞানের পরিধি প্রসার করার কেন্দ্র হয়ে উঠবে এটি। এই-ই সত্য আদর্শ বিশ্ববিদ্যালয়ের। অবশ্য আদর্শকে সজীব রাখতে, ও লক্ষ্যে পৌঁছতে পথে অনেক বাধা থাকতে পারে। তবু এটি অবশ্যকর্তব্য ও কার্যত অসাধ্য নয়। * * * তবে বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুসন্ধান যদি যথেষ্ট পরিমাণে না হয়, প্রচুর পরিমাণ উপযুক্ত কৃতী কর্মী যদি না পাওয়া যায়, যাঁরা সব বিষয়ে গবেষণা করার ক্ষমতা রাখেন—তা হলে অবশ্য কিছুতেই বলা চলবে না বিশ্ববিদ্যালয় আদর্শের নিকটবর্তী হতে চলেছে। অবশ্য এর জন্য প্রচুর অর্থ খরচ করা চাই—সে টাকা দেবেন হয় গবর্মেণ্ট, নয় দেশের বড়লোক। অনেক নতুন কাজ করতে হবে। কলেজগুলির সংস্কার, স্কুলগুলির পুনর্গঠন, শিক্ষাপদ্ধতির আমূল পরিবর্তন। জ্ঞান যাতে সত্যই শিক্ষার্থীর কাজে পৌঁছায় তার যথাযোগ্য ব্যবস্থা করতে হবে। তাদের বুদ্ধির উন্নতিমাত্র নয়—নৈতিক ও স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে। এ কাজে সেনেট-সভ্যদের সক্রির সহযোগ চাই এবং এ-দেশে যাঁরা চান শিক্ষার ঢঙ ও মান উন্নত করতে, তাঁদেরও সহযোগিতা দরকার।" আবার বিশেষ করে ছাত্রদের বলেছেন "ইংলণ্ডের ভারতবর্ষের প্রতি যে প্রীতির সম্পর্ক রয়েছে ও ভারত ইংলণ্ডের কাছে যে দাবী করতে পারে বিশ্বস্ত প্রতিনিধি হয়ে তোমারই সেই কথাবর্তা চালাবার যোগ্য। এইভাবে অবিশ্বাস ও মনোমালিন্য দূর কর ও বিশ্বাসের আলো দেশে আনো। সব বিষয়ে সাবধানী হয়ো, বেশী বাড়াবাড়ি করো না। যত্ন করে তলিয়ে বুঝতে চেষ্টা করো সব কথা। তোমাদের কল্পনাপ্রবণতার কাছে আবেগপূর্ণ আবেদন আরাম-দায়ক বা সুবিধাজনক বলেই সেটি মেনে নিও না। আবার নেতৃস্থানীয়দের জবরদস্তিতেও টলো না। যাচাই কঠোরভাবেই করো—যা যুক্তির বিচারে পাশ করে তাই মেনে নিও।" অন্যদিকে যুদ্ধে জাতীয়তাবাদীরা হঠতে শুরু করেছেন। ছাত্র-অভাবে জাতীয় বিদ্যালয়গুলি উঠে গেল, জাতীয় শিক্ষা পরিষদের

পরিকল্পনাকে কার্যকরী করার প্রধান বাধা দাঁড়াল উপযুক্ত শিক্ষক ও ছাত্রের অভাব।

এদিকে আশুতোষ এগিয়ে চলেছেন। লাইব্রেরী করার জন্য দারভাঙ্গার মহারাজা দিলেন ২½ লক্ষ টাকা, ছেলেদের শিল্পকলা শিখতে, ইউরোপ আমেরিকা জাপান পাঠাতে গুরুপ্রসন্ন ঘোষ দিলেন ২½ লক্ষ। রীডারবা বক্তৃতা শুরু করলেন, থিবো বললেন, প্রাচীন-প্রাচ্যের জ্যোতিষচর্চা। সুস্টর (Sehuster) বললেন, বর্তমানের পদার্থ বিজ্ঞানে প্রগতি। আবার কোশাম্বী পালি পড়াচ্ছেন। সত্যব্রত সমাশ্রমী বেদ রামাবতার শর্মা বেদান্তের কথা। স্নাতকোত্তর বৃত্তির ব্যবস্থা হল বারটি, ৩২ টাকা করে। চিকিৎসাবিজ্ঞানে অনুসন্ধানের উৎসাহ দিতে, হল দারভাঙ্গা প্রাইজ। সরকার একটা প্রফেসরের খরচ দেবেন। এদিকে কলেজ-স্কুলগুলিতে সংস্কারের কাজ চলেছে। প্রায় ৫০টা কলেজ, স্কুলসংখ্যা ৬ শ'র উপর। নতুনভাবে শিক্ষার জন্য, বেশীরভাগ ক্ষেত্রে কোন সুবন্দোবস্ত নেই। না ভাল শিক্ষক, না বই বা বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতি। গবর্মেণ্ট কলেজেরও দুরবস্থা, প্রচুর টাকার দরকার সর্বত্র। আশুতোষ প্রেসিডেন্সী কলেজকে ভয় দেখাচ্ছেন—সুব্যবস্থা না হলে ছেলে পড়াবার অনুমতি উঠিয়ে নেওয়া হবে। নৈতিক শিক্ষার বিষয়ে বলছেন, এগুলি অভিভাবকদের হাতে ছেড়ে দেওয়াই ভাল। তবে চরিত্র গঠনের জন্য হিন্দু ও মুসলমান দুই জাতির পুরাণ বই থেকে পাঠ দেওয়াই বেশী কার্যকরী হবে, তার মধ্যে উদাহরণ পাবে তারা—সত্যশুদ্ধি, ঔদার্য, আত্মোৎসর্গ, কৃতজ্ঞতা, গুরুভক্তি, কর্তব্য-নিষ্ঠা, পাতিব্রত্য, সন্তানস্নেহ, রাজভক্তি। প্রতিপক্ষ চেয়েছিলেন বিপুলভাবে সংস্কার করতে শিক্ষার ক্ষেত্রে, মাতৃভাষার মাধ্যমে জানবিজ্ঞান শেখাতে। সমালোচনা করেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে শেখান'র পদ্ধতির। আশুতোষ এক সমাবর্তনে তাঁদের উত্তর দিচ্ছেন। "আমি মনে করি আমাদের দেশে শিক্ষানীতির গোড়াকার কথা হল ইউরোপীয় জ্ঞানসম্ভার ঘরে তুলতে হবে ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে, প্রতীচ্যের খোলা-গেট দিয়েই ঢুকবে জ্ঞানের আলো। পূর্বদিকের জানলার ঝিলিমিলি দিয়ে নয়। এই মতের বিরুদ্ধে গভীর আপত্তি তুলেছেন এখন অনেক শিক্ষিত, ভদ্র ও উচ্চপদস্থ লোক—এর অবশ্য বিচার হওয়া উচিৎ। তবে লাট-সাহেব যা বলেছেন তারপর আমার পুরানো কথার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই। যখন সরকার শিক্ষার কথা অবহেলা করতেন তখন তো মাদ্রাসা ও সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হয়েছিল। তখন রামমোহন রায় ও ডেভিড হেয়ার

বলেছিলেন শিক্ষাদীক্ষা উদারভাবে পরিবেশন করতে, ইংরাজী ভাষার চাবিকাধি দিয়ে বিদেশী সাহিত্য ও জ্ঞানের ভাণ্ডার খুলতে হবে। নব ইঙ্গ ও সাবেকী পণ্ডিতের ঝগড়া তো ১৮৩৫ সালেই শেষ হয়েছে! উচ্চাঙ্গ শিক্ষা পরিবেশনের স্কীমের উপর মেকলে সাহেব ও লাট বেণ্টিক সাদর সম্মতির শীলমোহর মেরে দিয়েছেন—যারা উচ্চাঙ্গের শিক্ষা চায় তাদের রীতিমত ভাল করে ইংরাজী ভাষা শিখতে হবেই। তা ছাড়া আর এক নজীর হল, উড সাহেবের Education Despatch, যাকে লাট ডেলহাউসীই বলেছেন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টরা যা ভাবতে পারত বা লিখত তার থেকে এটি অনেক বেশী তথ্যপূর্ণ ও উদার। এটি তো আমরা বলছি ভারতীয় উচ্চশিক্ষার চার্টার। সম্প্রতি রব উঠেছে যে এই Despatch এর মধ্যে ভয়ঙ্কর ভুল রয়ে গিয়েছে। আমি জোর করেই বলছি, এতে ভুলও হয়নি আবার কোন বিপদের আশঙ্কা নেই। ইংরাজ আমাদের দেশের ভালই করে চলেছে। ইলবার্ট নেপিয়র ইত্যাদি সকলের বক্তৃতা ভাল করে প্রণিধান করলেই বোঝা যাবে।”

এইভাবে স্বদেশীওয়ালাদের দাবী, হাইকোর্টের বিচরাপতি শুধু নথী নজিরের সাহায্যেই ডিস্‌মিস্ করে দিলেন। আশুতোষ প্রথম থেকে চাইছেন এদেশের ছেলেদের নিজের দলে রাখতে। গ্র্যাজুয়েটদের উৎসাহ দেবার জন্য বিজ্ঞানী ও লব্ধ-প্রতিষ্ঠ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিদের নাম কলকাতার খাতায় সম্মানিত উপাধি দিয়ে লিখলেন বিশ্ববিদ্যালয়-স্থাপনের জুবিলী উৎসবের বৎসরে। ছেলেদের বললেন, “যে-কর্তৃত্ব দেশে প্রতিষ্ঠিত তার কথা মনে প্রাণে শোনার অভ্যাসের চর্চা করো। পৃথিবীতে প্রচার করো তোমরা শান্তির নায়ক। (এদিকে ১৯০৯ সালে আলিপুরে বোমার মামলা রুজু হয়ে গিয়েছে) সরকারের প্রতি আনুগত্যে এবং দেশের মূল্যবান নাগরিক হিসাবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করে তোমরা দেখাও পৃথিবীর সকলকে যে, তোমাদের শিক্ষা যত গভীর হয়েছে তোমাদের মনে ইংরাজ শাসকদের প্রতি আকর্ষণও তত গভীর হয়েছে।” অন্যদিকে জাতীয়তাবাদীদের দলের মধ্যে ভাঙ্গন ধরল। যারা নতুন পথে জগন্নাথের রথকে ঘুরোতে চেয়েছিলেন তাঁরাই হতাশ ও ভগ্নমনোরথ হয়ে পড়লেন। এক পক্ষের প্রতিভূ রবীন্দ্রনাথ, যাঁর মাতৃভাষার জন্য আবেদন আশুতোষ ডিস্‌মিস্ করলেন। তিনি লিখছেন, ‘সশস্ত্র ও নিরস্ত্র উভয় প্রকার যুদ্ধেই নিজের শক্তি ও দলবল বিচার করিতে হয়। আস্ফালন করাকেই যুদ্ধ করা বলে না। আমরা যখন দেশের পলিটিক্যাল বক্তৃতা সভায় তাল ঠুকিয়া

দাঁড়াইলাম, বলিলাম আমাদের লড়াই শুরু হইল, তখন আমরা নিজের অস্ত্রশস্ত্র দল বলের কোন হিসাবই লই নাই। তাহার প্রধান কারণ আমরা দেশকে যে যতই ভালবাসি না কেন, দেশকে ঠিকমত কেহ কোনদিন জানি না !" আবার, "যখন কাঁদিয়া কাটিয়া কর্তাদের আসন তিলমাত্র নড়াইতে পারিলাম না, তখন বয়কটের যুদ্ধ ঘোষণা করিলাম—তখন কি আমরা ঠাহরাইয়াছিলাম যুদ্ধ কেবল একপক্ষ হইতেই চলিবে—অপরপক্ষ অস্ত্র ধরিবে না একথা মনে করিয়া যুদ্ধে নামা একটা কৌতুকের ব্যাপার—এখন দেখিতেছি আমরা সেই আশাই মনে রাখিয়াছিলাম। ইংরাজের ধৈর্যের উপর ইংরাজ আইনের উপরই আমাদের সম্পূর্ণ ভরসা ছিল—নিজের শক্তির উপর নয়। (নরমপন্থী মনোভাবের বিশ্লেষণ)

"যুদ্ধের প্রারম্ভে আমরা বিপক্ষকে ভুল বুঝিয়াছিলাম আত্মপক্ষকে যে ঠিক বুঝি নাই, সে কথাও স্বীকার করিতে হইবে। আজ আমরা সকলে এই বলিয়া আক্ষেপ করিতেছি—ইংরাজ গোপনে মুসলমানদিগকে হিন্দুর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া দিতেছে। কথাটি যদি সত্যই হয় তবে ইংরাজের বিরুদ্ধে রাগ করিব কেন ? দেশের মধ্যে যতগুলি সুযোগ আছে ইংরাজ তাহা নিজের দিকে টানিবে না, ইংরাজকে আমরা এতবড় নির্বোধ বলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিব, এমন কী কারণ ঘটিয়াছে।

"মুসলমানকে যে হিন্দুর বিরুদ্ধে লাগানো যাইতে পারে এই তথ্যটাই ভাবিয়া দেখিবার বিষয়, কে লাগাইল সেটা তত গুরুতর বিষয় নয়। শনি তো ছিদ্র না পাইলে প্রবেশ করিতে পারে না, অতএব শনির চেয়ে ছিদ্র সম্বন্ধেই সাবধান হইতে হইবে। আমাদের মধ্যে যেখানে পাপ আছে সেখানে শত্রু জোর করিবেই। আজ যদি না করে তো কাল করিবে—এক শত্রু যদি না করে তো অন্য শত্রু করিবে। শত্রুকে দোষ না দিয়া পাপকেই ধিক্কার দিতে হয়। হিন্দু-মুসলমানের সম্বন্ধ লইয়া আমাদের দেশে একটা পাপ আছে। অভ্যস্ত পাপের সম্বন্ধে আমাদের চৈতন্য থাকে না, এই জন্য সেই শয়তান যখন উগ্রমূর্তি ধরিয়া উঠে তখন সেটাকে মঙ্গল বলিয়া জানিতে হইবে।"

পরে কবির সতর্কবাণী ক'টি উদ্ধৃত করিবার লোভ সামলাইতে পারিলাম না— "যাহারা নিজেকেই নিজে খণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে, ঐক্যনীতি অপেক্ষা ভেদবুদ্ধি যাহাদের বেশী—দৈন্য অপমান ও অধীনতার হাত হইতে তাহারা কোনদিন নিষ্কৃতি পাইবে না। বিদেশী রাজা চলিয়া গেলেই দেশ যে আমাদের স্বদেশ হইয়া

উঠিবে তাহা নহে। দেশকে আপন চেষ্টায় আপন দেশ বলিয়া গড়িয়া তুলিতে হয়—আজ আমাদের ইংরাজী-পড়া শহরের লোক যখন নিরক্ষর গ্রামের লোককে বলে আমরা উভয়ে 'ভাই' তখন এই ভাই কথাটির মানে সে বেচারা কিছুই বুঝিতে পারে না। করিতে হইবে কী? আর কিছু না স্বদেশের সম্বন্ধে স্বদেশীর যে দায়িত্ব আছে তাহা সর্বসাধারণের কাছে স্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষ করিয়া তুলিতে হইবে। পুরাতন দলই হউন, আর নতুন দলই হউন, যিনি পারেন একটা কাজের আয়োজন করুন। প্রমাণ করুন যে দেশের ভার তাহারা লইতে পারেন। দেশের সমস্ত সামর্থ্যকে একত্রে টানিয়া যদি তাহাকে একটা কলেবর দান না করিতে পারি, যদি সেইখান হইতে স্বচেষ্টায় দেশের অন্নবস্ত্র, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার একটা সুবিহিত ব্যবস্থা করিরা তোলা আমাদের সকল দলের পক্ষে অসম্ভব হয়, যদি আমাদের কোন প্রকার কর্মনীতি ও কর্ম্মসংকল্প না থাকে তো আজিকার এই আস্ফালন কাল আমাদিগকে নিষ্ফল অবসাদের মধ্যে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিবে। যদি সকলে মিলিয়া একটা কাজের আয়োজন গড়িয়া তুলিবার শক্তি আজও আমাদের না হইয়া থাকে, তবে আমাদিগকে নিভৃতে নিঃশব্দে ব্যক্তিগত চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে।"

স্বদেশীয়ানার জাহাজ বানচাল হতে বসল, কংগ্রেস ভেঙ্গে গেল। দেশের মধ্যে দলাদলি যখন প্রবল আকার ধারণ করেছে তখন কবি নিজের মত এইভাবে ব্যক্ত করে শান্তি-নিকেতনে গঠনের কাজে মন দিলেন। আদর্শবাদী ছাত্রমহলেও দুটা ভাগ হয়ে গেল। একদল যে করেই হোক ইংরাজ-শাসন দূর করার জন্য বদ্ধ-পরিকর হলেন, স্বাধীনতা আগে চাই তাঁদের। এতে অন্য সব করণীয়, পরে সব সহজেই হয়ে যাবে। অন্যপক্ষ ভাবলেন, প্রতীচ্যের শিক্ষা নিজেরা আয়ত্ত করা যাক, বিশেষতঃ বিজ্ঞান ও শিল্পকলার ক্ষেত্রে ঃ তার মধ্য দিয়ে হয়ত মুক্তি না হোক দেশসেবার সুযোগ পাওয়া যাবে। এইভাবে আশুতোষের গঠনমূলক কার্যে প্রথম যে সব প্রতিবন্ধক ছিল তা দূর হয়ে গেল। বেশী ছেলেরা সঙ্গে রইল। আশুতোষ চাইলেন বিশ্ববিদ্যালয়কে সত্যই একটা উচ্চশিক্ষার কেন্দ্রে রূপান্তরিত করতে। ঐতিহাসিক অনুসন্ধান, ভাষাতত্ত্ব, এই সব বিষয়ে কর্মী কিছু মিলল। গণিতের জন্য একটা প্রোফেসরী সরকারী টাকায় করতে পারলেন। কলেজ-গুলিও যথাসম্ভব বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতি জোগাড় করলে। দেশের অনেক শিক্ষায়তন ব্যক্তিবিশেষের নিজের চেষ্টাতেই গড়ে উঠেছিল। তাই অনেক ক্ষেত্রেই এসব সংস্থা

থেকে ব্যক্তিগত স্বার্থপ্রণোদিত দৃষ্টিভঙ্গী বা একনায়কত্ব বাদ দেওয়া চলত না। বিশ্ব-বিদ্যালয় এই পুরাতনী প্রথা লোপ করতে বদ্ধপরিকর হলেন। সব প্রতি-ষ্ঠানেই পরিচালক সমিতি গঠিত হতে লাগল। তাতে ঢুকলেন—শিক্ষকমণ্ডলী ও অভিভাবকদের প্রতিনিধিরা। উচ্চ শিক্ষার্থীদের সংখ্যা দ্রুত বাড়তে লাগল। বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষা মূলত পরীক্ষার্থীদের ফি থেকে চলে, পরীক্ষকদের ফি ইত্যাদি দিয়েও বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাগারে কিছু অর্থ সঞ্চিত হতে লাগল।

পূর্ববঙ্গে তখন ফুলারের লাটপনা চলছে। নানা জায়গায় ছেলেরা গণ্ডগোল করছে—কর্তার রোষ গিয়ে পড়ল স্কুলগুলির উপর। এসব প্রতিষ্ঠানকে জব্দ করতে সরকারী মহল চাইল বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষায় ছেলে পাঠানার অনুমতি পূর্ব থেকেই যেন সে সব স্কুল থেকে প্রত্যাহার করে নেয়। বিশ্ববিদ্যালয় সব সময়ে ইনস্পেক্টরের সুপারিশ গ্রহণ করত না। তাই ছোট ইংরাজ মহলে আশুতোষের প্রতিকূল দল একটা গড়ে উঠেছিল। আশুতোষ যখন বিশ্ববিদ্যালয়কে মাত্র পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে উচ্চশিক্ষা বিতরণের কেন্দ্রে রূপান্তরিত করতে চাইলেন ও আর্টসের অনেক বিষয়েই এম-এ শিক্ষার ক্লাস খুলে দিলেন—তখন তাঁকে অনেক বাধার সম্মুখীন হতে হল। বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুনভাবে দেশে শিক্ষার প্রবর্তন করতে চাইবার সময় একদল লোক বলেছিলেন, এ-ধরণের উচ্চশিক্ষা আয়ত্ত করা আমাদের ছেলেদের সাধ্যে কুলোবে না, কারণ বেশীর ভাগ স্কুলে শিক্ষার মান উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে অনেক নিম্নে থেকে গিয়েছে। আবার যখন ছাত্রসংখ্যা বিপুল-ভাবে বেড়ে উঠল, পাশের সংখ্যা আগেকার দিনের তুলনায় বহুগুণে বৃদ্ধি পেল তখন অনেকে বলতে লাগলেন—বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী পেতে আগেকার মত পরিশ্রম করতে হয় না, তাড়াতাড়ি উচ্চ শিক্ষিতদের সংখ্যা বাড়াবার চেষ্টা করতে গিয়ে নানাভাবে পরীক্ষার অবনতি ঘটছে।

১৯১২ সালে সমাবর্তন উৎসবে আশুতোষ কিভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার করতে চান, তার সম্বন্ধে বলছেন, "দেশের লোকে চাচ্ছে যে, বিশ্ববিদ্যালয় শুধু পরীক্ষার কাজে ব্যাপৃত না থেকে উচ্চশিক্ষার দিকে মনোনিবেশ করুক। আমি স্বীকার করছি দেশের এই দাবী যুক্তিসঙ্গত, তবে দেশের প্রয়োজন মেটাবার ইচ্ছা থাকলে আমাদের লক্ষ্য পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করে নির্দিষ্ট ও সুচিন্তিত পরিধির মধ্যে আমাদের চেষ্টাকে সীমিত রাখতে হবে। প্রতীচ্যের বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয় চিন্তা করলে দেখা যাবে সেখানকার প্রফেসররা যেমন একদিকে দেশের নানা

কাজের জন্য ছাত্রদের তৈরী করছেন বহুদিনের সঞ্চিত জ্ঞান বিতরণ করে, অন্য দিকে নিজেদের ছাত্রগোষ্ঠী নিয়ে গবেষণা করে নতুন নতুন আবিষ্কার করে বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারে মহামূল্য তথ্যরত্ন উপহার দিচ্ছেন। আমরা অবশ্য এখনো পশ্চিমী মানে উন্নত করতে পারিনি নিজেদের শিক্ষায়তনগুলিকে, সে তো ঠিক কথা। তবে যদি বলা হয় ওকাজ করা আমাদের সাধ্য নয়, তাহলে হয়ত ঠিক কথা বলা হবে না। কেন না এতদিন পর্যন্ত ওদিকে আমাদের লক্ষ্যই ছিল না। পুরাকালে ভারত নব নব ভাবধারার সৃজনের একটা প্রধান কেন্দ্র ছিল। সে কথা ভাবতেও আমরা গর্ব অনুভব করি এবং ভবিষতের উন্নতির উচ্চশা রাখার অনুপ্রেরণা পাই। তবে যাদের উপর দেশের প্রগতি ও জ্ঞানকেন্দ্রের পুনর্জন্ম ঘটান এতকাল নির্ভর করেছে তাঁরা তাঁদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সম্যকভাবে অবহিত ছিলেন না। এই দোষ থেকে মুক্ত হবার সময় এখন উপস্থিত। আমার মত আমার দেশবাসী অনেকে ভাবছেন তাঁদের মনের আকাঙ্ক্ষাই আমি ব্যক্ত করছি এখানে। আমি বিশেষ গর্ব ও আনন্দ অনুভব করছি যে, আমাদের বিচক্ষণ ও সহৃদয় সম্রাটও এই ধরণের কথা আমাদের অভিনন্দনের উত্তরে বলে গেছেন। আমরা স্থির করেছি তাঁর ভাষণ স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখবো। সম্রাট ঘোষণা করেছেন, আজকাল কোন বিশ্ব-বিদ্যালয়কেই পূর্ণাঙ্গ বলা যায় না, যেখানে কলা-সাহিত্য ও বিজ্ঞান শেখানর সুবিধা পূর্ণভাবে নেই—কিংবা যেখানে এই সবক্ষেত্রে অনুসন্ধানের উপযুক্ত সুযোগ মেলে না।”...“এই অভাব পূর্ণ করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে Arts Science-এ M.A. শিক্ষাদানের একটা খসড়া হাজির করেছি। এখন অনেকে অনেক কথা বলতে শুরু করেছেন। কেউ-বা বলছেন প্রাথমিক শিক্ষার সন্তোষজনক ব্যবস্থা না করে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার জন্য আর খরচ বাড়ান নিরর্থক হ'বে। এ-বিষয়ে আমার উত্তর, যদি ততদিন আমাদের অপেক্ষা করতে হয়, তবে উচ্চশিক্ষার উন্নতি করা কোন কালেই সম্ভব হবে না। এ দুটো সম্পূর্ণ আলাদা কথা। কেউ যদি বলেন স্কুল কলেজের শিক্ষার উন্নতি না করে এ কাজে হাত দেওয়া ভুল হবে—তা' হলে আমার একই উত্তর। ৫০ বৎসর ধরে আমরা বি এ এবং এম এ কলেজে পড়িয়ে এসেছি তার কি কোন ফলই হয় নি? বরঞ্চ স্বীকার করতে হবে কলেজে উচ্চ মানের অনেক ছাত্র এখন পাওয়া যাবে যারা উপযুক্ত চালক পেলে সর্বোচ্চ কাজের জন্য পরিশ্রম করতে প্রস্তুত। প্রতি বৎসরই Doctorate উপাধি লাভের জন্য বা Research Prize scholarship পাবার জন্য অনেক প্রবন্ধ আমরা পাচ্ছি,

তা থেকে বোঝা যায় আমাদের ছাত্রদের মধ্যে অনেকের অনুসন্ধানের ক্ষমতা প্রশংসার যোগ্য বলে যে কোন স্থানে বিবেচিত হবে। এদের বৃদ্ধি ও প্রেরণা দেবার জন্য উপযুক্ত প্রফেসর নিযুক্ত করা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কর্তব্য।"

ইতিমধ্যে স্যর তারকনাথ পালিতের কাছ থেকে ২ দফার প্রায় ১৪ লক্ষ টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষে এল। পালিত চাইলেন রসায়ন ও পদার্থবিদ্যার ২টি প্রফেসর বিশ্ববিদালয় ন্যাসের আয় থেকে নিযুক্ত করুন। তার আগে ২টি চেয়ারের জন্য সরকার থেকে টাকা পাওয়া গিয়েছিল। গণিতের হার্ডিঞ্জ চেয়ার ও সম্রাট পঞ্চম জর্জ চেয়ার দর্শনশাস্ত্রে। বিশ্ববিদ্যালয় নিজের অর্থ থেকে ভারতের প্রাচীন ইতিহাস ও কৃষ্টির চেয়ার-এ থিবোকে নিযুক্ত করলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে সেই বৎসর থেকে আর্টসের নানা বিষয়ে রীতিমত পড়ান শুরু হয়ে গেল। অনেক ছেলে ভিড় করলে ভর্তি হবার জন্য। কোন কোন বিষয়ে ছাত্র সংখ্যা এক শ'রও বেশী হয়ে দাঁড়াল। কেউ কেউ ইঙ্গিত করেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে এখন অবতীর্ণ হল। আশুতোষ বললেন, এটা বলা অন্যায় হবে—কারণ এত ছাত্র পড়তে আসছে তাদের সুযোগ দেবার জন্য বিভিন্ন কলেজে জায়গাই নেই। বললেন, এই ভাবেই আমরা জ্ঞান রাজ্যের প্রসার করে আমাদের আদর্শকে বাস্তবে পরিণত করতে চাইছি। তা ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস ঘর অনেক দরকার হবে, ও ল' কলেজ হস্টেলও দরকার। এই ভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন বাড়ি হল, ল' কলেজের হস্টেলও খোলা হল।

একদল বলতে শুরু করলে স্যর আশুতোষ শিক্ষার সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে নিজের একান্ত অধীন করতে চাইছেন। এম এ পড়ান আর গবেষণার জন্য তৈরী করা তো এক কথা নয়, যেসব যুবক এম এ পড়াতে লেগেছে, তাদের অভিজ্ঞতা নেই কিছু। তাই সিনেটেও বাধা দিতে তাঁরা বদ্ধপরিকর হলেন এবং সেই সময়ের আইন অনুসারে কোন নতুন দিকে পা বাড়াতে হলে চ্যান্সেলরের সম্মতি দরকার হতো। কলকাতা থেকে তখন বড়লাটের গদী চলে গিয়েছে, দিল্লী বা সিমলায় বসছে তাঁর দপ্তর। সাক্ষাৎ সম্পর্ক ঘুচে গিয়েছে। প্রতিকূল প্ররোচনা দেবার সুযোগও জুটল অন্য দলের। এদিকে পালিতের পরে স্যর রাসবিহারী ঘোষ এগিয়ে এলেন। প্রথমে দশ লক্ষ টাকা দিলেন শুদ্ধ ও ফলিত বিজ্ঞানের প্রফেসারী ও অনুসন্ধানের জন্য। পালিত ও রাসবিহারী ২জনেই স্বদেশী আন্দোলনে নেমে ছিলেন, পরে গঠনমূলক কাজে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ এগোতে পারল না দেখে একটু নিরাশ হয়ে

পড়েছিলেন। Bengal Technical Institute প্রথমে পালিতের বাড়ীতেই হয়েছিল। শেষে যখন মতে মিলল না, জাতীয় শিক্ষা পরিষদ অন্যত্র উঠে গেল ও সমস্ত সম্পত্তি চলে এলো আশুতোষের হাতে। আশুতোষ প্রথমে সাহিত্য-দর্শন ও আইন এই তিন শিক্ষার ব্যবস্থা করতে সমস্ত শক্তি ব্যয় করেছিলেন। বিজ্ঞানচর্চার প্রবর্তন অনেক ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। পালিতের দানকে ভিত্তি করে সরকারের কাছ থেকে চাচ্ছিলেন এই বিষয়ে অর্থানুকূল্য। সরকার বিজ্ঞান শিক্ষাকে সুনজরে দেখেননি। বাঙালী ছেলে বিজ্ঞান শিক্ষার অপব্যবহার করতে পারে এই আশংকা হয়ত শাসক মহলে ছিল। তার পর পালিতের ন্যাসের আয় থেকে যেসব প্রফেসর নিযুক্ত করবেন তাদের সকলকেই ভারতবর্ষীয় হতে হবে এই ছিল শর্ত এবং বিশ্ব-বিদ্যালয়ও ওই শর্ত রাজী হয়েছিলেন। বড়লাটের দপ্তর দিল্লী চলে গিয়েছে। নানা অপ্রিয়কর ঘটনার মধ্যে ও কলিকাতায় তাঁদের বিশ্বাসী পরামর্শদাতার নির্দেশে এই বিজ্ঞান শিক্ষা সরকারের অনেকদিন সমর্থন পায় নাই। শেষে আশুতোষকে সাহায্য করতে রাসবিহারী এগিয়ে এলেন। দুই দানবীরের সাহায্যে বিজ্ঞান শিক্ষার ভাণ্ডারে প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা জমল, আশুতোষ এবার বিজ্ঞান কলেজ গঠনের কাজে মনোনিবেশ করলেন। ২৭শে মার্চ ১৯১৪, ভিত্তি স্থাপন করতে গিয়ে আশুতোষ বলছেন, ১৫ই জুন ও ৮ই অক্টোবর, দুইবার স্যর তারকনাথের কাছ থেকে প্রায় ১৪ লাখ টাকা পাওয়া গেল। সিণ্ডিকেট (৩০শে ডিসেম্বর, ১৯১২) গভর্ণমেণ্টের কাছে চাইলেন মোটামুটি সমান টাকা, ভেবেছিলেন বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যার দাবী সরকার অবহেলা করতে পারবেন না। কিন্তু তা হল না, সরকারের সাড়া পাওয়া গেল না। ব্যথিত চিত্তে প্ল্যানের বিস্তার গোটাবার চেষ্টা করছেন এমন সময় একটি স্মরণীয় ঘটনা ঘটল। বোঝা গেল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজ খোলার সময় হয়েছে, আর বেশী দেরী হবে না। ৮ই আগষ্ট ১৯১৩ রাসবিহারী ঘোষ দান করেছেন ১০ লক্ষ টাকা। এবার বিশ্ববিদ্যালয় স্থির করেছেন নিজেদের জমান ফাণ্ড থেকে ৩ লক্ষ টাক্কা দেবেন এবং সঙ্গে ৪ঠা অক্টোবরে ভারত সরকারকে লেখা হল সাহায্য চেয়ে। উত্তর পেতে অনেক দেরী হল। পরে শোনা গেল যখন টাকা হাতে আসবে তখন অন্যান্য দাবীর সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রার্থনার বিষয় তাঁরা ভাববেন। যাঁরা বিজ্ঞান কলেজ স্থাপনের কাজে বেশী ঝুঁকেছিলেন তাঁরা এখন ব্যাপারটি বুঝতে পারলেন।

নিজের পায়েই দাঁড়াতে হবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে। তা ছাড়া নির্ভর

করতে হবে রাসবিহারী এবং তারকনাথের মত দাতার মহানুভবতার উপর, যাদের নাম ভবিষ্যতবংশীয়েরা বহু যুগ মনে রাখবে। পক্ষান্তরে অন্য সব লোকের নাম হয়ত এদেশের লোকে ভুলে যাবে, যাঁদের আজ আমরা তুষ্ট করবার জন্য 'মহাপুরুষ' বলে আখ্যা দিই। কলেজের ভিত্তিস্থাপনা হল। রসায়নের জন্য আসলেন প্রথমে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ও ডক্টর প্রফুল্ল মিত্র, পদার্থবিদ্যার জন্য নির্বাচিত হলেন চন্দ্রশেখর বেঙ্কটরামণ্ ও দেবেন্দ্রমোহন বসু। ফলিত গণিতে গণেশ প্রসাদ, বটানির চেয়ারে শঙ্কর পুরুষোত্তম আগরকার। আশুতোষ মনে মনে বিশ্বাস করতেন এই শিক্ষায়তন সহায় সম্বলের অভাবে উঠে যাবে না। বললেন, মাঝে মাঝে হয়ত বিদেশ থেকে যশস্বী বিজ্ঞানীদের আনাও সম্ভব হবে। যদিও ঘটনার বৈগুণ্যে গরিবিয়ানাভাবে এর পত্তন হল তবু আশা করা যায় যে, এর সক্রিয়তা অবিচ্ছিন্নভাবে বজায় থাকবে ও পুষ্টি ও প্রগতি অবাধে চলতে থাকবে। এইভাবে বিজ্ঞান বিভাগের কাজ আরম্ভ হল এবং আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে অবসর নিয়ে সায়েন্স কলেজে যোগদান করলেন। বড় রাস্তার ধারে তিনতলা বাড়ি উঠেছিল। তার মধ্যে প্রফুল্লচন্দ্র বসবাস করতে লাগলেন একটা ঘরে। দক্ষিণ দিকের অংশে অনুসন্ধানের কাজ শুরু হল। ডাঃ প্রফুল্ল মিত্রও তাঁর ছাত্রদের সঙ্গে কাজ আরম্ভ করলেন। রামণ সাহেব তখনও সরকারী কাজে ইস্তফা দেন নি। সকাল বিকাল অবসর মত তাঁর গবেষণা '২১০ বৌবাজার' ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনে হত।

১৯১৪ সালের সমাবর্তনে চ্যান্সেলর লর্ড হার্ডিঞ্জ এলেন না। ভাইস্-চ্যান্সেলরী থেকে সেইবার দীর্ঘ ৮ বৎসর পরিশ্রমের পর আশুতোষ অবসর গ্রহণ করেন। ইতিমধ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শাসনগণ্ডী অনেক সঙ্কুচিত হয়ে এসেছে, পাঞ্জাব ও এলাহাবাদ অঞ্চল অনেক আগে বেরিয়ে গিয়েছিল। পরে একে একে স্থাপিত হল পাটনা, ঢাকা, বর্মা, গৌহাটি—এখন এই প্রদেশের মধ্যেই হয়েছে যাদবপুর, বর্ধমান, কল্যাণী। দেবেন বসু ও আগরকর জার্মানীতে গেলেন অনুসন্ধানে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে। কিছু পরেই প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধ শুরু হল। দেবেন বসু ও আগরকর অন্তরীণ হয়ে জার্মানীতে রয়ে গেলেন প্রায় ৪ বৎসর। ১৯১৫ সালে নবীন একদল ছাত্র এম. এস. সি. পাশ করে স্যর আশুতোষকে ধরে বস্‌ল ; বললে, আপনি রসায়ন ছাড়া, গণিত ও পদার্থ-বিজ্ঞানেরও স্নাতকোত্তর ক্লাস খুলুন—আমরা সাধ্যমত পরিশ্রম করে আপনার এ চেষ্টা সফল করে তুলব। স্যর আশুতোষ মানুষ চিনতেন আর বাংলার নবীন্ ছাত্রের উপর তাঁর বিশ্বাস ছিল। তাই

নানা বাধা অতিক্রম করে বিশ্ববিদ্যালয়কে রাজী করালেন পদার্থ ও গণিতের ক্লাস খুলতে। প্রথমে যারা লেকচারার নিযুক্ত হয়েছিল পদার্থ-বিজ্ঞানে তাদের মধ্যে দুজন আবার রাজনৈতিক কারণে শেষ অবধি যোগ দিতে পারলেন না। ধরা পড়বার ভয়ে শৈলেন ঘোষ আমেরিকা পালিয়ে গেলেন, যতীন্দ্রমোহন শেঠ অন্তরীণ হ'লেন। তবুও শিক্ষার কাজ চলতে লাগল। ছেলে ছোকরারা সত্যই কি শিক্ষা ও অনুসন্ধানের আদর্শ বজায় রাখতে পারলেন! প্রতিপক্ষ কেউ কেউ আবিষ্কার করলেন মৌলিক গবেষণা বলে যে সব প্রবন্ধ ছাপা হ'চ্ছিল সেগুলি সব সময় লেখক নিজের দান বলে অন্যায় করে দাবী করছিলেন। এ বিষয়ে অনেক লেখালেখি শুরু হ'ল। আবার ইংরাজদের মধ্যে একদল ভাবতেন এ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মপন্থা হয়ত ঠিক-ভাবে নির্দিষ্ট হয়নি। তাছাড়া দেশে তখন নতুন নতুন বিশ্ববিদ্যালয় খোলার জল্পনা চলছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের নির্ভরযোগ্য মতামত পেতে নতুন এক কমিশন বসল। সভাপতি হয়ে এলেন মাইকেল স্যাডলার ও বৃটেনের নানা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের লব্ধপ্রতিষ্ঠিত অধ্যাপক। এই কমিশনে স্যর আশুতোষও সভ্য হলেন। কমিশন শেষ অবধি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর ক্লাস খোলার পুরো-সমর্থন করলেন। কয়েক শত পৃষ্ঠাব্যাপী তাঁদের মত ছাপা হ'ল—যেটা ভারতবর্ষে প্রামাণ্য শিক্ষা সম্বন্ধীয় নির্দেশ বলে স্বীকৃত হয়েছে। আশুতোষের কর্মপন্থার যৌক্তিকতা পূর্ণভাবে সমর্থিত হ'ল। কিছুদিন ধরে পোস্ট গ্রাজুয়েট কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট হয়ে আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর ক্লাশগুলির প্রগতি নিয়ন্ত্রিত করতে লাগলেন। রাসবিহারী ঘোষ দিলেন ফলিত বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য আরও যোল লক্ষ টাকা। নবীন শিক্ষকেরা নানা ভাবে চেষ্টা করতে লাগল জ্ঞানের জগতে কলকাতার নাম প্রতিষ্ঠিত করতে। আশুতোষ এদিকে বহুদিন থেকে কলকাতার অন্যান্য বৈজ্ঞানিক ও অনুসন্ধানের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন।

এসিয়াটিক সোসাইটির ৪দফা সভাপতি হয়েছিলেন। কলকাতা ম্যাথেমেটিকাল সোসাইটি তাঁর উৎসাহে স্থাপিত হয়েছিল (১৯০৮)। ১৯১৪ সালে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হ'ল। আশুতোষও এর প্রথম প্রেসিডেন্ট ছিলেন। কলকাতায় এক সমাবর্তন উৎসবে স্যর আশুতোষ গর্ব করে বলেছিলেন—দেশে নানা বিশ্ববিদ্যালয় হতে চলেছে। কলকাতা মহানগরী আর ভারতের বড়লাটের পীঠস্থান থাকবে না, বাঙ্গালী আর হয়ত সব বিষয়ে দেশের সব কাজে প্রথন স্থান নিতে পারবে না, তবু বাঙ্গালী হয়ত শিক্ষা ক্ষেত্রে চিরকাল নিজের প্রাধান্য বজায়

রাখতে পারবে। এই ছিল তাঁর কাম্য ও তাঁর স্বপ্ন। এরই জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে শিক্ষা ও গবেষণার প্রধান কেন্দ্র করতে তিনি জীবন উৎসর্গ করেছিলেন ও সর্বশক্তি নিয়োজিত করেছিলেন।

১৯২০ সালে অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হ'ল। নেতারা আবার চাইলেন ছেলেরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে আন্দোলনে যোগ দেয়। এতদিন অন্য অন্য অনেকে ভাইস-চান্সেলর হয়েছেন। সরকার শেষ অবধি বুঝেছিলেন ছাত্র মহলের আশুতোষের উপর পুরো বিশ্বাস আছে। তাই আবার ১৯২১ সালে দুই লাটই আশুতোষকে অনুরোধ করলেন ভাইস চ্যান্সেলর হ'তে। পরের দুই বৎসর আশুতোষকে দেখি আবার ভাইস-চ্যান্সেলর হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের দপ্তরে বসেছেন।

এর পরে (১৯২০) বিজ্ঞানের ও সুকুমার কলার জন্য আরও ৫½ লাখ টাকা দান পাওয়া গেল খয়রা পরিবার থেকে। ১৯২৩ সালে হাইকোর্টের জজিয়তী থেকে অবসর গ্রহণ করে, আশুতোষ মনে করেছিলেন তাঁর সর্বশক্তি শিক্ষার কাজে নিয়োগ করবেন। কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্য তাঁর সে ইচ্ছা পূর্ণ হল না। ২৫শে মে ১৯২৪ হঠাৎ তাঁর তিরোধান ঘটল। তারপর প্রায় চল্লিশ বৎসর কেটে গিয়েছে। ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে। পাশ্চাত্য শিক্ষা-শুরুর সময় ছিল সারা ভারতে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়—এখন গুণতিতে বোধ হয় চল্লিশ ছাড়িয়ে গিয়েছে। স্যর আশুতোষের মহান আদর্শ সামনে রেখে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় চলবার চেষ্টা করেছে। তিনি যা দেখে গিয়েছিলেন, মোটামুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসার সেইরূপই রয়েছে। কর্মক্ষেত্র হয়তো আরও সংকীর্ণ হয়ে এসেছে। পরিবর্তনও হয়েছে অল্প স্বল্প, জাতীয়তাবাদীরা চেয়েছিলেন মাতৃ-ভাষার মাধ্যমে বাংলাদেশে শিক্ষার আয়োজন করতে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশস্ত আসরে মাতৃভাষাকে এক কোণে স্থান দিলেও আশুতোষ চেয়েছিলেন ইংরাজীই উচ্চশিক্ষার বাহন থাকুক। আমি নিজে মনে করি এখন এ ধারা পরিবর্তন করা নিতান্ত দরকার, এর জন্য আমাদের দেশের শিক্ষার জয়যাত্রা ব্যাহত হয়েছে। অবশ্য কিছুদূর পর্যন্ত বাংলা ভাষা চললেও উচ্চক্লাসে ইংরাজী এখনও চলছে। ভবিষ্যতের কথা কে বলতে পারে ?

নঈ তালীম

২৪ আগস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসব হয়ে গেল। জাতীয় অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বক্তৃতা দিলেন।

মোদ্দা কথা আমরা এতকাল যেভাবে লেখাপড়া শিখেছি—তা শত বৎসরে নানাভাবে পোড় খেয়ে একেবারে অপূর্ব কার্যকর কল বলে প্রতিপন্ন হয়েছে ; সে যুগের মনীষিদের নাম বলে শেষ করা যায় না, যাঁরা এর মধ্য দিয়ে গিয়েছেন, মানুষ হয়েছেন। তা ছাড়া শেষ অবধি আমরাও তো আশুতোষের কারখানায় তৈয়ারী হয়েছি। এখনো চলেছি বেশ জোরের সঙ্গে ঃ স্কচ্ হুইস্কির বিজ্ঞাপন হিসাবে বেশ কায়েমী ও উগ্র মাল। সাত সমুদ্র জুড়ে ছিল বিশ্ববিশ্রুত বৃটিশ-সাম্রাজ্য তাও তো স্কচেরাই নিজের বুদ্ধিমত্তায় গড়ে তুলেছিল ও প্রাণ দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিল। কত সস্তায় এত বড় সাম্রাজ্য চলতো।

ভারতবর্ষেও সরকারী কর্মচারী তৈয়ারী করার যে কল বসেছিল তা মজবুৎ বটে। এতকাল তো টিকে গেল। আজও I.A.S. সব পয়দা করে চলেছে ভালভাবেই। তাই সেটা নিয়ে নাড়াচাড়া করে বিগড়ে দেওয়া নিতান্ত অর্বাচীন হনুমত্তার পরিচায়ক দাঁড়াবে।

বলিহারী বক্তাকে, রবীন্দ্রনাথের মতও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বপক্ষে উদ্ধৃত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ইংরাজী জানলেও এ বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌকাট পার হন নি—আর যে স্টাইলে ইংরাজী লিখে গেছেন—তা বিশ্ববিদ্যালয় আদর্শ বলে প্রচার করবে না বোধ হয়। তা হলে এত শত ছেলে-মেয়ে ডাক্তার উপাধি পেয়ে বেরিয়ে আসতো না প্রতি বৎসর, যা দেখে অবাক হয়ে বসে রইলাম এবার।

নানাকথা ভাবতে ভাবতে বাড়ি ফিরেছি। বহু দিনের পরিচিত এক বন্ধু বসেছিলেন, তাঁকে বললাম, সুনীতিবাবুর কথা।

তিনি বললেন, ব্রাহ্মণের তেজ আছে, অনেক শক্ত কথা শুনিয়ে দিয়েছেন। হিন্দীওয়ালাদের আরও একটু খোলাখুলি বললেন না কেন, যে এ আজাদি ঝুটা হ্যায়। আমরা ভায়া, বৃটিশ সিংহের আওতায় ছিলাম ভাল—আমাদের জোয়ান

ছেলেরা পিকিংয়ে গিয়ে চীনাদের সমুচিত শিক্ষা দিয়েছিল—ভারতের আফিং বয়কট করার জন্যে। হায়! তে হি নো দিবসা গতা। তা না হলে কি চীনারা এসে আমাদের বেইজ্জত করে কয়েক বৎসর আগে। আমি তো চিরকাল বলে এসেছি—তিলক-অরবিন্দ-ক্ষুদিরাম-কানাই-রাসবিহারী-সুভাষ সব মিলে দেশটাকে ডুবিয়ে দিলেন, তা না হলে আজ এইভাবে কি আমরা মারা যেতে বসি। যদি অধ্যাপক বর্ণিত সৎ-সাহস আমাদের থাকে তো বিশ বিঘৎ নাক-খত দিয়ে আবার মহারাণীর শাসন চালু করো এ দেশে। দেখবে সোনার দর দেখতে দেখতে নেমে আসবে ২০ টাকা ভরি, আর চালের দর হবে ৪—৪॥। দেশহিতৈষণার নামে তো চলছে এখন ডামাডোল।

……যত দোকানদার

সব হলো লাট গবরনর! ছ্যা!

সমাবর্তনের ছাপান বক্তৃতা একখানা ভিক্ষা করে জোগাড় করে এনেছিলাম। পাতা ওলটাচ্ছি বিরস মনে। আমি তো সারা বাংলায় একমাত্র অপরাধী যে বলে আসছে বহু বৎসর—সব বিষয়ে সর্বত্র বাংলাভাষায় এ দেশে শিক্ষার প্রবর্তন করা ছাড়া আমাদের অন্য পন্থা নেই। কেমন, এবার সামনে চলছে কত ডিগ্রীধারীর সারি দেখে এলাম—তা ছাড়া শুনে এলাম সতেজ বক্তৃতা—যা এখনো কানে বাজচে।

ইংরাজী এখন আন্তর্জাতিক ভাষা হয়ে দাঁড়িয়েছে। একে এখন ত্যাগ করা কি চলে? যখন বিশেষ করে সব দেশেই ইংরাজীভাষা শেখান চালু হয়ে গিয়েছে তখন আমাদের দেশ থেকে কি করে ইংরাজী চলে যায়? সুদূর মঙ্গোলিয়ায় যাই নি—সেখানে বা আরমানিয়ায়—শাস্ত্রীর তাসখন্দে—চাই কি সোভিয়েট দেশেও হয়ত ইংরাজীভাষায় সব শেখান শুরু হয়ে গেছে। সে সব দেশের সাম্প্রতিক হালচাল বন্ধুবর তো স্বচক্ষে দেখে ফিরেছেন সেদিন।

আস্তে আস্তে ঘরে এসে ঢুকলেন অনেক বন্ধু—আমি সমাবর্তন থেকে ফিরছি শুনে জানতে চাইলেন—কি হ'লো? সকলেই উদ্‌গ্রীব, চট্টোপাধ্যায়ের মত কি? আমার হাত থেকে ভাষণ নিয়ে দেখে শুনে বললেন—অন্তত তিন ভাষা নিয়ে ঘর করতেই হবে দেখছি, তবে সংস্কৃতভাষা যদি সকলেই চায়, আর সে তো দেবভাষা—তাকে আমাদের জাতীয় ভাষা বলে চালিয়ে নিলেই তো হিন্দীর বিরুদ্ধে এত বিতণ্ডার অবসান ঘটে। ইস্রেল তো চালিয়ে দিয়েছে হিব্রু, আমাদের সংস্কৃত সুরে তার পাল্টা গাইলে ক্ষতি কি? রাজাজীর তো আপত্তি থাকবে না এই সমাধানে—

এখনো তো আমরা শঙ্কর-রামানুজ-বিদ্যারণ্য-রাধাকিষণ নিয়েই ঘর সাজাচ্চি—তারা তো সবাই দক্ষিণী—শুনেছি দক্ষিণী পণ্ডিতের মুখে আজও সংস্কৃতভাষা বেঁচে রয়েছে, তবে ডি-এম-কেরা কি বলবেন জানি না—স্বতন্ত্রবাদীদের অবশ্য আপত্তি থাকার কথা নয়।

এর উত্তরে একজন বলে উঠলেন—তোমরা আজ আছ কোথায় ভুলে যাচ্ছ। এখন সনাতনী বলে জাহির করলে লোকে বি-রূপ হবে। বাজারে নাম খারাপ হবে—এ যে প্রগতির যুগ! সব থেকে সোজা ইংরাজীভাষাকে মাতৃভাষা বলে মেনে নেওয়া—তাহলে আন্তর্জাতিক জগতে আমাদের প্রতিষ্ঠা সহজেই হবে। দেখা যাচ্ছে—হিন্দীওয়ালারাও তো সকলেই ইংরাজী-মাধ্যমে নিজেদের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা দেবার পক্ষপাতী—তাঁদের ঘরে-বাইরে ইংরাজী বুলি সকলেই আওড়াচ্ছে—কাজেই এতে কারোরই আপত্তি থাকা উচিত নয়। আমাদের মুসলমান ভ্রাতাদেরও তো এতে সম্মতি সহজেই মিলবে—যদিও তাদের ঘরকন্নায় এখনো হদিসের নির্দেশ মত বিকল্প চলে (মাঝে মাঝে)। আর এদিকে কুলীনের কুল প্রথম আইন করে বন্ধ করা হলো। অবশ্য ইংরাজী, দেশের সব স্তরে চালু করতে কতদিন লাগবে, জানি না। ইংরেজের দু'শত বছরে লোক আক্ষরিক করতে পেরেছি আমরা মাত্র গড়ে শতকরা ১৭৷২০ জন আরও ৪৷৫ শ' বছরে কাজটা অনেকটা এগোবে। ততদিন আমরাই গণতন্ত্র চালিয়ে নেব, উভয় পক্ষের ভালই হবে। আজকাল যেভাবে আমেরিকান মত জাহির হয়েছে বিশ্বের দরবারে—এদের প্রাধান্য চলবে নিশ্চয়ই বেকসুর ২৷৩ শ' বছর। তা ইউ-এফ বা ভিয়েৎনামীরা যাই বলুক। এই ফুরসতে আমরাও ও ভাষা শেখার কাজ কতকটা টেনে তুলবো। বাবা, এক ভাষা যদি মেনে নেওয়া যায় তো গরীব অভিভাবকেরা বাঁচে, কারণ চাল-ডালের সঙ্গে সঙ্গে ছেলে-মেয়েদের পড়ানোর খরচ তা বেড়েই চলেছে প্রতিদিন—বইয়ের বাজারও খুব গরম। এক ভাষার গণ্ডীতে সারা দেশকে পুরতে পারলেই তো এ সব ল্যাঠা মিটে যায়।

তা ছাড়া ভাব, হিন্দুদের বেদ-মহাভারত বা মুসলমানের কোরাণ তো ইংরাজীতেই আমরা তরজমা করেই পড়ি ও বুঝিও ভাল। এতে দেশের ঐতিহ্যের প্রতি কোন অবিচার করা হবে না।

প্রমথ চৌধুরী বলেছেন, ইংরাজী পুরুষালী ভাষা, কাজেই মহিলারা এতে আপত্তি করতে পারেন বলে মনে হয়েছিল। তবে, এবৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েদের কৃতিত্ব

দেখে সে দ্বিধা কেটে গেছে—তাঁরা তো হিউম্যানিটিসের সব বিষয়ে প্রথম স্থান সব অধিকার করে বসেছেন এই শুনে অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক অধ্যাপক বন্ধু বলে উঠলেন—ভালই হয় সব বিষয়ে ইংরাজী চললে। আর তরুণীর মন পেতে 'আই লাভ ইউ' বললে আবেগ প্রকাশ যতটা সহজ হয় 'তোমায় ভালবাসি' বললে এ জিনিস অনেক জলো ঠেকে তার কানে, মনে হবে বা বহুদিনের পুরনো নিধুবাবুর গানের প্রথম চরণের মামুলী পুনরুক্তি মাত্র।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ অধ্যাপক বন্ধু এতক্ষণ এই সব সংশোধনী মনোভাবের প্রগলভ ব্যাখ্যা চুপ করে বসে শুনছিলেন, শেষ কালে বললেন, তোমরা সুনীতিবাবুর কথা নিয়েই আলোচনা চালিয়েছ—জাতীয় অধ্যাপক তো বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক কাল আসেন নি। এলে চারিদিকে তাকালেই বুঝতেন, এবারও তো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণ বা প্রকোষ্ঠ থেকে দূরে দূরে ছাত্রদের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা হলো। শুধু যে, জাতীয় অধ্যাপক বলেছেন তা' নয়—তার আগে আমাদের মুখপাত্র নব-উপাচার্য বহুভাবে সমস্যা নিয়ে আলোচনা চালিয়েছেন। সুন্দর দীর্ঘ বিশ্লেষণ—মহাজাতি সদন তখন মনে হচ্ছিল যেন মহাবিদ্যালয়ের অর্থনৈতিক বিভাগের কোন হলঘর। তাঁর কথাগুলি তোমরা ভেবে দেখো, হয়ত উৎকট উত্তেজনা প্রতিসারণে লাগবে। বাঙালী পথিকৃৎ রামমোহন, বা হিন্দু কলেজ স্থাপয়িতারা কিসের জন্য ইংরাজী শিক্ষা চেয়েছিলেন তা আমরা ভুলে গিয়েছি, ডিরোজিও কি মধুসূদন বা রাধানাথ শিকদার-কে মনে রেখেছে তাঁদের কথা আক্ষেপগুলোকে! হিন্দু কলেজ উঠে গিয়েছে—মেকলের মত চলেছে। তার পর বহু ডেপুটি উকীল সৃষ্টি হলো—জজ ম্যাজিস্টেট্রটও—তবে সেইটে কি প্রথম স্থাপয়িতাদের লক্ষ্য ছিল। মানুষে ভাবে এক, কালের আমোঘ নিয়ম দাঁড়ায় অন্য, শিব গড়তে বাঁদর আর কি! আর সংস্কৃতর কথা তুলেছ। বেচারী বিদ্যাসাগর তিনি তো সংস্কৃত শিক্ষার বহুল প্রসার চেয়েছিলেন, এখানে আজীবন সেজন্য পরিশ্রম করে গিয়েছেন—বাঙালী ব্যক্তিত্বে উজ্জ্বল আদর্শ। বঙ্কিমী শ্লেষ ব্যঙ্গে মুষড়ে পড়েন নি—সব সহ্য করেছেন। শেষ অবধি মানুষের উপর আস্থা হারিয়েছিলেন শুনেছি। তবে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। আমরা শুধু একটা মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছি তাঁর, তাও অযত্নে পড়ে অনাবৃত অবস্থায় শহরের পাখীদের বিহার স্থান হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে সব মনীষি-দের কথা তুলেছেন সুনীতিবাবু তা'ও তো প্রাক্‌আশুতোষ যুগের কথা। আশুতোষ তো জস্টিস গুরুদাসকে তাঁর গুরু বলে মানতেন—স্বকর্ণে শুনেছি তাঁর মুখে। তখন

তো সংরক্ষণের ও সংবর্ধনের পালা। যে রবীন্দ্রনাথের বাণী উদ্ধৃত করে চিরাগত বিশ্ববিদ্যালয়ের ঢং সমর্থন করবার চেষ্টা করেছেন, সুনীতিবাবু ভুলে গিয়েছেন, বোধ হয়, এক সময়ে স্বদেশী যুগে রবীন্দ্র প্রমুখ দেশ-নায়কদের বিরুদ্ধে আশুতোষই দাঁড়িয়েছিলেন। পশ্চিমদিকের জানলা খুলে রাখার জন্য আবেগপূর্ণ ওকালতী করেছিলেন, তাঁরই পদানুসরণে শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী বা সুনীতিকুমার এসেছেন।

আজও জানলা খোলা, তবে ধুলা ঝাড়া হচ্ছে না, মন্দিরেও পোষ্টার সকল দিকে, হাওয়া বদলে দিচ্ছে। আশুতোষ অবশ্য যুগ পরিবর্তনকে কৌশলে নিজের হাতে নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছিলেন। স্যাডলার কমিশনের তথ্যপূর্ণ রিপোর্ট লিখতে তিনিও তো অংশগ্রহণ করেছিলেন। তবে কি তিনি খুশিমনে নতুন রিফর্ম চালাতে দিয়েছিলেন? তাঁর নন্দীভৃঙ্গীরা সোনার ছড়ি হাতে তৎপর ছিল, সব গণ্ড-গোলের নিরাকরণ করছিল। আজও পর্যন্ত সেই চেষ্টাই চলেছে। সেনমশায় কিন্তু অর্থনীতিবিদ্—এ রোগের নিদান প্রায় ধরে ফেলেছেন ও সমুচিত ব্যবস্থাও করছেন। ফলে নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও ছাত্র-ছাত্রীর পাশের হার বেড়েই চলেছে। তার জন্যে শুধু একালের শিক্ষকদেরই সাধুবাদ দিলে হবে না, ছাত্র-ছাত্রীরাও আত্মনির্ভর-শীল—নানা সুযোগ-সুবিধার ব্যবহার করে আশুতোষ প্রবর্তিত উচ্চ পাশের হার বজায় রেখেছে। আবার পুরনো-পন্থী প্রশ্নকর্তারা ব্যাসকূট জিজ্ঞাসা করে গণ্ডগোল সৃষ্টি করতে চাইলে ছাত্র বৈঠকের মত বিবেচনা করবেন, কর্তৃপক্ষ এই বলে সংক্ষুব্ধ ছাত্র জনতাকে আশ্বস্ত করেছেন। শেষ অবধি দেখ কালের গতিতে আমরা কোথায় ভেসে এসেছি। শেষ নির্দেশ চাইছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ ছাত্র-মণ্ডলীর কাছ থেকে—আর এদিকে তারাও এখন নতুন প্রতীক ও নতুন তারার ইঙ্গিতের জন্য পূর্ব-গগনে চেয়ে রয়েছে। কাজেই হাওয়া ঘুরেছে। বায়ু বহে পুরবৈয়াঁ। আপনারা দেশের ভবিষ্যৎ শিক্ষা নিয়ন্ত্রণের হাল ছাত্রদের হাতে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। আপনারা বা আছেন কতদিন? চতুর্দশ লুইর মত ভাবুন—**Apre's moi—le Deluge** আমার পরে বিশ্বপ্লাবন। মহাসমুদ্র স্ফীত হয়ে বাংলাদেশকে ডুবিয়ে দেবে। শীঘ্রই চলবে নঈ তালীম তবে তা হয়ত রাষ্ট্রপতির শাসন নয়। আর আপনাদের সকলকেই নিবেদন করি, প্রাচীন স্বর্ণযুগে আবার ফিরে যাওয়া বোধ হয় অসম্ভব। এ দেশে নিরক্ষর বাউলরাও তা বুঝেছিল, প্রাচীন সিদ্ধাচার্যের কথায় সে ভাব ফুটে উঠেছিল—'দুহিল দুধু কি বেণ্টে ষামায়।'

অর্থাৎ দোয়া দুধ কি আবার বাঁটে ফিরে যায়?

পরিভাষা প্রসঙ্গে

সায়েন্সের নবীন ছাত্ররা চেষ্টা করেছেন বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের নতুন কথা শোনাতে। এ অবশ্য যে সব ছাত্র নিজেরাই বিজ্ঞান রাজ্যে গবেষণা করতে নেমেছেন তাঁদেরই চেষ্টা। গবেষণার ফলাফল এতদিন প্রকাশ হচ্ছিল ইংরেজী ভাষায় কিংবা বিদেশী কোনভাষায় ভাষান্তরিত হয়ে। সে সময় ভারতীয় গবেষকরা চেষ্টা করতেন তাঁদের আবিষ্কার বা দৃষ্টিভঙ্গী বিদেশী মহলে যাচাই করতে। লেখকের মনের পিছনে থাকত একটা বিজ্ঞানী সমাজ, যাদের দরবারে পেশ করতে গেলে তাদের বাচনভঙ্গীর অনুকরণ করতে হবেই। দু'তিনশ বৎসর ধরে বিদেশে এই ভাবে এক ধরণের যাচাই চলে আসছে। ফলে সেই বাজারে এক ধরণের প্রকাশভঙ্গীও গড়ে উঠেছে। সেই বাজারে কিছু পেশ করতে গেলে স্বল্প কথায় বলতে হবে কী নূতনত্বের দাবী করা হচ্ছে। যে পত্রিকায় পাকা বিজ্ঞানীরা নিজেদের মতামত আলোচনা করেন, সেই পত্রিকার ভাষা সাধারণ পড়ুয়ার বোধগম্য নয়। তার জন্য শুধু বিদেশী ভাষা শিক্ষারই প্রয়োজন নয়। স্বল্প কথায় দুরূহ বিষয় বলবার একটা রীতি অনুসরণ করাও বাধ্যতামূলক। এই কটি কথা "গবেষণা"র নবীন বন্ধুদের বলছি—আমাকে ভয়ে ভয়ে স্বীকার করতেই হবে যে, অনেক সময় আমি "গবেষণা"র মৌলিক প্রবন্ধ গুলি ভাল করে বুঝতে পারি নি। যদিও মনে হচ্ছিল ইংরেজীতে লেখা হলে হয়ত প্রতিপাদ্য আমার কাছে এত দুর্জ্ঞেয় বলে মনে হত না। অবশ্য শেষে পরিভাষা দেখে একটু চেষ্টা করলে প্রবন্ধের সারকথা উদ্ধার করা সম্ভব বলে মনে হয়েছে।

বিজ্ঞানের কথা বাংলায় প্রচার করার জন্য প্রায় অর্ধেক জীবন কাটিয়ে এসেছি। আমি সব সময়ে মনে করি যে, আমাদের দেশের বিজ্ঞানী লেখকদের শুধু বিজ্ঞান জানলেই চলবে না তাদের চেষ্টা চাই যারা বিজ্ঞান বোঝে না তাদেরও বুঝিয়ে দিতে হবে। এবং সেই মত একটা ভাষা সৃষ্টি করা তাদের দায়িত্ব। আমরা সবে এই কাজে নেমেছি। কাজেই বাচনরীতিতে শুধু ইংরেজী পত্রিকার অনুসরণ করলেই চলবে না, অবশ্য এদেশে বিজ্ঞান পত্রিকা শুধু নিজস্ব নূতন কথা দিয়ে ভরা যাবে

না। যা আমাদের দেশের পক্ষে নূতন অথচ বিজ্ঞানীর বাজারে মৌলিক বলে চালানো যাবে না, এমন সব প্রসঙ্গেরও অবতারণা করতে হবেই। সেখানে নতুন কথা-চয়ন "গবেষণা"র লেখকরা খুশীমত করতে পারেন। অবশ্য এখানেও বিজ্ঞানের ভাষা ও পরিভাষার কথা উঠবে। এসব ক্ষেত্রে হয়ত অনেকদিন পর্যন্ত নতুন কথা সৃষ্টির চেষ্টা করার থেকে সরাসরি বিদেশী চালু কথাগুলিকে নিয়ে বিজ্ঞানীকে বাংলা ভাষায় আলোচনা করতে নামতে হবে। হয়ত এই ভাবেই আমরা বিজ্ঞানের প্রচার কাজে অনেক তাড়াতাড়ি ফল পেতে পারব। যে ভাষা সতেজ এবং প্রাণবন্ত সেই ভাষা অন্য ভাষা থেকে নতুন কথা আহরণ করতে ইতস্ততঃ করে না। এখানে জাত যাবার ভয় নেই। এভাবে বহুশত শব্দ বিদেশী ভাষা থেকে আমরা সংগ্রহ করে প্রতিদিন ব্যবহার করছি। কাজেই বিংশশতাব্দীর সভ্যতার বিবর্তনের আলোচনা করতে আরও কয়েকশত নতুন কথার আমদানী করলে ক্ষতি কি? নতুন কথা অর্থাৎ পরিভাষা সৃষ্টির চেষ্টাকে আমি কিন্তু এই বলে বিরোধিতা করছি না। সব রকমের চেষ্টা চলতে থাকুক। ভবিষ্যতে বাঙালী বুঝবে, স্বদেশী কি বিদেশী কথা তাদের ধাতে মানানসই হল কিনা।

জীবন কথা

আইনস্টাইন—২

গত ১৮ই এপ্রিল (১৯৫৫) আমেরিকার এক হাসপাতালে আইনস্টাইন পরলোকগমন করেছেন। দেশে দেশে লোক তাঁর জন্যে শোক প্রকাশ করছে। আমাদের দেশের শিক্ষিত জনসাধারণ, যাঁরা বিজ্ঞানের বিশেষ খবর রাখেন না, তাঁরাও ভাবছেন পৃথিবী সত্যিকারের একজন মহাপুরুষকে হারালো। তাঁর জন্ম ১৮৭৯ সালে দক্ষিণ জার্মানীর এক ইহুদী পরিবারে। বাবা ছিলেন ছোট কারবারী। মিউনিকের স্কুলে কিছুদিন পড়বার পর অল্প বয়সেই ইটালীতে চলে আসতে হয়েছিল। শেষ অবধি চলে আসেন সুইজারল্যাণ্ডে। জুরিখের ইনজিনিয়ারিং কলেজ থেকে পাশ করবার পর বাইশ বছর বয়সে বার্নের পেটেন্ট অপিসে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়।

কিশোর বয়সের কিছু কিছু কথা আইনস্টাইন নিজেই লিখে গেছেন। বরাবরই তিনি সাধারণ থেকে কিছু ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ। যে উন্নতির দুরাশা মানুষকে সারা-জীবন অস্থির করে, মাতিয়ে রাখে, তার অসারতা কিশোর বয়সেই তাঁর মনে পরিষ্কার ভাবে ফুটে উঠেছিল। পেট বড় বালাই, এর জন্য সকলকেই নেচে বেড়াতে হয়। কিন্তু পেট ভরলেই যে মানুষের মন ভরে না, এ সত্য তাঁর কাছে অল্পবয়সেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। তাই অল্পবয়সেই প্রথমে তাঁর মন ঝুঁকেছিল ধর্মের দিকে। হঠাৎ বারো বছর বয়সে বিজ্ঞানের চলতি বই পড়ে তাঁর মনে হল, বাইবেলের কথা ও গল্প কখনও সত্য হতে পারে না। হঠাৎ মন বেঁকে বসল; সম্পূর্ণ নতুন পথে স্বাধীন চিন্তার দৌরাত্ম্যে মনে হল ইচ্ছা করেই সমাজ চিরদিন মানুষের মন ভোলাবার জন্যে মিথ্যা প্রচার করে আসছে। সেই থেকে আপ্তবাক্যে অবিশ্বাস তাঁর মজ্জাগত হয়ে উঠল; কোন ক্ষেত্রেই কোন চিরাচরিত মতামত বিচার না করে সহজে তিনি গ্রহণ করতে পারেন নি।

অল্পবয়সে ধর্মের দিকে যে মন ঝুঁকেছিল, সে হয়ত নিজের একান্ত ছোট গণ্ডী থেকে নিজেকে মুক্ত করবার প্রথম প্রয়াস। তাঁর মন শুধু নিজের ছোট কথা নিয়েই থাকতে চাইছিল না। তাই বহির্জগতের আকর্ষণ তাঁর কাছে মুক্তির ডাক বলে মনে

হল। পরিণত বয়সে তিনি লিখেছেন—"বাহিরে প্রকাণ্ড জগৎ—সম্পূর্ণভাবে মানুষের নিরপেক্ষতার অস্তিত্ব—তবু এই রহস্যের কতকটা হয়ত আংশিকভাবে মানুষ পরীক্ষা ও চিন্তা করে বুঝতে পারে। দেখলাম বহু শ্রদ্ধাভাজন সারা জীবন এই কাজে নিজেকে উৎসর্গ করে জীবনে মুক্তি ও নিরাপত্তা এনেছেন। বুদ্ধির দ্বারা জগৎকে যতটুকু পাওয়া সম্ভব তার প্রয়াসই জীবনের শ্রেষ্ঠ কাম্য বলে মনে হল। অতীতে বহু লোকই এই কাজে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন—বর্তমানেও এই কাজে নিজেকে নিয়োগ করেছেন বহুলোক। তাঁদের অর্জিত জ্ঞান আত্মার এই সাধনার নিত্য সহায় হবে। এই সাধনার পথ হয়ত ধর্মমার্গের মতো চিত্তাকর্ষক কিংবা সুখপ্রদ নয়, তবু কখনও বিশ্বাস হারাই নি, এই পথের পথিক হয়েছি বলে একবারও অনুশোচনা করতে হয় নি।"

পাঠ্যাবস্থায় আইনস্টাইন জুরিখের কলেজ ল্যাবরেটরীতেই বেশী সময় কাটাতেন। তিনি সরাসরি পরীক্ষার একটা মস্ত আকর্ষণ অনুভব করতেন। পদার্থ-বিজ্ঞানের যে-সব সমস্যার কথা তাঁর মনে অল্পবয়সেই ফুটে উঠেছিল তার উত্তর খুঁজতেন ঘরে বসে হেল্‌মহোলট্‌স্, কিরকফ্ ও হার্ট্‌স্-এর বই পড়ে। বহু মনীষী সেই সময় জুরিখে অধ্যাপনা করতেন, তবু তাঁদের কাছ থেকে নিজের সমস্যাগুলির সমাধানে কোনো সাহায্য পেয়েছিলেন বলে মনে হয় না। বরং কলেজের শিক্ষা পদ্ধতি, নিয়মের গণ্ডি, বহু পরীক্ষার আনুগত্য তাঁর কাছে প্রকৃত শিক্ষার অন্তরায় বলে মনে হত। এতে ছাত্রদের মন থেকে জানবার উৎসাহ যে একেবারে মুছে যায় না, সেইটেই তিনি আশ্চর্যের কথা মনে করতেন। তিনি লিখেছেন—"সুখী, ক্ষীণজীবী উদ্ভিদের মতো ছাত্রদের মনে এই অনুসন্ধিৎসা বৃত্তিকে লালন করতে হয়। সযত্নে উদ্দীপনা জাগ্রত করবার চেষ্টা তো আছেই, কিন্তু বিশেষ করে দরকার বাঁধাধরা নিয়মের পাশ থেকে মুক্তি। পক্ষান্তরে, জোর করে দায়িত্বের ভার চাপিয়ে অনুসন্ধানের আনন্দ মনে ফুটিয়ে তোলা যাবে কিংবা জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করা যাবে, এটা ভাবা মস্ত ভুল। চাবুক হাতে জোর করে অনবরত খাওয়ানোর চেষ্টা করলে শিকারী বন্য জন্তুরও অবশেষে খাদ্যে অরুচি জন্মানো অসম্ভব নয়।" এই ভাবেই কলেজের চার বছর নির্দিষ্ট পাঠ্যতালিকার মধ্যে আবদ্ধ না থেকে তাঁর সতেজ প্রতিভা নিজের মনের খোরাক সংগ্রহ করে নিয়েছিল নিজের চেষ্টায়।

এই সময় থেকে Thermodynamics-এর উপর শ্রদ্ধা তাঁর মনে বদ্ধমূল হয়েছিল। বহু বছর ধরে নানাভাবে বিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলির উপর গবেষণা চালিয়ে

তিনি শেষ বয়সে বলে গেছেন যে, এর বিশেষ রীতি ও মূলসূত্রগুলি পদার্থ-বিজ্ঞানে চিরকাল অপরিবর্তিত অবস্থায় থেকে যাবে।

গতি-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তখন নানারকম তর্কবিতর্ক চলছিল। এই সময়ে বিজ্ঞানীরা নানাভাবে এই দ্বন্দ্বের সমন্বয় করবার চেষ্টা করছিলেন। ম্যাক্সওয়েলের অনুসরণে আলোক-তরঙ্গের পরিব্যাপ্তির কারণ খুঁজতে গেলে যে নিউটনীয় গতি-বিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলির সঙ্গে বিরোধের সম্মুখীন হতে হয়, এটা তাঁর জানা ছিল বহু দিন থেকে।

সকলেই এ দ্বন্দ্বের সমন্বয়ের উপায় খুঁজতে লাগলেন। ম্যাক্সওয়েলের নির্দেশিত পথে লোরেঞ্জ এগিয়ে গেলেন। পরীক্ষার ফলে সব জড়ের মধ্যে বিদ্যুৎকণার অস্তিত্ব ততদিনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। বিদ্যুতের অবস্থান ও বিশেষ করে ইলেকট্রনের গতিবৈচিত্র্য ও সমাবেশের ফল হিসাবে জড়ের মধ্যে বিশেষ বিশেষ ধর্মের প্রকাশ সম্ভব, এই ছিল লোরেঞ্জের প্রতিপাদ্য। এতে তিনি অনেকটা কৃতকার্য হয়েছিলেন। এভাবে দেখলে আলোক-তরঙ্গের উপর বস্তুর গতির কি প্রভাব থাকতে পারে তাই খুঁজতে লাগলেন লোরেঞ্জ এবং ১৯০৫ সালে যে প্রবন্ধ প্রকাশ করলেন, এই বিষয়ে তাতে সম্পূর্ণ কৃতকার্যতার পূর্বাভাস ছিল। এই সময়ে আইনস্টাইন তাঁর আপেক্ষিকবাদের প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। পেটেণ্ট আপিসে কাজ করেন পেটের দায়ে, গবেষক হিসাবে তখন সম্পূর্ণভাবে অজ্ঞাতকুলশীল। এখান থেকেই সম্পূর্ণ নতুন ধরণের কথা তিনি বিজ্ঞান জগতে প্রচার করেন। বিরোধের কারণ দেখালেন, বিশেষ করে নিউটনীয় গণিতে কালের পরিকল্পনায়। দর্শকের গতিনিরপেক্ষ এই কাল যে বৈজ্ঞানিক জগতে অচল—এটি আপেক্ষিকবাদের মূল কথা। প্রতি দর্শককেই তার জগতের মাপজোখের ব্যবস্থা করতে হয়। প্রাকৃতিক ঘটনাগুলির মধ্যে কার্য-কারণের শৃঙ্খলা খুঁজতে গেলে, কোথায় ঘটেছে কোন বিশেষ ঘটনা এবং কখন সেটি ঘটল—এই দুয়েরই খবর রাখতে হয়। ব্যবধানের হিসাব হয় মাপকাঠির গুণে ইউক্লিডীয় জ্যামিতির মূল সূত্রগুলি অনুসারে এবং সময়ের মাপও করতে হবে ঘড়ির কল্পনা করে। প্রথম থেকে ধরে নিলে চলবে না যে, এই মাপজোখের কাল একই এবং দর্শকের গতিনিরপেক্ষ। বরং বুঝতে হবে যে, কালের পরিমাপের সম্ভাবনার মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে যে মূল নীতি, সেটি হচ্ছে আলোকের দর্শক-নিরপেক্ষ অপরিবর্তিত বেগ। মাত্র এরই আশ্রয়ে প্রতি দর্শকের যে নিজস্ব কালের পরিকল্পনা সম্ভব তা আমরা অবিসম্বাদী রূপে দেখাতে পারি। পরিমিত

কালের এই কল্পনার সঙ্গে নিউটনীয় গণিতের সাক্ষাৎ বিরোধ আছে। আইনস্টাইনের অনুসরণে দেশ ও কালের পরিমাণের মধ্যে যে দর্শকের নিজের গতির প্রভাব প্রচ্ছন্নভাবে থাকে তা সকল বিজ্ঞানীরা স্বীকার করেন। প্রকৃতির নিয়মাবলীর মূল সূত্র যে এইভাবে শুদ্ধচিন্তা পথে আবিষ্কৃত হওয়া সম্ভব, আইনস্টাইনের আবিষ্কার তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

বৈজ্ঞানিক গবেষণার মধ্যে সরাসরি পরীক্ষার স্থান যে অতি উচ্চে তা তিনি কোনকালেই অস্বীকার করেন নি। বাহ্য প্রকৃতির সঙ্গে ওই প্রণালীতে মানুষের পরিচয় হয়। তবে অবিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতাকে নিয়মসূত্রে গেঁথে মানুষ যে বিজ্ঞান সম্ভব করেছে, যার ফলে মনে হয় জড়ের আদিম রহস্য সে কত কষ্টে বুঝতে পেরেছে— সেই নিয়মের আবিষ্কারের পথে পথপ্রদর্শক, বিশেষ করে মানুষের মন। একাগ্র চিন্তা ও গণিতের সুষমিত নিয়মাবলীর মধ্যে দিয়ে আমাদের মূল নীতিগুলি অনুসরণ করতে হবে। আইনস্টাইন সারাজীবন এই নীতি মেনে গবেষণা চালিয়ে গেছেন।

১৯০৫ সাল আইনস্টাইনের জীবনে এক স্মরণীয় বছর। এই এক সালেই তিনি পদার্থ-বিজ্ঞানের তিনটি বিশেষ ক্ষেত্রে তাঁর অসাধারণ চিন্তার যে আলোক-পাত করেছেন এবং যে মূল সূত্রগুলির আবিষ্কার করেছেন তা বিজ্ঞানের ইতিহাসে অবিনশ্বর হয়ে থাকবে। Thermodynamics-এর নীতি অনুসারে ব্রাউনিয়ান মুভমেন্ট-এর গণনা করেছিলেন—তার উপর নির্ভর করে পেঁরা অণু-পরমাণুর অস্তিত্বকে কল্পনান্তর থেকে পরীক্ষিত সত্যের পর্যায়ে এনেছিলেন। প্লাঙ্ক যে মূল সূত্রের সন্ধান পেয়েছিলেন (১৯০০), তাঁর মধ্যে জড় ও বিকিরণের শক্তির আদান-প্রদানের বৈচিত্র্য তাঁকে বিহ্বল করেছিল। বিকিরণকে নিছক তরঙ্গ হিসাবে ভাবলে সেইরূপ আদান-প্রদানের হেতু খুঁজে পাওয়া যায় না। এইবার বিজ্ঞান জগতে আর এক বিপ্লব উপস্থিত করলেন আইনস্টাইন। তিনি প্রচার করলেন শক্তির কণাবাদ —জড়ের উপর আলোক-তরঙ্গের প্রতিক্রিয়ার মধ্যে তার অস্তিত্ব প্রমাণ করবার চেষ্টা করলেন। চিরাগত গতিবিজ্ঞান ও ম্যাক্সওয়েলের রীতি পরিত্যাগ করে থার্মোডাইনামিক্সের নব সূত্রানুযায়ী তিনি বুঝতে চেষ্টা করলেন এই প্রক্রিয়া। বিজ্ঞানের এই ক্ষেত্রে অনেক নতুন সন্ধান দিলেন তিনি।

বিচিত্র রীতিতে নিছক একাগ্র সাধনার ফলে যে সব সত্যের তিনি সন্ধান দিয়েছেন তা বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাহায্য করেছে প্রচুর। তাঁরই শক্তি-কণাবাদ

বোরের কল্পনার ভিত্তিস্বরূপ হয়ে রয়েছে। জড়ের শক্তি বিকিরণ ও বিশ্লেষণ—এই দুই ব্যাপার বুঝতেই আইনস্টাইনের শক্তি-কণার আশ্রয় নিতে হয়।

আপেক্ষিকবাদের পরিকল্পনার সাহায্যে গতি ও আলোক-বিজ্ঞানের বিরোধের সমন্বয় করে তিনি ক্ষান্ত থাকেন নি—জড়ের মহাকর্ষণের রহস্যও তিনি এভাবেই বুঝতে চেষ্টা করেছেন। প্রথম যুগের আপেক্ষিকবাদের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে তা ১৯১৫ সালে সম্ভবপর হল। তার সঙ্গে সঙ্গে বহু কালের প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক বিশ্বাসের উপর তিনি ঘা দিলেন। শুধু যে কালের আপেক্ষিকতা প্রচার করলেন তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে ইউক্লিডের জ্যামিতির উপর প্রতিষ্ঠিত দেশ বর্ণনারও যে পরিবর্তন দরকার তা তিনি সকলকে বোঝালেন।

আজকের দিনে যে সব জ্যোতির্বিদেরা ব্রহ্মাণ্ডের বিপুল বিস্তার ও বিভিন্ন নীহারিকার উৎপত্তির বিষয় জল্পনা-কল্পনা করেন, তাঁদের সকলকে আইন-স্টাইনই পথ দেখিয়েছেন।

নিউটনীয় গণিতের মূল নীতির সংশোধনের চেষ্টা করবার সময় আইনস্টাইন আর একটি মূল সূত্রের সন্ধান পেলেন। আইনস্টাইনের হিসাবে কোন বস্তুকণারই ভরসংখ্যা নিত্য থাকবার কথা নয়। এই কথাটি নিউটনের মতের সোজাসুজি পরিপন্থী এবং গতিবর্ধন ও শক্তি আহরণের ফলে প্রত্যেক বস্তুকণারই ভরসংখ্যা বেড়ে যেতে থাকবে, এই সত্য আইনস্টাইন প্রমাণ করেন। তার মানে, ঐ ভর সংখ্যা নির্দেশ দিচ্ছে—ঐ কণার মধ্যে কি প্রভূত শক্তি প্রচ্ছন্ন আছে। আণবিক বোমার যুগে এই যুক্তি বার বার পরীক্ষিত হয়েছে এবং বর্তমানে নিউক্লিয়ার গবেষকের সর্বগ্রাহ্য পরীক্ষিত সূত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে এই মতবাদ।

১৯০৫ সালের পর বিদ্বজ্জন মহলে তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়ল। পেটেন্ট আপিস থেকে তাঁকে অধ্যাপনার কাজে নামতে হল। জুরিখ, প্রাগ ঘুরে তিনি শেষে প্রথম মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে বার্লিনে গবেষক ও অধ্যাপক নিযুক্ত হয়ে রইলেন। এতদিনে তাঁর প্রচুর কাজের মধ্যে কিছু অবসর মিলল। নিছক চিন্তার পথে তিনি ভিন্ন ভিন্ন সত্যের উদ্‌ঘাটনে তৎপর হয়ে রইলেন।

অবশ্য শেষ অবধি বার্লিনে তিনি নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে পারেন নি। জাতি-বিদ্বেষের যে আগুন জ্বলে উঠেছিল তার ফলে ১৯৩৩ সালে তাঁকে জর্মানী ছাড়তে হয়। শেষ জীবনে তিনি আমেরিকায় কাটান। সেইখানে শেষ অবধি একই চিন্তাধারা তাঁকে ব্যাপৃত রেখেছিল। তিনি বার বার বলেছেন যে, পূর্ণ সত্যের সন্ধান

এখনও মেলেনি তাঁর আপেক্ষিকবাদে। অনেক কিছু জানা সম্ভব—তা শুধু পরীক্ষার ফলে হবে না। কঠোর সাধনা ও চিন্তা তাই তিনি নিয়োগ করেছিলেন এই কাজে। এইভাবেই বিশুদ্ধ সত্যের সাধনা করতে করতে তিনি মৃত্যু-বরণ করেছেন।

মানুষ হিসাবে তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল অসাধারণ। অত্যাচার কিংবা অসত্যের কাছে কখনও মাথা নত করেন নি। মানুষের উপর বিশ্বাস ছিল তাঁর অপরিসীম। নিজে অনেক অবহেলা সহ্য করেছিলেন—তাই বিজ্ঞানের নবীন ব্রতীদের তিনি স্নেহ করতেন।

বিজ্ঞানব্রতীদের অনেক সভাতেই তাঁকে দেখা যেত। নতুন মতবাদ, যার মধ্যে সত্য নিহিত আছে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন, তাকে তিনি খোলাখুলি সাহায্য ও প্রশ্রয় দিয়েছেন।

অনেক গবেষকের মতবাদের উপর তাঁর প্রতিভার আলোক ফেলে সমালোচনার কঠোর পরীক্ষার মধ্য দিয়ে সত্য-দর্শকদের ঠিক পথে চলতে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

বার্লিন ছাড়তে হল অত্যাচারের খোলাখুলি প্রতিবাদ করেছিলেন বলে। কি হিটলার, কি মুসোলিনী, এই একনায়কদের কারও কাছে তিনি মাথা নত করেন নি। শেষ জীবনে যখন আমেরিকা তাঁর প্রদর্শিত পথে এগিয়ে আণবিক শক্তির সন্ধান পেল এবং তা মানুষের সংহারকার্যে ব্যবহার করল, তখন তার বিরুদ্ধে খোলাখুলি প্রতিবাদ জানাতে তিনি পশ্চাৎপদ হন নি।

সর্বক্ষেত্রেই তাঁর মতামতের একটা অভিনবত্ব ছিল। তুচ্ছ আত্মগরিমা কিংবা নিজের আর্থিক প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি কখনও ব্যগ্র ছিলেন না—অনেক সময় অনেক কথা হয়ত সকলের মনঃপূত হত না, তবু সকলেই জানত তিনি কোন ব্যক্তিগত কোর্ণ থেকে সমালোচনা বা প্রচার করছেন না।

আজ তিনি চলে গেছেন। তাঁর দান জগতে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে, আর থাকবে তাঁর কীর্তি—নিছক সাধনা ও একাগ্রতায় মানুষ কি করতে পারে তাঁর জাজ্বল্যমান নিদর্শন।

ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার

ভারতীয় বিজ্ঞান সভা ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের স্মৃতি-সভার আয়োজন করেছেন। তাঁর মৃত্যু দিবস ২৩শে ফেব্রুয়ারী। এই আসরে আপনাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাঁর পুণ্যকীর্তি আলোচনা করবার সুযোগ পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করছি ও সেই সঙ্গে সময়োপযোগী কয়েকটি কথা বলবার আহবানও পেয়েছি।

মহেন্দ্রলাল জন্মেছিলেন ১৮৩৩ সালের ২রা নভেম্বর। প্রায় এই সময়েই রাজা রামমোহন রায় চেয়েছিলেন যে, পশ্চিমী রীতি অনুযায়ী স্বদেশেও বিজ্ঞান শিক্ষার প্রবর্তন হয়। অতীতের অনুধ্যানে শুধু সংস্কৃত ভাষার মধ্যে মজে থাকলে এদেশে সুদিন ফিরবে না। এখন বর্তমান যুগের উপযোগী মনোভাব দেশবাসীর মধ্যে জাগাতে হবে নবশিক্ষার মাধ্যমে, এই কথা তিনি বড়লাট আমহার্স্টকে জানিয়েছিলেন। বিদেশীদের সাহচর্যে সাধারণের মনে যে আকাঙ্খা জেগেছিল তারই প্রতিধ্বনি পাই আমরা ওই চিঠিতে।

তখন বিজ্ঞান অনুশীলনের জন্য অনেক ছাত্রেরই মন ঝুঁকেছে। দরিদ্র ও অনাথ মহেন্দ্রলাল হিন্দু কলেজে ঢুকেছিলেন জুনিয়র বৃত্তি পেয়ে। পড়াশুনায় খুব ভাল ছিলেন তিনি, ইংরেজী সাহিত্য ও দর্শনে তাঁর ব্যুৎপত্তি জন্মেছিল, শিক্ষকেরা তাঁর মেধা ও তীক্ষ্ণ বিচার শক্তির প্রশংসা করতেন। সিনিয়র বৃত্তিও পেলেন, তবু বিজ্ঞান শেখার উৎসাহে সকলের অনুরোধ কাটিয়ে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হলেন ১৮৫৪ সালে। তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের আয়োজন চলছে।

জৈব ও অজৈব রসায়ন, অস্ত্রোপচার, ধাত্রীবিদ্যা সবেতেই কৃতিত্ব দেখালেন তিনি। মেডিক্যাল কলেজে তখন বাংলার মাধ্যমেই শিক্ষা দেওয়া হত বলে শুনেছি। তদুপ-যোগী বিজ্ঞানের বইও তখন লেখা হয়েছিল, যা এখন দুষ্প্রাপ্য হয়ে গিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় খুলল, আর কলেজ থেকে বাংলা উঠে গেল। ১৮৬০ সালে এল. এম. এস. ও ১৮৬৩ সালে এম. ডি. উপাধি পেয়ে যখন মহেন্দ্রলাল চিকিৎসা শুরু করলেন, দেশে তখন পুরাদমে ইংরেজী চলেছে। ইংরেজী ভাষা বিজ্ঞান-ভাণ্ডারের চাবিকাঠি জোগালেও সেই সঙ্গে বিজ্ঞানীর মনোভাব তৈরী করে না। তার জন্যে

চাই বলিষ্ঠ চিন্তা শক্তি ও নির্ভীক ভাবে সত্যানুসরণের প্রেরণা। ইংরেজী প্রবর্তনের আগে এ দেশেও স্বাধীনচেতা সংস্কারমুক্ত অনেক সত্যসন্ধানী জন্মেছিলেন, যাঁদের এখনকার মান দণ্ডেও বিজ্ঞানী বলা চলে। ইতিহাসে তার বহু দৃষ্টান্ত মিলবে। তাঁরা সাধনার ফল এ দেশের ভাষাতেই লিখে গেছেন। যেমন ভারতীয় জ্যোতির্বেত্তারা যবনদের শাস্ত্রও অধ্যয়ন করতেন এই প্রমাণ রয়েছে, তবু তাঁদের সুচিন্তিত অভিজ্ঞতার ফল দেশবাসীর জন্য লিখেছেন দেশের ভাষাতেই। পরাধীনের মনোভাব, বৃথা শিক্ষার গর্ব ও বিদেশী ভাষার মোহ তখন এ দেশীয়দের সত্য বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে ফেলেনি। ভূয়োদর্শন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার উপর যে বিজ্ঞানের প্রগতি নির্ভর করে, সব দেশের মতো এদেশের ইতিহাসও তারই সাক্ষ্য দেবে।

মহেন্দ্রলাল যা সত্য বলে উপলব্ধি করতেন, তার বিরুদ্ধাচরণ করতেন না কখনও। প্রকৃত বিজ্ঞানীর এ মনোভাব তাঁর চরিত্রে ফুটে উঠেছে। নানাবিধ পরীক্ষা করে সত্য উপলব্ধি করেন বিজ্ঞানী। সব সময় অন্যের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করা চলে না তাঁর। পরীক্ষা ও বিচার বুদ্ধির দ্বারা বিশ্লেষণ করে নতুন সত্যে উপনীত হলেই বিজ্ঞানীর চরম আনন্দ। তিনি তা কখনই পরিত্যাগ করেন না এবং অন্যকে ডেকে এনে সেই নতুন কথা শোনান। যে পথে তিনি সত্যে উপনীত হয়েছেন, তারও নিখুঁত বর্ণনা রেখে যান। ডাক্তারী জীবনে মহেন্দ্রলালের এই বিচিত্র অনুভূতি হয়েছিল। তিনি অ্যালোপ্যাথি রীতিতে শিক্ষিত লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক। যখন হোমিওপ্যাথিতে সত্যবস্তুর সন্ধান মিলেছে বুঝলেন তখন তাকে বরণ করে নিলেন। তাঁর বিশ্বাস হল, রোগ শান্তির যে ব্রত গ্রহণ করেছেন তা হয়ত এইভাবে আরও ভাল করে করা সম্ভব হবে; কাজেই অনায়াসে বরণ করলেন হোমিওপ্যাথির পদ্ধতিকে। অখ্যাতি বা ব্যবসায়ের লোকসানের ভয় তাঁকে টলাতে পারল না।

এই মত পরিবর্তনের ইতিহাস 'ক্যালকাটা জার্নাল অব মেডিসিন'-এর ১৯০২ সালের জুলাই সংখ্যায় তিনি নিজেই লিখে গিয়েছেন। তাঁর জীবনী লেখক শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত এর যে তর্জমা ছাপিয়েছেন, এখানে তার কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করবার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না। নতুন মত প্রচারের পর তিনি চিকিৎসক সমাজে এক ঘরে হলেন। শিক্ষক ও বন্ধুরা সকলে বলতে শুরু করলেন আবার-অ্যালপাথিতে ফিরে যাবার জন্যে। কিন্তু তিনি লিখলেন, "আমার প্রিয়তম শিক্ষক ও সহৃদয় বন্ধুদের একই জবাব দিলাম। সত্য আমি পরিত্যাগ করতে পারব না।

যাক আমার ব্যবসায়, বরং অন্য জীবিকা গ্রহণ করব অথবা হয়ত অন্নাভাবেই হবে। আমার যা বিশ্বাস—যা হয় হোক—আমি জগতের কাছে আমার সর্বশক্তি দিয়ে ঘোষণা করব—সেই সত্য, যা আমি জেনেছি।" এই কয়টি কথায় আত্মবিশ্বাসী, স্থিতধী বিজ্ঞানী-যোদ্ধার ছবি ফুটে উঠেছে।

সাময়িক বিপর্যয়ের পর মহেন্দ্রলাল আবার সম্মানী চিকিৎসকের পদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হলেন। তাঁর যশ ও প্রতিষ্ঠার খবর দেশের চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। বিশ্ববিদ্যালয় সে সময় রেখেছিলেন কলেজের উপর ছাত্রদের শিক্ষার ভার। খুব কম কলেজেই বিজ্ঞান শিক্ষার আয়োজন ছিল। এদিকে দেশের লোক ভাবতে শুরু করেছে বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা। এদেশের অবস্থার পরিবর্তন করতে, দারিদ্র্য ঘুচিয়ে আনতে যে পথে প্রতীচী উন্নতির শিখরে পৌঁচেছে, আমাদেরও সেই পথে চলতে হবে—এই বিশ্বাস দৃঢ় হলো ছাত্রদের মনে। প্রায় সেই সময় থেকে শুরু হয়েছে বিজ্ঞান শিখতে বিদেশ যাত্রা। এদেশের সরকারের প্রথমে সহানুভূতি ছিল এই আন্দোলনে। তাঁরা জন কতক মেধাবী ছাত্রের জন্যে বৃত্তিরও বন্দোবস্ত করলেন। বেসকারী বৃত্তি লাভ করতে "গিল খ্রীষ্টের" জন্যে প্রতিযোগিতার পরীক্ষা প্রায় সেই সময় থেকেই শুরু হল। তাই উচ্চ চাকরির জন্যে বা ব্যারিষ্টারী শিখতে শত শত বিদেশী যাত্রীদের মধ্যে দেখা গেল, কয়েকজন ছাত্রও চলেছেন উচ্চ বিজ্ঞান শিক্ষার জন্যে। দেখি তাঁদেরই মধ্যে জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, প্রমথনাথ ও আরো অনেককে। এঁরা কেউ কেউ ফিরে এসে বিজ্ঞান শেখাবার ভার নিলেন। ১৮৮২ সালের পর থেকে শিক্ষার নতুন যুগ পত্তন হলো এদেশে।

মহেন্দ্রলাল বিদেশে যাননি ; কিন্তু দেশ জোড়া দৈন্য ও অজ্ঞতার কথা চিন্তা করে তখনই স্থির করেছেন ভারতবর্ষীয়দের বিজ্ঞান চর্চার জন্যে জাতীয় সভার আবশ্যকতা। আন্দোলন শুরু করেলেন ১৮৭০ সাল থেকেই। নানা কাগজে, ইংরেজী ও বাংলায়, তাঁর আবেদন পত্র ছাপা হতে শুরু হলো। তাতে লেখা হলো "পূর্বকালে এদেশে বিজ্ঞান চর্চার যথেষ্ট সমাদর ছিল। প্রাচীন হিন্দুরা গণিত, আয়ুর্বেদ, রসায়ন, উদ্ভিদ তত্ত্ব, মনোবিজ্ঞান ও আত্মতত্ত্ব ইত্যাদি বহু বিজ্ঞানের বীজ রোপণ করিয়াছিলেন, তবে দুঃখের বিষয় তার অনেক কিছুই প্রায় লোপ হইয়াছে। ভারতবর্ষীয়দের পক্ষে বিজ্ঞান শাস্ত্রের নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে, তন্নিমিত্ত ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভা নামে একটি সভা কলিকাতায় স্থাপন করিবার প্রস্তাব হইয়াছে।"

এভাবে লেখালেখি চলতে লাগল—বিদ্যাসাগর, জাষ্টিস দ্বারকানাথ, কৃষ্ণদাস পাল, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রমুখ অনেক মনীষীই এই পরিকল্পনার পোষকতা করেন। মহেন্দ্রলালের চেষ্টার ফল ফলল। ১৮৭৫ সালের মধ্যেই চাঁদা উঠল প্রায় আশি হাজার টাকা। ১৮৭৬ সালে ২৯শে জুলাই ২১০, বহুবাজার ষ্ট্রীটে ছোটলাট স্যার রিচার্ড টেম্পল-এর সভাপতিত্বে ভারতীয় বিজ্ঞান সভার (Indian Association for the cultivation of sciences) উদ্বোধন হলো।

এই স্বার্থ-ত্যাগী, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, দেশসেবকের দূরদর্শিতার কথা ভেবে মন বিস্ময়ে ও শ্রদ্ধায় ভরে ওঠে। ১৮৭৬ সালে জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্রও তাঁদের সাধনা শুরু করেন নি। কে তখন ভাবতে পারত, ভারতীয়েরা বিজ্ঞানে মৌলিক গবেষণায় কৃতী হয়ে সারা বিশ্বের প্রশংসা অর্জন করবে, শিল্প বিজ্ঞানের পথে আবার দেশের সমৃদ্ধির দিন ফিরবে! আজ তাঁর সে স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হতে চলেছে। ২১০, বৌবাজারের ল্যাবরেটরী থেকে আবিষ্কারের ফলে অধ্যাপক রামন নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন। নব স্বাধীনতার যুগে বৌবাজার থেকে যাদবপুরে উঠে এসেছে বিজ্ঞান মন্দির। কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যে প্রকাণ্ড সৌধ উঠেছে ও মনোরম পরিবেশে বহু বিজ্ঞানী নিজ নিজ বিষয়ে গবেষণা করবার সুযোগ পেয়েছেন।

বিজ্ঞান সভা স্থাপনের প্রস্তাবে এদেশে বিজ্ঞান চর্চার পক্ষে ও বিপক্ষে নানা কথাই উঠেছিল। সনাতনীদের মনে সংশয় জেগেছিল, বিজ্ঞানের প্রসারে এ দেশের মানুষের স্বাভাবিক সুপ্রবৃত্তিগুলি হয়ত নষ্ট হয়ে যাবে। নানা সভা সমিতিতে মহেন্দ্রলাল এই মত খণ্ডন করতে চেষ্টা করতেন। তাঁর ধর্ম বিশ্বাস ও সামাজিক বুদ্ধি অনেকাংশে সংস্কার মুক্ত ছিল ও তদানীন্তন প্রচলিত কতকগুলি সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে তিনি সভা-সমিতিতে অনেক সময় তীব্র প্রতিবাদ করতেন। শেষ জীবনে বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ বিষয়ে যে সব প্রশ্ন তাঁর মনে জেগেছিল, মৃত্যুর দুই-তিন বছর আগে ১৯০১ সালে একটি ইংরেজী প্রবন্ধে তার আলোচনার চেষ্টা করেছিলেন। প্রশ্নটি এই : বিজ্ঞান চর্চার সাহায্যে মানুষ কি তার নিয়তি সম্বন্ধে কিছু জানতে পারে? (Can physical science enlighten man as to his destiny ?)

ব্যক্তি বিশেষের আত্মিক পরিণামই ছিল মহেন্দ্রলালের লক্ষ্য। বিশ্বাস, কল্পনা ও বিচার বুদ্ধিতে যা অনুভব করেছিলেন, তা-ই ব্যক্ত করে গিয়েছেন এই

প্রবন্ধে। তারপর পঞ্চাশেরও বেশী বছর কেটে গিয়েছে—বিজ্ঞানের জয় যাত্রার বিস্ময়কর পরিণতি দাঁড়িয়েছে আজ। কোন বাধাই তার কাছে অনতিক্রমনীয় মনে হয় না। বায়ুমণ্ডল ভেদ করে ভূলোকেরও উর্ধ্বে সে মানুষকে নিয়ে গেছে, যে দূরত্ব অতিক্রম করতে আলোকেরই লাগে লক্ষ বছরেরও বেশী, তারও বাইরে অবস্থিত নীহারিকা, নক্ষত্র মণ্ডলের খবরও তার যন্ত্রে ধরা পড়েছে। সৃষ্টি ছাড়া তেজস্ক্রিয় পদার্থকে বাস্তব জগতে অবতরণ করিয়েছে—আবার কি ভাবে, কিসের তাড়নায় বিশ্বব্যাপী কোন্ আদি উপাদানের বিপর্যয়ে বিচিত্র অণু-জগৎ বা রহস্যময় নক্ষত্র লোকের সৃষ্টি হলো, তাও সে ভাবতে শুরু করেছে। প্রাণের পরিণতি জড় ভূমিতে কি ভাবে হলো, তারও আলোচনা চলেছে। এদিকে সহস্র বছরের রীতি-নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত আত্মকেন্দ্রিক ধর্ম বিশ্বাস আজ সংকটের মুখে। আবার বিরাট জ্ঞানও যে সব সময়েই মানুষের কল্যাণে রত রয়েছে, তা নয়। এই অর্ধ-শতাব্দীর মধ্যেই মহাযুদ্ধের দাবানল দুইবার জ্বলে উঠেছিল। বিজ্ঞান সেবায় সহ-যোগিতা করতেন যে-সব জাতি, তাঁরাই আবার স্বজাতির কল্যাণের দোহাই দিয়ে যুদ্ধের তাণ্ডবে মেতে গেলেন ও ধ্বংসলীলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে লাগলেন। মানব হত্যায় নৃশংসভাবে নিয়োজিত হল বিজ্ঞানলব্ধ তাঁদের সর্বশক্তি। আজ মহাযুদ্ধের অবসান হলেও অস্বস্তিকর শান্তির মধ্যে বিভীষিকার অন্ত নেই। তাই মহেন্দ্রলালের প্রশ্ন আজ নতুন ভাবে মানুষের মনে জেগেছে ও দিকে দিকে ধ্বনিত হচ্ছে। বিজ্ঞান-চর্চা শেষ অবধি মানুষকে কোথায় নিয়ে যাবে? বিজ্ঞানের ভিত্তিতে সভ্যতার সৌধ উঠেছে সর্বত্রই এই পৃথিবীতে, তবু সব মানুষের মনে আজও শুভ বুদ্ধি জাগেনি, আজও প্রতিযোগিতা চলেছে অমোঘ মারণ যন্ত্র সৃজন করে—অপ্রতিদ্বন্দ্বী কোন্ জাতি জগতে একেশ্বর হয়ে বিরাজ করবে। বিজ্ঞান সেবা কি শেষ অবধি হিংসার ইন্ধন জুগিয়ে পরিণামে সভ্যতাকে ধ্বংস করবে? সব দেশের বিজ্ঞান প্রেমিকদের এই প্রশ্নের জবাব দিতে হচ্ছে। ভারতীয় বিজ্ঞান সভার সভ্যদের ঘরে-বাইরে সেই এক প্রশ্ন। আবার এখানকার ঐতিহ্যকে ঘিরে রয়েছে যাগ যজ্ঞের ধূম্রলোক। বিজ্ঞান বুদ্ধিকে পরাস্ত করতে এদেশে আবার কোন নতুন স্বস্ত্যয়নের ব্যবস্থা করতে হবে কি-না, এই প্রশ্নের জবাবও হয়ত তাঁদের দিতে হতে পারে।

তবে মহেন্দ্রলালের প্রশ্নের ঝোঁক এখন অন্যত্র। ব্যক্তিকে ছেড়ে উঠেছে সমষ্টির কথা। সব মানুষের ভবিষ্যৎ নিয়েই সর্বত্র আলোচনা, তাই ধর্ম, দর্শন,

সমাজনীতি, আত্মতত্ত্ব সবার মধ্যে মানুষ খুঁজছে বিশেষ করে ঐহিক সভ্যতা, সংকটের পরিত্রাণ। পরলোকের আশা দিয়ে সে আর মনকে ভরাতে পারছে না। বিজ্ঞানের কাছে এই সংকটের কি পথ নির্দেশ পাওয়া যেতে পারে, অনেকে ভাবতে শুরু করেছেন। নিজের সীমাবদ্ধ জ্ঞান, বিচার-বুদ্ধিতে যে কয়টি কথা বিজ্ঞানের পক্ষে বলা চলে মনে হয়েছে, তার আলোচনা করে এই প্রসঙ্গের উপ-সংহার করব।

আপেক্ষিকতাবাদ শুরুতে কালের মানদণ্ডকে দেশ নির্দেশের অক্ষত্রয়ীর সমতুল্য ভেবে যে চতুষ্পাদ জগতের রচনা করেছিল, জ্যামিতিক সেই কল্পনার মধ্যে কালের প্রবহমান সত্তা রূপায়িত হয়নি। এখন নিত্য প্রসারমান ব্রহ্মাণ্ডের কল্পনার মাধ্যমে কালের অসামান্যতা বিজ্ঞানীর মনে গভীর ভাবেই মুদ্রিত হয়ে গিয়েছে। অতীত থেকে বর্তমানে ছাপিয়ে চলেছে একমুখে কালের প্রবাহ। তারই মধ্যে যথা সময়ে ঘটেছে নানা নক্ষত্রমণ্ডল বা নীহারিকা-জগতের উদ্ভব। ঘটেছে বিবিধ তেজষ্ক্রিয় পরমাণুর উদ্ভব ও বিনাশ। তার নীতি বিশ্লেষণ করে আজ, কালের পরিবর্তন স্রোতের নিশানা বা তার পরিবর্তনের উপযুক্ত মাপকাঠি পাওয়া যাচ্ছে। গ্রহ, সূর্য, নক্ষত্র—বিশ্বের সব জড় উপাদানের সৃষ্টি স্থিতি-প্রলয়, আজ বিশেষ করে বিজ্ঞানের গবেষণার বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। জড়ের জগতে বিবর্তন ও ক্রমবিকাশের তত্ত্ব আজ পূর্ণগৌরবে প্রতিষ্ঠিত। যে-সব গ্রহ সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে, তার মধ্যে বসুন্ধরার অবস্থান ও তার পরিণতির বৈশিষ্ট্য আজ গভীর গবেষণার বস্তু। নিরন্তর সৃষ্টির মধ্য দিয়ে কোন সুদুর অতীতে বস্তু জগতে প্রাণশক্তির সংঘাত হল—অজৈব পরিণতি ঠেকল এসে জীবজগতের বিকাশে, তার আলোচনা শুরু করেছিলেন বার্গস্যঁ প্রমুখ দার্শনিকেরা। আজ বিজ্ঞানীরাও সেই কথা ভাবছেন ও তার মধ্যে কোন প্রচ্ছন্ন মূল সূত্র আছে কিনা, তারই অনুসন্ধান করছেন। বিজ্ঞানীর মতে, পরিদৃশ্যমান বিশ্বের জৈব, অজৈব—নানা উপাদান সব কিছু একটি নির্দিষ্ট মুহূর্তে সৃষ্টি হয়নি। আবার ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্রই পরিণতি যে একই ছন্দে ঘটেছে, তাও নয়। এইভাবে পরীক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান শাস্ত্রেও ইতিহাস-সুলভ আলোচনা-রীতি গৃহীত হয়েছে। তাঁরা ভাবছেন, সব জিনিসের উদ্ভব ও পরিণতির কারণ রয়েছে, আর তার অন্বেষণ পরিবর্তনবাদে বিশ্বাসী বিজ্ঞানীর অবশ্য কর্তব্য। এই পৃথিবীতে প্রাণের অভিব্যক্তি ঐতিহাসিক ধারা ক্রমে পর্যালোচনা করতে গেলে প্রথমেই আশ্চর্য হতে হয়—জীব জগতের বৈচিত্র্যে। কত রকমের বিভিন্ন আকৃতির জীবজন্তু নানা সময়ে

জন্মেছে, আবার পরিশেষে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। যথারীতি কালের স্রোতের মধ্যে কবে তাদের উদ্ভব হয়েছিল, তখন পারিপার্শ্বিক অবস্থাই বা ছিল কি রকম, এই পৃথিবীতে—এদের বিষয় আলোচনা করে কি বিবর্তনবাদের কোন মূলসূত্র ধরা পড়বে? আজও পর্যন্ত এই নিয়ে তর্ক বিতর্ক শেষ হয়নি, একই মতে সকল বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন না। নিজের অভিরুচির উপর এখনো অনেকটা নির্ভর করছে বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিভঙ্গী।

সম্প্রতি এই কঠিন সমস্যার উপর আশার আলোকপাত করেছেন একজন লব্ধ-প্রতিষ্ঠ ফরাসী বিজ্ঞানী ও খৃষ্টীয় সন্ন্যাসী Pierre Teilhard. Phenomena of Man বলে এঁর একখানি বই সম্প্রতি প্রকাশিত হয়ে সারা জগতের দৃষ্টি আর্কষণ করেছে। এর বক্তব্য অল্প কথায় বোঝাবার চেষ্টা করব। জৈব অভিব্যক্তির বিষয় আলোচনা করে তিনি বলেছেন—কালপ্রবাহে বিভিন্নপ্রাণীর অভিব্যক্তি লক্ষ্য করলে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে জীবদেহে স্নায়ুমণ্ডলীর অভিব্যক্তি। মনে হয় প্রাণ-শক্তি যেন চাইছে অবচেতনা থেকে চেতনার উচ্চস্তরে বিকশিত হতে। এই সূত্র ধরে বিবর্তন আলোচনা করলে সহজেই একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়। বিবর্তন-বৃক্ষের যে শাখায় মেরুদণ্ডীদের স্নায়ুগ্রন্থির বিপুল বিকাশ চলেছিল, তারই সঙ্গে সঙ্গে দেখছি মস্তিষ্কেরও দ্রুত উন্নতির পরিচয়। যে ধারায় এর সাক্ষৎ মেলে তার শেষ ভাগে মানুষের উৎপত্তি। অতিকায় দুধর্ষ কত বলবান জীব ছিল অতীতে, তার মধ্যে উঠলো মানুষ—অপেক্ষাকৃত দুর্বল প্রাণী। কিন্তু সকলকে পরাজিত করে আজ সে পৃথিবীর রাজা হয়ে বসেছে। এও একদিনে হয়নি ও শুধু বুদ্ধিবলে নয়। যখন সে ভাবতে শিখল, তখনই তার ঊর্ধ্বগতি দ্রুততালে এগিয়ে চলল। শুধু ব্যক্তি বিশেষের ভাগ্যের কথা বিচারের মধ্যে না এনে ভাবা যাক সারা মানবজাতির কথা। চিন্তাধারা সারা পৃথিবী ছেয়ে ফেলবার পর অতীতে মানুষ যে অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান অর্জন করেছিল, পরবর্তীকালের বংশধরের জন্যে তা রেখে যাবার সম্ভাবনা হল।

আবার তা থেকে প্রেরণা ও পাথেয় সংগ্রহ করে যুগে যুগে বংশধরেরা জ্ঞানের ভাণ্ডার বাড়িয়ে চলল। এইভাবে গড়ে উঠেছে বর্তমান সভ্যতা, আর ক্রমে মানুষও সম্যক্ সমৃদ্ধ হতে বসেছে। কি বিরাট সম্ভাবনা তার সামনে খুলে গিয়েছে! বিবর্তনের ঊর্ধ্বস্তরে পৌঁছতে প্রাণশক্তি একটি বিশেষ রীতি অবলম্বন করেছে—সে হচ্ছে সহযোগিতা। প্রাণ ছিল প্রথমে দুর্বল, মাত্র একটি জীবকোষে নিবদ্ধ—বহু কোষের

জীব হয়ে সে শক্তি সঞ্চয় করল। উচ্চ পর্যায়ের জীবের দেহে কত সহস্র কোটি জীবকোষ পরিপূর্ণ সহযোগিতায় তাদের কাজ করে চলেছে, পরস্পরকে সাহায্য ও পরিপূর্ণ করে তুলেছে তাদের জীবন।

প্রাণীর দেহে বিজ্ঞানী যে সহযোগিতার অঙ্কুর দেখেছেন, খৃষ্টীয় সাধু মনে করেন সামজ-গঠনে সেই এক নীতিই কাজ করছে; আবার ভবিষ্যতে বিবর্তনের নির্দেশও তিনি তাতে পেয়েছেন। মানুষের ভবিষ্যৎ মানুষের হাতে—সে যদি অনুসরণ করে ব্যক্তি নির্বিশেষে দয়া ও সহযোগিতার মনোভাব, তা হলে যে সংঘাত ও দ্বেষের প্রকোপ আজ দেখা যাচ্ছে, তার নিরসন হবে। তাহলেই সার্বজনীন বিশ্বমানবের সভ্যতার আবির্ভাব হবে। অন্যথায় যেমন অতিকায় জীবজন্তুরা অতীতেই লোপ পেয়েছে ও সাক্ষ্য দিতে আছে মাত্র তাদের প্রস্তরীভূত কঙ্কালের অবশেষ, ভবিষ্যতে মানব সভ্যতারও ওই রূপ বিষাদভরা পরিণাম হওয়া বিচিত্র নয়! বিজ্ঞানের এই কথা আমাদের দেশের অনেক সাধুর শিক্ষার সঙ্গে মিল আছে বলে মনে ঠেকে। যে ধর্মবিশ্বাস, সমাজ-নীতি ও জাতিভেদ, হিংসাদ্বেষের মূল কথা হয়ে রয়েছে, তার সঙ্গে বিজ্ঞানের মিল নেই, বরং অজ্ঞান থেকে তার উদ্ভব হয়েছে বলা চলে। মানুষের সভ্যতার মধ্যে চিন্তার স্বাধীনতা যে ভাবে ফুটে উঠেছে, কীটপতঙ্গ রাজ্যের পর্যালোচনা করলে দেখতে পাই, সহজপ্রবৃত্তি বা ইন্‌স্টিংক্ট-এর প্রকর্ষ ভিন্ন রকমের। এর উপর ভিত্তি করে কীটপতঙ্গ-সমাজ গড়ে উঠেছে। তারও নিয়মানুবর্তিতা ও ছন্দোবদ্ধ জীবন যাত্রা দেখে আমাদের বিস্মিত হতে হয়। তবে সেই ধরণের পরিণতির কোন ভবিষ্যৎ নেই, প্রকৃতির এই ইঙ্গিত বিবর্তনের মধ্যে রয়েছে বলে Pierre Teilhard-এর বিশ্বাস। ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ভবিষ্যতে যদি মানুষ বিশ্বসমাজ গড়ে তুলতে পারে তো এক হিসাবে প্রাণের অভিযান জয়যুক্ত হল। মানুষ এইভাবে ভবিষ্যতে যে উন্নতির সৌধ রচনা করতে পারবে, তার মহিমা ও ঐশ্বর্য আজ আমরা কল্পনাও করতে পারছি না। আজকাল বিজ্ঞানের প্রগতি শুধু তার ক্ষীণ ইঙ্গিত দিচ্ছে। তাই বিজ্ঞান থেকে মুখ ফিরিয়ে মনন, বুদ্ধি ও প্রেরণা অন্যদিকে চালিয়ে যে মানুষের সিদ্ধি হবে—এ নয়। বীরের মতো সব বাধা অতিক্রম করে মানুষকে চলতে হবে। ভবিষ্যতের সভ্যতা গড়ে তুলতে হবে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে। তার মধ্যে থাকবে সব মানুষের স্থান। বিজ্ঞানীর কাছে পাই এই আশার বাণী। বিজ্ঞানোচিত মনোভাব, হিংসাদ্বেষের

পরিবর্তে সহযোগিতা ও প্রেমের প্রতিষ্ঠার দরকার—বিবর্তনের ইতিহাস এই নির্দেশ দিচ্ছে। বিজ্ঞানের পথেই জয়লাভ হবে। বিজ্ঞানকে প্রত্যাখ্যান করে অতীতের পথে প্রত্যাবর্তন করলে মানুষ চরম সাফল্যে পৌঁছবে না।

ফরাসী বিজ্ঞানীর এই মতের মধ্যে আছে তাঁর বহু বছরের চিন্তা। তাঁর জীবনের ইতিহাসে আছে অনন্যসুলভ আত্মত্যাগ ও মানবপ্রীতি। এঁর কথা আমার মনকে গভীর ভাবে স্পর্শ করেছে বলে এঁর সাধনার কথা আপনাদের বললাম। খৃষ্টীয় সাধুর কথাগুলির সঙ্গে ভারতের মরমী সাধকদের কথার সঙ্গতি অনেকের কানে ঠেকবে, আর মনে পড়বে মহাবীর বিবেকানন্দের কথা; "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

শিশির কুমার মিত্র

আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোডে (আপার সারকুলার রোড) বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান কলেজে আজকাল বিজ্ঞানের নানাবিধ শাখার শিক্ষার বন্দোবস্ত হয়েছে। প্রথম যখন এই বাড়ীর গোড়া পত্তন হয়, তখন ওই তিনতলা বাড়ী কেবলমাত্র উচ্চাঙ্গের রসায়ন-শাস্ত্রের শিক্ষা ও গবেষণায় নিয়োজিত হবে—এই অনেকে মনে করতেন। আচার্য রায় যখন প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে অবসর গ্রহণ করে এই বাড়ীতে গবেষণা শুরু করেন, তখনও এই ধরণের কথাই বিজ্ঞানীমহলে শোনা যেত। অবশ্য তারকনাথ পালিত এবং রাসবিহারী ঘোষের কাছ থেকে যে দান বিশ্ববিদ্যালয় পেয়েছিলেন, তা বিভিন্ন রকম বিজ্ঞানের শিক্ষায় নিয়োজিত হবে—এই নির্দেশ ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ও তা-ই চেয়েছিলেন। তবে তখন মহাযুদ্ধের হিড়িক চলছে। কাজেই ভিন্ন ভিন্ন বিজ্ঞান বিষয়ের অধ্যাপক যাঁরা নির্বাচিত হয়েছিলেন, তাঁরা তখন সকলে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কাজে যোগদান করতে পারেননি। অধ্যাপক রামন তখনও সরকারী বিভাগে কাজ করছেন। ডাঃ দেবেন্দ্র মোহন বসু ও অধ্যাপক আগরকার তখন জার্মানীতে অন্তরীণ। তবু স্যার আশুতোষ মনে করলেন অচিরে বিভিন্ন বিজ্ঞানের ক্লাশ শুরু করা দরকার। যন্ত্রপাতির অভাব নানাভাবে মেটাবার চেষ্টা হলো। কতক যন্ত্রপাতি জাতীয় শিক্ষা পরিষদে পাওয়া গেল, কতক আনা হলো বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ থেকে। শিবপুরেও তখন সূক্ষ্ম কাজের উপযোগী কয়েকটা যন্ত্র ছিল, যা' বহুদিন আগে আনা হলেও সাধারণ শিক্ষার কাজে লাগতো না। জার্মান অধ্যাপক বুল ভেবেছিলেন, এদেশীয় ছেলেরা সূক্ষ্ম মাপজোখে দক্ষ হবে। তাই থিওডোলাইট, মানদণ্ড ইত্যাদি যা সংগ্রহ করেছিলেন, তা তখনকার যুগে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী প্রার্থীদের পরীক্ষার সময় চমক ও ভীতি উদ্রেক করতো।

স্যার আশুতোষের আগ্রহে ১৯১৬ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুনভাবে শিক্ষা-দীক্ষার আয়োজন হলো। পদার্থ-বিজ্ঞানের ক্লাসও সুরু হবে। এই জন্যে কয়েকজন নবীন ডিগ্রীধারীদের তিনি পদার্থ-বিজ্ঞানের লেকচারার নিযুক্ত করে সতেরো সাল থেকে স্নাতকোত্তর ক্লাস শুরু করে দিলেন। ডাঃ শিশির কুমার মিত্র সেই সময় এসে যোগদান করলেন। স্যার সি, ভি, রামন তখনও ২১০ নং

বহুবাজার ষ্ট্রীটে ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনে এসে সরকারী কাজের পর যাকিছু তাঁর অবসর মিলতো, সবই গবেষণার কাজে লাগাতেন। তাঁর উৎসাহ অনেকের মনে আশার সঞ্চার করেছিল। উচ্চাঙ্গের গবেষণা করবার দুরাশা অনেকেরই হয়েছিল। তাই তাঁরাও ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনে প্রোফেসর রামনের কাছে গবেষণা শুরু করলেন।

এদিকে উচ্চাঙ্গ গণিতে রাসবিহারী ঘোষ অধ্যাপকরূপে ডাঃ গণেশ প্রসাদ কিছুদিন আগে বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেছেন। তিনি স্যার আশুতোষকে সাহায্য করবার জন্য ছাত্রদের গবেষণার কাজে লাগিয়ে দিলেন। এঁরা প্রায় সকলেই কৃতবিদ্য হয়ে ডক্টরেট উপাধি পেয়েছিলেন। পরে এই দলের অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান কলেজে শিক্ষকের কাজ গ্রহণ করেন।

ডাঃ শিশিরকুমার মিত্র ও ফণীভূষণ ঘোষ, এঁরা দুজনেই, আলোক-তরঙ্গ বাধা পেলে কিভাবে বিচ্ছুরিত হয়ে অন্ধকার রাজ্যেও আলোছায়ার বিচিত্র সমাবেশ সৃষ্টি করে—তাই নিয়ে গবেষণা করতেন। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনে মিত্র মশায়ের কাজ ছিল এই ধরণের। সেই সময়কার আনি-দুয়ানির যে বিচিত্র রকম ঢেউ খেলানো বেড় ছিল, আলো সেই বাধাকে ডিঙিয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গের আকারে ছায়ারাজ্যে প্রবেশ করতো তাদের বিচিত্র সমাবেশ সম্পর্কে ডাঃ মিত্র পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাতেন। এই ভাবে পরীক্ষায় যে নতুন তত্ত্ব প্রকাশিত হলো, তা নবীন বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করেছিলেন ম্যাক্সওয়েলের তরঙ্গবাদ দিয়ে বুঝতে। এই ধরণের কাজ একেবারে নতুন। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু তখন পদার্থ বিজ্ঞানের কাজ থেকে সরে গিয়ে উদ্ভিদজগতে প্রাণের বিচিত্র অভিব্যক্তির রহস্য উদ্ঘাটনে নিমগ্ন রয়েছেন। পদার্থ বিজ্ঞানীরা তাই তাঁর কাছে বিশেষ আমল পেত না। অধ্যাপক রামন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চাভিলাষী ছাত্রদের পথ নির্দেশ করে এদেশে নতুন যুগের সৃষ্টি করেছিলেন।

গতানুগতিকভাবে বিজ্ঞান কলেজে স্নাতকোত্তর শিক্ষা চালু হলো। কিছুকাল পরে ডাঃ রামন পালিত অধ্যাপক হয়ে যোগদান করলেন। তবে তাঁর নিজের গবেষণা নিয়ে ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনে কাজ করতেন। যে সব ছাত্র তাঁর কাছে গবেষণাধীন ছিল, তারা সব সময় বহুবাজারেই কাজ করতো, যদিও আধুনিক যন্ত্রপাতি সবই পালিত ফাণ্ড থেকে কেনা হয়েছিল। কিছুদিন পরে ডাঃ রামনের ঐকান্তিক সাধনা সাফল্য লাভ করলো এবং বিজ্ঞান-লক্ষ্মী তাঁকে জয়মাল্য পরিয়ে দিলেন। যে নতুন ধরণের কাজ তাঁর নামের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, সেই তথ্য উদ্ঘাটনের

দরুন নোবেল পুরস্কার তাঁর ভাগ্যে জুটলো। ডাঃ মিত্র ও অন্যান্য নবীন ছাত্রেরা তাঁরই অনুকরণে গবেষণা ও অধ্যাপনা—এই দুই কাজেই নিজেদের ব্যাপৃত রেখেছিলেন।

কিছুদিন বাদে ডাঃ মিত্র ফরাসী দেশে গিয়ে নতুন ধরণের কাজকর্ম সুরু করলেন। যুদ্ধোত্তর কালে ইলেক্‌ট্রন ভালবের উচ্চাঙ্গের বিকাশের ফলে বিদ্যুৎ-বার্তা প্রেরণ তখন সহজসাধ্য হয়েছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গের কম্পন তুলে ঈথারের মাধ্যমে অপেক্ষাকৃত বহু দূরে সংবাদ প্রেরণ করা যায়—এই বিস্ময়কর আবিষ্কার প্রথম মহাযুদ্ধের মধ্যেই ঘটেছিল। আগে বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করতেন, হাজার হাজার মাইল দূরে খবর পাঠাতে হলে সেই অনুযায়ী শক্তিশালী প্রেরকের সাহায্য নিতে হবে। এখন দেখা গেল, ছোটখাটো তরঙ্গের সাহায্যে এই ধরণের খবরও বহু দূরদেশে পাঠানো যায় ও ইলেক্‌ট্রন ভাল্‌বের গুণে তার ক্ষীণশক্তি স্ফীত করে সহজ শ্রবণযোগ্য করা যায়। কুব্জপৃষ্ঠ পৃথিবীর উপরে অবস্থিত গবেষণাগার থেকে যে তরঙ্গ উৎপন্ন করা হতো, তা পৃথিবীর বিশেষ আকৃতির জন্যে সমতল আশ্রয় করে বেশীদূর অগ্রসর হতে পারে না—গণিতজ্ঞেরা এটা প্রমাণ করে দিয়েছিলেন। কাজেই অন্য ধরণে এই ক্ষুদ্রাকায় তরঙ্গের প্রসার চলেছে—এটা বিজ্ঞানীরা বুঝলেন। এই-ভাবে নজর পড়লো হেভিসাইড ও অ্যাপলটন-এর কল্পিত উচ্চাকাশের আয়ন-মণ্ডলের দিকে। ছোট ছোট তরঙ্গগুলি প্রথমে ঊর্ধ্বে ছুটে গিয়ে এই আয়নমণ্ডলে প্রতিহত হয়ে আবার পৃথিবীর দিকে ফিরে আসে। তখন আয়নমণ্ডল প্রায় আরসির মত কাজ করে। বিরাট বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়ে গেলেও তরঙ্গের শক্তির বিশেষ হ্রাস পায় না বলেই এই ধরণের সংবাদ প্রেরণ করা সম্ভব হয়েছিল—এটা বিজ্ঞানীরা বুঝলেন। যে সব বিজ্ঞানী এই নতুন আবিষ্কৃত রাজ্যে কাজ করতে এগিয়ে এলেন, ডাঃ মিত্র তাঁদের মধ্যে একজন এবং ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম। এঁরই উৎসাহে আকাশবাণীর প্রাক্ যুগেও মাঝে মাঝে বিজ্ঞান কলেজ থেকে নানাবিধ চিত্তাকর্ষক প্রোগ্রাম প্রচার করা হতো। তার কথা হয়তো এখনো অনেকের মনে আছে।

ফ্রান্স থেকে ফিরে আসবার পর ডাঃ মিত্র বেতার বিভাগ গঠনের কাজে আত্ম-নিয়োগ করলেন এবং পেলেনও অনেক উৎসাহী ছাত্র। পরে ডাঃ রামন চলে যাবার পর তিনি রাসবিহারী ঘোষ অধ্যাপক হলেন এবং নানাভাবে গবেষণা চলতে লাগলো। রক্ষিত, ভড় প্রমুখ কৃতী ছাত্রেরা, যাঁরা তাঁর কাছ থেকে দীক্ষা পান—

তাঁরা বেতার বিষয়ে নতুন নতুন কাজ করে যশস্বী হয়েছেন। উচ্চাকাশে আয়নমণ্ডল কি করে সৃষ্টি হয়, সে সম্পর্কে ডাঃ মিত্র অনেক দিন গবেষণা করেছিলেন। তাঁদের সমবেত চেষ্টার ফলে ভারতীয় বিজ্ঞানীরা আয়নমণ্ডল সম্পর্কে একখানি প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করেন, যাতে ডাঃ মিত্রের সুনাম দেশ বিদেশে ছড়িয়ে পড়লো। বিদেশ থেকেও এলো তার স্বীকৃতি।

বেতার-বিজ্ঞান ও ইলেকট্রনিক্স-এর একটি পূর্ণাঙ্গ বিভাগ গঠনের জন্যে ডাঃ মিত্র বহুদিন ধরে চেষ্টা করে আসছিলেন। স্বাধীনতার পরবর্তী যুগে সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ উভয়েই উপলব্ধি করলেন, এই বিষয়টি পদার্থ-বিজ্ঞানের অংশ হিসাবে অনুশীলিত হওয়ার চাইতে একটি সম্পূর্ণ পূর্ণাঙ্গ বিভাগ গঠন করা প্রয়োজন। তার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের মধ্যে একটি নতুন গবেষণা কেন্দ্র সৃষ্টি হলো। সেখানে ডাঃ মিত্র যে কাজ আরম্ভ করেন, তার নানা দিকে ব্যবহার ও বিকাশ চলেছে।

সারা জীবন বিজ্ঞান-সাধনার কাজে ব্যাপৃত থেকে তিনি একটি সতেজ বিভাগ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। তাঁর ছাত্রেরা তাঁরই পরিকল্পনা রূপায়িত করবার জন্যে পরিশ্রম করছেন। আজ তিনি আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি যে বিজ্ঞানের সাধনায় আত্মোৎসর্গ করেছিলেন, তা সকলের সামনে পথনির্দেশক হিসাবে সারা দিক দীপ্ত করে রাখবে।

সেই যুগে বাংলাভাষায় বিজ্ঞানের কথা প্রচার করবার জন্য যে অল্পসংখ্যক কৃতী লেখক ছিলেন, তাঁদের মধ্যে ডাঃ মিত্রের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সঙ্গে তাঁর প্রথম থেকেই যথেষ্ট সদ্ভাব ও সম্প্রীতি ছিল।

"জ্ঞান ও বিজ্ঞান"-এর বিশেষ সংখ্যায় তাঁর কথা স্মরণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

গণিত-বিজ্ঞানী জ্যাক হাদামার

১৭ই অক্টোবর, ১৯৬৩ সালে বিশ্ববিখ্যাত ফরাসী গণিত-বিজ্ঞানী জ্যাক হাদামার (Jacques Hadamard) পরলোক গমন করেছেন। ১৮৬৫ সালে এঁর জন্ম। পিতা স্কুলে সাহিত্য পড়াতেন। ছেলেকে অনেক সময় বলতেন, গণিতশাস্ত্র খুবই দুরূহ ব্যাপার—তোমার বোধ হয় সেই দিকে না ঝোঁকাই ভাল। তাই জ্যাক গণিতের অধ্যয়ন আরম্ভ করেন একটু বেশী বয়সে। তবে তাঁর অসাধারণ কৃতিত্ব প্রথম সাধারণ প্রতিযোগিতায় (১৮৮৪) প্রকাশ হল। এই পরীক্ষাতে যত নম্বর পেলেন, তাঁর আগে কেউ তত পায়নি। এখনো তাঁর রেকর্ড অপরাজিত রয়েছে সে দেশে। Ecole Normal Superieure—এ ভর্তি হলেন। সব বিষয়ে দেশের সেরা ছাত্ররা ওই খানেই পড়ে এসেছে। ১৮৯২ সালে Function-এর সাধারণ গুণাগুণ ব্যাখ্যা করে যে থিসিস লেখেন তা এই বিষয়ের একটি বিশেষ পথনির্দেশ করেছে। ডক্টর উপাধি পাওয়ার চার বৎসর বাদেই সংখ্যা গণিতের একটি কূট প্রশ্নের সমাধান করে দিলেন। এটি ফরাসী দেশের ইনস্টিটিউট, প্রাইজের বিষয় বলে ঘোষণা করেছিলেন।

হাদামার সারা জীবন গবেষণা নিয়ে ও অধ্যাপনায় কাটিয়েছেন—আগে Sorbonne বিশ্ববিদ্যালয়ে College-de-France-এর প্রফেসর হিসাবে অধ্যাপনা করে ছিলেন ১৯৩৭ সাল অবধি। গণিতে নানা বিষয়ে তাঁর অমর দান বিশ্বে স্বীকৃতি ও খ্যাতিলাভ করেছে।

জীবন দেবতা তাঁকে অনেক দুঃখই দিয়েছেন। প্রথম মহাযুদ্ধে হারালেন দুই পুত্র। এদের মধ্যে আবার একটির উপর পিতা অনেক আশা রাখতেন। বলতেন, এর তুলনায় আমি গণিতবিদ হিসাবে কিছুই নই; গণনার মধ্যেই আসি না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে আর একটি পুত্রও হারালেন তিনি। ইহুদীদের নির্যাতন থেকে রক্ষা পাবার জন্য চার বৎসর আমেরিকায় (১৯৪০-৪৪) থাকতে হয়েছিল। এত দুঃখ কষ্টের মধ্যেও তাঁর মানসিক ক্ষমতা অটুট ছিল বহুদিন। এমন কি একানব্বই বৎসর বয়সেও মৌলিক প্রবন্ধ লিখেছেন। শেষ দিনের কিছু আগে হারালেন সহধর্মিনীকে, আবার এক নাতিও চলে গেলেন দুর্ঘটনার কবলে। এত কষ্টের

মধ্যেও তাঁর ধৈর্য ছিল অপরিসীম—আর অল্পবয়স্ক যুবার মত ছিল তাঁর উৎসাহ ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করার স্পৃহা।

তিনি বলতেন, অন্যায় সহ্য করা কিংবা তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ না করা কখনই উচিত নয়। অবশ্য মাত্র এক ক্ষেত্রে চুপ করে থাকা চলতে পারে,—যদি সেই অন্যায়ের লক্ষ্য হই আমি নিজে।

দেশের অনেক তুমুল উত্তেজনার সময় তিনি নিজের মতামত প্রকাশ করতে দ্বিধা করেন নি। তিনি বলতেন, অন্যায়ের সঙ্গে সংগ্রাম কোন ব্যক্তি বিশেষের বিরুদ্ধাচরণ নয়—এই যুদ্ধ ন্যায়, সত্য ও আদর্শের মান বজায় রাখবার জন্যই। তাঁর অনন্যসাধারণ গুণাবলী সর্বদেশে স্বকৃতি পেয়েছে। নিজের দেশের ইনস্টিটিউট বহুবার তাঁর প্রবন্ধগুলিকে জয়মাল্যে ভূষিত করেছে। ১৯১২ সালে Poincar-এর তিরোধানের পর তিনি সভ্য নির্বাচিত হলেন ইন্‌স্টিটিউট-এ। ১৯৬২ সালে, তারই জয়ন্তী উপলক্ষে স্বর্ণপদক পেলেন ইনস্টিটিউট থেকে। সত্তর বৎসর পূর্তির সময় বন্ধুরা তাঁরই প্রবন্ধগুলি থেকে সংকলন করে একখানা চারশ' পাতার বই প্রকাশ করলেন তাঁকে সম্মানিত করতে। নব্বই বৎসরের বৃদ্ধকে দেশের সরকার "Grand-croix-de la legion d'honneur" দিয়ে বিভূষিত করলেন।

বহুদেশ পর্যটন করেছেন তিনি, এমনকি, ভারতবর্ষেও একবার সায়েন্স কংগ্রেসে উপস্থিত হয়েছিলেন। এদেশের অনেক বিখ্যাত বিজ্ঞানী তাঁর ছাত্র। সারা জীবন তিনি ছিলেন সত্যের পূজারী। বিজ্ঞানের সৌন্দর্যের অনুভূতি ছিল তাঁর কাছে প্রধান কথা—তার প্রয়োগের দিকে আকর্ষণ গৌণ ব্যাপার বলে তিনি মনে করতেন। ১৯৫৯ সালে এই বিষয়ে তিনি একটি ছোট পুস্তিকা প্রকাশ করেছিলেন, যার উদ্দেশ্য ছিল, বিজ্ঞানে উদ্ভাবনীর পেছনে যে মনস্তত্ত্ব বিরাজ করছে, তার বিচার। (ঐ পুস্তিকার কিছু নির্বাচিত অংশের অনুবাদ পরে দেওয়া হল।)

গালিলিও

১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৫৬৪ গালিলিও পিসা-তে জন্মেছিলেন। সব দেশের বিজ্ঞানীর কাছে এঁর নাম সুপরিচিত। তাঁর জন্মের চার-শ' বৎসর পরে আজ সব দেশে সভাসমিতিতে তাঁর কথা ও জীবনীর আলোচনা হচ্ছে।

তাঁর পরিবারের নাম ছিল গালিলাই। পিতা পুরাণ-সাহিত্যে কৃতবিদ্য ছিলেন, তাছাড়া সঙ্গীতে ও গণিতে তাঁর দখল ছিল—নিজে Lute ভাল বাজাতে পারতেন—সঙ্গীত-তত্ত্বের উপর বইও লিখেছিলেন কয়েকখানি। প্রথমে ১৩ বৎসরের ছেলে গালিলিও গেলেন Vallam-brosa-র বেনেডিক্‌টিন (Benedictine) সম্প্রদায়ের মঠে। দুই বৎসর ধরে সাহিত্য, ন্যায় ও ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করলেন। তবে শেষ অবধি মঠ ছাড়তে হলো। বাপ বললেন ছেলের দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ, বেশী পড়াশুনা ক্ষতিকর। অবশ্য হয়তো মনে মনে একটু ভয়ও ছিল—ছেলে যদি সন্ন্যাসী হয়ে যায়—সংসারের দিকে নজর দিতে কেউ থাকবে না তাঁর পরে। সচ্ছল অবস্থা আর নেই তাঁর। সংসারের হতশ্রীকে পুনরুদ্ধার করতে ছেলেকে চেষ্টা করতে হবে। আজ এখন গালিলিওর জীবনের সব কথা জানা দুষ্কর। তবে আমরা জানি, তিনি নিজে খুবই ভালবাসতেন সঙ্গীত ও চিত্রকলা। নিজের ইচ্ছা চালাতে পারলে হয়তো শেষ অবধি চিত্রকর হয়ে পড়তেন। তবে তা হলো না। ১৫৮১ সালে সতেরো বৎসরে ঢুকলেন পিসা (Pisa) বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাক্তারী পড়তে। অভিভাবক ভেবেছিলেন এতেই অর্থাগমের বিপুল সম্ভাবনা। সে সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক ছাত্রকেই দর্শন পড়তে হতো। তখন অ্যারিষ্টটলীয় যুগ—সেই গ্রীক দার্শনিকের কথা সকলেই মাথা পেতে নেয় নির্বিচারে। সব জ্ঞান ও বিজ্ঞান সুরু হতো ওই মনোভাবকে ভিত্তি করে। গালিলিওর ঝোঁক কিন্তু অল্প বয়স থেকেই হাতে-কলমে করে দেখতে—তাই তর্ক লাগতো অন্য ছাত্রদের সঙ্গে। কখনও কখনও শিক্ষকদের সঙ্গেও বেধে যেত বাক্‌যুদ্ধ। যুক্তিতর্কের প্রতি প্রবণতা তাঁর সারা জীবনে লক্ষ্য করবার জিনিষ—এই স্বভাবই শেষ জীবনে তাঁর অশেষ দুঃখের কারণ হলো। এই কাজ-পাগল কি করে বিশুদ্ধ গণিতের দিকে ঝুঁকলো ? গল্প এই—পরিবারের এক বন্ধু ছিলেন গণিতশাস্ত্রে মহাপণ্ডিত। তিনি বিখ্যাত ছিলেন সে সময়—সকলে যেত তাঁর কাছে পড়তে। একদিন কোন কাজে গালিলিও এসেছেন তাঁর বাড়ীতে।

তাস্‌কানীর (Tuscany) শাসকের পুত্র তখন সেই পাণ্ডিতের কাছে পড়ছে। কাজেই গালিলিও অনেকক্ষণ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইলেন, অনেকক্ষণ মনোযোগ দিয়ে শুনলেন সেই গণিতের ব্যাখ্যা। এই থেকে সুরু হলো মনের প্রচণ্ড পরিবর্তন। সেই থেকে ডাক্তারী পড়ায় আনন্দ পান না। গণিতের অধ্যয়ন বাসনাই প্রবল হয়ে উঠলো, গালিলিওর ডাক্তারী পড়া হলো না। বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাধি পেলেন না। পারিবারিক নানা কারণে গৃহস্থালী ফ্লোরেন্সে (Florence) উঠে এলো। বাবার অর্থ সামর্থ্য নেই ছেলেকে বিদেশে রেখে পড়ান। কাজেই গালিলিও চলে এলেন ফ্লোরেন্সে। এখানে সেই সভাপণ্ডিতের কাছে পড়তে সুরু করলেন—গণিত ও পদার্থবিদ্যা। অদ্ভুত তাঁর অধ্যবসায়। অল্প সময়ের মধ্যেই শিক্ষককে ফেলে গেলেন অনেক পেছনে। এই বিদ্যায় ও অনুসন্ধানে প্রতিষ্ঠা এলো—নানা দেশে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লো। ২৪ বৎসর বয়সে তিনি এই নিয়ে মেতে আছেন, উদ্ভাবন করছেন নানারকমের যন্ত্র এবং নানারকম পরীক্ষাও সুরু হয়েছে তাদের সাহায্যে। নবীন বিজ্ঞানীকে প্রথমে ভুগতে হয়েছিল অর্থকষ্টের জন্যে। ছেলে পড়িয়ে রোজগারের চেষ্টা ছিল, কিন্তু তাতে অল্পই আয় হতো সে সময়। তবে ১৫৮৮ সালে দেখি, 'পিসা' বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতের শিক্ষকতা করছেন। আয় মাত্র ৬০ Scudi। একজন হিসাব করে বলেছেন—বর্তমানের হিসাবে এটা ৯০০-১০০০ টাকা বাৎসরিক আয়ের সামিল হবে। এতে পরিবারের সব খরচ চালানো দুষ্কর। তখন এদেশের মত ইটালিতে একান্নবর্তী পরিবারের যুগ। বাপ আবার মারা গেলেন ১৫৯১ সালে। গালিলিও হলেন কর্তা। সকলের ভার বইতে হলো—মা, দুই বোন। ছোট ভাই মাইকেল এন্‌জেলো (Michael-Angelo) (ইনি বোধহয় গান-বাজনা নিয়েই সময় কাটাতেন) বিদেশে চলে গেলেন এবং পোলাণ্ডে রাজদরবারে কলাবিদ্‌ হলেন। বাড়ীতে-ফ্লোরেন্সে রয়ে গেল তাঁর স্ত্রী ও সাতটি ছেলে-মেয়ে। গালিলিওকে তাঁদেরও দেখতে হতো। এই জন্যে সারাজীবন দেখা যায় গালিলিও একদিকে যেমন মহানুভব, পরের কথা ভাবছেন—অপর দিকে চাইছেন, কি করে তাঁর প্রচুর অর্থাগম হয়। তার জন্যে করতে চাইছেন ব্যবসা, নানা স্থানে উমেদারী করছেন—ছুটাছুটি করছেন ও কর্মস্থল পরিবর্তন করছেন। যদিও মন তাঁর ফ্লোরেন্সকেই ভালবেসেছিল। সেখানেই তিনি থাকতে চাইতেন সারা-জীবন। ফ্লোরেন্সকে যে জানে, সেই বুঝবে তাঁর শিল্পী মন ওই মহিমময়ী নগরীর প্রতি কেন এত বেশী আকৃষ্ট ছিল।

পিতার মৃত্যুর পর সংসারে অনটন বাড়লো। তখন ১৫৯২ সালে এলেন পাডুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভূমি তাস্‌কানী ছেড়ে। এখানেই সুরু হলো তাঁর প্রকৃত বিজ্ঞানীর জীবন। তবে চাপও পড়লো খুব বেশী—বিদ্যালয়ের অধ্যাপনা তো আছেই, তাছাড়া দেশরক্ষার নানা ব্যাপারে পরামর্শদাতা হয়ে উঠলেন। আবার ফ্লোরেন্সকেও ভুলতে পারলেন না। ফ্লোরেন্সে আসতেন প্রতি গ্রীষ্মের ছুটিতে। এখানকার Duke-এর ছেলে Cosmo তাঁরই প্রিয় ছাত্র। তাঁর মা আবার বিশ্বাস করতেন ফলিত জ্যোতিষে—রাশিচক্র কেটে ভবিষ্যৎ গণনায়। তাঁর মন জুগিয়ে তাও করতেন গালিলিও সময় সময়। যদিও এতে তিনি নিজে বিশ্বাস করতেন কিনা বলা শক্ত। নিজে কোপারনিকাসের বিশ্ব বিন্যাসে গভীর বিশ্বাসী। অবশ্য তখনও সর্বত্র টলেমীর যুগ চলছে। ফলিত জ্যোতিষের রাশিচক্র গ্রহনক্ষত্র সবই অচল পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরছে—এই পরিবেশে গ্রহদের অবস্থান নিয়েই জ্যোতিষের বিচার ও গণনা টলেমীয় পন্থায় করতে হয়। এদিকে গালিলিও নতুন মতবাদ নিয়ে মেতে আছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে পাডুয়ায় বক্তৃতা দিচ্ছেন—কোপারনিকাসের মতবাদের পক্ষে। প্রচুর লোক শুনতে আসছে এই সব মনোজ্ঞ বক্তৃতা।

দেখতে দেখতে কেটে গেল ১৮ বৎসর একই বিশ্ববিদ্যালয়ে। Venice-এর সরকার তাঁর উপর খুসী। ১৬০৪ সনে আরও ৬ বৎসরের মেয়াদ বাড়লো শিক্ষকতার। এই সময় তাঁর বৈপ্লবিক মতবাদের বিপক্ষে কেউ আপত্তি জানালো না।

১৬০৯ সালে ঘটলো এক নতুন ব্যাপার—হল্যাণ্ডে একজন কাচের লেন্স নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে হঠাৎ একটি নলের দু-পাশে রেখে দেখলেন, দূরের জিনিষ এভাবে বড় দেখায়—মনে হয় কাছে এগিয়ে এসেছে। গালিলিওর কাছে এই খবর পৌঁছলো। তিনি কাগজে প্ল্যান এঁকে আলোর রেখাপথের বিষয় বিচার করতে লাগলেন। শীঘ্রই এই সমস্যার সমাধান হলো। তিনিও দূরবীণ তৈরী করতে পারলেন—এটি আরও ভাল ও শক্তিশালী হলো। হল্যাণ্ডে লোকটি দেখছিল—সব উল্টো দেখায় তার দূরবীণে। গালিলিও করলেন যে যন্ত্র, তার সাহায্যে সব জিনিস যথারীতি অবস্থিত দেখায়, উল্টাপাল্টা হয় না। Venice-এ কর্তৃপক্ষের কাছে তাঁর এতে কদর বেড়ে গেল। সমুদ্রপথে Venice-এর নৌবাহিনী তখন ঘুরে বেড়ায়, নানা দেশ থেকে পণ্য সংগ্রহ করে এনে ইউরোপে নানা স্থানে বেচা-কেনা করে—বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী। রূপকথার স্বপ্নপুরীর মত তখন Venice

সহরের সম্পদ। মধ্যে মধ্যে এর নৌবহরকে শত্রুপক্ষের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে হতো। আগে থেকে শত্রুকে দেখা গেলে যুদ্ধের প্রস্তুতি যথাসময়ে করা সম্ভব। তাই কর্তৃপক্ষ ভাবলেন—এই দূরবীণ সব জাহাজেই বসাতে হবে। গালিলিওর উপর ভার পড়লো—দূরবীণ যোগান দেবার। গালিলিও রাজী হলেন – বাড়ী হয়ে উঠলো ফ্যাক্‌-ট্রী কারখানা। সেখান থেকে প্রচুর দূরবীণ বিক্রি হতে লাগলো। তৈরীর সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রেরও নানা উন্নতি হলো। নতুনগুলি হলো আগের চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী। এবার গালিলিও পেলেন হাতের মধ্যে বিশ্বসমীক্ষার এক প্রধান যন্ত্র। আকাশের দিকে ফিরিয়ে গালিলিও অনেক নতুন দৃশ্য দেখলেন। তাঁর আগে এসব মানুষের কল্পনার অতীত ছিল। চাঁদের পাহাড়, ছায়াপথের মধ্যে লক্ষ লক্ষ তারার সমাবেশ চোখে ধরা পড়লো, আবার এল নতুন নতুন উপগ্রহের খবর। আমাদের পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে একটি মাত্র চন্দ্রমা। গালিলিও দেখলেন বৃহস্পতি গ্রহের ৪টি উপগ্রহ ঘুরছে। তখনকার দিনে ধার্মিক পণ্ডিতেরা এসব বিশ্বাস করতে চাইলেন না। তাঁরা ভাবলেন—এইভাবে কোপারনিকাশের বিশ্ববিন্যাসের স্বপক্ষে যুক্তি সংগ্রহ করে গালিলিও অন্যায় করছেন। দূরবীণের মধ্যে কোন যাদুর বলে বৃহস্পতির চাঁদের ছবি পড়েছে, যা চোখে দেখা যায় না—তা যন্ত্রে প্রতিপন্ন হলে সেটা যন্ত্রেরই কারসাজী। ধার্মিকেরা মত পরিবর্তন করলেন না ও পাছে তাঁদের বিশ্বাস টলে যায়, এই ভয়ে দূরবীণের ভিতর দিয়ে দেখতেও চাইলেন না। এতে গালিলিওর আমোদ লাগলো। একজন উচ্চপদস্থ ধর্মযাজক, যিনি দূরবীণের ব্যবহার করতে চান নি, কাজেই বৃহস্পতির উপগ্রহে অবিশ্বাসী ছিলেন, মারা গেলেন। সেই সময়ে গালিলিও রহস্য করে বললেন—হয়তো এবার যাবার সময় 'চন্দ্রগুলি' দেখতে পাবেন। গালিলিওর নাম তখন দেশে দেশে অভিনন্দিত হচ্ছে। Venice-এর রাজ সরকারের কাছ থেকে অর্থও পাচ্ছেন প্রচুর। তবে এত কাজের মধ্যে বিজ্ঞানীর অবসর মেলে না। অথচ মাথার মধ্যে অনেক নতুন নতুন কথা ভেসে উঠছে—নানা বিষয়ে অনু-সন্ধান করতে চান, কিন্তু সময় পান না একাগ্র মনে এই সব বিষয় ভাবতে। অথচ সংসারে তাঁর প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। তাই ১৬০৯ সালে যখন Tuscany-র বৃদ্ধ ডিউক মারা গেলেন ও তাঁর ছাত্র Cosmo সেই গদীতে বসলেন, তখন তিনি ভাবলেন হয়তো এঁর কাছে যেতে পারলে তিনি আকাঙ্ক্ষিত অবসর পাবেন নিজের কাজ করতে, অথচ অর্থেরও কোন অভাব থাকবে না। তাই ভিতরে ভিতরে চেষ্টা করতে লাগলেন দরবার করতে নতুন ডিউকের কাছে। এই সময়

ফ্লোরেন্সের এক বন্ধুকে লেখা চিঠির থেকে কয়েক লাইনের সারাংশ উদ্ধৃত হলো ঃ

"এখান থেকে অন্য কোথাও গেলে যে বেশী অবসর পাবো নিজের কাজ করতে, তা মনে হয় না। কারণ বক্তৃতা দিয়েই পয়সা রোজগার করতে হবে সংসার চালাতে। পাডুয়া ছাড়া অন্য কোন শহরে গিয়ে অধ্যাপনা করতে ইচ্ছাও হয় না নানা কারণে। অথচ আমার অবসর না পেলে কাজও এগোবে না।

ভিনিসে গণতন্ত্র—যতই এরা উদার বা মহানুভব হোক, বাঁধা কর্তব্য করা ছাড়া এদের কাছে বৃত্তি আশা করা বৃথা। যতদিন পারি এই গণতন্ত্রে বক্তৃতা ও লেখাপড়া চালাতে হবে—যা এখানকার লোকেরা চায়। মাইনে পেলে আর অবসর মিলবে না ; অর্থাৎ যে অবসর ও অর্থানুকুল্য আমি চাইছি, সে কোন এক দেশের স্বতন্ত্র রাজার কাছ থেকেই পাওয়া সম্ভব।"

আবার অন্যত্র লিখেছেন—"রোজ রোজ নানা উদ্ভাবন করা যাচ্ছে। অবসর ও সাহায্য পেলে অনেক বেশী পরীক্ষা ও আবিষ্কার করতে পারবো"।

এক বৎসর ধরে এই ধরণের কথাবর্তা চালালেন রাজার বিশ্বস্ত মন্ত্রী ও কর্মচারী-দের সঙ্গে। শেষে ১৬১০ সালে শরৎকালে Tuscany-এর নতুন Grand Duke নিজের পুরনো গুরুকে আশ্রয় দিলেন—১০০০ scudy মাইনে প্রতি বৎসর। তাছাড়া রাজপণ্ডিত ও দার্শনিক হিসাবে স্বর্ণপদকে বিভূষিত হলেন তিনি। পাডুয়া ছেড়ে ফ্লোরেন্সে গেলেন গালিলিও।

এবার বিজ্ঞান সেবার প্রচুর অবসর মিললো। তবে যে সব নতুন কথা বললেন, বিশেষ করে জ্যোতিষের বিষয়, তাতে ইউরোপের পণ্ডিতমহলে হৈ চৈ বেধে গেল। অনেকে তাঁর বিরুদ্ধতা করতে লাগলেন। তাছাড়া আর এক কারণে তাঁর সব আবিষ্কার ও মতামত শুধু পণ্ডিতমহলে আবদ্ধ রইলো না। শিক্ষিত জনসাধারণের কাছে প্রচারের জন্যে গালিলিও ধরলেন এক নতুন পন্থা। পণ্ডিতীমহলে চালু Latin ছেড়ে লিখতে আরম্ভ করলেন—নিজের আবিষ্কার ও মতবাদ, ইটালীয়ান ভাষায়। ইটালীর মধ্যে যাদের অক্ষর-পরিচয় হয়েছে, এমন সব লোকই যাতে পড়তে পারে। ১৬১২ সালের মে মাসে তিনি চিঠিতে লিখলেন ঃ

"আমি দেখি যুবকেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাচ্ছে—হচ্ছে ডাক্তার, দার্শনিক বা অন্য কিছু—যাহোক একটা উপাধি হলেই হলো। তারপর এমন কাজে তারা নামে, যার জন্যে তারা একেবারেই অপটু। এদিকে যারা সত্য-সত্যই উপযুক্ত লোক,

তারা কাজের মধ্যে থেকে কিংবা দৈনিক দুশ্চিন্তার মধ্যে আর জ্ঞানের চর্চা করতে পারে না। এরা মেধাবী, কিন্তু তাঁরা সাধুভাষা (Latin) ইত্যাদি বোঝে না। তাই সারাজীবন তাঁদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল থেকে যায় যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বই এমন সব মহামূল্য জ্ঞানের ভাণ্ডার, যা তাদের কাছে একেবারে অবরুদ্ধ হয়ে থাকবে। কিন্তু আমি চাই তাদের মধ্যে এই সত্য জ্ঞানের উদ্বোধন করতে যে, বিশ্বপ্রকৃতি সকল মানুষকে চোখ দিয়েছেন তাঁর ক্রিয়াকলাপ দেখতে ও বুদ্ধি দিয়েছেন যাতে তার মর্মকথা সকলে বুঝতে পারে ও নিজেদের কাজে লাগাতে পারে।"

নিজের দূরবীণ নিয়ে গালিলও অনেক নতুন আবিষ্কার করলেন। চাঁদের পর্বতমালা, বৃহস্পতির উপগ্রহসমূহ, সূর্যবিম্বে কলঙ্কবিন্দু, শুক্র গ্রহের চন্দ্রের মত ঔজ্জ্বল্যের হ্রাসবৃদ্ধি, শনির বলয় ইত্যাদি আরও অনেক জিনিষ। এই ভাবে নিজের চোখে গ্রহমণ্ডলের অনেক বৈশিষ্ট্য দেখতে পেলেন, যার সত্যতা যে কেউ দূরবীণের সাহায্যে নিরূপণ করতে পারবে। কোপারনিকাসের মতবাদ তাঁর কাছে অভ্রান্ত মনে হলো। যুক্তিবাদী গালিলিও ভাবলেন, এই সব কথা প্রকাশ করলে সকলকেই তাঁর স্বপক্ষে আনতে পারবেন। তাই সে বিষয়ে বইও লিখলেন তিনি। তা সত্ত্বেও সনাতনীরা কিন্তু তার বিরুদ্ধতা করতে লাগলেন। একদিকে ফ্লোরেন্সের ডোমিনিকান সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীরা, অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা অধ্যাপক ও ছাত্রেরা, যাঁরা এই সব নতুন মত মানতে পারতেন না কিংবা যাঁরা তাঁর যশোপ্রতিভায় ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠলেন। প্রথম প্রথম গালিলিও তাঁর সহকর্মীদের মনোভাব নিয়ে অনেক ঠাট্টা-তামাসা করতেন, এতে তাদের বিদ্বেষ আরও বাড়লো। ধর্মযাজকেরা প্রচার করতে লাগলেন যে, গালিলিওর অধ্যাপনা ধর্মবিশ্বাসের পরিপন্থী, বাইবেলের অনেক কথার সরাসরি বিরুদ্ধে। তাঁরা গোপনে অভিযোগ করলেন—গালিলিও ধর্ম-বিদ্বেষ প্রচার করছেন; বাইবেলের উপর মানুষের বিশ্বাস নষ্ট করতে চাইছেন।

তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র গোপনে কাজ আরম্ভ করলো। প্রথমে Inquisition রায় দিলেন যে, সূর্য যে জগতের কেন্দ্র স্বরূপ—এটি অযৌক্তিক এবং যথার্থ ধর্মমতের পরিপন্থী—কারণ এই মত বাইবেলের অনেক লেখার সঙ্গে মিলবে না, যা এতকাল ধার্মিক যাজক ও পণ্ডিতেরা শিক্ষা দিয়ে এসেছেন। সঙ্গে সঙ্গে এই সিদ্ধান্তও প্রকাশ করলেন—পৃথিবীর আহ্নিক বা বার্ষিক গতির ধারণা প্রকৃত ধর্মবিশ্বাসের বিরোধী। ১৬১৬ মার্চ মাসে কোপারনিকাসের বই ও তৎসম্পর্কিত আরও দুইটি

বইয়ের প্রচার তাঁরা নিষিদ্ধ করে দিলেন এবং পুণ্যাত্মা পোপের কাছে এই খবর পৌঁছে দিলেন।

পোপ আদেশ দিলেন কার্ডিনাল বেলারিমিন যেন গালিলিওকে ডেকে বুঝিয়ে বলেন—তিনি যেন এই ভ্রান্তবিশ্বাস ত্যাগ করেন, আর তা যদি তিনি না করতে চান তো বিধিমত তাঁকে আদেশ দেওয়া হবে, যাতে তিনি এই মত প্রচার বা আলোচনা বন্ধ করেন। যদি তাতে তিনি অস্বীকৃত হন তো তাকে কারারুদ্ধ করা হবে। ১৬১৬ সালে গালিলিওর রোমে ডাক পড়লো। বেলারিমিন ছিলেন গালিলিওর হিতাকাঙ্খী ও সুহৃদ। জ্যোতিষ শাস্ত্র ছাড়াও অন্যান্য আবিষ্কারে গালিলিও তখন নাম করেছেন। জলে ভাসমান বস্তুর স্থিতিসাম্যের বিষয়ে ভাবছেন। আবার গতিবিজ্ঞানে অনেক নতুন কথাও তিনি বলতে আরম্ভ করেছেন, সেই সময় থেকেই। তাই কার্ডিন্যাল বেলারমিন ডেকে আনলেন গালিলিওকে নিজের প্রাসাদে। বুঝিয়ে বললেন—কোপারনিকাসের তত্ত্ব নিয়ে তিনি যেন ধর্মপ্রচারকদের সঙ্গে তর্ক না করেন বা বাইবেল থেকে লাইন উদ্ধৃত করে নিজের মতই তার ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা না করেন। গালিলিও রাজী হলেন, তবে তিনি ভাবলেন এখনো গণিতের কল্পনা হিসাবে হয়তো কোপারনিকাসের কথা আলোচনা করা যাবে কিংবা যুক্তিতর্ক দিয়ে টলেমী ও কোপারনিকাসের বিশ্ববিন্যাসের গুণাগুণ আলোচনা চলতে পারবে। তাই তার পরও তিনি যেমন অন্যান্য বিজ্ঞানের বই লিখলেন, গতির কথা বা ভাসমান বস্তুর স্থিতিরহস্য —সঙ্গে সঙ্গে কথোপকথনের আকারে দুই মতবাদের আলাচনা করে বই লিখে ছাপাবার অনুমতি চাইলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে অনেক কিছু ঘটে গিয়েছে। পোপ ও বেলারিমিন মারা গিয়েছেন। নতুন আর একজন পোপের পদে অধিষ্ঠিত। এক সময়ে গালিলিও ভাবতেন—ইনি বিজ্ঞানকে শ্রদ্ধা করেন, তাই ভেবেছিলেন নতুন বই প্রকাশে অনুমতি মিলবে। কিন্তু হলো হিতেবিপরীত, নানা কারণে তিনি নতুন পোপের বিরাগভাজন হয়েছেন। তাঁর বিষয়ে তদন্ত সুরু হয়েছে। শেষে গালিলিওর ডাক পড়লো—১২ই এপ্রিল তিনি কারারুদ্ধ হলেন। বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করা নিষিদ্ধ হয়ে গেল। ৩০শে এপ্রিল গালিলিওকে স্বীকার করানো হলো যে, যা কিছু তিনি এই বিষয়ে কথোপকথনের ছলে লিখেছেন—সে সবই তাঁর বৃথা গর্বের অজ্ঞতা ও অসতর্কতার নিদর্শন।

তাঁর নির্যাতনের এইখানেই শেষ হলো না। তাঁর মুখ দিয়ে বলানো হলো যে, তিনি কোপারনিকাসের মতে বিশ্বাস ত্যাগ করেছেন। বিচারকদের সামনে অনুতাপ-

ব্যঞ্জক সাদা পোষাক পরে তিনি হাঁটু গেড়ে রইলেন। বিচারকেরা বললেন—"তোমার ভুল দেশের ভয়ানক অমঙ্গল করেছে। তার শাস্তি তোমায় পেতে হবে, তোমার বই নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত হবে। আমাদের আদেশে তোমাকে কারারুদ্ধ থাকতে হবে যতদিন আমরা তোমাকে রাখতে চাই, তাছাড়া তিন বৎসর ধরে প্রতি সপ্তাহে তোমাকে অনুতাপসূচক প্রার্থনা করতে হবে।" এর দু'দিন বাদে Inquisition তাঁকে ফ্লোরেন্সের দূতাবাসে প্রেরণ করলেন। প্রথমে তাঁকে সিয়েনাতে (Siana) Archbishop-এর নজরবন্দী করে রাখা হলো। তার পর ফ্লোরেন্সের সহরতলীতে নিজের গৃহে অন্তরীণ রইলেন।

দুঃখে-কষ্টে গালিলিওর জীবনের শেষ ৯ বৎসর কাটলো। তখনও বিজ্ঞানের নতুন কথা ভাবতে চেষ্টা করতেন বটে, কিন্তু জীবন বিস্বাদ হয়ে গেছে। যে মেয়ে তাঁর পরিচর্যা করতো এই দুঃখকষ্টের মধ্যে সেও মারা গেল। নিজে অন্ধ হয়ে যেতে বসলেন। শেষের পাঁচ বৎসর একটু বন্ধন ঢিলে হলো—কিছুটা বাধানিষেধের হাত থেকে অব্যাহতি পেলেন পোপের করুণায়—নানা দেশ থেকে তখন তাঁকে দেখতে আসতো, তাঁর বই ও লেখা অবৈধ ভাবে অন্য দেশে চালান ও ছাপা হয়েছে। খ্যাতি ও সহানুভূতি ছিল সেই খ্রীষ্টীয় মহলে, যাঁরা রোমান ক্যাথলিক ধর্মপন্থী ছিলেন না। সর্বশেষে ৮ই জানুয়ারী ১৬৪২ সালে ৭৭ বৎসর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করলেন।

প্রবাদ আছে যে, Inquisition বিচারকদের সামনে হাঁটু-গাড়া থেকে যখন তিনি দাঁড়িয়ে উঠলেন—তখন নাকি তিনি বলেছিলেন—"এ সত্ত্বেও পৃথিবী চলমান।" কিন্তু এটা হয়তো গল্প কথা। সনাতনী ধার্মিকেরা বিজ্ঞানের শ্বাসরুদ্ধ করবার চেষ্টা করেছিলেন যথারীতি। ফলে ইটালী দেশই পেছিয়ে পড়লো। ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড ও অন্যান্য দেশে গালিলিওর আজন্ম সাধনা সুফল প্রসব করলো।

গালিলিও প্রথমে সনাতনী ভ্রান্তমতবাদের বিরুদ্ধে বিজ্ঞানের পরীক্ষিত সত্য প্রচার করতে চেষ্টা করেছিলেন। বলেছিলেন নিজে পরীক্ষা, বিচার ও যাচাই করে নিতে হবে সব সত্যকে—শুধু আপ্তবাক্যকে বিশ্বাস করে জীবনকে গড়ে তুললে ভুল হবে। ফলে তিনি কুসংস্কার ও ধর্মান্ধতার যাঁতায় গুঁড়ো হয়ে গেলেন। তবে মানুষের অগ্রগতি স্তব্ধ রইলো না।

চার শত বৎসর বাদেও তাঁর প্রতি নানা লোকের ভক্তির অর্ঘ্য, সেই সত্যের জয় ঘোষণা করছে। 'সত্যমেব জয়তে'

আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর

উত্তররাঢ়ের সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পরিবারে রামেন্দ্রসুন্দরের জন্ম হয় সন ১২৭১, ৫ই ভাদ্র, শনিবার। সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত রামেন্দ্র রচনাবলীর ষষ্ঠ খণ্ডে যে আত্মকথার বিবৃতি আছে তাতে পড়ি, এই ত্রিবেদী পরিবার হয়তো দু-শ বছরের কিছু আগে বাংলায় বসতি স্থাপন করেছিলেন। মোগল সেনাপতি রাজা মানসিংহের সঙ্গে কয়েকজন যুদ্ধজীবী ঝিঝোতিয়া ব্রাহ্মণ এসেছিলেন। পাঠান বিদ্রোহের সময় তাদের দলপতি ও জেমো-রাজপরিবারের পূর্বপুরুষ সবিতা রায় যথেষ্ট বীরত্ব দেখিয়ে মানসিংহের প্রশংসা এবং শেষে বাদসাহী সনদ ও জায়গীর জোগাড় করে বাংলা দেশেই রয়ে গেলেন। ত্রিবেদীর পূর্বপুরুষ এই পরিবারে বিবাহ করেন এবং সেই সময় থেকেই নানা ঘটনা ও অঘটনের মধ্যেও এই দুই পরিবারের নিকট সম্পর্ক বজায় আছে। পরিবারের ইতিহাস, পুরনো পুঁথি ও কাগজপত্র থেকে উদ্ধার করেছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর নিজে। ত্রিবেদী পরিবারে লেখাপড়ার আদর ছিল। এক-শ' বছর আগেই এঁরা হয়ে গিয়েছিলেন মনেপ্রাণে খাঁটি বাঙ্গালী। অবশ্য আচার-ব্যবহারে কিঞ্চিৎ পার্থক্য এঁরা বরাবরই রেখে এসেছেন। তবে আমরা জানি, রামেন্দ্রসুন্দরের পিতা নিজে বাংলায় উপন্যাস রচনা করেছিলেন—যাত্রাগান ভালবাসতেন ও গ্রামের নানা কাজে তাঁর নেতৃত্ব স্বীকৃত হতো। সংস্কৃত শাস্ত্রেরও অনুশীলন ছিল এই বংশে। রামেন্দ্রসুন্দরের লেখাপড়া সুরু হলো গ্রামের পাঠশালায়। পিতা গোবিন্দসুন্দর চাইতেন ছেলে যেন সব পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করতে পারে। শেষ অবধি স্বচক্ষে না দেখে গেলেও পিতার ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছিল। ছাত্রবৃত্তি থেকে সুরু করে প্রায় সব পরীক্ষায় প্রথম হতেন রামেন্দ্রসুন্দর। কান্দী স্কুল থেকে এনট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম হলেন। পিতা তখন দেহরক্ষা করেছেন। পিতৃব্যের সঙ্গে এসে কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হলেন (১৮৮১)। স্কুল থেকেই পড়তে সুরু করেছেন নানা বই—সাহিত্য ও ইতিহাসে ঝোঁক বেশী—কলকাতায় প্রথম দুই বছর মন ঠিক বাঁধা গণ্ডীর ভিতর থাকতে চাইলো না। সাহিত্য ও ইতিহাস চর্চা একটু বেশী করেই হলো, ফলে পাঠ্যপুস্তকে অবহেলার দরুন ফার্ষ্ট আর্টস্ (১৮৮৩) পরীক্ষায় এক প্লেস নেমে গেলেন। কিন্তু বি. এ-তে অনার্স নিলেন বিজ্ঞানে। প্রেসিডেন্সি কলেজে তখন পেড্‌লার সাহেবের রাজত্ব। উচ্ছ্বসিত প্রশংসা পেলেন তাঁর কাছে রামেন্দ্রসুন্দর। এ দেশে দীর্ঘ অধ্যাপনার কালে রামেন্দ্রের মত তীক্ষ্ণধী ছাত্র তিনি কখনো পান নি।

সাহেব খুব উৎসাহ দিলেন।- রামেন্দ্রসুন্দর ,সম্মানের সঙ্গে উৎরে গেলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সব পরীক্ষাই—বি. এ. (১৮৮৬), এম. এ. (১৮৮৭), প্রেমচাঁদ রায়-চাঁদ বৃত্তি (১৮৮৮)। ছেলেবেলা থেকে রামেন্দ্রসুন্দরের স্বাস্থ্য খারাপ চলছিল—অজীর্ণ রোগই প্রবল। আবার প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ পরীক্ষায় অন্য প্রতিভাধর ছাত্রদের (তাঁদের মধ্যে রায়বাহাদুর অবিনাশ বসু ছিলেন) সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নিজের স্থান বজায় রাখতে পরিশ্রম করে ফেললেন প্রচুর—ফল শিরঃপীড়া। শেষ জীবনে এটি তাঁর অনেক কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সেবার (রায়বাহাদুর) অবিনাশ বসু ছিলেন প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। শেষ অবধি দুই জনেই পেলেন বৃত্তি আর পুরা ৮০০০ হাজার টাকা। দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে বরাবরই ভাব—যে দিন খবর বের হলো সে দিন দুই বন্ধুতে বাঘবন্দী খেলছিলেন (ধীরেন্দ্রনারায়ণের সাক্ষ্য)। এর পরে দুই বছর প্রেসিডেন্সী কলেজে বিনা বেতনে বিজ্ঞান চর্চা করবার সুযোগ পান। আবার শ্বশুর ও অন্যান্য গুরুজনের বিশেষ ইচ্ছা, তিনি আইন পাশ করে স্বাধীন ব্যবসায় ওকালতিতে যোগ দেন। কিছুদিন আইনের বই উল্টেপাল্টে দেখে রামেন্দ্রসুন্দর কিছুতেই এই কাজে আত্মনিয়োগ করতে চাইলেন না। তখনও কি বাংলায়, কি ভারতে, কোথাও বিজ্ঞানে মৌলিক গবেষণা সুরু হয় নি। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র অবশ্য—১৮৮৯ সালে প্রেসিডেন্সীতে রসায়ন বিভাগে যোগ দিয়েছেন। এই লাজুক লোকটিকে কেউ তখন আমল দিত না। ব্যবসা-বাণিজ্যে বিজ্ঞানকে ফলবতী করা যায় কি না, তারই চেষ্টা করছেন প্রফুল্লচন্দ্র। অবশ্য Mercurous Nitrite-এর গবেষণা হয়তো তখনই হতো কলেজে, তবে সে সব কথা প্রকাশ হলো ১৮৯৬ সালে, (J.R.A.S.)। পদার্থবিদ্যা বিভাগেও জগদীশচন্দ্র কাজ করছেন—তবে ১৮৯৪ সালে যশস্বী হলেন ও কাগজে নাম বের হলো। সকলের সঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দরও খুব আশ্চর্য হয়েছিলেন। পেড্‌লার সাহেব নাকি তার আগে বাঙ্গালীর মস্তিষ্কে বিজ্ঞানের চাষ ফললো না বলে দুঃখ করেছিলেন (এশিয়াটি সোসাইটির সভায়)। কাজেই ১৮৮৮ সালে বিজ্ঞানের ঝোঁক জীববিদ্যা অনুশীলন করে মেটাতেন রামেন্দ্রসুন্দর। কৌটার মধ্যে সঞ্চিত থাকতো গুটিপোকা, শুঁয়াপোকা। এরা দেহকে আবরণীতে বেষ্টন করে গুটি বাঁধে, শেষে খোলস কেটে কিরূপে সুন্দর প্রজাপতিতে পরিণত হয়—আবার কি করে প্রজাপতিরা অণ্ড প্রসব করে—সে সব বিশেষ মনোযোগ সহকারে নিজে দেখছেন ও সঙ্গীদের দেখাচ্ছেন রামেন্দ্রসুন্দর। রসায়ন ও পদার্থবিদ্যায় হাতেকলমে কাজ হয়তো রামেন্দ্রসুন্দরের প্রিয় ছিল না। এদিকে পিতা ও পিতৃব্য বিয়োগ তাঁর

ছাত্রাবস্থায়ই ঘটেছিল। বিষয়কর্মের পরিচালনায় অনেক বিশৃঙ্খলা এসেছিল। তাই দেখি রামেন্দ্রসুন্দর জেমোতে রয়েছেন। বিষয়কর্মের জন্যে পরিশ্রম করে যে সব কর্তব্য বাকী পড়েছিল, তা সম্পন্ন করে দায়মুক্ত হবার চেষ্টা করছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক নিযুক্ত হয়েছেন এবং সে জন্যে মাঝে মাঝে কলকাতায় এসে কিছু দিন কাটিয়ে যান। বাংলার বাইরে বিদেশে যাবার এই সময় ডাক এসেছিল। অন্য কাজ-পাগল বিজ্ঞানীর কাছে তার আহ্বান ফিরিয়ে দেওয়া শক্ত হতো। মহীশূর কলেজের অধ্যক্ষ ও তথাকার মানমন্দিরের তত্ত্বাবধায়কের পদ খালি হয়েছিল। পেড্‌লার সাহেব প্রিয় ছাত্রকে এই কাজ নিতে পরামর্শ দিলেন—অনেক বুঝালেন। দেশ থেকে দূরে যেতে রামেন্দ্র নারাজ। কাজেই সাহেবের নানা নির্বন্ধ কাটিয়ে দেশের বাড়ীতেই রয়ে গেলেন। এমন কি, প্রেসিডেন্সী কলেজের সরকারী চাকরীও তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন বলে শোনা যায় (আশুতোষ বাজপেয়ীর 'রামেন্দ্রসুন্দর')। কারণ তাহলে সরকারী নিয়মে তাঁকে দূরে কলকাতার বাইরে যেতে হতে পারতো।

ডাঃ শিশির মৈত্রেয় (দার্শনিক) অন্য এক কারণের অবশ্য উল্লেখ করেছেন। রামেন্দ্রসুন্দরের নাকি ডাক পড়েছিল ডি.পি. আই-এর সঙ্গে দেখা করবার। সেখানকার খাস পেয়াদা নাকি দেখা করার আগেই বকশিশের জন্যে হাত পাতে। তাই এই পঙ্কিল পথে নামতে তাঁর প্রবৃত্তি হলো না। তাই মাঝে মাঝে কলকাতায় আসতেন ও বেশীর ভাগ সময়ে নিজের তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু মনের আকাঙ্খা মেটাতে পড়া সুরু করলেন বিভিন্ন পুস্তক—ইতিহাস, দেশ বিদেশের কথা, ডারউইনের বিবর্তনবাদ, জেমসের মরমী দর্শন, ব্যার্গসঁ, আবার সংস্কৃত শাস্ত্রের কাব্য, দর্শন, অন্বয়বাদ, বৌদ্ধ সাহিত্য ও শেষ অবধি বেদপন্থীদের আচারের নির্দেশক নিকষ ব্রাহ্মণ গ্রন্থ-সমূহ। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের কথা প্রকাশ করবার ঝোঁক প্রথম থেকেই ছিল। তাঁর প্রথম প্রবন্ধ "মহাশক্তি" অক্ষয় সরকারের "নবজীবনে" ছাপা হয় (১৮৮৩)। রামেন্দ্রসুন্দর তখনই দেখছেন "বিশ্বে এই অনন্ত বৈচিত্র্য—যাহা কিছু নক্ষত্রে, সূর্যে, গ্রহে, উপগ্রহে, পৃথিবীর ইতিহাসে, জীবশরীরের গঠনে, মানব মনের বিকাশে, সমাজ-শরীরের বিবর্তনে—যেখানে যা কিছু দেখা যায়, সে সমস্তই গতি ও সেই গতি জড়ের উপর শক্তির ক্রিয়ায় উৎপন্ন।"

শেষ অবধি রামেন্দ্রসুন্দর রিপন কলেজে বিজ্ঞানের অধ্যাপক হয়ে কলকাতায় স্থায়ীভাবে বাস করতে আরম্ভ করলেন। বিবাহ হয়েছিল ১৪ বছরে,—

১২৮৫, ২২/২৩ বৈশাখ। বি. এ. পরীক্ষার সময় প্রথম সন্তান হলো, কন্যা চঞ্চলা। রিপন কলেজে এলেন (১৮৯২)। এর কিছু আগে শ্বশুর নরেন্দ্রনারায়ণ দীর্ঘকাল রোগ ভোগ করে ১২৯৮ সালের ভাদ্রমাসে চিরশান্তি লাভ করেন। রাজবাটির বিষয়কর্ম রাজার দুই ছেলেকে বুঝিয়ে দিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর স্থায়ীভাবে কলকাতায় বসলেন। সঙ্গে কনিষ্ঠ সহোদর দুর্গাদাস এলো ও কলকাতায় হেয়ার স্কুলে পড়া সুরু করলো। দাদার সংসারের প্রায় অভিভাবক হয়ে দাঁড়ালেন তিনি। এখানে রামেন্দ্র প্রথমেই পেলেন ৩-৪ জন নিকট বন্ধু, যাঁরা তাঁর সাহিত্য সেবায় প্রেরণা ও উৎসাহ দিতেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন, সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস লেখক রজনীকান্ত গুপ্ত, বৈষ্ণব ধর্মের ঐতিহাসিক গিরিজাপ্রসন্ন রায়চৌধুরী, বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। ললিতবাবু প্রথমে রিপন কলেজেই অধ্যাপনা করতেন ও রামেন্দ্রসুন্দরের প্রতিবেশী ছিলেন অখিল মিস্ত্রী লেনে। বাড়ীতে সাহিত্যালোচনার বৈঠক বসতো। ললিতবাবু অনেক সময় নিজের নতুন লেখা পড়ে রামেন্দ্রকে শোনাতেন।

সাহিত্য পরিষদের তৃতীয় অধিবেশনে ১৮৯৪ সালে ২৯শে জুলাই রামেন্দ্রসুন্দর সর্বসম্মতিক্রমে সভ্য নির্বাচিত হন। এটি তাঁর জীবনের একটি মুখ্য ঘটনা—তাঁর সাধনার দিক্‌নির্ণয় হয়ে গেল। এতদিন নানা সাময়িকীতে প্রবন্ধ লিখে শিক্ষা-নবিশী চলছিল। এখন থেকে সর্বশক্তি নিয়োগ করলেন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সেবায়। ১৩০১ সালে শাখা সমিতির সভ্য হয়েছেন ও বৈজ্ঞানিক পারিভাষিক শব্দ সংগ্রহ ও প্রণয়নের কাজ সুরু করেছেন। পরিভাষা সম্পর্কে অনেক মূল্যবান প্রবন্ধ সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় ছাপা হতে লাগলো। তাঁরপর পরিষদের নানা কাজে তাঁকে ব্যাপৃত থাকতে দেখি। কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্য হলেন, সম্পাদনাও করেছেন কয়েক বছর। প্রথমে রাজা বিনয়কৃষ্ণের বাড়ীতেই সাহিত্য সভা বসতো—তার পরে অনেকে ভাবলেন পরিষদের স্বতন্ত্র আড্ডা থাকা উচিত—এঁদের মধ্যে রামেন্দ্রসুন্দরও ছিলেন। তাই ১৩৭/১ কর্ণয়ালিশ ষ্ট্রীটে ভাড়াটিয়া বাড়ীতে উঠে এলো পরিষদের অফিস। তখন থেকে রামেন্দ্রসুন্দর সাহিত্য পরিষদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধনে বদ্ধ-পরিকর হলেন। এখানে ব্যোমকেশ মুস্তফী তাঁর প্রধান সহায়। কলেজ থেকে প্রত্যহ বিকেলে চলে আসেন সাহিত্য পরিষদে। সংসার দেখছে ছোট ভাই। পত্নী ও নাতি—তাঁর এই সাধনা নিয়ে ঠাট্টাতামাসা করছে—এ যেন ঘরের বাইরে অপর পক্ষ। পরিষদের নিজের বাড়ী হবার কল্পনা রামেন্দ্রকে পেয়ে বসলো। ১৩০৫

সালে কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী জমি দিলেন। চাঁদা সংগ্রহের আবেদন বের হলো। শেষ অবধি ১৩১৫ সালের ২৯শে অগ্রহায়ণ, রবিবার পরিষদের নিজের বাড়ীতে প্রথম সভা বসলো। তারপর ধীরহস্তে পরিষদকে নানা গঠনমূলক কাজে নিয়ে গেলেন। অনেক সময় বাধা-বিপত্তি ও প্রতিকূল মতামতের সামনে রামেন্দ্রসুন্দরকে পড়তে হতো। তবু সে সময়ে বহু শুভকার্যের পত্তন হয়েছিল। দেখছি—পুরাতন পুঁথি সংগ্রহ, বৈজ্ঞানিক পারিভাষিক শব্দ সঙ্কলন—প্রাচীন গ্রন্থ প্রকাশ ইত্যাদি। সন ১৩২১, ৫ই ভাদ্র রামেন্দ্রসুন্দরের পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হলো। তাঁর সম্বর্ধনার জন্যে পরিষদ সভার আয়োজন করলেন। সভাপতি মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী অভিনন্দন পাঠ করলেন। তাঁর দীর্ঘায়ু কামনা করে লিখলেন—"যৌবনের প্রারম্ভেই তুমি যেরূপ বিদ্যাবত্তা প্রকাশ করিয়াছিলে, তুমি যে পথেই যাইতে, তাহাতেই প্রভূত ধনসম্পদ ও যশঃ উপার্জন করিতে পারিতে, কিন্তু তুমি সে সকল পদই ত্যাগ করিয়া দারিদ্র্যমণ্ডিত অধ্যাপনা ও মাতৃভাষার সেবাই জীবনের ব্রত করিয়াছ এবং আত্মত্যাগ ও আদর্শ চরিত্রের পরমোজ্জ্বল ও মহিমময় দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছ। তুমি বিজ্ঞানকে স্বর্গ হইতে মর্তে নামাইয়া আনিয়াছ এবং যাঁহারা বিজ্ঞান জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিয়া দেশের অশেষ কল্যাণসাধন করিয়াছেন, তাঁহাদের একজন অগ্রণী হইয়াছ।" তারপর রবীন্দ্রনাথও একটি অভিনন্দন পত্র পাঠ করেন। তাতে লিখলেন—"তোমার হৃদয় সুন্দর, তোমার বাক্য সুন্দর, তোমার হাস্য সুন্দর,—হে রামেন্দ্রসুন্দর আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি। * * * সাহিত্য পরিষদের সারথি তুমি, এই রথটিকে নিরন্তর বিজয়পথে চালনা করিয়াছ। এই দুঃসাধ্য কার্যে তুমি অক্রোধের দ্বারা ক্রোধকে জয় করিয়াছ, ক্ষমার দ্বারা বিরোধকে বশ করিয়াছ, বীর্যের দ্বারা অবসাদকে দূর করিয়াছ এবং প্রীতির দ্বারা কল্যাণকে আমন্ত্রণ করিয়াছ।" শেষের দিকে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন—"রামেন্দ্রকে আমি ভালবাসি তাহার স্বভাবগুণে, তাহার রচনানৈপুণ্যে, তাহার আদর্শ চরিত্রগুণে। সাহিত্য পরিষদের কেরাণীগিরিতে ঢুকিয়া সে নিজের সর্বনাশ করিয়াছে, সে যদি পরিষদের কাজে এত সময় না দিত তাহা হইলে তাহার "জিজ্ঞাসা"র মত "প্রকৃতি"র মত "কর্মকথা"র মত, "বিচিত্র প্রসঙ্গে"র মত তাহার আরও কত বিচিত্র রচনা যে আমাদের মাতৃভাষার দেহ অলঙ্কৃত করিতে পারিত তাহাতে আর ভুল নাই। তবে সে না থাকিলে হয়তো পরিষদই হইত না।" দুঃখের কথা, এই জনসম্বর্ধনার পর রামেন্দ্রসুন্দর বেশী দিন এই গঠনমূলক কার্য চালাতে পারেন নি।

১৩২৬ সালের ১৮ই জ্যৈষ্ঠ সাহিত্য পরিষদ রামেন্দ্রসুন্দরকে সর্বজনমান্য সভাপতির পদে নির্বাচন করলো। কিন্তু তার ছয় দিন পরেই রামেন্দ্রসুন্দর পরলোক গমন করলেন।

রামেন্দ্রসুন্দর স্বেচ্ছায় রিপন কলেজে অধ্যাপক হিসাবে প্রবেশ করেছিলেন ১৮৯২ সালে। জীবনের শেষ পর্যন্ত তিনি ওইখানেই থেকে গেলেন। জিজ্ঞাসু মন বুঝতে চায়—দিনের পর দিন এই আত্মাহুতি থেকে চিত্ত সন্তুষ্টির কি পাথেয় সংগ্রহ করতেন! অথবা সত্যই কি তাঁর এই নির্বাচনের দ্বারা আমাদের দেশের দুর্ভাগ্যই সূচিত হচ্ছে—যেখানে তাঁর অলোকসামান্য প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যকে আমরা কোন যোগ্যতর পদে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলাম না। রামেন্দ্রসুন্দর যখন রিপন কলেজে ঢুকলেন—তখন কলেজের ছাত্র সংখ্যা ৪৫০/৫০০ মাত্র এবং অধ্যাপকের সংখ্যা দশ-বারো জনের অধিক নয়।

অবশ্য তাঁদের মধ্যে অনেকেই লব্ধপ্রতিষ্ঠ ; যেমন, অধ্যক্ষ কৃষ্ণকমলবাবু, জানকী-বাবু, ক্ষেত্রমোহনবাবু, ললিতবাবু প্রভৃতি। তবে বিজ্ঞানের কোন উচ্চাঙ্গের শিক্ষার বন্দোবস্ত ছিল না এই কলেজে। ১৯০৪-০৫ সালে একবার বি. এস. সি শ্রেণী খোলবার চেষ্টা হলো। পরিদর্শকরূপে এলেন ভাইস-চ্যান্সেলার পেড্‌লার সাহেব। রামেন্দ্রসুন্দরের ছাত্রাবস্থায় তাঁকে বিজ্ঞান পড়তে অনেক উৎসাহ দিতেন তিনিই। এসে কলেজের কারুশাল (Laboratory) ও পুস্তকাগারের দৈন্য দেখে দুঃখ প্রকাশ করাতে কলেজের কর্তৃপক্ষ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন—"রামেন্দ্রবাবুর বাড়ীতে বিজ্ঞানের বহু পুস্তক আছে, তাহা হইতে কলেজ সাহায্য পায়"; এ কথাটি সাহেবের মনঃপুত হলো না। তিনি উত্তর করলেন—রামেন্দ্রবাবু তো রিপন কলেজ নন। পেড্‌লার সাহেব রাজী হলেন না, ফলে সেবার বি. এস-সি. ক্লাসও খোলা হলো না। আবার ১৯০৫ সালের আগে এই কলেজের কোন পরিচালক সমিতি ছিল না—সুরেন্দ্রনাথই সর্বেসর্বা। পরে ১৯০৫ সালে অবশ্য হলো। ১৯০৭ সালে নতুন নিয়মের আই.এস.সি.শ্রেণী খুলতে, বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভ করতে, কারুশাল তৈরী ও অন্যান্য বিষয়ে রামেন্দ্রসুন্দরকে অক্লান্ত পরিশ্রম ও মস্তিষ্ক পরিচালনা করতে হয়। ইতিমধ্যে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য পদত্যাগ করেছেন ও রামেন্দ্রসুন্দর অধ্যক্ষতা করছেন। সায়েন্সেও যেমন, আইন বিভাগেও প্রায় তাই। সার আশুতোষ বললেন—এই বিভাগ তুলে দিন, কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দর রাজী নন। ১৯০৮ সালে ডিরেক্টর কুক্‌লার বলছেন—"সিণ্ডিকেট কলেজ উঠাইতে চায়—আমি

কলেজ পরিদর্শন করিয়া খুসী হইলাম, কলেজের সবই ভাল, কিন্তু লাইব্রেরীর অবস্থা অতি হীন। লাইব্রেরীতে কোন Law Reports-গ্রহণ করা হয় না।" অবশ্য তবুও আইন বিভাগ টিকে গেল। দয়ালু লাটসাহেব Law Reports-এর বন্দোবস্ত করে দিলেন। এদিকে স্বদেশী যুগ এসে পড়লো। কলকাতার বেসরকারী কলেজে ছাত্র-সংখ্যা বাড়তে লাগলো। সরকারী আনুকূল্যে রিপন কলেজের নতুন নতুন বাড়ী উঠলো। ছাত্র সংখ্যা বেড়ে ৫০০ থেকে হলো ১২০০। ১৯০৫ সালে কলেজ বি. এ-সি শ্রেণী খোলবার অনুমতি পায়নি। অধ্যক্ষ ত্রিবেদী তখন বি. এ. ক্লাসে রসায়ন পড়াতেন। শেষে যখন ১৯১৫ সালে বি. এস-সি. শ্রেণী খোলবার অনুমতি মিললো—তখন রসায়নের অধ্যাপনা অন্যের হস্তে অর্পণ করে স্বয়ং পদার্থবিদ্যা পড়াতে আরম্ভ করলেন রামেন্দ্রসুন্দর (তখন বোধ হয় এই বিষয়ে অনার্স পড়ার অনুমতি ছিল না) এবং জীবনের শেষ দিন (১৯১৯) পর্যন্ত এটিই তাঁর অধ্যাপনার বিষয় ছিল। সত্য সত্যই রিপন কলেজের অধ্যাপনার মণ্ডই ছিল রামেন্দ্রসুন্দরের পক্ষে প্রধান পরীক্ষাগার। কারুশালে হাতেকলমে করে দেখাতে বোধ হয় তাঁর বেশী উৎসাহ ছিল না। তবে বহুদিন থেকে তিনি বাংলা ভাষাকে বিজ্ঞান-শিক্ষার বাহন করতে চেয়েছিলেন। সাহিত্য পরিষদে পারিভাষিক শব্দ সংগ্রহে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন।

নিজে সংগ্রহ ও উদ্ভাবন করে ছাপিয়েছিলেন ভৌগলিক পরিভাষা (১৩০৬)। শারীরবিজ্ঞানের পরিভাষা সংগ্রহ করেছিলেন ব্রাহ্মণ সংহিতা, শ্রৌতসূত্র ইত্যাদি থেকে। বৈদ্যক পরিভাষা ও রাসায়নিক পরিভাষা বিষয়ে প্রবন্ধ "শব্দ-কথা" রচনাবলীতে দেখতে পাই। নিজে যে কঠোর বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক বিষয়-সরল বাংলায় ছাত্রদের বুঝিয়ে দিতেন, তাঁর খবর পাই তাঁর অভিভাষণে কলিকাতায় টাউন হলে। ১৩২০ সালের ২৭-২৯শে চৈত্র বিজ্ঞান সভার সভাপতিরূপে তিনি বলছেন—"অধ্যাপকের আসনে বসিয়া বাংলা ভাষায় অধ্যাপনা যদি আপনারা অপরাধ বলিয়া গণ্য করেন, তাহা হইলে আমার মত অপরাধী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সঙ্ঘ মধ্যে খুঁজিয়া মিলিবে না। হয়ত ইংরাজী ভাষায় অজ্ঞতা আমার এই দুষ্প্রবৃত্তির মূল কারণ। * * * কারণ যাহাই হউক আমি এই পাপের বোঝা চিরজীবন মাথায় বহিতেছি। কিন্তু সে জন্য অধ্যাপনা কার্যে যে ব্যাঘাত অনুভব করিয়াছি তাহা সহজে স্বীকার করিব না। পদার্থবিদ্যায় বাংলা পারিভাষিক শব্দের একান্ত অভাব রহিয়াছে, তাহা স্বীকার করি তবে অধ্যাপনার সময়ে

ইংরাজী পারিভাষিক শব্দের বাংলা অনুবাদ যে নিতান্ত আবশ্যক তাহাও বোধ করি না। পারিভাষিক শব্দগুলি ইংরাজী রাখিয়া ও সাঙ্কেতিক চিহ্নগুলি ইংরাজী রাখিয়াই আর সমস্ত কথা বাংলায় প্রকাশ করা যাইতে পারে। কোন স্থানে ঠেকিতে বা ঠকিতে হয় না। এই ধারণা আমার বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। * * * পদার্থবিদ্যায় যে সকল তত্ত্ব ছাত্রদের নিকট নিতান্ত দুরূহ বলিয়া বোধ হয়, আমার এই অপরূপ ভাষার আশ্রয়েও তাহা ছাত্রদের বোধগম্য করিতে কখনও কষ্ট পাইয়াছি বলিয়া মনে হয় না। পদার্থবিদ্যার অঙ্কগুলির বিকট মূর্তি ছাত্রদিগের মনে কিরূপ আতঙ্ক সঞ্চার করে, তাহা ভুক্তভোগী ছাত্র মাত্রেই অবগত আছেন। অমি কিন্তু দেখিয়াছি সহজ বাংলায় সেই আঁচড়গুলার তাৎপর্য বুঝাইয়া দিলে ছাত্রদের হৃৎকম্প তৎক্ষণাৎ নিবৃত্ত হইয়া যায়; এমন কি, তাহাদের মনের ভিতর যে একটা আনন্দের সঞ্চার হয় তাহারও প্রমাণ পাইয়াছি। * * * রসায়ন শাস্ত্রের বিবিধ মৌলিক ও যৌগিক দ্রব্যের পারিভাষিক নামগুলা এবং তাদের গঠন বিজ্ঞাপক সাঙ্কেতিক চিহ্নগুলা ইংরেজী রাখিব, কি বাংলায় ভাষান্তরিত করিব, তাহা লইয়া একটা বিবাদ বহুকাল হইতে চলিত আছে, সেই বিবাদের মীমাংসার কোন সম্ভাবনা দেখি না। কিন্তু সেই বিবাদের নিষ্পত্তি পর্য্যন্ত বাঙ্গলাদেশের শিক্ষার্থীরা—ইংরাজী ভাষায় যাহাদের দখল নাই, তাহারা রসায়নের রসাস্বাদনে যে একেবারে বঞ্চিত থাকিবে ইহা উচিত নয়।" রামেন্দ্রসুন্দর এভাবে এক রকম সারাজীবন অধ্যাপনার অভিজ্ঞতা দ্বিধাহীন ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। এজন্য বাংলার চিন্তাশীল বিজ্ঞানীরা সকলে তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে। এই অভিভাষণের অন্য স্থানে তিনি বলছেন— "বাংলা সাহিত্যের বিজ্ঞান বিভাগের-দারিদ্র্যমোচন আপনারা করিতে পারেন। ইহা আপনাদের কর্তব্য মধ্যে গণ্য করিয়া লওয়া উচিত। পারিভাষিক শব্দের অভাব এই বিষয়ে অন্তরায় হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস নাই। যিনি শ্রদ্ধার সহিত মাতৃভাষার সেবাকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া গ্রন্থরচনায় প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহার মনের ভাব আপনা হইতে শব্দরূপে লেখনীমুখে আবির্ভূত হইবে, সর্বদেশে সর্বজাতির মধ্যে এই ব্যবস্থা। পরিভাষা সঙ্কলনের অপেক্ষায় কোন দেশেই বৈজ্ঞানিক সাহিত্য নিশ্চলভাবে বসিয়া থাকে নাই। * * * পূর্বেই বলিয়াছি বঙ্গের জনসাধারণ জ্ঞানার্থী হইয়া ঊর্ধ্বমুখে আপনাদের অভিমুখে চাহিয়া রহিয়াছে। আপনারা তাহাদের জ্ঞানতৃষ্ণা নিবারণ করুণ। ইহা আপনাদিগের কর্ম, ইহা আপনাদিগের ধর্ম। সাধ্য সত্ত্বেও এই বিষয়ে কুণ্ঠিত হইলে আপনাদের

প্রত্যবায় হইবে।" রামেন্দ্রসুন্দরের এই আবেদন বিজ্ঞান পরিষদ মাথায় করে রেখেছে। তবে সব বৈজ্ঞানিকের মনে এই কথাগুলি যে সন্তোষজনক অনুরণন তুলতে পেরেছে, একথা ভাবতে দ্বিধা হয়।

রিপন কলেজের ছাত্রদের ক্লাসের বাইরে রামেন্দ্রসুন্দর একটি সহৃদয় অধ্যাপক-গোষ্ঠী গড়ে তুলেছিলেন। সকলেই বাংলা ভাষার সাধক ছিলেন। শিক্ষকদের সভায় ধারাবাহিকভাবে "জগৎ কথা"র যে বিবরণী দিয়ে গেছেন—শেষের দিকে তাঁর স্বাস্থ্যভঙ্গের দরুণ মৃত্যুর প্রায় চার বছর বাদে পুস্তকাকারে সেই সংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছিল ; এখন হয়তো আবার দুষ্প্রাপ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। রচনাবলীর মধ্যে এগুলি রয়েছে (৪-২০৯-৪৯৯)। শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই গ্রন্থের বহুল প্রচার একান্ত বাঞ্ছনীয়। দ্বিধায় দোলায়িত শিক্ষকমণ্ডলীর কাছে রামেন্দ্রসুন্দরের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ-গুলি জ্যামিতিক প্রমাণের মত কাজ করবে। মাতৃভাষায় শিক্ষা যে অবশ্য কর্তব্য তা সর্বজনগ্রাহ্য স্বতঃসিদ্ধ হিসাবে মেনে নিলেও উপযুক্ত সম্পাদনায় অনেকের সন্দেহ আছে। আমি দেখেছি, শিক্ষকদের মধ্যে অনেকে আজও ভাবেন—যে ভাষায় তাঁরা নিজেরা শিখেছেন, সে ভাষা ছাড়া বিজ্ঞান বোঝানো সম্ভব নয়। রামেন্দ্রসুন্দরের রচনায় তাঁদের চোখ ফুটতে পারে।

দীর্ঘ কয়েক বছর (১৩৫৬-৬৩) অনুসন্ধান ও পরিশ্রমের পর সাহিত্য পরিষদ রামেন্দ্র রচনাবলী ছয়খণ্ডে প্রকাশ করেছেন। এর মধ্যে রামেন্দ্রসুন্দরের ভাবনা-বিকাশের একটা নির্ভরযোগ্য ছবি পাওয়া যায়। বিজ্ঞানের কথা প্রথমে তাঁর রচনার বিষয়। তবে বিশেষ করে তার তাত্ত্বিক দিকেই রামেন্দ্রসুন্দরের ঝোঁক বেশী। "প্রকৃতি" ও "জিজ্ঞাসা" স্বদেশী যুগের আগের লেখা। আমরাও বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক বলে অধ্যয়ন করেছি (১৯০৮-১৯১৩)। ইতিমধ্যে, সাহিত্য পরিষদে নানা মনীষীর সঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দরের সম্পর্ক ঘটেছে। স্বদেশী যুগের উদ্দীপনা তাঁর মনকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে। যন্ত্রশিক্ষার ব্যর্থতা তাকে ব্যথিত করেছে। দেশের পরাধীনতা, সামাজিক ব্যাধি ও তার প্রতিকারের বিষয় প্রবন্ধ লিখেছেন। রাখীবন্ধনকে তিনি দেশের নিত্যকৃত্যের মধ্যে স্থান দেবার জন্যে লিখলেন "বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা"। আবার রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে এসে "শব্দ কথায়" তিনি করলেন বাংলা ভাষার ধ্বনি বিচার। নিজের গ্রামের চারপাশে যে ধর্মঠাকুরের পূজা চলছিল, তার তথ্য সংগ্রহ করে ধর্মঠাকুর বলে যে বুদ্ধদেবের মূর্তি পূজা আজও অবধি চলেছে, তার সন্তোষ জনক প্রমাণ দিয়েছেন তিনি।

মন ক্রমশঃ দেশের পুরাতনী বিদ্যার দিকে ঝুঁকতে চললো। স্বদেশী যুগে দীঘাপাতিয়ার কুমার শরৎকুমারকে বিজ্ঞান পড়াতে পড়াতে নানা কথারও আলোচনা হয়। রামেন্দ্রসুন্দরের মনে হচ্ছে—"দেশের পুরাতন কথা যে আমরা জানি না বা জানিবার যত্নও করি না—ইহা অপেক্ষা লজ্জার বিষয় আমাদের পক্ষে আর কিছুই হইতে পারে না।"

সাহিত্য পরিষদে যখন ব্রাহ্মণ-গ্রন্থগুলির অনুবাদ হঠাৎ কোন কারণে স্থগিত হলো, তখন তিনি নিজেই সেই অনুবাদ কার্যের ভার নিলেন। তাঁর চিত্তমানস ভাবছে—"বেদপন্থী সমাজে জন্মিয়া পুরাতনী বিদ্যার অজ্ঞতা নিতান্ত ভাগ্যহীনতার লক্ষণ বলিয়া আমি বোধ করিতাম—সেই মহতী বিদ্যার যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞান লাভ করিতে পারিব"—এই প্রলোভন তিনি ত্যাগ করতে পারেন নি। তার ফলে পাওয়া গেল ঐতরেয় ব্রাহ্মণের একটি সুন্দর বাংলা অনুবাদ—যা পড়ে শান্তিনিকেতন থেকে লিখেছেন শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর—"ব্রাহ্মণটির শরীরের আয়তন দেখিয়া আমার মনে হইল "ব্রাহ্মণভোজন" বৈদিক যাগযজ্ঞের মুখ্যতম উদ্দেশ্য ছিল—দ্যু-দেবদের তুষ্টিসাধনের সঙ্গে ভূ-দেবদের পুষ্টিসাধন অবিচ্ছেদ্য সৌহার্দ্য-সূত্রে বাঁধা ছিল। ব্রহ্মবাদীরা মাঝে মাঝে detective officer-এর ন্যায় আসিয়া খানাতল্লাসী করিতেছেন—আর ব্রাহ্মণটি চট্‌পট্ তাহার একটি সদুত্তর দিয়া আপনাকে সাফাই করিতেছেন—ইহার ন্যায় সরস সামগ্রী কোথাও আমি দেখি নাই—অতি চমৎকার ব্যাপার।"

এই সব করতে গিয়ে সাফাই গাইবার প্রবৃত্তিটি বোধ হয় বেদপন্থী ত্রিবেদী সন্তানের মধ্যে প্রবেশ করলো। তার নিদর্শন পাই তাঁর "নানা-কথা"র মধ্যে। এসব কথার যথাযথ সমালোচনা করা এখানে অসম্ভব—তবে তাঁর চিত্তামানসের দৃষ্টিভঙ্গী বুঝতে এই প্রবন্ধগুলি সাহায্য করবে। যেমন—"অদৃষ্ট দোষেই হউক আর শিক্ষা প্রণালীর দোষেই হউক ইংরাজী শিক্ষা ষাট বৎসরে আমাদের দেশে ফলে নাই। বৎসর বৎসর আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিদান কালে প্রতিনিধি চ্যান্সেলরের মুখে এই আক্ষেপই শোনা যায়। আমাদের জ্ঞানার্জনে মতিরতি হইল না। জ্ঞানরসের প্রতি আমাদের তৃষ্ণা জন্মিল না। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় হাজারে হাজারে গ্রাজুয়েট সৃষ্টি করিতেছেন, কিন্তু একজনও একখানা লাঙ্গল আনিয়া জ্ঞানরাজ্যের এক ছটাক জমিতে চাষ দিল না। দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু ততোধিক দুঃখের বিষয় আর একটি আছে। সরস্বতী যজ্ঞের সহিত

কোলে লইয়া তাঁহার বীণা-পুস্তক তাঁহার সন্তানদের হাতে দেন। কিন্তু কৃতী সন্তানেরা মায়ের কোল হইতে নামিবামাত্র বীণাটি ভাঙ্গিয়া ও পুস্তকখানি বেচিয়া মায়ের সপত্নী লক্ষ্মীদেবীর দাসত্বে নিযুক্ত হয়েন। সত্য বল দেখি, ইংরাজী কি আমাদের সমাজে অর্থোপোর্জন ও জীবিকার্জনের সুগম উপায় মাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে! সেই অবধি আজ পর্য্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত শিক্ষায় হাকিম, উকিল ও কেরানীতে দেশটা প্লাবিত হইয়া গেল।" এ তো আমাদের আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সখেদ উক্তি। তিনি তো ল' কলেজ ভূমিসাৎ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু রিপন কলেজের আইন বিভাগকে অধ্যক্ষ ত্রিবেদী সযত্নে রক্ষা করে গেলেন। আবার অন্য স্থানে পড়ি—"অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা ভারতের ব্রাহ্মণের জীবনের ব্রত ছিল। অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা মাত্র ব্রত করিয়া সে জীবনের সমুদয় ভোগাকাঙ্খা বিসর্জন দিয়াছিল।" এ তো স্বর্ণ যুগের কথা। অবশ্য শোনা যায়, রাজসভায় জয়ী হয়ে যাজ্ঞবল্ক্য সহস্র ধেনু তাড়িয়ে নিয়ে যাবার সময় বাধা পেয়েছিলেন। শিক্ষা সে কালেও সম্পদের কারণ হতো।

অবশ্য সকলেই তখন যাজ্ঞবল্ক্যের মত সৌভাগ্যবান ছিলেন না। আবার পড়ি,—"চতুষ্পাঠীর ব্রাহ্মণ অধ্যাপক হিন্দু সমাজের শীর্ষস্থানে দণ্ডায়মান আছেন। এখনও সেই প্রাচীন কালের পদ্ধতির বিশুদ্ধ ধারা ক্ষীণস্রোতে এই দেশে বহিয়া আসিতেছে। এখনও নাকি সিন্ধুতীর ও কৃষ্ণাতীর হইতে নবদ্বীপের চতুষ্পাঠীতে ভক্তিমাত্র দক্ষিণা ও উপহার লইয়া ছাত্রেরা শিক্ষক সমীপে উপস্থিত হয়। (তবে) তাহারা কি শেখে না শেখে, তাহা দেখিবার প্রয়োজন নাই। পুনশ্চ—বিলাতী শিক্ষা সহকারে বিলাতী সভ্যতার নিয়ম এই দেশে উপস্থিত হইয়া শিক্ষিত সম্প্রদায়ের খরচের মাত্রাটা অযথা পরিমাণে বাড়াইয়া দিয়াছে। সেটাও বিবেচনা করা উচিত।" শেষে—"আমাদের বিবেচনায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত শিক্ষাপ্রণালীর মূলে দোষ বর্তমান আছে। এই মূলস্থ দোষের সংস্কার সাধন না হইলে কোনরূপ ফল লাভের আশা নাই। * * * বিশ্ববিদ্যালয় যে প্রণালীতে শিক্ষা দিয়া থাকেন তাহাতে বিদ্যার প্রতি বিশেষ অনুরাগ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। (১৩০২) এখনও অবশ্য স্বদেশী আন্দোলন শুরু হয় নাই।"

দেশের পুরাতনী সমাজনীতির উপর রামেন্দ্রসুন্দরের মনোভাব জানতে পারি—তাঁর "সামাজিক ব্যাধি ও তার প্রতিকার" প্রবন্ধে। সেখানে পড়ি—"যদি আমাদের সামাজিক ব্যাধির কোন ফলপ্রদ চিকিৎসা আবিষ্কৃত হয়, তাহা এই আত্মসমাজের প্রতি অকপট শ্রদ্ধা ও অবিচলিত ভক্তি।" * * *

আবার "যদি আমরা কখনও রঙ্গমঞ্চের অস্বাভাবিক প্রহসনের অভিনয় ত্যাগ করিয়া প্রকৃত মনুষ্যোচিত কর্মক্ষেত্রে বিচরণ করিতে চাই, আমাদের প্রাচীন সমাজের প্রতি অকপট শ্রদ্ধা হইতেই সেই ক্ষমতা উৎপন্ন হইবে।" *** পুনশ্চ—"যাহারা এই পুরাতন সমাজকে অদ্য হীনবল অধঃপতিত ও শাসন-বিষয়ে অসমর্থ দেখিয়া ইহার প্রতি নির্মম বিদ্রূপবাণীর প্রয়োগ করেন তাহাদের কাপুরুষত্ব অবজ্ঞেয়। কিন্তু বলিতে দুঃখ হয় আমাদের শিক্ষাপ্রণালী আমাদের সমাজের প্রতি এই অকৃত্রিম শ্রদ্ধা উৎপাদনে সমর্থ হন নাই।"

"ভারতবর্ষের পুরাকালের ও বর্তমানকালের সমাজ-তত্ত্বের শ্রদ্ধার সহিত আলোচনা করেন, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এরূপ উদাহরণ নিতান্তই বিরল। আমাদের মধ্যে যাঁহারা অত্যন্ত গম্ভীরভাবে বৈদেশিক সমাজের ইতিবৃত্ত ও সমাজ-তত্ত্বের আলোচনা করেন তাঁহারা স্বদেশের ইতিবৃত্ত ও সমাজতত্ত্বের আলোচনায় সম্পূর্ণ উদাসীন। আমার বোধ হয় বর্তমান শিক্ষাপ্রণালীই তাঁহাদের এই ঔদাসীন্যের জন্য ও অবজ্ঞার জন্য দায়ী। যে প্রণালী জাতীয় ভাবের ভিত্তির উপর স্থাপিত নহে, তাহাতে প্রকৃত স্বজাতি-অনুরাগ ও স্বদেশ-অনুরাগ আনিতে পারে না। কেবল স্বজাতির প্রতি একটা কৃত্রিম, অন্তঃসার শূন্য মৌখিক আসক্তির ছদ্মভাব উৎপাদন করে মাত্র।" এই যুক্তির উপর ভিত্তি করলে বর্তমানে পাকিস্তানের ইসলামীয় রাজ্যস্থাপন বা জনসংঘের হিন্দুরাজ্য স্থাপনের পরিকল্পনাকে সমালোচনা করা চলবে না। এই প্রসঙ্গে যন্ত্রবদ্ধ শিক্ষাপ্রণালীতে কলকাতা কলেজে বিদ্যা-লাভের ব্যবস্থার একটি হাস্যকর ছবি আছে, যা উদ্ধৃত করবার লোভ সামলানো গেল না—"প্রবেশান্তে বিদ্যালাভের ব্যবস্থা কর্তৃপক্ষ নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন, কোন্ শাস্ত্র সম্পর্কে কয়খানি বই পড়িতে হইবে, কোন্ বহির কোন্ পাতাটা বর্জন করিতে হইবে, কোন্ শাস্ত্র সম্পর্কে কয়ঘণ্টা লেক্চার হইবে—ঘণ্টার অর্থ ষাট মিনিট কি ছত্রিশ মিনিট—কতগুলি লেক্চার শুনিতে হইবে এবং কতগুলি ফাঁকি দেওয়া চলিবে—লেক্চার শুনিতে শুনিতে-কত মিনিটকাল ঘুমাইয়া পড়িলে সেই শ্রবণক্রিয়া অগ্রাহ্য হইবে ইত্যাদি। অতএব এসব বিষয়ে শিক্ষক কিংবা শিক্ষার্থী কাহারও কোন দুশ্চিন্তার প্রয়োজন নাই। কিন্তু লেক্চার এক সময়ে এ কানে ঢুকিয়া ওকান দিয়া বাহির হইয়া যায় এবং কোন শিক্ষকই ইহা নিবারণ করিতে পারেন না, কাজেই মাঝে মাঝে শিক্ষার্থীকে পরখ করিয়া, বাজাইয়া লওয়া দরকার।

সপ্তাহে পরীক্ষা, মাসান্তে পরীক্ষা, বৎসরান্তে পরীক্ষা এবং চূড়ান্ত পরীক্ষা, এই পরীক্ষা পরম্পরায় যে বিদ্যার বিশুদ্ধি বা শ্যামিকা নির্ধারিত হয়, তাহার নগদ মূল্য প্রতিমাসে চারি মুদ্রা (এখন আক্রার দিনে বাড়িয়াছে) এবং মাসের পোনেরই জমা না দিতে পারিলে অতিরিক্ত দেয় জমা চারি আনা। বিদ্যাদানের এই যন্ত্রের মধ্যে নানাবিধ মহার্ঘ সামগ্রী আছে—দ্বারোয়ান, চাপরাশী, সেক্রেটারী, দপ্তরী অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, বেঞ্চি, টেবেল, লাইব্রেরী, হষ্টেল, ডিপ্লোমা, উপাধি, জরিমানা, রসিদ, ডাকটিকিট এবং অনেক চামড়াবাঁধা খাতা—কিন্তু কোন হৃদয় নাই। শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে কোন নাড়ীর টান নাই, কোনরূপ প্রীতিসম্পর্ক নাই। শিক্ষক ছাত্রের নাম জানেন না, মুখ চেনেন না। ঘণ্টা বাজিলে আপন কর্তব্য সারিয়া মাসান্তে বেতন গ্রহণ করেন ; চুক্তিমত আঠারোর জায়গায় উনিশ ঘণ্টা কোন সপ্তাহে কাজ করিতে বলিলে কপালে চোখ তোলেন, আর অধ্যক্ষ বসিয়া দারিদ্র্যাপরাধী ছাত্র বেতন দিতে দেরী করিলে তাহার জলখাবারের পয়সা হইতে জরিমানা করেন"***। আবার ছাত্রদের কথা—"ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া লেবরেটরীতে দাঁড়াইয়া তাঁহারা কষ্টিক লোশনের মধ্যে রূপার আবিষ্কার করিতেছে—কিন্তু রূপা না থাকিয়া যদি সীসা থাকিত তাহাতে তাহাদের কিছুমাত্র ক্ষতিবৃদ্ধি হইত না। পৃথিবীর অভ্যন্তরে চুম্বক আছে কিনা এই লইয়া তাহারা অনেক বিচারবিতর্ক মুখস্থ করিতেছে ; কিন্তু ভূকেন্দ্রে চুম্বক না থাকিয়া একটা ভল্লুক থাকিলেও তাহারা কিছুমাত্র বিস্মিত হইত না। তাহারা চায় কেবল একখানা ডিপ্লোমা যাহার বলে ভবিষ্যতে মুনসেফী বা কেরানীত্ব জুটিবে, সেখানে চুম্বক বা ভল্লুক উভয়েরই সমান মর্যাদা। নিতান্তই দায়ে পড়িয়া তাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিহিত পলিটিক্যাল ইকনমির লেক্‌চার শোনার অত্যাচার সহ্য করিতেছে। অথচ এই শূন্যগর্ভ ফাঁকিকারী এবং হৃদয়হীন দোকানদারীর আশ্রয় করিয়া আমাদের শিক্ষাযন্ত্র বিকট শব্দ করিয়া ঘূর্ণিত হইতেছে। এই আধুনিক শিক্ষাপ্রণালীর পার্শ্বে পুরাতন শিক্ষাপ্রণালীর আলোচনা করা যাইতে পারে—শিক্ষার বিষয়ের তুলনা করার আবশ্যক নাই।" এই ভাবে প্রাচীন ভারতের নীতির উৎকর্ষের দৃষ্টান্তে প্রবন্ধটি পূর্ণ। হায় রামমোহন ! তোমার আমহার্ষ্টের প্রতি লেখা চিঠিতে একটা মূলগত দোষ রয়ে গেছে। তুমি শুধু শিক্ষার বিষয়ের কথাই পেড়েছিলে !

"ভারতবর্ষ এই দোকানদারীতে চিরকাল কুণ্ঠিত, ভারতবর্ষের ইহাই স্বভাব......... ভারতবর্ষ এই বণিকবৃত্তির প্রতি পক্ষপাত দেখাইতে সঙ্কুচিত। এ দেশে ধনীর

গৃহে কোন উৎসব সমারোহের অনুষ্ঠান হইলে, সেখানে ইতর সাধারণের জন্য দ্বার অবারিত থাকে। কাহাকেও দ্বারদেশে টিকিট দেখাইতে হয় না। এদেশে মেলা বসিলে দর্শনী দিয়া তা দেখিতে হয় না। গৃহস্থের বাড়ী ভোজ হইলে অনাহূত ও রবাহূত সমান আদরে আহূতগণের সহিত এক পংক্তিতে ভোজন করে। এদেশে যে বস্তু যত আদরের সেই বস্তুর দানে ততই গৌরব এবং সেই বস্তুর জন্য মূল্য প্রার্থনা ততই অগৌরবেয় বিষয়।" আবার দৃষ্টান্ত শুনুন—"মনুষ্যের প্রাণদানকে যিনি ব্যবসায় করিয়াছেন তিনি জীবিকার জন্য প্রাণদানের বিনিময়ে তুচ্ছ অর্থ গ্রহণে বাধ্য হন। ভারতবর্ষের ধাতের সহিত ইহা সম্পূর্ণ মেলে না"। (মানসী, ১৩১৭) রামেন্দ্রসুন্দরের মতে তাই ভিষক সামাজিক সম্মানে ব্রাহ্মণের নীচে।

এইবার স্বদেশীর যুগে এসে পড়েছি। রামেন্দ্রসুন্দরের সমাজরক্ষণশীলতা শেষ অবধি পুরাতনী মনোভাবে পরিণত হয়েছে। গান্ধীবাদী ও হিন্দু সঙ্ঘওয়ালা স্বতন্ত্রবাদীদের মধ্যে সাদৃশ্য প্রবল। রিপন কলেজে শিক্ষকমহলে তখনকার দিনে এই মনোভাবের বিকাশই প্রশংসিত হতো। আজও এইভাবে স্বদেশীয়ানা আমরা তাঁর রিপন কলেজের পুরাতন সহকর্মীদের কাছে কখনও কখনও শুনছি। এসব ব্যাপারের বিস্তারিত সমালোচনার এখানে আবশ্যক দেখি না, পাঠক আমার বক্তব্য বোধহয় বুঝতে পারবেন। বর্তমান বিজ্ঞানের আবশ্যিকতা রামেন্দ্রসুন্দর স্বীকার করতেন না। তবে বৈজ্ঞানিক বিষয় বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি বঙ্গমাতাকে যে সুন্দর অলঙ্কার উপহার দিয়েছেন—স্বচ্ছ গতিশীল ভাষা যা বিজ্ঞানের দুর্জ্ঞেয় রাজত্ব থেকে অবলীলাক্রমে ঘরের কোণে পরিচিত বস্তুর বর্ণনায় চলে আসতে পারে, তার জন্যেই দেশ তাঁর কাছে চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকবে। এদেশে রক্ষণশীল, সনাতনী মনোভাব চিরকাল থাকবেই এবং সঙ্গে হয়তো ভৌগলিক কোন সম্পর্ক থাকতে পারে। মাঝে মাঝে মনে হয় ত্রিবেদী মশায়ের মত তত্ত্বজিজ্ঞাসু শিক্ষক যদি রিপন কলেজের মত স্থানে কাল না কাটিয়ে এমন কোন স্থানে অধ্যাপনা করতেন— দেশের নবীন মনের সঙ্গে যেখানে সাক্ষাৎ হওয়া সম্ভব ছিল, তাহলে এই সাময়িক একদেশদর্শী তর্করাশির পরিবর্তে হয়তো চিরস্থায়ী মৌলিক অবদান আমরা তাঁর কাছ থেকে পেতে পারতাম।

আমাদের দুঃখ হয় "বিদ্যার এত বড় জাহাজ" থেকে কোন চিরস্থায়ী সম্পদ নামানো সম্ভব হলো না। তাঁর রচনাবলী বেশীর ভাগ সাময়িকীতে প্রকাশিত জন-প্রিয় ও মুখরোচক প্রবন্ধে ভরা। খুব কম প্রবন্ধ পড়ি, যাতে তাঁর গভীর সংস্কারমুক্ত

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ও মৌলিক চিন্তার সাক্ষ্য দেয়। কে জানে রামেন্দ্রসুন্দরের নিজের মনেও এইরূপ কোন মৌলিক নিদর্শন রাখার ইচ্ছা ছিল কিনা! এমন কিছু মৌলিক দর্শনতত্ত্ব লেখা, যার মধ্যে প্রতীচ্যের বিজ্ঞান, দর্শন, বিবর্তনবাদের সঙ্গে এদেশের অন্বয়বাদ এবং বৌদ্ধ হেতুবাদের সমন্বয় থাকবে। হয়তো 'বিচিত্র প্রসঙ্গের' মধ্যে সেইরূপ চেষ্টা দেখা যায়। "অধিকারীরা" এই বিষয়ে বিচার করবেন। শেষ অবধি বৈজ্ঞানিক রামেন্দ্রসুন্দরের প্রতি বাংলার শিক্ষিত সমাজের অবিচলিত ভক্তি ছিল। এই প্রসঙ্গে আমার নিজের একটা কথা মনে হচ্ছে—দেশের নবীন যুবারা যখন কলকাতা সায়েন্স কলেজে নিজেরাই পদার্থ-বিদ্যার স্নাতকোত্তর ক্লাস খুলতে চেয়েছিল, তখন সার আশুতোষ চেয়েছিলেন ত্রিবেদীর মত একজন বিচক্ষণ প্রবীণ বিজ্ঞানীকে তাদের নেতা হিসাবে। অশুতোষের বাণী নিয়ে আমরা ত্রিবেদীর সঙ্গে দেখা করেছিলাম। সব কথা শুনে তিনি বলেছিলেন যে, যথাস্থানে এই আর্জির উত্তর জানাবেন। অবশ্য তিনি শেষ অবধি সায়েন্স কলেজে যোগ দেন নি। কারণ কি দিয়েছিলেন, তার সম্বন্ধে কানাঘুষাই শুনেছিলাম। তা অব্যক্ত রহস্যই রয়ে গেছে।

তার কিছু পরে কলকাতায় স্যাড্‌লার কমিশন বসলো। ১৯১৭ সালে ৩০শে নভেম্বর কমিশন রিপন কলেজ পরিদর্শন করতে এসেছিলেন। স্যাড্‌লার সাহেব রামেন্দ্রসুন্দরের বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞানবত্তার পরিচয় পেয়ে একান্ত মুগ্ধ হয়েছিলেন, তিনি বিস্ময় বিমুগ্ধচিত্তে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্ট গ্রাজুয়েট ক্লাসে এরূপ লোক নিযুক্ত না করে কতকগুলি ছোকরা নিযুক্ত করা হয়েছে কেন? তিনি উত্তরে বলেছিলেন—"This is the fate of our country., এটাই আমাদের দেশের ভাগ্য।" (বাজপেয়ীর রামেন্দ্রসুন্দর ১২১ পাতা)। বাংলার ভাগ্যলক্ষ্মী তখন হয়তো সার আশুতোষের নির্বাচনে বিশেষ রুষ্ট হন নি। তখন এই যুবকদের দলে ছিলেন ডাঃ মেঘনাদ সাহা, ডাঃ (পরে সার) জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, ডাঃ সুধাংশু ব্যানার্জি, ডাঃ নিখিলরঞ্জন সেন প্রভৃতি।

শেষ বয়সে নানা শোক-তাপে রামেন্দ্রসুন্দরের শরীর ভেঙ্গে যায়। পুরনো শিরঃপীড়া আবার আত্মপ্রকাশ করে। মাঝে মাঝে তিনি সংজ্ঞা হারাতেন। ১৩২৫ সালে আবার পড়লেন ম্যালেরিয়া জ্বরে। তাঁর মার'ও স্বাস্থ্যভঙ্গ হলো, তিনি তীর্থ-যাত্রা করতে চাইলেন এবং দুর্গাদাস ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনকে নিয়ে তীর্থযাত্রা করলেন। ইতিমধ্যে রামেন্দ্রসুন্দরের কন্যা গিরিজা দেবী অসুস্থ হয়ে পড়লেন।

কলকাতায় আসা হলো, যত্ন ও চিকিৎসা সত্ত্বেও/ ১৭ই পৌষ তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করলেন। তারপর তাঁর বৃদ্ধা মাতা দেশে মহাবিষুব সংক্রান্তির দিন অনন্তধামে চলে গেলেন। ১৩২৫ সালের ফাল্গুনে রামেন্দ্রসুন্দরের ভগ্নদেহে জ্বরের লক্ষণ প্রকাশ পেলো। মায়ের মহাপ্রয়াণের পর স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙ্গে পড়লো। তাঁর ইচ্ছামত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাই চলতো। মাঝে একবার ডাঃ সুরেশ প্রসাদ সর্বাধিকারী এসেছিলেন, বললেন Bright's disease, জীবনের আশা নেই। তারপর কোনক্রমেই রোগ বা যন্ত্রনার উপশম দেখা গেল না। এই সময় একদিন কাগজে বের হলো কবিশ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ জালিয়ানওয়ালাবাগে নৃশংস অত্যাচারের পর নাইট উপাধি বর্জন করেছেন। রবীন্দ্রনাথকে দেখবাব ইচ্ছা প্রবল হলো—তাঁর সেই বিখ্যাত ইংরাজী পত্র তাঁর নিজমুখে শোনবার ইচ্ছাও তিনি তাঁর ভ্রাতা দুর্গাদাসের মুখে কবিকে জানালেন। ১৯শে জ্যৈষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী মশায়কে দেখতে এলেন। রামেন্দ্রসুন্দর অনুরোধ করেন, বড়লাটের কাছে লেখা চিঠি স্বয়ং আপনার মুখে একবার শুনতে চাই। তিনিও একখানা নীল কাগজে লেখা সেই পত্রটি বের করে দৃপ্তকণ্ঠে পড়ে শোনালেন। একটা গভীর পরিতৃপ্তি ফুটে উঠলো ত্রিবেদী তাপসের মুখে। শারীরিক অসুস্থতার তীব্রতা তাঁর কাছে তুচ্ছ হয়ে গেল। * * নির্বাণোন্মুখ প্রদীপের শিখা বুঝি এমনি করেই জ্বলে উঠে। কম্পিত কণ্ঠে রামেন্দ্রসুন্দর বললেন—আমি আর উঠতে পারি না—দয়া করে আপনার পদধূলি আমার মাথায় দিন। * * * কবিগুরু বিদায় নিলেন—এদিকে রামেন্দ্রসুন্দর তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। সে তন্দ্রা আর ভাঙ্গলো না (ধীরেন্দ্রনারায়ণ, ২৪৮ পাতা, 'ঘরে বাইরে রামেন্দ্রসুন্দর'), ২৩শে জ্যৈষ্ঠ রাত্রি দশটার সময় অকালে মহাপ্রয়াণ করলেন রামেন্দ্রসুন্দর। রামেন্দ্রসুন্দরের অন্তিমকালে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় উপস্থিত ছিলেন—তিনি বড় আক্ষেপের সঙ্গে বলেছিলেন—"আমাদের চক্ষের সামনে বিদ্যার একটা বড় জাহাজ ডুবিয়া গেল" (বাজপেয়ীর "রামেন্দ্রসুন্দর" ৮২ পাতা)

তাঁর চিরদিনের সাধনা ও প্রিয় সাহিত্য পরিষদে স্মৃতিরক্ষাকল্পে অনেক প্রস্তাবই হয়েছিল।

(৮) দফায় দেখি (বাজপেয়ী "রামেন্দ্রসুন্দর")

"শেষ পর্য্যন্ত স্মৃতিসংরক্ষণ বিষয়ে সাহিত্য পরিষদ তৈলচিত্র ও রচনাবলী ব্যতীত কোন কাজে অগ্রসর হইতে পারেন নাই।"

জাপানী বিজ্ঞানী তোমোনাগা

ডাঃ তোমোনাগা (Tomonaga) এবার পদার্থ-বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। এঁর পিতা জুঞ্জিরো (Zunjiro) বহুদিন (Kyoto) বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্রের যশস্বী অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর লেখা বই "এই যুগে জাপানের নব জাগরণ" আজও জাপানে বহুলোক পড়ছে। ছোট ভাই যোজিরো এক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভূগোলের অধ্যাপক। পিতৃব্য ও মাতুল কিয়োটোতেই শিক্ষকতা করতেন। বিদ্বানের বংশ বলে জাপানে তোমোনাগাদের সুখ্যাতি আছে।

ইনি জন্মেছিলেন টোকিও সহরে, তবে অল্প বয়সেই পরিবারের সকলের সঙ্গে কিয়োটাতে চলে আসেন। স্বভাবতঃ ক্ষীণজীবী, শৈশব থেকেই নানা অসুখে ভুগেছেন। প্রকাণ্ড মাথার মধ্যে বুদ্ধিদীপ্ত চক্ষু জ্বল জ্বল করছে, তবে অস্থিচর্মসার দেহ। বিজ্ঞানের উপর ঝোঁক ছেলেবেলা থেকে। "ছেলেদের বিজ্ঞান পত্রিকা" নিয়মিতভাবে পড়তেন ও মাঝে মাঝে তাতে প্রবন্ধও লিখতেন। গাছপালা, কীট-পতঙ্গ সংগ্রহ করবার বাতিক ছিল। কাগজে তৈরি জাহাজ ও আরও টুকিটাকি জিনিসের ভিতর তাঁর কারুবিদ্যার ঝোঁক প্রকাশ পেত। জাপানের উচ্চমান-বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণীতে উঠে পদার্থ-বিজ্ঞান নিয়ে মেতে উঠলেন। সেই সময় জাপানে বক্তৃতা দিতে গিয়েছিলেন প্রোফেসর আইনস্টাইন। তাঁর প্রত্যেক বক্তৃতা-সভায় বালক তোমোনাগা উপস্থিত থাকতেন। তখন থেকেই সারাজীবনের মত পদার্থ-বিজ্ঞানের সেবাই বরণ করে নিয়েছেন। এর কিছু পরেই কোপনহাগেন থেকে ফিরে এলেন নিশিনা (Nishina)। ইনি নীল বরের ছাত্র—নামে বিজ্ঞানী জগতে সুপরিচিত। ১৯৩২ সালে কিয়োটোতে পদার্থ-বিজ্ঞানের অধ্যাপনা করছেন নিশিনা, ইকাওয়া (Ykawa) ও তোমোনাগা (পরে দু'জনেই নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন) ওঁর কাছে রিসার্চে শিক্ষানবিসী করছেন, সঙ্গে আর একজন—সাকাতা (Sakata); আজ ইনিও যশস্বী হয়েছেন। ১৯৩৬ সালে মেসন (Meson) নিয়ে প্রবন্ধ প্রকাশ করলেন ইকাওয়া। ১৯৩৭ সালে নিশিনা—তোমোনাগা—সাকাতা-র ইলেকট্রন-যুগ্মের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রবন্ধ বের হলো।

বিজ্ঞানীমহলে তোমোনাগার এই প্রথম পরিচয়-পত্র। তারপর ২ বছর ('৩৮-৪০) তোমোনাগা জার্মেনীতে হাইসেনবার্গের কাছে কাটিয়েছিলেন।

হাসি ও রঙ্গ করে অবসর কাটান বিজ্ঞানী। জার্মেনী থেকে ফিরে নিজে একটা রঙ্গনাট্য লেখেন এবং তার অভিনয়েও অংশগ্রহণ করেছিলেন। আজও এই ধরণের নাট্য-নিকেতনে তাঁর আকর্ষণ অটুট রয়েছে।

এর কিছু পরেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হলো। প্রশান্ত মহাসাগরেও যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠলো। যুদ্ধে দরকারী রেডার ও বেতার সাজসরঞ্জামের প্রস্তুতি নিয়েই অনুসন্ধানে ব্যাপৃত থাকতে হতো তোমোনাগাকে। মধ্যে মধ্যে ফুজিওকার নিমন্ত্রণে যান কিয়ুকু বিশ্ববিদ্যালয়ে টোকিওতে। তাঁর সঙ্গে রিসার্চের সম্বন্ধে নানাবিধ আলোচনা হয়। তখন জাপানে খাদ্যের ভীষণ অনটন—অনুসন্ধানীদেরও খাবার জোটে না। শরীর এমন দুর্বল যে, রাস্তায় যেতে যেতে অজ্ঞান হয়ে পড়েন সময় সময়। শেষে যুদ্ধ থামলো, এদিকে বোমাবর্ষণে দুই অনুসন্ধানাগারই পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে। তবু ভাঙ্গা বাড়ীর মধ্যে জানালার পাশে তোমোনাগা গভীর চিন্তায় নিমগ্ন থাকেন, নিজে যে কল্পনা করেছিলেন পরমাণুর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বিষয়ে, সেই ক্ষেত্রে বহু বিশিষ্ট কাল-পরিমাপের প্রয়োগ নিয়ে অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছেন।

১৯৪৮ সালে তাঁর মত পূর্ণরূপে প্রকাশ পেল। কিছু পরে আমেরিকান বিজ্ঞানী ফেইনম্যান ও সুইঙ্গার তাঁদের প্রবন্ধও ছাপালেন। অন্যভাবে তাঁরাও তোমোনাগার দৃষ্টিভঙ্গী ও মতের অনুরূপ অবস্থায় এসে পৌঁচেছেন। আজ তিন জনের সেই সব নতুন কথা বিশ্বস্বীকৃতি পেয়েছে—তিন জনেই এর জন্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। যখন ভাবি—যুদ্ধের পর জাপানে কোন বিদেশীয় বৈজ্ঞানিক সংবাদ বা সংবাদপত্র বহুদিন পাওয়া যেত না এবং তোমোনাগাকে একা একাই নব মতের সারা সৌধকেই গড়ে তুলতে হয়েছিল, তখন তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও চিন্তাশক্তির প্রাচুর্যের কথা পূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারি।

১৯৫০ সালে D. Oppenheimer-এর নিমন্ত্রণে Princeton-এ এক বছর কাটিয়ে এলেন তোমোনাগা। ফিরে আসবার পর—বন্ধুরা জিজ্ঞাসা করলে বলতেন, দাঁতগুলির ভাল করে চিকিৎসা করা গেল। পূর্বেই রূপনাট্যে তাঁর অনুরাগের কথা বলেছি। রূপকচ্ছলে নানা কথা বলে কোয়াণ্টাম-বাদের অনেক কুহেলিকাও জনসমক্ষে সুস্পষ্ট করতে পারতেন।

একদিন প্রোফেসর নাকামুরাকে (Prof. Nakamura) বলছেন—রাস্তার

আলোর তলায় কে একজন যেন কি খুঁজে বেড়াচ্ছে। কিছু হারিয়েছে না কি? বলে—হ্যাঁ চাবিটা! কোথায়? ওইখানের অন্ধকারে—তবে অন্ধকারে কিছু পাওয়া শক্ত, তাই যেখানে আলো পড়েছে, সেইখানেই হাতড়াই। আমাদের কোয়াণ্টা-বাদের অবস্থা আজকাল প্রায় এই রকম নয় কি?

গল্প করবার আশ্চর্য ক্ষমতা তোমোনাগার—রহস্য করে নব্য বিজ্ঞানের নানা কথা জনপ্রিয় করতে চেয়েছেন। এখনও রঙ্গনাট্য-নিকেতন নিয়ে বিভোর। সরল সাদাসিদা মানুষ, নিজের আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব নিয়েই এইভাবে অবসর বিনোদন করেন। তবে শরীরকে টিকিয়ে রাখবার জন্যে সন্ধ্যাবেলাই ঘুমের প্রয়োজন। রাতের খাওয়া শেষ করেই ঘুমের সাধনা—ডাক্তার বলেছেন ১২ ঘণ্টা ঘুমান চাই প্রত্যহ। তাঁর পানের আসক্তি নিয়ে অনেকে ঠাট্টা তামাসা করেছে। নোবেল প্রাইজের খবর এলে বিজ্ঞান অ্যাকাডেমি নিজের খরচে কয়েক বোতল বিলাতী সরাব পাঠালে—সবেতেই লেখা—বিশিষ্ট রসিকের জন্যে।

টাকাকড়িতে মায়া নেই। নানাভাবে অল্প স্বল্প যা আসে, আর তাঁর বাঁধা মাহিনা। ঐ সব দিয়েই সংসার চলে। নিজের হয়তো হিসাব নেই, ঠিক কত তাঁর রোজগার। স্ত্রীর (রিয়োকো) সেই সব ঝঞ্ঝাট পোহাতে হয়। ছেলেরা স্কুলে পড়ছে। এক মেয়ের সম্প্রতি বিবাহ হলো—এসব নিয়ে তোমোনাগা ব্যস্ত নয়। শিশু অবস্থায় তিনি সন্তানদের খেলার সঙ্গী; তবে বড় হলে তাদের ভাবনা তারাই-ভাবে—তাদের পড়াশুনা নিজেরাই চালিয়ে নেয়। স্ত্রী বলেন ঠাট্টাচ্ছলে এক জাপানী প্রবাদ—

"মুচির ছেলের—খালি পা।"

পরকে জ্ঞানদান করতে তোমোনাগা ব্যস্ত, নিজের ছেলেমেয়ের শিক্ষার কথা ভাববার অবসর কোথায়?

সাংবাদিকেরা জিজ্ঞাসা করেছিলেন—মিসেস তোমোনাগা, নোবেল পুরস্কারের টাকায় কি হবে?

বললেন, এখানো ভাবি নি দুজনে—হয়তো এই বাড়ী তৈরির দেনা মিটাতেই শেষ হয়ে যাবে।

আইনস্টাইন—৩

বিখ্যাত মনীষী আইনস্টাইনের নাম তোমরা সকলে নিশ্চয়ই শুনেছ। নানাভাষায় তাঁর জীবনী লেখা হয়েছে, কোন কোন বই আবার বাংলাভাষায় তর্জমা করা হয়েছে। কৌতূহল হলে জোগাড় করে পড়ে দেখো। ১৪ই মার্চ ১৮৭৯ দক্ষিণ জার্মানীর উল্‌ম (Ulem) সহরে এক ইহুদী পরিবারে আইনস্টাইনের জন্ম। পিতা হারমান অল্প ধন নিয়ে ব্যবসায়ে নেমেছিলেন। দেশ-বিদেশ ঘুরে প্রথম মিউনিক্‌ (Munick) পরে ইটালী দেশের মিলান (Milan) সহরে বৈদ্যুতিক নানা সরঞ্জাম বিক্রীর ছোট দোকান খুলেছিলেন। এতে রোজগার বেশী হত না। বরং আস্তে আস্তে পারিবারিক সব সঞ্চয়ই দেনা শোধ করতে তলিয়ে গেল। ছেলে অ্যালবার্ট (Albert) যখন মিউনিক স্কুলে পড়া শেষ করলেন জার্মানীর বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর উচ্চশিক্ষার ব্যয় বহন করা পরিবারের সাধ্যাতীত ঠেকলো। আইনস্টাইন তখন সুইজারল্যাণ্ডের জুরিক (Zurich) সহরের বিখ্যাত ইন্‌জিনীয়ারিং কলেজে ভর্তির আবেদন করলেন। প্রথম বৎসরে আবেদন অগ্রাহ্য হলো। প্রবেশিকা পরীক্ষায় গণিতে খুব ভাল নম্বর পেয়েছিলেন। তবে জীববিজ্ঞান বা বিদেশী ভাষার উপর তাঁর উপযুক্ত পরিমাণ দখল ছিল না বলে, আবার এক বৎসর সুইজারল্যাণ্ডের স্কুলে পড়তে হলো বিষয়গুলি। শেষ ১৮৯৬ সালে ভর্তি হলেন, ও পলি-টেকনিকে পড়লেন ৪ বৎসর। নিজেই পদার্থবিজ্ঞানে যা ভাল লাগতো, মনীষী Maxwell, Bolzmann, Hertz, Krichoff-এর মৌলিক গবেষণার গ্রন্থগুলি, নিজে নিজেই আয়ত্ত করেছিলেন। ১৯০০ সালে পলি-টেক্‌নিকের পড়া শেষ হল। প্রথমে উপার্জনের জন্য নানা রকমের ছোটখাট কাজ বা প্রাইভেট টুইসানি—করতে হতো। শেষে ১৯০২ সালে জুলাই মাসে বার্ণ (Berne) সহরের পেটেন্ট অফিসে চাকরী পেলেন। বার্ষিক বেতন জুটলো ৩৫০০ সুইস্‌ ফঁ্রা।

এই সামান্য চাকরীর বিষয়ে আইনস্টাইন শেষ জীবনে লিখেছেন—"এখন জীবনের প্রারম্ভে এই সামান্য চাকরী ভাগ্যদেবীর আশীর্বাদ বলেই মনে হচ্ছে। স্কুল বা কলেজে শিক্ষকতা করার চেয়ে এই আমার পক্ষে বেশী ভাল ফল দিলে। এই কাজ করে প্রচুর অবসর মিলতো, সেটি বিজ্ঞানের নানা বিষয়ে স্বাধীন ও মৌলিক চিন্তা করে ব্যয় করা যেত।

আমার মত বয়সে নবীন বিজ্ঞানীরা যাঁরা পাশ করেই স্কুল-কলেজে বিজ্ঞানে অনুসন্ধানের সুযোগ পেয়েছিলেন, তাঁদের আশু কৃতিত্ব দেখানর তাগিদে সামান্য

সামান্য বিষয় নিয়েই ব্যাপৃত থাকতে হতো। অনায়াসলব্ধ যশের প্রলোভন থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে বিজ্ঞানের মূল ও গভীর তত্ত্বের সন্ধানে নিজের সর্বশক্তি উৎসর্গ করতে যে চারিত্রিক দৃঢ়তা ও মনোবলের দরকার তা' সাধারণতঃ নবীন বিজ্ঞানীদের মধ্যে বিরলই ঠেকে। তাই তাঁরা ছোটখাট জিনিষের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেন।"

অবসরের সুযোগকে তিনি একান্তভাবে বিজ্ঞানের সাধনায় উৎসর্গ করলেন। তিন বৎসর নীরব ও একাগ্র বিজ্ঞান সাধনায় সরস্বতী প্রসন্না হলেন। ২৬ বৎসর বয়সে ১৯০৫ সালে আপেক্ষিকতাবাদের প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশ করলেন। সেই সময় আলোক বিজ্ঞানের একটি সমস্যা বিশ্বের বিজ্ঞানীদের বিভ্রান্ত করেছিল। তাঁর মৌলিক প্রবন্ধ এই বিষয়ে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোকপাত করে বিজ্ঞানরাজ্যে এক যুগান্তর ঘটালে। প্রৌঢ় বিজ্ঞানীরা যেমন পঁয়কারে (Poincare), লরেঞ্জ (Lorentz) বা প্ল্যাঙ্ক এই উদীয়মান নবীন বিজ্ঞানীর ভূয়সী প্রশংসা করলেন। বেশী দিন ছোট বার্ন সহরে তাঁর থাকা চললো না। অধ্যাপক হয়ে যাবার ডাক এলো প্রথমে প্রাগ থেকে। সেখানে নানা বিষয়ে মৌলিক প্রবন্ধ লিখে বিশ্ব-বরেণ্য বিজ্ঞানীর দলে উন্নীত হলেন ও প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের প্রাক্কালেই বার্লিন মহানগরীতে অধ্যাপনা করার ডাক এলো।

নানা নতুন কথা প্রচার করলেন আইনস্টাইন। বাহ্যজগতের ঘটনার কার্যকারণ সম্পর্কীয় আলোচনা দর্শকের গতিভঙ্গী বা অবস্থান থেকে বিমুক্তকরেই করা সম্ভব এবং বহিঃবিশ্বের দর্শক-নিরপেক্ষ অস্তিত্ব মেনে নিয়ে, বিজ্ঞানীকে আলোচনা করতে গেলে যে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে জগৎ-সমীক্ষা করতে হয় সে বিষয়ে অনেক কথা আইনস্টাইন বললেন। বস্তু, শক্তি, বল, মাধ্যাকর্ষণ এই সব বিষয়ে অনেক নতুন তথ্য আমরা আইনস্টাইনের কাছে শিখেছি ও তাঁর নির্দেশিত পথে নবযুগের বিজ্ঞানীরা আজকাল অগ্রসর হয়ে অনেকে যশমাল্য অর্জন করছেন। ১৯০০ সালে প্ল্যাঙ্ক (Planck) আলোক ও বস্তুর প্রতিক্রিয়া, ও কার্য-শক্তি বিনিময় নিয়ে নতুন এক মত প্রচার করেছিলেন যা আজ নানাভাবে পরিমার্জিত ও পরিবর্তিত হয়ে বর্তমান যুগের কোয়ান্টাম বাদে (Quantum Theory) পরিণত হয়েছে। আইনস্টাইন এই মতবাদের পক্ষে যে সব প্রবন্ধ লেখেন, তাতে একটি নতুন পরিকল্পনা জুড়ে দিলেন প্ল্যাঙ্কের মতবাদে। আইনস্টাইন অবতারণা করলেন আলোকের শক্তিকণা-বাদ বা Photon theory। এর সাহায্যে অনেক রহস্য পরিষ্কার ও সহজে বোঝা গেল। যদিও তরঙ্গবাদকে বাতিল করে আবার

নিউটনের মত আলোককে জ্যোতিকণার সমূহ হিসাবে ভাবা একেবারে অসম্ভব হয়ে পড়েছিল, তবু কি ভাবে আলোকের মধ্যে সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী ধর্ম বর্তমান থাকতে পারে তাই নিয়ে আইনস্টাইন অনেক গবেষণা করলেন।

আমরা যখন কলেজে পড়ি তখনই এই সব নতুন তথ্য প্রচার হয়েছিল তবে এ দেশে বহুল প্রচার হওয়ার আগেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলো। আমরা এই সব বিচিত্র কথার খবর পেলাম অনেক পরে।

প্রথম আপেক্ষিকতাবাদের উদ্ভাবন করার পর থেকে প্রায় দশ বৎসর মাধ্যা-কর্ষণের বিষয় চিন্তা করছিলেন কিভাবে মাধ্যাকর্ষণকে তাঁর আপেক্ষিকতাবাদের দেশ-কালের পটভূমিতে নামাতে হবে। শেষে সম্পূর্ণ নতুনভাবে মাধ্যাকর্ষণের ব্যাখ্যা করলেন। যুদ্ধের মধ্যে দেশ-বিদেশের বিজ্ঞানীরা এ বিষয়ে মনোযোগ দিতে পারেন নি। আইনস্টাইন এ দিকে ভবিষ্যৎবাণী করে রেখেছেন, তাঁর মতে আলোক রশ্মি সূর্যের মণ্ডল ঘেঁষে এলে, তার দিকে ঈষৎ বিচ্যুতি ঘটবে এমন কি কত পরিমাণ হবে এই বিক্ষেপ, তাও তিনি গণনা করে রেখেছিলেন। ১৯১৮ সালে জারমানীর হার হলো। বিশ্বে শান্তি পুনঃস্থাপিত হলো। তখন বিশ্বের বিজ্ঞানীদের অবসর মিললো আইনস্টাইনের মাধ্যাকর্ষণবাদকে যাচাই করে দেখার।

১৯১৯ সালে বিশ্বের সব বিজ্ঞানীদের চমৎকৃত করে এক খবর সব দেশের খবরের কাগজে ছাপা হলো। ওই বৎসর সূর্যের পূর্ণ গ্রাসের সময় একদল বৃটিশ বিজ্ঞানী চেষ্টা করেছিলেন জানতে দূরের নক্ষত্র থেকে আলোক সূর্যমণ্ডলের নিকট দিয়ে আসতে মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে ঈষৎ-বক্র পথে বিচ্যুত হয় কিনা। আইন-স্টাইনের নতুন মতে এই বিচ্যুতির পরিমাণ হবে 1·75" (সেকণ্ড)। তাঁরা চমৎকৃত হলেন তাঁদের পরীক্ষার ফল আইনস্টাইনের গণনা প্রায় পুরোপুরি সমর্থন করছে। সেই সময় থেকেই সারা বিশ্বে আইনস্টাইনের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লো।

সেই সময় আমরা সবে শিক্ষকতা করতে নেমেছি। বিশ্ববিদ্যালয় সায়েন্স কলেজে স্নাতকোত্তর বিজ্ঞানের ক্লাস খুলে দিয়েছেন। ডাঃ মেঘনাদ সাহা, অধ্যাপক প্রশান্ত মহলানবীশ ও আমি, তিনজনে নতুন থিওরীর প্রবন্ধগুলি চয়ন করে মূল জার্মান থেকে ইংরাজীতে অনুবাদ করি ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সেই গুলিকে নিয়ে এক বই ছাপান। প্রথমে ইংরাজীতে আমাদের বইয়ে প্রথম আপেক্ষিকতাবাদের মূল প্রবন্ধগুলি পাওয়া যেত। এখন অবশ্য অনেক লোকই

প্রকাশ করেছেন নানা অনুবাদ ও আমাদের বই এখন বাজার থেকে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলো ১৯২১। আমাকে পদার্থবিদ্যা বিভাগে রীডার হয়ে যেতে হল্। বিজ্ঞানের অনেক নতুন কথারই ব্যাখ্যা করতে হয় উচ্চস্তরের ক্লাসে। ওই সময় Planck এর মূলনীতি ও আইনস্টাইনের আলোককণা (Photon) পরিকল্পনার সমন্বয় ঘটিয়ে আমি একটি প্রবন্ধ লিখি। অবশ্য ইংরাজীতে লিখেছিলাম ও ইংলণ্ডে পাঠিয়েছিলাম প্রকাশ করার জন্য। এদিকে আবার নিজের কৌতূহলও হলো জানতে, আইনস্টাইন এই নতুন কথায় কি অভিমত প্রকাশ করেন। তাঁর কাছেও অপ্রকাশিত প্রবন্ধের একটি অনুলিপিও পাঠিয়ে দিলাম। তখন অভাবনীয় কোন ফলের আশাই রাখি নি, ও তাঁর দৃষ্টি এ বিষয়ে যে আকর্ষণ করতে পারবো, সে বিষয়ে আশারেখা খুব ক্ষীণই ছিল মনের মধ্যে।

তবু ঘটে গেল এক আশ্চর্য ব্যাপার। আইনস্টাইন পেয়েই অল্প কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ছোট এক পোষ্টকার্ডে জবাব দিলেন। স্বীকার করলেন এতে তাঁর থিওরী অনেকটা এগিয়ে গেল, এবং বললেন আমার কথাগুলি এতই মূল্যবান যে নিজেই তর্জমা করে জার্মানীতে ছাপিয়ে দেবেন। অবশ্য ইংলণ্ড থেকে কোন খবর আসার অনেক আগেই এ প্রবন্ধ প্রকাশ হলো (১৯২৪)।

আমার বিদেশে যাবার কথা হচ্ছিল। এই সময় প্রোফেসর আইনস্টাইনের চিঠি আসাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কার্যকরী সভার আমাকে বিদেশে পাঠান নিয়ে যে দ্বন্দ্ব বা দ্বিমত ছিল তার অবসান ঘটলো।

আমি ২ বৎসরের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের খরচায় বিদেশে যাবার ছুটি ও পাথেয় পেলাম। জার্মানী যাবার ছাড়পত্র ইত্যাদি সবই ওই ছোট পোষ্টকার্ডখানির দৌলতে অনায়াসে মিলে গেল। আমার বিজ্ঞানী জীবনে নবযুগের সূচনা করলে সেই চিঠি। পরে যখন বিদেশে গিয়ে উপস্থিত হলাম তখন দেখি প্রায় সকলেই আমার প্রবন্ধ পড়েছেন ও আলোচনা করছেন। স্বয়ং আইনস্টাইন, আমার নতুন সংখ্যায়নরীতিকে (Statistics) বস্তুকণার ক্ষেত্রে প্রয়োগ ক'রে এর প্রয়োগ ক্ষেত্র অনেক বাড়িয়ে দিয়েছেন। জার্মানীতে যত দিন ছিলাম বিজ্ঞানের সব প্রতিষ্ঠানে সহজে ঢুকতে পেরেছি— তা ছাড়া জার্মান অধ্যাপকদের মত সরকারী পুস্তকাগার থেকে বই নিয়ে বাড়ীতে বসে পড়ার অধিকার মিলেছিল কিছু অর্থ না জমা রেখেই, সবই গুরুর কৃপায় হয়েছিল।

১৯২৫ সালে বার্লিন পৌঁছাই। তখন 5 Heberland strasse এ একটা ছোট Flat-এ আইনস্টাইন পরিবার বাস করতেন। সেখানে অনেক সময় যাবার ও বহুক্ষণ ধরে নানাবিষয় আলোচনা করার সৌভাগ্য জুটে ছিল আমার। একদিনের কৌতূহলোদ্দীপক একটি কথোপকথনের বিষয় বলে এই প্রবন্ধ শেষ করবো। বিশ্বযুদ্ধের পরে ইহুদীজাতি তাঁদের পূর্বপুরুষের দেশে নতুন রাজ্য গড়ে তোলার সুযোগ পেয়েছিলেন। সেই সময় জেরুজেলেমে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় খোলা হলো।

অখ্যাত-নব-বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনস্টাইন গিয়ে বক্তৃতা দিলেন, ও প্রায় সেই সময়ে জাপানেও বৈজ্ঞানিক সফর করে গিয়েছিলেন। ভারতবর্ষ তাঁকে নিমন্ত্রণ করেছিল, তবে নানা কারণে তিনি এ দেশে আসতে পারেন নি। ইহুদীরাজ্য ইশ্‌রায়েল (Israel) তখন ইংরাজ সাম্রাজ্যের আওতায় বর্দ্ধিত হচ্ছিল। অনেকে বিশ্বাস করতেন এই যোগসূত্র ইহুদীদের পক্ষে পূর্ণ-কল্যাণকর হবে। আইন-স্টাইনেরও তখন এই বিশ্বাস ছিল। এদিকে অবশ্য অনেকে ইংরাজ সরকারের কূটনীতিকে সম্পূর্ণ সমর্থন করতেন না, প্যালেষ্টাইনে তখন মুসলিমধর্মী আরবীয় অনেক বাস করতো। এরা ইহুদীদের আগমন বিশেষ সুনজরে দেখে নি। ইংরাজ প্রভু আমাদের দেশের মত তাঁর প্রভুত্ব ভেদনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন। ভারতবর্ষের সকলে এই কূটনীতির সঙ্গে সুপরিচিত, ও এর বিষময় ফলে এখনো আমরা জর্জরিত রয়েছি।

আমি যে সময়ের কথা বলছি তখন এ দেশে ইংরাজবর্জন আন্দোলন সুরু হয়ে গিয়েছে। বিপ্লবীরা ব্যর্থচেষ্টা করছে সংগ্রাম করে ইংরাজদের হঠাতে, কংগ্রেস তুলেছে অসহযোগের কথা। আইনস্টাইনের কাছে এটা একটা রহস্যের মত ঠেকতো!

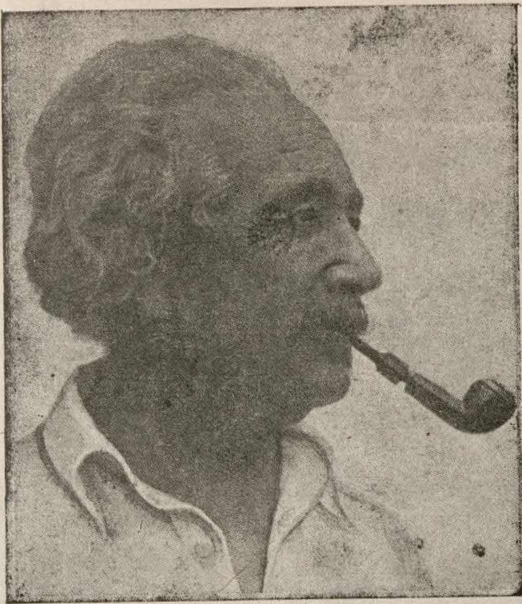
একদিন তিনি আমাকে প্রশ্ন করে বসলেন দেখো ঔপনিবেশিক পশ্চিমী জাতিদের মধ্যে আমার তো ইংরাজদের ভাল বলে মনে হয়—ফরাসী বা ওলন্দাজদের থেকে এরা অনেক ভাল বলেই তো আমার বিশ্বাস—যদিও আমার মত একজন জার্মান—যে ইংরাজদের (বিশ্বযুদ্ধের পরে) সুখ্যাতি করছে শুনে আশ্চর্য হয়ো না। আচ্ছা বলতো, সত্যি সত্যি কি তোমরা চাও, যে ইংরাজ তোমাদের দেশ ছেড়ে চলে যাক। —আমি বললাম "নিশ্চয়ই আমরা সকলেই নিজেদের ভাগ্যবিধান নিজেরাই করতে চাই।" তাতেও তাঁর পুরাপুরি বিশ্বাস হলো না। ঠিক বুঝতে একটি কাল্পনিক প্রশ্ন তুললেন। বললেন "ধরো তোমার হাতের কাছে একটা

বোতাম রয়েছে, যেটি টিপলে সব ইংরাজ তোমার দেশ থেকে চলে যাবে তা হলে সত্যই কি তুমি সেই বোতাম টিপে দেবে ?" আমি হেসে বললাম—"ভগবান যদি এমন একটা সুযোগ আমাকে দেন, তো ক্ষণমাত্র বিলম্ব না ক'রে সেটি আমি টিপে দেব।" তিনি বললেন "বটে।" খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। আমি বললাম,—আচ্ছা আপনারা ইহুদীরা তবে কেন চাচ্ছেন,—একটা নতুন ইশরায়েল স্থাপনা করতে, আপনিও তো সেই দিকে বেশ ঝুঁকেছেন। তিনি বল্‌লেন অবশ্য এবার তোমার কথা আমি বুঝেছি—এটি প্রাণের আবেগের কথা—একে যুক্তিতর্কে বোঝা যায় না। তার পরে দেশে ফেরবার পথে আর একজন বিশ্ববিখ্যাত মনীষীর সঙ্গে ফরাসীদেশে দেখা হলো। ইনি আমাদের দেশ বেড়িয়ে গিয়েছেন। তিনি বললেন এই সব মনের আবেগের তাড়নায় আবার একটা জাতীয়তার পত্তন করে কি হবে। এতে তো বিশ্বে দ্বন্দ, ও অশান্তি বেড়েই চলবে। ইহুদীরা একটা পৃথক জাতি হয়ে স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপন করবে—এর ফল যে কি হবে—তা বোঝা শক্ত। দেখা গেল নানা ঋষির নানা মত, অবশ্য ফরাসীদেশের অন্যান্য ইহুদীরা এই ফরাসী পণ্ডিতের মতে সায় দিতেন না। সে আজ ৪০ বৎসর আগের কথা।

তার পর ইস্‌রায়েল ও ভারত প্রায় এককালেই স্বাধীন রাজ্যে রূপান্তরিত হয়েছে এবং ইংরাজের ভেদনীতি এই দুই নবীন রাজ্যের কুক্ষিতে শক্তিশেলের মত জাতি বিদ্বেষের সঞ্চার করে গেছে। এর ফল শেষ অবধি কি দাঁড়াবে—তা কেউই বলতে পারে না।

আমি জার্মানী ছেড়ে চলে এলাম ১৯২৬ সালের মাঝামাঝি। তার পর জার্মানীতে ইহুদীবিদ্বেষ দারুণ আকার নিলে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগেই আইনস্টাইনকে স্বদেশ ছেড়ে আমেরিকার প্রিন্সটনে আশ্রয় নিতে হয়েছিল। সেইখান থেকেই তিনি তাঁর নবতম মত প্রচার করেছিলেন। বিশ্ব-শান্তিকামী ছিলেন তিনি, বিশ্বশান্তির প্রার্থনা তিনি দ্বিধাহীনভাষায় ব্যক্ত করে গেছেন। গান্ধীর বিষয়ে তাঁর অমর কথাগুলি আমাদের ইতিহাসে অক্ষয় হয়ে বিরাজ করবে।

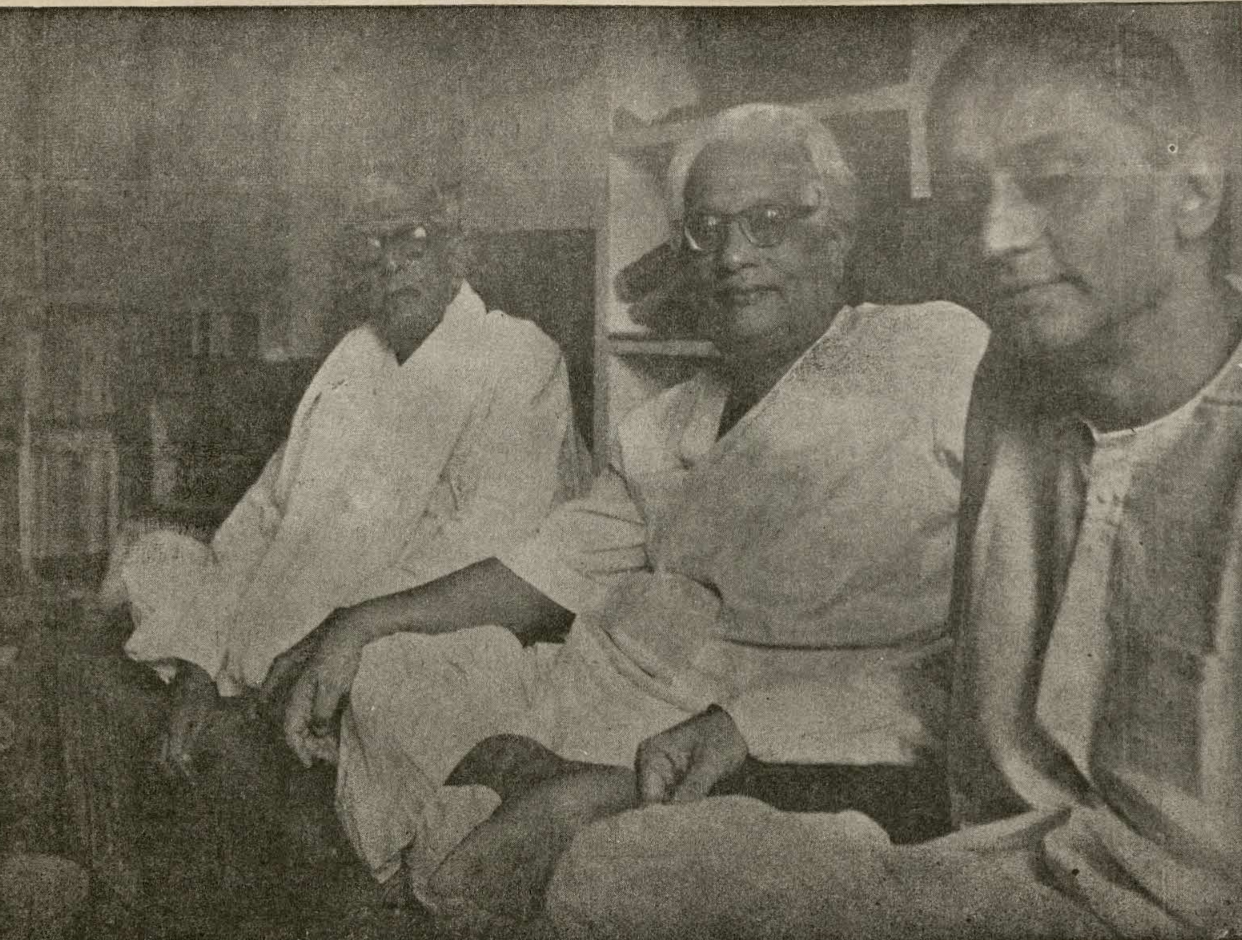
পরে আমার ভাগ্যে আর আইনস্টাইনের সঙ্গে সাক্ষাৎলাভ হয় নি। মধ্যে মধ্যে পত্র বিনিময় হয়েছে। শেষে ১৯৫৫ সালে রিলেটিভিটির স্বর্ণজয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে বার্ণ (Berne) সহরে হাজির হয়েছিলাম। কিন্তু তার অল্প কিছুদিন আগে হঠাৎ আইনস্টাইন হাসপাতালে মারা গেলেন। বার্ণের উৎসব আইনস্টাইন ছাড়াই উদ্‌যাপিত হলো।



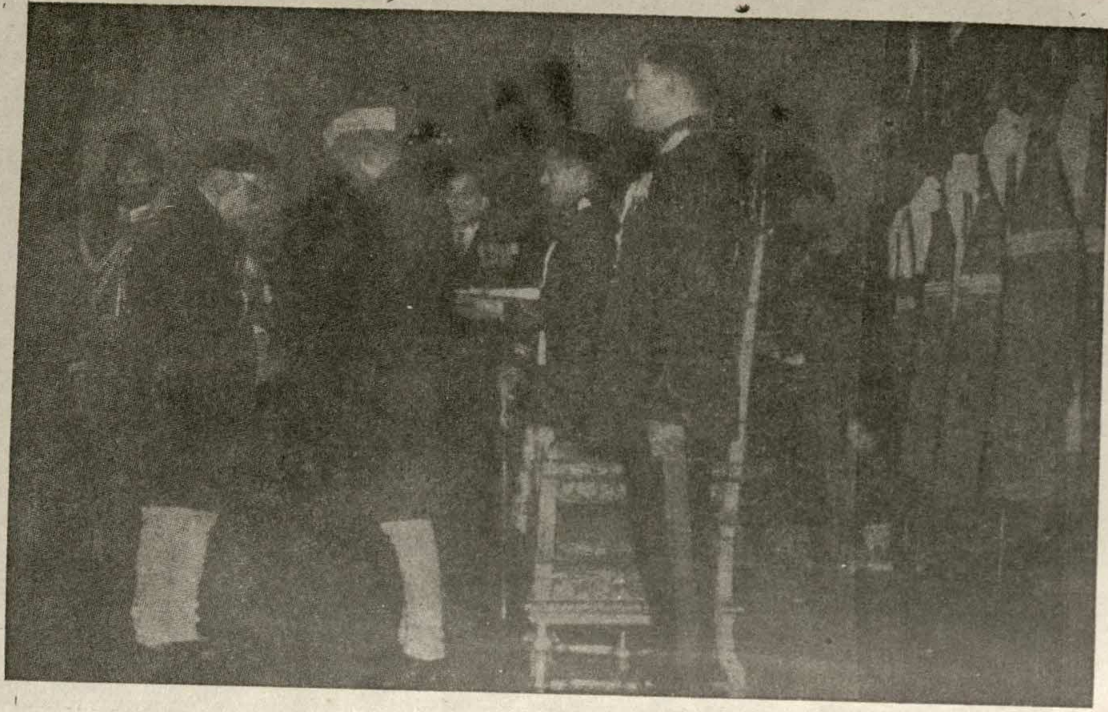
অধ্যাপনাকালে আইনস্টাইন।



বাঁদিক থেকে—মাদাম কুরী, কন্যা আইরিন, পিয়ের কুরী।



বাঁদিক থেকে—
যামিনী রায়,
সত্যেন্দ্রনাথ,
বিষ্ণু দে।



২৭শে জানুয়ারী (১৯৫৫) রাষ্ট্রপতি ভবনে সত্যেন্দ্রনাথ রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদের নিকট হইতে পদ্মবিষণ উপাধির প্রতীক ও প্রশংসাপত্র গ্রহণ করিতেছেন।

আণবিক যুগের পথিকৃৎ—মাদাম কুরী

মানবসভ্যতা ধাপে ধাপে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে। আজ যে প্রগতির স্তরে এসে পৌঁছেচে, তার অনেক আগে প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে তার অভিযান শুরু। অনেকদিন আগে প্রস্তর, ব্রোঞ্জ ও লোহার যুগ পার হয়ে গিয়েছে। গ্যালিলিও নিউটনের নামে উদ্‌ভাসিত বিজ্ঞানের চর্চা চালু হয়েছে প্রায় ৪-শত বৎসর আগে ! বিজ্ঞানের চর্চা করে আজ আমরা নানা শক্তির উৎস আবিষ্কার করেছি। প্রকৃতির ভাণ্ডারের মাটির মধ্যে থেকে কয়লা ও তেল উদ্ধার করে তাকে কাজে লাগাচ্ছি, বাষ্পযন্ত্র—বিদ্যুৎশক্তির কেন্দ্রগুলি গড়ে তুলছি পৃথিবীর নানা স্থানে। আবার জল-প্রপাত ইত্যাদিতে যে অমিত শক্তির আধার বর্তমান তার থেকে শক্তি বার করে নিজের কাজে লাগিয়ে দিচ্ছি। এ কাজে সাধনালব্ধ বিজ্ঞানই আমাদের সহায়। প্রাণ-ধর্মের গুণে সূর্যের তেজ থেকে যুগ যুগ ধরে সংগৃহীত বিপুল শক্তি নানাভাবে পৃথিবীতে নানারূপে সঞ্চিত ছিল। প্রাকৃতিক নিয়মগুলি বুঝতে শিখে, প্রকৃতির ভাঁড়ারের চাবি মানুষের হাতে পৌঁছে গিয়েছে। তারই বেপরোয়া খরচ চলেছে আজকাল। নানা হাতিয়ার সৃষ্টি হচ্ছে, ভাঙ্গাগড়ার কাজ চলেছে উত্তরোত্তর বর্ধমান তালে। এতে কত সাম্রাজ্যের বিস্তার বা বিলোপ ঘটলো। যে ভাবে আমরা কয়লা ও তেল পুড়িয়ে যাচ্ছি, তাতে লক্ষ লক্ষ বংসরের সংগ্রহ—এ বিপুল শক্তি-সম্ভার মাত্র কয়েক শত বৎসরের উত্তেজনার মধ্যে শেষ হয়ে যাবে আশঙ্কা হয়েছিল। তবে বিংশশতাব্দীর সুরু থেকে নতুন আশার বাণী শোনা যাচ্ছে। মানুষ আবিষ্কার করেছে অণুর মধ্যে অমেয় শক্তির নতুন উৎস ! এতদিন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বস্তুর রূপান্তর ঘটিয়ে মানুষ শক্তির চাহিদা মিটিয়ে এসেছে। যে অফুরন্ত শক্তির উৎস পদার্থের পরমাণুর মধ্যে সুপ্ত রয়েছে সেই আবিষ্কার হয়েছে বিংশ শতাব্দীতে ! আমরা আজ আণবিক যুগে পদার্পণ করেছি।

রাসায়নিক আকর্ষণের বশে বিশ্বের সারা বস্তু গড়ে উঠেছে। আদি মৌলিক উপাদান থেকে এদের বিশ্লেষণ করে আবার অণু-পরমাণুর রাজ্যে প্রবেশ করেছি। আমাদের দেশের কণাদ-প্রমুখ ঋষিরা আন্দাজ করেছিলেন, এই অণুর অস্তিত্ব।

ড্যাল্টন ও আভোগাড্রো তাতে সায় দিয়ে নানা যুক্তিবলে আমাদের বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত করেছিলেন—নানা রাসায়নিক পরীক্ষায় ও আবিষ্কারে আজ তা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়েছে। আমরা পরিচিত জিনিষের উৎপত্তি যেমন বুঝতে শিখেছি তেমনি বৈজ্ঞানিক কৌশলে নানা নতুন বস্তু তৈয়ারী করে কাজে লাগাচ্ছি, আমাদের জটিল সভ্যতার নানা চাহিদা মেটাচ্ছি। এতদিন রাসায়নিক নিয়মে বস্তুজগতের রূপান্তর ঘটান ছিল বিজ্ঞানীর প্রধান কাম্য। আজ আদি অণুর মধ্যেই বিজ্ঞানী আবিষ্কার করেছে অজ্ঞাত শক্তির নতুন জগৎ। ড্যাল্টনের অ্যাটম আর অবিভাজ্য বা অবিনাশী রইল না। আমরা অণুর বিভাজন করে অমেয় শক্তির প্রকাশ ঘটিয়ে নানা রোমাঞ্চকর ঘটনা ইতিমধ্যেই ঘটিয়ে ফেলেছি। সম্পূর্ণভাবে আয়ত্তে এলে আণবিক শক্তিকে মানুষ তার কল্যাণে লাগাতে পারবে—এই হলো বর্তমান যুগের স্বপ্ন। এই ভাবের প্রধান প্রচেষ্টা চলেছে বিশ্বে অগ্রগণ্য সব জাতির মধ্যে। তেজস্ক্রিয়তার আবিষ্কার থেকে এই উদ্যম সুরু হয়েছে বলা যায়। এই তেজস্ক্রিয়তার আবিষ্কার ও স্বরূপ নির্ধারণ করেছিলেন প্রথমে কুরী-দম্পতী—এর মধ্য দিয়ে অণুর মধ্যে যে বিরাট শক্তি প্রচ্ছন্ন রয়েছে তার খবর তাঁরাই প্রথম পেয়েছিলেন। তাই মাদাম কুরীর জন্মশতবার্ষিকীতে পৃথিবীর সর্বত্র লোকে তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছে।

পরমাণুর তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কারের জন্য বেকরেল ও কুরী-দম্পতি যৌথভাবে ১৯০৪ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেছিলেন। ইউরেনিয়ম বহু পরিচিত ধাতু। এর নানা যৌগিক থেকে এক অদৃশ্য বিকিরণ ছড়িয়ে পড়ে কাগজ ঢাকা আলোক-ফলকেও আপনার প্রভাব ফোটাতে পারে, তাকে পরিবর্তিত করতে পারে এই সত্য বেকরেল প্রথমে হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন (১৮৯৬)। কুরী-দম্পতি এই ব্যাপার নিয়ে অনেক পরিশ্রম করলেন। সরকারের মুখাপেক্ষী না হয়েই নিজেদের স্বল্প আয়ের উপর নির্ভর করে চালিয়ে গেলেন গবেষণা পাঁচ বৎসর। ফলে নানা বস্তুর মধ্যে এই অদ্ভুত বিকিরণের সন্ধান পাওয়া গেল। শুধু ইউরেনিয়মের বিশুদ্ধ যৌগিক থেকেই নয়, ইউরেনিয়মের নানা, আকর প্রস্তর বেশী করে পিচ-ব্লেণ্ড থেকেও এই অদৃশ্য বিকিরণ ঘটছে তার আবিষ্কার করলেন কুরী-দম্পতি। নিবিড় ও একনিষ্ঠ সাধনায় তাঁরা আবিষ্কার করলেন নতুন দুটি আদি-বস্তু—পলোনিয়ম (১৮৯৮) ও রেডিয়ম (১৯০২)। তাই তাঁদের নাম বিজ্ঞানের ইতিহাসে অমর হয়ে লেখা রয়ে গেল।

বুঝতে চেষ্টা করা যাক তেজস্ক্রিয়তা মূলত কি? পরমাণুকে আজকাল ছোটখাট সৌরজগতের মত কল্পনা করছে বিজ্ঞানীরা। অণুকেন্দ্রে প্রায় সমস্ত ভর ও নিহিত

প্রচুর শক্তি নিয়ে অবস্থান করছে নিউক্লিয়স। এর চারিদিকে ঘুরছে সূর্যের চারিদিকে গ্রহের মত—ইলেকট্রনের কণাগুলি। প্রত্যেক ইলেক্‌ট্রন আবার নেগেটিভ বিদ্যুৎ-কণা—তবু সব মিলে সমগ্র অণুর বিদ্যুৎ সাম্য বজায় রয়েছে। তাই কেন্দ্রবস্তুকে পজিটিভ বিদ্যুতেরও আধার ভাবতে হয়।

সব থেকে হালকা আদিবস্তু হাইড্রোজেন থেকে সব থেকে ভারী ইউ-রেনিয়ম পর্যন্ত আদিবস্তু গণনা করলে দাঁড়াবে ৯২। এবিষয়ে আজকাল আমরা নিঃসন্দেহ। তবে অনেক আগে রুশ বিজ্ঞানী মেণ্ডেলহয়েফ এক ছক কল্পনা করে সারা বিশ্বের আদিবস্তুদের ভরের এই গুরুত্ব অনুসারে সাজিয়েছিলেন, এবং এই ছকের সজ্জার মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে বস্তুধর্মের অনেক কথার মূলসূত্র নিহিত রয়েছে—তিনি ভেবেছিলেন ও নানাবস্তুর নানাধর্ম আলোচনা করে তাঁর এই প্রস্তাবিত সম্ভাবনায় আমাদের বিশ্বাস দৃঢ় করতে যত্নশীল হয়েছিলেন। আজকে আমরা মেণ্ডেলইয়েফের ছকের মধ্যে ক্রমসংখ্যাকে বলি কেন্দ্রের বিদ্যুতাঙ্ক —তারাই আবার ভ্রাম্যমাণ ইলেক্‌ট্রন সংখ্যারও বিজ্ঞাপন দিচ্ছে। ছকের শেষের দিকে অবস্থিত ইউরেনিয়ম ও থোরিয়ম। কুরীর আবিষ্কারের ফলে আমরা জেনেছি কোন অজ্ঞাত কারণে ছকের শেষে অবস্থিত ভারী পরমাণুগুলি আপনাপনি ভেঙে পড়ছে। এর ফলে তেজস্ক্রিয়তার বহিঃপ্রকাশ ও বিকিরণ। এদের বিশ্লেষণ করার নানা উপায় উদ্ভাবন করলেন কুরীরা। ফলে এই বিকিরণের ত্রিধা-সত্বার সন্ধান পাওয়া গেছে। এদের আজকাল আমরা বলে থাকি অ্যালফা, বীটা ও গামা বিকিরণ। অ্যালফা রশ্মি মূলত হিলিয়মের কেন্দ্রবস্তু, বিরাট বেগে ভারী কেন্দ্র থেকে বিভাজনের ফলে বিক্ষিপ্ত হচ্ছে; এরা পজিটিভ বিদ্যুতের বাহক। বিশ্লেষণ করতে, চৌম্বকক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে এই অ্যালফা রশ্মিকে চালিয়ে দিলে—সরল রেখার গতি পরিবর্তিত হয়ে অ্যালফা-কণা বৃত্ত পথে চালিত হবে। যে পথে বেঁকে চল্‌বে, সেই বৃত্তের ব্যাসার্ধ নিরূপণ করে বিজ্ঞানীরা এর স্বরূপ ব্যাখ্যায় কৃতনিশ্চয় হয়েছিলেন। আবার বীটা রশ্মি বস্তুত ভীষণ বেগে বিক্ষিপ্ত ইলেক্‌ট্রন। এরা যেভাবে চৌম্বকক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে যেতে বেঁকে যায়, তার থেকেই এর স্বরূপ নির্ধারিত হয়েছে। তাছাড়া প্রায় সব সময়ই সব বিকিরণের মধ্যে আছে তরঙ্গধর্মী বিকিরণ—গামা রশ্মি আলোক বা এক্স-রশ্মির পর্যায়ে একে ফেলা যায়। এই প্রাথমিক বিশ্লেষণ ও বিভাজনের ফলে ইউরেনিয়ম বা অন্যান্য তেজক্রিয় বস্তুরা সরাসরি অন্য বস্তুতে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে। হয়ত সেই পরিবর্তিত অণুতে

তখনও তেজস্ক্রিয়তা বর্তমান, কাজেই সেটিও অনুরূপ বিভাজনক্রিয়া সুরু করবে। কুরীদের আবিষ্কারের ফলে এইভাবে তিন তেজস্ক্রিয়কুলের আবিষ্কার হয়েছে—প্রত্যেকের শীর্ষে যথাক্রমে ইউরেনিয়ম-থোরিয়ম বা অ্যাক্টিনিয়ম। ভাঙতে ভাঙতে প্রত্যেক কুলে প্রকাশ পাচ্ছে নানা নতুন তেজস্ক্রিয় পদার্থ। কুরীর আবিষ্কৃত রেডিয়ম ও পলোনিয়ম, ইউরেনিয়ম কুলের মধ্যে গণিত হবে। অ্যালফা, বীটা বা গামা রশ্মি ছড়িয়ে ইউরেনিয়ম, থোরিয়ম বা অ্যাকটিনিয়ম থেকে নানা তেজস্ক্রিয় নতুন বস্তুর উদ্ভব হলো। তারাও ভেঙে চল্‌লো। শেষ অবধি অবশ্য এই বিভাজন থেমে যায়। এক পর্যায়ে এসে দাঁড়ায় স্থায়ী পরমাণু—যার পরিবর্তন নেই। বেশীর ভাগ তেজস্ক্রিয়কুলের শেষে রয়েছে সীসা ধাতু।

কুরীরা নানা চেষ্টা করেছিলেন, তঁদের যা জানা ছিল, সেইসব প্রক্রিয়ার ফলে বিভাজনের হার রদ-বদল করতে পারেন নি তাঁরা। কোন অজ্ঞাত কারণে আদি-বস্তুর লক্ষ লক্ষ কণার মধ্যে বিশেষ কয়েকটির কোন এক মুহূর্তে অবসান হ'লো। তাদের থেকে বের হয়ে এলো অ্যালফা, বীটা বা গামা রশ্মি। আবার সেই কয়েকটি আদিবস্তু অন্য কণায় পরিবর্তিত হয়ে তাদের লীলা অন্যভাবে চালিয়ে গেল।

এই বিভাজনের হার ভিন্ন ভিন্ন আদিবস্তুর ভিন্ন রকমের। এক গ্রাম ইউ-রেনিয়ম থেকে তেজস্ক্রিয়তার বিভাজনে অর্ধগ্রাম দাঁড়াতে লাগবে কয়েক'শ কোটি বৎসর। কাজেই তার থেকে বিকিরণও অনেক মৃদু। কারণ প্রত্যেক একটি অণু থেকে একটি জ্যোতিঃকণা নির্গত হচ্ছে।

আবার যে রেডিয়ম কুরীরা আবিষ্কার করলেন, তা' অনেক দ্রুতহারে ভেঙে চলে; ১ গ্রাম রেডিয়ম প্রায় ২০০০ বৎসরের মধ্যেই অর্ধেক হয়ে দাঁড়াবে। ফলে তার থেকে তেজস্ক্রিয় বিকিরণ অনেক শক্তিশালী। এই ক্ষণজন্মা রেডিয়মকে বিশুদ্ধ অবস্থায় উপনীত করে—সব জটিলতার ব্যাখ্যা করতে পারায় মাদাম কুরী আরও একবার নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন।

ইতিমধ্যে দারুণ এক দুর্ঘটনায় তাঁর স্বামী পিয়ের কুরী প্রাণত্যাগ করলেন (১৯০৬)। তাই শেষজীবনের গবেষণা একলাই চালিয়ে গেলেন মাদাম কুরী। ফরাসী দেশ তাঁর গুণপনার স্বীকৃতিস্বরূপ, তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনার ভার দিলে,—স্বতন্ত্র রেডিয়ম ইনষ্টিট্যুট গড়ে তুল্‌লে ১১নং পিয়ের কুরী রোডে। মৃত্যুর অব্যবহিত আগে পর্যন্ত এইখানে মাদাম কুরী গবেষণার কাজ চালিয়ে গিয়েছেন। শুধু যে বিজ্ঞানের সাধনাই তাঁর মূলমন্ত্র ছিল তা নয়, তাঁর প্রেরণা জাগাত বিশ্বের

মানবের কল্যাণ কামনা ও দৃঢ় স্বাদেশিকতা। তাঁরই আবিষ্কৃত রেডিয়ম রশ্মি আজ দুরন্ত ক্যানসর রোগের সঙ্গে যুদ্ধ করবার কাজে ব্যবহার করে চলেছে মানুষ! বিন্দুপ্রমাণ রেডিয়ম ভরা রয়েছে নানা সূচীকায়—তাই আজ সারা বিশ্বে নানা আরোগ্য নিকেতনে ব্যবহার হ'চ্ছে। তিনি নিজের নিপুণতার কোন সুযোগ নিজের স্বার্থের জন্য ব্যবহার করেন নি। রেডিয়ম নিষ্কাশনের কোন প্রক্রিয়ার তিনি পেটেন্ট নেন্ নি।

মাদাম কুরীর দেশপ্রেমও উল্লেখযোগ্য এবং অনুসরণীয়। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ফ্রান্স অতর্কিতে মহা সমস্যার মধ্যে পড়েছিল। আহতদের হাসপাতালে বীক্ষণ করার জন্য যে পরিমাণ এক্স-রশ্মির উৎপাদক যন্ত্র ও নিপুণ পরিচর্যাক্ষম সহায়ের যত সংখ্যায় প্রয়োজন ছিল, তার ঘাট্তি পড়েছিল খুবই। ফ্রান্সের এই দারুণ দুর্দিনে তিনি একা নিজের উপর ভার নিয়েছিলেন যুদ্ধক্ষেত্রের হাসপাতাল-গুলির এই অংশের সুব্যবস্থা করতে। যুদ্ধক্ষেত্রের নিতান্ত নিকটেই প্রথম লাইনের হাসপাতালগুলি। সেখানে তিনি এক্স-রে যন্ত্র স্থাপনার কার্যভার নিজের স্কন্ধে নিয়েছিলেন, তাকে চালু রাখার জন্য নিত্য তদারক করতেন। নানান বিপদ মাথায় করে রণক্ষেত্রের কাছে দৌড়াদৌড়ি করতেন। যে অল্পসংখ্যক বিজ্ঞানী ফ্রান্সে এক্স-রে ব্যবহার জানত, তারাও ঝাঁপিয়ে পড়েছিল আহতদের সেবা ও শুশ্রূষার কাজে। তাদের সংখ্যা বাড়াতে, সেচ্ছাসেবক-সেবিকাদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার সব ভার ছিল মাদাম কুরীর উপর। মাদামের প্রথমা কন্যা ঈরেনও এগিয়ে এসেছিলেন দেশসেবার কাজে। পরে শান্তি পুনঃস্থাপিত হলে কন্যাও মায়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করলেন—তেজস্ক্রিয়তার বিষয়ে গবেষণায় নিজেও যশস্বী হলেন। তিনিই প্রথম কৃত্রিমভাবে তেজস্ক্রিয় পদার্থ উৎপাদন সম্ভব দেখিয়েছেন এবং এই জন্যই নোবেল পুরস্কার তিনিও অর্জন করেছেন।

সারাজীবন লোকসেবায় ও বিজ্ঞানের কাজে আত্মোৎসর্গ করে মাদাম কুরী দেহ-রক্ষা করলেন ১৯৩৪ সালের ৪ঠা জুলাই। দুরন্ত ক্যানসার রোগের প্রতিষেধকের ব্যাপারে নানা পরীক্ষার ফলে অজ্ঞাতভাবে নিজের শরীরকে তেজশালী বিকিরণের প্রভাবে নষ্ট করে বসলেন। মেরুসার ও রক্তকণা দুইই তাঁর শরীরে অনেকাংশে বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এর কোন সারাবার উপায় নেই। তাই মানবকল্যাণের ব্যাপারে নিজেকে বলিদান দিয়ে তিনি পৃথিবীর ইতিহাসে অমর ও চিরস্মরণীয় হয়ে রয়ে গেলেন। আজ সারা বিশ্বের লোক তাঁর শতবার্ষিকী জন্মদিবসে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন কর্‌ছে।

মাদাম কুরী—২

১৮৬৭ সালের ৭ই নভেম্বর। ওয়ার-শ (Warsaw) সহরে এক দরিদ্র বিজ্ঞান শিক্ষকের ঘরে জন্মেছিলেন মারী স্কলোদায়স্কা। ইনিই পরে মাদাম কুরী বলে বিশ্ববিখ্যাত হয়েছিলেন। পোলাণ্ডে জন্ম, তখন সে দেশের গৌরবরবি অস্তমিত। পোলেরা স্বাধীনতা হারিয়েছে, তাদের দেশ ভাগ করে নিয়েছে শত্রুরা। রুশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হয়েছে ওয়ার-শ। সেখানে চলেছে নির্মম শাসন। পোল জাতির ভাষা প্রচারও লোপ পেতে বসেছে। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদেরও রুশ ভাষায় শিক্ষা দেবার সর্বত্র ব্যবস্থা।

মারীর শৈশব এই অপ্রীতিকর পরিবেশের মধ্যে কেটেছিল। মা অল্প বয়সেই মারা গেছেন। কয়েকটি ছেলে-মেয়ে নিয়ে পিতা বিব্রত হয়ে পড়লেন। শেষ বয়সে চাকুরী থেকে অবসরও নিতে হলো। পারিবারিক আয় অনেক কমে গেল—ছেলে-মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায় না। এই অপ্রতুল সংসারে বড় মেয়েরা এগিয়ে এলো পিতার ভার লাঘব করতে। বড় দুই বোন রোজগার সুরু করলে। মেয়েদের নিজের প্রতিভা ও ক্ষমতায় বিশ্বাস অটুট—উচ্চ শিক্ষার প্রতি অদম্য আকর্ষণ। ওই পথেই স্বাবলম্বী হয়ে নিজেদের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলবে তারা, তবে রাশিয়া কি জার্মেনী ছেড়ে যেতে হবে। সেখানে প্রতিমুহূর্তে পরাধীনতার গ্লানি মনকে বিষাক্ত করে দেয়, ব্যক্তিত্বের অবাধ স্ফুরণ ও প্রসারের এত কঠোর অন্তরায়।

তাই বহু দূরে পারী সহরের বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করবার সিদ্ধান্ত করলেন দুই বোন। সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার দেশ—পরদেশী নির্যাতিতদের সে সাদর অভ্যর্থনা করেছে সব সময়। স্বাধীনতাকামী কত পোলও সেই দেশে আশ্রয় নিয়েছে। আর পারী বিশ্ববিদ্যালয়ের তো জগৎজোড়া সুনাম।

পিতা মেয়েদের এই উচ্চাভিলাষে সায় দিলেন। তবে এক সঙ্গে দুই বোনেরই বিদেশে শিক্ষার ব্যয় সঙ্কুলান অসম্ভব। তাই প্রথম কন্যা গেলেন পারী সহরে। আর মাত্র ১৭ বছরের কুমারী মারী চললেন দেশের মধ্যেই এক ধনী পরিবারের

গৃহ-শিক্ষকতা করতে। এইভাবে দরিদ্র তহবিল স্বচ্ছল হলো। বড় মেয়েকে বাপের অর্থসাহায্য করাও সম্ভব হলো।

(২)

মারীর সুযোগ এলো ৭ বছর পরে। দিদি ব্রনিয়ার পড়া শেষ হয়েছে, বিবাহ হয়েছে স্বদেশী ভদ্র পরিবারে। স্বামী ডাক্তার, পারীতেই প্র্যাকটিস সুরু করেছেন। এত বছরের কৃচ্ছ সাধনায় মারীর কিছু অর্থ সংগৃহীত হয়েছে। রেলের নিম্নতম শ্রেণীতে ওয়ার-শ থেকে পারীর রাহাখরচ, তাছাড়া বিদেশে যাবার আনুষঙ্গিক পোষাকাদির ব্যয়ও কুলিয়ে গেল। পিতা নানাভাবে ব্যয় সংক্ষেপ করে প্রতি মাসে খরচ হিসেবে দেবেন ৪০ রুবল। পারীতে দাঁড়াবে ১০০ ফ্রাঁ (তখনকার ভারতীয় মুদ্রায় মাত্র ৫০ টাকা)। তাই নিয়ে পারী বিশ্ববিদ্যালয়ে সুরু হলো পড়াশুনা। বড় বোন ও ভগ্নীপতি চেয়েছিলন মারী তাঁদের বাড়ীতে থেকে পড়াশুনা করে। তবে তাতে নানা অসুবিধা দেখা গেল, সে বাসাও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনেক দূরে। তাই মারী চলে এলেন ল্যাটিন পাড়ায়। ওখানেই দরিদ্র ছাত্রেরা কষ্ট করে থাকে। ক্লাশ, লাইব্রেরী, লেবরেটরী সবই কাছে। তবে মারীর বাসস্থান জুটলো ৭ তলায় একটি ছোট কামরা—আসবাবপত্র সবই কিনতে হলো। সস্তা কাঠের টেবিল, চেয়ার, লোহার খাট, কাঠ-কয়লা জ্বালাতে আঙ্গারিকা। রাঁধতে স্পিরিট-ষ্টোভ, দুখানা প্লেট, কাঁটা, ছুরি, চামচ, কেট্‌লী ও তিনটি গ্লাস। এসব জোগাড় হলো। বিছানা এসেছে সঙ্গে ওয়ার-শ থেকে। যে বাক্সে পোষাক, আসবাব এসেছিল, তাই পরিবর্তিত হয়ে দাঁড়ালো আলমারী। সব কাজ নিজে করতে হয়, অন্যের সাহায্য নিলে খরচ বাড়বে। সোরবনে (Sorbonne) পড়তে প্রত্যহ হেঁটে যেতে হচ্ছে। শীত পড়লে নিজেকেই টেনে তুলতে হচ্ছে ২।৩ বস্তা কয়লা অল্পে-অল্পে ৭ তলায়, শুধু মাঝে মাঝে দম ফেলতে জিরিয়ে নিতে হয়। রাত দশটা পর্যন্ত পাড়ার লাইব্রেরীতে আরামে গরমে পড়া যায়। তেলের খরচ বাঁচে। পরে নিশীথে ঘরে পড়া চলে রাত ২।৩টা পর্যন্ত, তারপর ঘুম। দিনের পর দিন কঠোর সাধনা, তবে এতেই সিদ্ধিলাভ হলো। মারী সম্মানের সঙ্গে সব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। ১৮৯৩ সালে পদার্থবিদ্যায় হলেন প্রথম। পরের বছর গণিতে অধিকার করলেন দ্বিতীয় স্থান। তবে প্রত্যেক বছর শরতের ছুটিতে দেশে ফেরা চাই। সেই দূরের যাওয়া-আসা, তার ভাড়া যোগাড় করা এক

সমস্যা। খরচের গুরুভার বৃদ্ধ বাপের কাঁধে কত আর চাপানো যাবে! হঠাৎ স্বদেশী সহৃদয়া এক বন্ধু চেষ্টা করে দরিদ্র ছাত্র সাহায্য-ভাণ্ডার থেকে সাময়িক সাহায্য জুটিয়ে দিলেন ৬০০ রুবল। এতে পনেরো মাস থাকা চলবে পারী সহরে। অপ্রত্যাশিত এই দয়ায় অভিভূত হয়ে পড়েন মারী। তবে দেশের গরীব ছাত্রদের কথা সব সময়ই মনে রয়েছে। যখন উপার্জন করতে পারলেন, কয়েক বছর কষ্ট করে সব টাকাই সংগ্রহ করে ফেরৎ দিলেন। সদাব্রতী সভ্যদের আশ্চর্য করে দিলেন। মারী চাইলেন যে, ওই টাকা আবার অন্য গরীব ছাত্রের কাজে লেগে যাক। (এই ধরণে বিদেশে শিক্ষালাভের জন্যে ছাত্রকে সাময়িক অর্থ-সাহায্য দেবার রীতি আছে সব দেশেই, তবে উপার্জনক্ষম হয়ে কজনইবা সে টাকা ফেরৎ দেন। কলকাতা সেনেটের বিবরণীতে পড়েছিলাম সেদিন পালিত-স্কলাররা কত টাকা ফেলে রেখেছেন।)। জীবনের সায়াহ্নে এই সব গল্প করতেন মারী ছোট মেয়ে ঈভার কাছে, তখন রেডিয়াম আবিষ্কার করে বিজ্ঞানের দরবারে মাদাম কুরী সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত। নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন ২ বার, যা আজ পর্যন্ত কোন বিজ্ঞানীর ভাগ্যেই জোটে নি। তবু সম্পদের মধ্যে জীবনের সায়াহ্নে গল্প করতেন যৌবনের সেই সব দুঃখ-কষ্টের। তাঁর ভাগ্যে সুখ-দুঃখ অনেক জুটেছে, তবু মায়ের গল্প শুনে মেয়ের মনে হতো, সেই সব পুরনো দিনের স্মৃতি মায়ের মনে সবচেয়ে বেশী রমণীয় হয়ে রয়েছে। গল্প করতেন অভাবের কথা—প্রত্যেক দিন তো আনন্দে কাটতো না। তবে কখনও বা এমন দুর্ঘটনা ঘটতো, যার তাল সামলে নেওয়া কঠিন। হয়তো একমাত্র জুতাজোড়া ছিঁড়ে ছিঁড়ে অচল। নতুন এক জোড়া কিনতেই হয়, তবে এত দাম যে, সে খরচ কুলাতে খাবার ও আলোর খরচে টান পড়ে। আবার কখনও শীতের দিন আর কাটে না। ৭ তলার ছোট কুঠরী বরফের মত ঠাণ্ডা। ঘুম হচ্ছে না, এদিকে কাঠ-কয়লা ফুরিয়ে গেছে, আঙ্গারিকায় আগুন জ্বালা যাবে না। তবে ওয়ার-শ'র মেয়ে কি পারীর হিমের কাছে হার মানবে? মারী বাক্স খুলে যে ক'প্রস্থ পোষাক এক সঙ্গে অঙ্গে চাপানো যায়—সব পরেছে, বাকী বাক্স উজাড় করে বিছানায় লেপের উপর ঢাললো। তবু শীত ভাঙ্গে না—মারী বিছানার তলা থেকে হাত বের করে চেয়ারখানা লেপের উপর—পোষাকের উপর চাপাচ্ছে। হয়তো এই ভাবে চাপায় পড়ে মনে হবে শরীর গরম হলো। আর তো কিছু নেই—তবু কাঁপুনী যায় না, বেশ কিছুক্ষণ বিছানার মধ্যে—ক্রমে শরীরের উত্তাপে বিছানা গরম হয়ে উঠেছে—

পরে ঘুম এলো। অবশ্য পরে এলো সুখের দিন, পিয়ের কুরী এলেন জীবনে—প্রথম পরিচয় হলো ১৮৯৪ সালের প্রথম দিকে—তখনও সব পরীক্ষা শেষ হয় নি মারীর।

(৩)

পিয়ের কুরী জন্মেছিলেন ১৫ই মে, ১৮৫৯ সালে আলসাস প্রদেশের বাসিন্দা ফরাসী পরিবারে। তিন পুরুষ ধরে বিজ্ঞান-চর্চা চলছে। পিতা-পিতামহ সুচিকিৎসক। বাপ ইউজেন নিজে মিউজিয়ামের লেবরেটরীতে গবেষণায় শিক্ষানবিশী করেছেন, যক্ষ্মারোগের প্রতিষেধক টীকা আবিষ্কারের জন্যে পরিশ্রমও করেছেন। দুই ভাই জ্যাক ও পিয়ের, দুজনেই বিজ্ঞানী বলে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন অল্প বয়সে। কেলাস-কঠিন নানা বস্তুর পরীক্ষা নিয়ে মেতেছিলেন। চাপে কেলাসের অবস্থার রূপান্তরের সঙ্গে তার বৈদ্যুতিক সাম্য পরিবর্তিত হয়। এতে বিদ্যুতের বহিঃপ্রকাশ তাঁরাই দেখেছিলেন প্রথমে। এই ভাবে পিজো-ইলেকট্রিসিটির (Piezo-Electricity) আবির্ভাব হলো। সূক্ষ্মভাবে বিদ্যুৎ-পরিমাপের যন্ত্র তৈরি হচ্ছে এই উপায়ে। তাছাড়া চৌম্বক ক্ষেত্রের শক্তি-পরিমাপের তৌল-যন্ত্রেরও আবিষ্কার হলো। এই নিয়ে তাপের পরিবর্তনে কেলাসে চৌম্বক ক্ষেত্রের রূপান্তরের বিষয়ে মৌলিক সূত্র আবিষ্কার করেছেন পিয়ের—এটি বিজ্ঞানে কুরী নিয়ম বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

পিয়ের ও মারীর প্রথম পরিচয় হলো এক নব পরিণীত বন্ধু পোল দম্পতির নিমন্ত্রণে—চায়ের টেবিলে। পিয়ের তখনই অধ্যাপনা করছেন—মিউনিসিপাল বিজ্ঞান স্কুলে (১৮৯৪)। মারীর গণিতের পরীক্ষা পাশ করতে কয়েক মাস দেরী। এদিকে পিয়ের অধ্যাপক, ১৫ বছরে—মাইনে মাত্র ৩০০ ফ্রাঁ। মারী কাজ করেন প্রোফেসর লিপ্‌ম্যানের লেবরেটরীতে। এই প্রথম পরিচয় শীঘ্রই গভীর বন্ধুত্বে দাঁড়ালো—তেজস্বিনী, বুদ্ধিমতী বিদেশিনীর আকর্ষণে পিয়ের ধরা পড়ে গেলেন। সব বিষয়ে বন্ধুর সঙ্গে পরামর্শ হচ্ছে। বান্ধবীর উৎসাহে ১৫ বছরের ছড়ানো মৌলিক কার্যের বিবরণী একত্রিত করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ সম্মান ডক্টরেটের প্রার্থী হয়ে থিসিস পেশ করলেন। পরীক্ষকেরা ভূয়সী প্রশংসার সঙ্গে ডক্টর উপাধিতে সম্মানিত করলেন সেই বছর। আসবাবহীন দরিদ্রের রিক্ত ঘরে মারীর চায়ের নিমন্ত্রণে আসছেন পিয়ের। দুজনে একত্রে কাছে, দূরে—সহরতলীতে, জঙ্গলে,

উপবনে বেড়াতে যাচ্ছেন—তুলে আনছেন নানা বনফুল। মারীর পরীক্ষা শেষ হলো। ওয়ার-শ যাবার দিন এগিয়ে আসছে। সে দেশ থেকে বিদেশিনী আবার ফিরবেন তো ? পিয়ের কোনমতে উৎকণ্ঠা চেপে বলছেন—"মারী তোমার বিজ্ঞান-চর্চা বন্ধ করবার কোন মানে হয় না। আবার পারীতে ফিরে এসো।" বহুক্ষণ দুজনে নীরব, শেষে মারী বলছেন—"তোমার কথাই ঠিক। ফিরে আসতে আমার খুবই ইচ্ছা।" শেষ অবধি বাড়ী থেকে আবার ফিরলেন মারী। অক্টোবর মাসে লিপ্‌মানের লেবরেটরীতে কাজ জুটলো। ব্রনিয়ার কাছে উঠছেন এবার, মারীর ল্যাটিন পাড়ায় কষ্ট করে থাকা শেষ হয়েছে। পিয়েরও খুসী। সোরবনের বক্তৃতা-কক্ষেই দেখা হচ্ছে দুজনায়। আরও দশ মাস নানা কথাবার্তা। মারী ভাবছেন ফ্রান্স ছেড়ে শিক্ষাব্রতী হয়ে দেশে ফিরবেন—এই ভাবে দেশসেবায় উৎসর্গ করবেন জীবন। পিয়েরও নাছোড়বান্দা। শেষ অবধি ২৬শে জুলাই, ১৮৯৫, মারী ও পিয়েরের বিবাহ হলো। সমারোহ কিছু নেই। বাজে অর্থব্যয় নেই। এমন কি ধর্মীয় অনুষ্ঠানেরও বাহুল্য নেই। মেয়রের রেজেস্টারীতে সই করলেন দু-জনে, সাক্ষী ব্রনিয়া-কাশিমির। বাপ স্কলোদায়স্কি এসেছেন ওয়ার-শ থেকে। অনাড়ম্বর হৃদ্যতার মধ্যে দুই বিদেশী পরিবারের মধ্যে প্রীতির নিবিড় বন্ধন বাঁধা হলো।

(৪)

স্বাধীনভাবে গৃহস্থালী সুরু হলো। পিয়েরের আয় মাত্র ৫০০ ফ্রাঁ। মারীকেও রোজগার করতে হবে, তাছাড়া সংসারের সব কাজ। সারা জীবন দুজনে বিজ্ঞান-চর্চায় কাটাবেন। শিক্ষাব্রতী হতে শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি হলেই চলে না, ফ্রান্সে আরও এক পরীক্ষা। এ্যাগ্রেজে হলে তবে···। তাই মারীকে আরও পরিশ্রম করতে হচ্ছে। এদিকে সংসারে প্রথম সন্তান ভূমিষ্ঠ হলেন—কন্যা ইরেন, পরে ইনিও নোবেল বিজয়িনী হবেন। সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা কত কাজ—স্বামী, কন্যা, তাদের পরিচর্যা। লিপ্‌মানের লেবরেটরীতেও বিশেষ এক কাজের দায়িত্ব। নানা ধরণের ইস্পাতে চৌম্বক ধর্মের তারতম্য—এসব পরীক্ষার ফলও নিবন্ধ হয়ে বুলেটিনে প্রকাশ হলো, কন্যা প্রসবের মাস-তিনেক পরেই। অটুট স্বাস্থ্যে ফাটল দেখা দিয়েছে মারীর। সুকুমার সৌন্দর্য অন্তর্হিত হলো। ডাক্তারেরা ভয় পেয়েছেন। কিছুদিন স্বাস্থ্যাবাসে অবসর ও বিশ্রামের কথা তোলেন। কিন্তু মারীর সে সব ভাববার সময় নেই। ১৮৯১ সালে পারীতে প্রথম পদক্ষেপের পর পাঁচ বছর

প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রাম চলেছে। অবশ্য শেষ অবধি জয়…সব পরীক্ষাতেই উত্তীর্ণ হলেন। শিক্ষকতার অনুমতিও মিললো। এবার কিছুদিন অবসর—তাও মাত্র এক বছর।

(৫)

১৮৯৭ সালে মারী ভাবছেন, এইবার উপযুক্ত বিষয় বেছে গবেষণায় মন দিতে হবে। পিয়েরের সঙ্গে আলোচনা করছেন। অনুসন্ধানী পত্রিকার পাতা উল্টাচ্ছেন —এবার ভবিতব্য তাঁর জীবনের প্রধান অবদানের দিকে তাঁকে অলক্ষ্যে নিয়ে গেল। ১৮৯৫ সালে জার্মেনীতে প্রোফেঃ রন্‌গেন আবিষ্কার করলেন X-রশ্মি। বায়ুশূন্য কাচের গোলকে প্রোথিত ২টি ধাতুদণ্ডের মাঝে বিদ্যুৎ প্রবাহ পাঠাবার চেষ্টা করেছেন বিজ্ঞানী, প্রচুর শক্তিশালী বিদ্যুৎ প্রেরক যন্ত্রের সাহায্যে। গোলকের কাচ ঈষৎ পীতাভ আভায় স্ফুরিত হলো। এক অদৃশ্য কিরণ ছড়াচ্ছে চারদিকে। কাঠ আড়াল-করা কালো কাগজে মোড়া চিত্র-ফলকেও এই কিরণের প্রতিক্রিয়া হচ্ছে। সাধারণ আলো অবশ্য কাঠ, কাগজ ভেদ করতে পারে না, তবে ধাতুর ফলকের বাধায় আট্‌কা পড়ে দুজনেরই প্রভাব—আলোর বা X-রশ্মির। আরও সব নতুন গুণ প্রকাশ পেল। বায়ুর মধ্য দিয়ে নতুন রশ্মি প্রবাহিত হলে বিদ্যুৎ-সংরোধক গুণ লোপ পেতে বসে বাতাসের। আধারে রক্ষিত বিদ্যুৎ-ইলেক্‌ট্রোস্কোপে যুক্ত করা সোনার-পাতের বিস্তার, জ্ঞাপন করছে বিদ্যুৎ-আধান। X-রশ্মি ছুটলো বাতাসের মধ্য দিয়ে ধাতব পাত দুটি বুজে এলো, শেষে একেবারে মিশে গেল, বায়ুর মধ্যে আয়নের সৃষ্টি হয়েছে—তাই বিদ্যুতের অবক্ষয় ঘটছে—ইত্যাদি।

ফরাসী বিজ্ঞানী হাঁরী বেকরেল (Henri Becquerel) ভাবছেন, অদৃশ্য X-রশ্মির সঙ্গে কাচের আবরণের পীতাভ স্ফুরণের কোন সম্পর্ক আছে কি? নানা ধাতুভস্ম মিশিয়ে নানা রঙের কাচ—বাজারে। ইউরেনিয়াম ধাতুঘটিত কাচ থেকে সূর্যের আলো পড়লে এইরূপ ঈষৎ পীতাভ স্ফুরণ দেখা যায়। বেকরেল ইউরেনিয়ামের নানা যৌগিক নিয়ে পরীক্ষা করলেন—দেখলেন অন্ধকারে এই সব দ্রব্য থেকেও অনুরূপ এক অদৃশ্য বিকিরণ হয়। কাগজ-ঢাকা চিত্রফলকে দাগ পড়ে, কাছে থাকলে এসব যৌগিক রক্ষিত আধার থেকে বিদ্যুতের অবক্ষয় ঘটতে থাকে। বাতাসে বিদ্যুৎ-ভরা আয়নের সৃষ্টি হয়। সব ঠিক রন্‌গেনের X-রশ্মির মত।

বেকরেল এই সব পরীক্ষার ফল প্রকাশ করেছিলেন '৯৬ সালে। নতুন ক্ষেত্র নির্দেশিত হচ্ছে। খুব নতুন ব্যাপার, ইউরোপে অন্য স্থানে তখনও ইউরেনিয়াম রশ্মির দিকে নজর যায় নি। এই সম্পূর্ণ অজানা পথে নব-আবিষ্কারের অ্যাডভেঞ্চার মারীকে হাতছানি দিয়ে ডাকলে।

রীতিমত অনুসন্ধান চালাতে মারীর উপযুক্ত স্বতন্ত্র স্থানের দরকার—যেখানে নিজের খুসীমত পরীক্ষা করা চলে। তাঁর স্কুলের অধ্যক্ষের কাছ থেকে চেয়ে পিয়ের নীচের তলায় রাস্তার ধারে পরিত্যক্ত মেসিন ঘরে কাজ করবার অনুমতি পেলেন। বিশেষ কিছু নেই সেখানে—কি আসবাব—কি যন্ত্র। আরামের স্থানও নয়—এতে নব-বিজ্ঞানী দমলেন না। সবকিছু নিজের খরচে গুছিয়ে কাজে নেমে পড়লেন। ঘর স্যাঁতসেতে, Electrometer বা Electroscope-এ কাজ করা দুঃসাধ্য—তাছাড়া খুব স্বাস্থ্যকর পরিবেশও নয়। তবু তাড়াতাড়ি কাজ এগিয়ে চললো। ইউরেনিয়ামের সব যৌগিক থেকেই রশ্মি নির্গমনের প্রমাণ মিললো। যেভাবে বায়ুকে পরিবাহক করতে পারে নিপুণ যন্ত্রে মেপে দেখা গেল, বায়ুকে আয়নিত করবার ক্ষমতা সরাসরি উপস্থিত ইউরেনিয়াম ধাতুর পরিমাণের উপর নির্ভর করে। এখন ভাবতে হয় অন্যান্য আদি বস্তু থেকেও এই ধরণের অদৃশ্য বিকিরণ হচ্ছে কি না। আশীটি আদি ধাতুর মধ্যে ইউরেনিয়াম ছাড়া মাত্র থোরিয়ামে এই গুণ দেখা গেল। তার যৌগিকগুলিরও পরীক্ষা হলো, এখানেও এই প্রভাবের শক্তি অবস্থিত থোরিয়ামের সমানুপাতিক। আদি বস্তুর অদৃশ্য রশ্মি বিকিরণের ক্ষমতা রয়েছে—এটার উপযুক্ত নামকরণ চাই। মাদাম কুরী বললেন—এটা রেডিও-অ্যাক্টিভিটি ; অর্থাৎ তেজস্ক্রিয়তা (রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ)।

কয়েক মাস পরীক্ষার পর মারীর ধারণা বদ্ধমূল হলো যে, রেডিও-অ্যাক্টিভিটি পরমাণুর স্বভাবগুণ—যে পরমাণু তেজস্ক্রিয়, সে সব অবস্থায় ওই শক্তি প্রকাশ করবে। শক্তির ক্রিয়ার ফল ও পরমাণুর সংখ্যা সমানুপাতিক। ইউরেনিয়াম কি থোরিয়াম থাকলে তেজস্ক্রিয়তার পরীক্ষা করে বস্তুতে তাদের পরিমাণ আন্দাজ করা যাবে। পারীর ওই স্কুলের মিউজিয়ামে নানা প্রস্তরের সংগ্রহ ছিল। বিশুদ্ধ যৌগিক ছেড়ে মারী সেই সব নিয়ে পরীক্ষা আরম্ভ করলেন। প্রথম প্রথম সন্তোষজনক ফল হচ্ছিল, ইউরেনিয়াম ও থোরিয়াম না থাকলে প্রস্তরে তেজস্ক্রিয়তা দেখা যায় না। তবে ইউরেনিয়ামের আকর ছিল মিউজিয়ামে। তাদের পরীক্ষা করে প্রথমে বিভ্রমের সৃষ্টি হলো। Pitchblende কি Chalcolite-এর মধ্যে ইউরেনিয়াম রয়েছে—

তবে তেজাস্ক্রিয়তা মেপে মনে হলো তারা অনেক বেশী শক্তিশালী। অন্তরের ইউরেনিয়াম গণনায় এনেও সে শক্তির পরিমাণ বোঝানো যায় না। এই সব প্রস্তরের তেজাস্ক্রিয়তা অবস্থিত ইউরেনিয়ামের চেয়ে অনেক বেশী। বার বার পরীক্ষা করে একই ফল পাওয়া যাচ্ছে। নানা স্থান থেকে প্রস্তরের সংগ্রহ, তবে সব পরীক্ষায় একই ফল। Pitchblende-এ তেজাস্ক্রিয়তার পরিমাণ নিহিত ইউরেনিয়ামের প্রায় ৪ গুণ। অনেক চিন্তার পর মারী স্থির করলেন, Pitchblende-এ অত্যল্প মাত্রায় কোন অজানা বস্তু রয়েছে। এতদিন রাসায়নিক পরীক্ষায় সে ধরা পড়ে নি। আজ তেজাস্ক্রিয়তা ধরিয়ে দিচ্ছে তাকে। অতএব প্রবন্ধে লিখলেন—Pitchblende-এ রয়েছে কোন অজানা মৌলিক পদার্থ, বিজ্ঞানীরা এতদিন তার সন্ধান পান নি। এই সিদ্ধান্ত সত্যই চাঞ্চল্যকর। বহু বিজ্ঞানী তখনও বেকরেলের আবিষ্কার নিয়ে ভাবতে সুরু করেন নি। তাঁদের তেজাস্ক্রিয়তার সঙ্গে পরিচয় ছিল না। এভাবে বিদ্যুৎ নিয়ে মাপজোখ করে নতুন এক মূল বস্তুর সন্ধান পাওয়া যাবে—বিজ্ঞানীর মন ঐ কথায় সায় দিলে না। ১৮৯৮ সালে Pitchblende-এর অসাধারণ তেজাস্ক্রিয়তার কথা প্রকাশ করবার পর পিয়েরও মারীর সঙ্গে আদি বস্তুর সন্ধানে যোগ দিলেন। তারপর পিয়ের যত দিন বেঁচেছিলেন, দুজনে একত্রে এইসব গবেষণার কাজ করেছেন। গুরুতর পরিশ্রম করে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় Pitchblende থেকে প্রথমে এক তেজাস্ক্রিয় আদি বস্তুর সন্ধান পাওয়া গেল। '৯৮ সালেই মাদাম কুরীর মাতৃভূমির স্মরণ করে দুই বিজ্ঞানী তার নাম দিলেন "পলোনিয়াম"। ১৯০০ সালে ক্ষারধর্মী নতুন এক মৌলিক বস্তুর সন্ধান পেলেন তাঁরা পিচব্লেণ্ডে। এর ব্যবহার বেরিয়ামের মত—নাম দিলেন —রেডিয়াম।

দুটি নতুন মৌলিক বস্তুর আবিষ্কারের খবর সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়লো। বিশ্বের বিজ্ঞানীর দরবারে কুরীদের স্থান প্রথম শ্রেণীতে দাঁড়ালো। তবু তখনও বিতর্কের অবসান হয় নি। কেমিষ্ট বললেন, নব ধাতুগুলির বিশুদ্ধ যৌগিক তৈরি করা চাই, তার মৌলাঙ্ক ঠিক কত বলতে হবে—তা না হলে তাদের অস্তিত্ব সর্বজনগ্রাহ্য হবে না। এবার কুরীরা বিপদে পড়লেন। এতদিন গবেষণার সব খরচ দরিদ্র দম্পতি নিজেরাই জুগিয়ে এসেছেন। একমাত্র পিয়ের উপার্জন করেন। মারী স্কুলে পিয়েরের সহায় বলেই গণিত। সংসারের সব চাহিদা মিটিয়ে নিজেদের গবেষণার খরচ কোনমতে চলে যেত এতদিন। যে নতুন ফরমাস হলো নব ধাতুকে

বিশুদ্ধ অবস্থায় Pitchblende থেকে নিষ্কাশন—তা তো প্রচুর ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। Pitchblende দামী জিনিষ। সরকারী আনুকূল্য না পেলে এত টাকা আসবে কোথা থেকে? পিয়ের তখনও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার ছাড়পত্র পান নি। স্কুলের শিক্ষকের গবেষণার জন্যে সরকারী অর্থ-সাহায্য চাওয়া বাতুলতা বলে মনে হয়। তবু তাঁরা সফলতার আশা ছাড়লেন না। ভাগ্যদেবীরও করুণা হলো। ব্যাভেরিয়া Pitchblende প্রচুর পরিমাণে খনি থেকে তোলা হয়। সেখানে ইউ-রেনিয়াম বের করে নেবার বড় কারখানা আছে। কারখানার চারদিকে অপ্রয়োজনীয় আবর্জনার স্তূপ জমছে। অথচ কুরীরা জানেন, এই আবর্জনার মধ্যে মূল্যবান অজানা ধাতু লুকানো রয়েছে। যদি কেউ তাঁদের ওই আবর্জনা পৌঁছে দেয়! অবশেষে এক বন্ধু বিজ্ঞানীর সাহায্যে অষ্ট্রীয় গভর্ণমেণ্টর আনুকূল্যে কয়েক টন এই Pitch-blende-এর টাট্‌কা-অবশেষ পারী সহরে পৌঁছালো। অধ্যক্ষের অনুমতি নিয়ে স্কুলের উঠানে এক পড়ো ঘরে রাসায়নিক বিশ্লেষণের আয়োজন হলো। কয়েক বছর অক্লান্ত পরিশ্রমের পর কুরী দম্পতি প্রায় বিশুদ্ধ অবস্থায় রেডিয়ামের যৌগিক তৈরি করলেন। মৌলাঙ্কও মোটামুটি স্থির হলো—রেডিয়ামের ২২৫। এবার সব সন্দেহের নিরসন হলো। জগৎ রেডিয়ামের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিলে।

(৬)

তারপর সারা জগতে সাড়া পড়ে গেল। জুন, ১৯০৩ ইংল্যাণ্ডের রয়েল ইন্‌ষ্টিটিউশনে পিয়ের কুরীর নিমন্ত্রণ এলো রেডিয়ামের বিষয় বক্তৃতা করতে। পরে লণ্ডনে নানাস্থানে সুধী সমাজে, অভিজাত মহলে, অভ্যর্থনা ও নিমন্ত্রণ কুরী দম্পতির। নভেম্বর মাসে রয়েল সোসাইটি তাঁদের ডেভি পদকে ভূষিত করলেন। অবশেষে ১০ই ডিসেম্বর স্টকহল্‌ম থেকে প্রকাশ—১৯০৪ সালে তেজস্ক্রিয়তা সম্বন্ধে আবি-ষ্কারের জন্যে নোবেল পুরস্কার বেকরেল ও কুরী দম্পতির মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। স্বদেশে স্বীকৃতি হলো সকলের শেষে। এতদিন অপেক্ষাকৃত নগণ্য লেবরেটরীতে নিজের খরচায় গবেষণা চালিয়েছিলেন কুরী দম্পতি। মারী শেষ অবধি থিসিস দিলেন তেজস্ক্রিয় বস্তুর সম্বন্ধে। ১৫ই জুন, ১৯০৩, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষকেরা উচ্চ প্রশংসা করে ডক্টরেট উপাধিতে ভূষিত করলেন মারীকে। ১৯০৪ সালে নানা বাধাবিপত্তি কেটে গেল। পিয়ের কুরী পদার্থবিদ্যায় অধ্যাপনা করবেন বিশ্ববিদ্যালয়ে। পুরনো সোরবন অট্টালিকার মধ্যে নতুন লেবরেটরীর স্থান

সঙ্কুলান করা গেল না, বাইরে দুটি ঘর তৈরি হলো—সেখানে রেডিও-অ্যাক্টিভিটির নিজস্ব লেবরেটরী। এবার মারীরও চাক্‌রী হলো—এতদিন স্বামীর লেবরেটরীতে কাজ করছিলেন বিনা মাইনায়।

নভেম্বর, ১৯০৪, অধ্যাপনায় প্রোফেসর পিয়ের কুরীর লেবরেটরীতে মারী প্রধান সহায় নিযুক্ত হলেন, মাস মাইনে—২০০ ফ্রাঁ। ৬ই ডিসেম্বর দ্বিতীয় সন্তান ভূমিষ্ঠ হলো—এটি কন্যা ঈভা। ১০ই ডিসেম্বর নোবেল পুরস্কার ঘোষিত হলে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে গেল তেজষ্ক্রিয়তার বিষয়ে গবেষণার কথা। ১৯০৩ সালে রাদারফোর্ড ও সডি দুজনে রেডিয়াম থেকে হিলিয়াম উৎপত্তির কথা প্রমাণ করলেন। তেজষ্ক্রিয় পরমাণু ভেঙ্গে রূপান্তরিত হচ্ছে—তাই তেজষ্ক্রিয়তার বিকাশ হয়—রাদারফোর্ড সন্তোষজনকভাবে পরীক্ষা করে প্রমাণ ছাপালেন। বিশেষ যে নিয়মে পরমাণুর পরিমাণের রূপান্তর ঘটে—তাও আবিষ্কৃত হলো। জার্মেনী, হল্যাণ্ড, ইংল্যাণ্ড, ক্যানাডা সর্বত্র মহাউৎসাহে কাজ চলতে লাগলো। পিয়ের ও মারী সব সময় একসঙ্গে কাজ করছেন। নানা নতুন তথ্য আবিষ্কার করছেন—সব প্রবন্ধে যুগ্ম নাম। রেডিয়াম থেকে বের হয় ইমানেশন গ্যাস, এটি রেডিয়ামের মতই তেজষ্ক্রিয়। তাই নিয়ে কাজ চলছে। ১৯০৬ সালে ১৪ই এপ্রিল পিয়ের লিখছেন—দুজনে চেষ্টা করছি, ইমানেশনের পরিমাণ মেপে কতটা রেডিয়াম থেকে এর উৎপত্তি হলো, তা নিরূপণ করা যায় কিনা।

(৭)

১৯শে এপ্রিল সাংঘাতিক এক দুর্ঘটনায় গাড়ির তলায় চাপা পড়ে পিয়ের নিহত হলেন। বিনা মেঘে বজ্রপাত।

* * * *

এর আগে মৃত্যুর ছায়া মাঝে মাঝে আতঙ্কিত করতো মারীকে। ১৯০২ সালে বাপকে হারালেন, অসুখের সংবাদ পেয়ে ছুটে ওয়ার-শ গিয়েও বাপকে জীবিত দেখলেন না। অন্ত্যেষ্টি শেষে ফিরে এলেন। আবার ভাই-বোন সকলে একত্র হলেন পিতার স্মৃতি উদ্‌যাপন করতে পোল্যাণ্ডে। তারপর অক্টোবর মাস—একদিন লেবরেটরী থেকে দুজনে পরিশ্রান্ত হয়ে ফিরছেন—মারীর মন হঠাৎ বিষাদে ভরে উঠলো—জীবন-পথে চলবার সব উৎসাহ যেন নিবে এসেছে। রুদ্ধকণ্ঠে ডাকলেন—পিয়ের। সচকিত পিয়ের ফিরে তাকালেন—সুধালেন আদর করে—কি হলো, কি দুঃখ মনে জাগছে? মারী বলছেন—একজন যদি মরে যায়, তবে অপরে

কি নিয়ে বেঁচে থাকবে? আমরা দুজনে কেউ যদি কাউকে হারাই। পিয়ের নিরুত্তর। তবে বিজ্ঞানী নিজের কর্তব্য বা দায়িত্ব কখনো ভোলে না। পিয়ের ঘাড় নাড়লেন, জ্ঞানের পূজায় তো ব্যাঘাত হবে না। আস্তে বললেন—বৃথা ভাবছ তুমি—এসব বাজে কথা। তবে যাই-ই হোক, কাজ করে যেতেই হবে।

তাই হলো—শেষ অবধি ১৯০৬ সালের শেষ থেকে একলা চললেন মারী।

বিশ্ববিদ্যালয় পিয়েরের পরিবর্তে মারীকে অধ্যাপনার ভার দিলেন—সেই পদে প্রতিষ্ঠিত করলেন। পিয়েরের অসমাপ্ত বক্তৃতামালা কয়েক মাস বাদে মারী উপসংহার করলেন।

পরে Institute of Radium তৈরি হলো—তার সব ভার নিজের হাতে নিয়ে সুষ্ঠুভাবে চালিয়ে গেলেন সব কাজ আরও ২৭ বছর। তার মধ্যে মহাযুদ্ধ হলো। দেশসেবার জন্যে প্রাণপাত করলেন মারী। রেডিয়াম দুরন্ত ক্যান্সার রোগের চিকিৎসায় ব্যবহার করা হচ্ছে। বড় মেয়ে তাঁর মত প্রথিতযশা, বিজ্ঞানী হয়ে উঠলো। সেও তাঁর মত নোবেল পুরস্কার পাবে। রেডিয়ামের অদৃশ্য রশ্মির তেজে অল্পে অল্পে মারীর জীবনশক্তি ক্ষয় হয়ে গেল। সংস্থা আর চালাতে পারেন না। শেষ দিন মালীকে ডেকে বললেন—গোলাপ-ঝাড়গুলির যত্ন করো।

স্বাস্থ্যের জন্যে আরোগ্য নিকেতনে যেতেই হলো—সেখানে মাদাম কুরী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন, জুলাই ১৯৩৪।

(৮)

শেষ অবধি দুষ্ট অ্যানিমিয়া। রেডিয়াম শরীরের মেরু-সার সব নিস্তেজ করে—শ্বেত ও লোহিত-কণা সবই কমে গেছে। আর নিস্তার নেই। রেডিয়াম আবিষ্কারের শেষ মূল্য দিলেন নিজের জীবন এবং তারই স্মৃতি হিসাবে রইলো তাঁর বিখ্যাত পুস্তক "Radio-activita."

*   *   *   *

ইভা কুরী মায়ের জীবনী বিশদভাবে লিখেছেন। সে বই নানা ভাষায় অনূদিত হয়েছে। বাংলাতে শ্রীমতী কল্পনা রায় তর্জমা করেছেন।

বাংলার বিজ্ঞানসেবী ছেলে-মেয়েরা পড়লে মারীর জীবনের অনেক তথ্য জানতে পারবেন।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের জন্মবার্ষিকী বাংলার লোক নানাভাবে পালন করছে। খুলনা-বাসীরা প্রকাশ করেছেন স্মারক-গ্রন্থ—তা ছাড়া নানা শহরে, গ্রামে, স্কুলে-কলেজে, সমিতি ও সেবা-প্রতিষ্ঠানে তাঁর ছাত্ররা, অনুরাগী ও সহকর্মীরা তাঁর অনুধ্যানে নানা কথা বলেছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও অনেক ছবির সঙ্গে প্রকাশ করেছেন স্মারক-পুস্তিকা, তাতে অনেক খবর দিয়ে অনেক লোকে লিখেছেন—বাংলা ও ইংরাজী ভাষায়। বেঙ্গল কেমিক্যালও প্রতিবৎসয় জন্মতিথি পালন করে আসছে। এবারও ২রা আগস্ট নানা জায়গায় তাঁকে স্মরণ করতে সভা বসবে আশা করা যাচ্ছে।

তাঁর জীবনের প্রধান ঘটনাগুলির খবর এখন সুস্পষ্ট। যখন যশোহর ও খুলনা ভিন্ন ভিন্ন জেলা হয় নি, তখন তিনি জন্মেছিলেন রাড়ুলী গ্রামে এক প্রাচীন সম্ভ্রান্ত পরিবারে। শুনেছি, সেই বংশের সঙ্গে শোভাবাজার দেববংশের সম্পর্ক বিশেষ দূর নয়। প্রফুল্লচন্দ্র যখন জন্মালেন তখন রাড়ুলী পরিবারের অর্থাগম অনেক কমে এসেছে। পিতা হরিশ্চচন্দ্র নিজে ছিলেন সাহিত্য-অনুরাগী। গ্রামের বাড়ীতেও ইংরাজী বাংলা সাহিত্যের বই, নানা সংবাদপত্র নিয়ে একটা ছোট লাইব্রেরী ছিল। ছেলেবেলায় প্রফুল্লচন্দ্র সেখানে অনেক রকমের বই পড়তেন—এই খবর নিজেই লিখে গেছেন। বিদেশী সভ্যতার আলো কলকাতা থেকে অনেক সুদূরের গ্রামেও তখন পৌঁছে গেছে। কবি মধুসূদনের জন্মস্থান রাড়ুলী থেকে বেশী দূরে নয়। দেশের নব জাগরণের বিদ্রোহী আন্দোলন তখন খুলনা জেলায় নানাভাবে পৌঁছেচে। পিতা হরিশ্চন্দ্র সাবেকী আচার-সংস্কারের প্রভাব থেকে নিজে অনেকটা মুক্ত ছিলেন, তবে বাহিরের ব্যবহারে বিশেষ কোন পরিবর্তন দেখতো না, কাছাকাছি গ্রামের লোকেরা।

প্রফুল্লচন্দ্র কলকতায় এলেন ও ভর্তি হলেন হেয়ার স্কুলে। তবে কিছুদিন বাদে হজমের গোলমাল নিয়ে অসুখে পড়লেন দারুণভাবে—সেজন্য কিছুদিন পড়া-শুনা বন্ধ করে তাঁকে দেশে ফিরে যেতে হল। সেই থেকে তাঁর স্বাস্থ্য যেভাবে ভেঙ্গে গেল, পরে সেই অসুবিধা তাঁকে বহন করতে হয়েছিল সারা জীবন।

কলকাতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাতে তাঁর আশানুরূপ সাফল্য হয় নি। তবে নিজের ক্ষমতার প্রমাণ দিলেন—সম্পূর্ণ নিজের অধ্যবসায় ও পরিশ্রমে Gilchrist Scholarship পরীক্ষায় কৃতিত্ব দেখিয়ে—নিজেই বিদেশে যাবার পাথেয় ও পড়ার খরচ জোগাড় করে নিলেন। তাঁর সহপাঠী ও মাস্টারমশায়েরা সকলেই বিস্মিত হলেন এই পরিণতিতে।

ছাত্রমহলে ও দেশে তখন কেশবচন্দ্র সেনের যুগ। তাঁর মনও সহজে সেদিকে ঝুঁকলো—প্রফুল্লচন্দ্র ব্রাহ্ম হ'লেন। জাতিভেদ, অন্ধসংস্কার, পৌত্তলিকতার উপর তাঁর বিরাগ ছিল আন্তরিক। নানা জায়গায় নানা ভাষণে তিনি খোলাখুলি সে মত ব্যক্ত করতেন। তাঁর চিরন্তন আদর্শ ছিল—

এক জাতি, এক ভগবান
এক দেশ এক মন-প্রাণ ॥

স্বাবলম্বী প্রফুল্লচন্দ্র বিদেশে অধ্যয়ন করলেন রসায়ন-শাস্ত্র। কৃতবিদ্য হয়ে নিঃসম্বল তিনি যখন দেশে ফিরলেন বিদেশী সরকার তাঁর উপযুক্ত শিক্ষাপদে তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করে সম্মানিত করলো না। কিন্তু কাজের নেশা তাঁকে পেয়ে বসেছিল—তাই প্রাদেশিক শিক্ষকের বরাদ্দ মাহিনা সরকারী কলেজে প্রায় সারাজীবন পেয়ে এসেও তিনি নিরুদ্যম হননি। কাজের জন্য যে সুযোগ পেয়েছিলেন তাতেই সন্তুষ্ট হয়ে রয়ে গেলেন নিজের সাধনা নিয়ে। বাংলায় লিখ্‌লেন সর্বসাধারণের উপযোগী তথ্যবহুল বিজ্ঞান পুস্তিকা—আবার কলেজে নতুন আগন্তুকদের জন্য অজৈব রসায়নের প্রবেশিকা। সহকর্মীদের সঙ্গে সালফুরিক এসিডের কারখানা খোলা হলো। মিতব্যয়ী অধ্যাপকের যথাসর্বস্ব প্রায় ব্যয় হত তখন এই কাজে। তখন তাঁর প্রধান সহায়ক ছিলেন অধ্যাপক চন্দ্রভূষণ ভাদুড়ী, ডাক্তার কার্তিক বসু ও আরও অনেকে। এঁরা তাঁরই মত বিশ্বাস করতেন বাঙ্গালীকে জগতে সুপ্রতিষ্ঠ হতে হ'লে শিল্প-বাণিজ্যের বাজারে তাকে নামতেই হবে।

গবেষণার রাজ্যে মারকুরস-নাইট্রাইট ($Hg_2(NO_2)_2$) হলো তাঁর প্রথম উল্লেখ-যোগ্য আবিষ্কার। সেজন্য এই যৌগিক উপকরণটি তাঁর খুব প্রিয় ছিল ও পরে নানা গবেষণার কাজে তিনি এটি ব্যবহার করতেন। অবশ্য প্রাচীন হিন্দুদের রসায়নবিদ্যার ইতিহাস লিখে তিনি প্রথমে বিদ্বান সমাজে দেশ-বিদেশে যশ অর্জন করেছিলেন। এর জন্য কয়েক বৎসর ধরে সংগ্রহ করেছিলেন অনেক দুষ্প্রাপ্য পুরানো পুঁথি—সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের সাহায্যে তাদের পাঠোদ্ধার করলেন। প্রাচীন

হিন্দুদের গবেষণার খবর প্রকাশ করলেন—ভারতীয়েরা চিরকৃতজ্ঞ রইলো তাঁর কাছে। তাঁরা বুঝলেন, প্রাচীন হিন্দুদের মননশীলতা শুধু দর্শন ও ধর্মচর্চায় পর্যবসিত হয়নি, ফলিত-বিজ্ঞানে, আয়ূর্বেদে তাদের অবদানও যথেষ্ট। পরে আচার্য ব্রজেন্দ্র শীল, অধ্যাপক রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় ও পরবর্তী অনেক গবেষকরা আচার্য রায়ের মতকে পুরাপুরি সমর্থন করলেন—এই প্রাচীন জাতির নানা ফলিত-বিজ্ঞানে কৃতিত্বের ইতিহাস লিখে।

সারাজীবন পরিশ্রম করে আচার্য রায় বেঙ্গল কেমিক্যালকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। অবনত ভারতমাতাকে বিশ্বের দরবারে সগৌরবে স্থাপিত করতে জীবনের সমস্ত নিয়োগ করতেন আচার্য রায়। তাঁর অনেক সর্বত্যাগী ছাত্র যখন দেশসেবার বিপদসঙ্কুল পথে ঝাঁপিয়ে বেরিয়ে পড়ত, তখন তারা তাঁর কাছে সব সময় পেত আন্তরিক সহানুভূতি ও অনেক সময় নানাভাবে সাহায্য। বন্যার মধ্যে সঙ্কটত্রাণের উদ্যোগ তাঁর অবিস্মরণীয় কীর্তি। আবার এদেশে স্বাধীনতা সংগ্রামে নীতির যখন পরিবর্তন হলো তখন তিনি গান্ধীজীর একজন প্রধান সমর্থক হয়ে দাঁড়ালেন। দেশ-বিদেশে প্রচার করে বেড়ালেন গান্ধীনীতি—নিজে খদ্দর পরলেন ও চরকা কাটা শুরু করলেন। এইখানে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর তফাৎ অনেকের চোখে ঠেক্‌বে।

বাঙ্গালী খদ্দরনীতি মনে-প্রাণে নিতে পারেনি। তাঁদের কাছে আচার্য ছিলেন শিল্পে সংগ্রামী-অগ্রণীদের প্রতীক। স্বদেশী যুগে তাই তাঁর পাশে অনেক উচ্চাভিলাষী গবেষক ছাত্র এসে দাঁড়াল ও শেষ বয়সে তাঁর গবেষণার যথেষ্ট প্রসার হ'লো। তিনি অনেক নতুন তথ্য আবিষ্কার করলেন প্রেসিডেন্সী কলেজে ও পালিত রাসায়নিক প্রেক্ষাগারে। শান্তিস্বরূপ ভাটনাগর একবার রহস্য-ছলে তাঁকে কিমিয়া-বিজ্ঞানীদের পিতামহ এই আখ্যা দিয়েছিলেন। বস্তুত আজকাল ভারতবর্ষে কিমিয়া-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গবেষণা করে যশস্বী হয়েছেন যে-সব বিজ্ঞানী তাঁদের মধ্যে অনেকেই তাঁর সাক্ষাৎ ছাত্র, আবার অন্যদের অনেকেরও হয়ত তাঁরই কোন শিষ্যেরই কাছে বিজ্ঞানে প্রথম হাতেখড়ি হয়েছে। ক্ষীণ স্বাস্থ্য নিয়েও চিরকাল রোগ ভোগ করে, কি করে তিনি এত কাজ করতে সক্ষম হয়েছিলেন এই প্রশ্ন আমাদের মনে ওঠা স্বাভাবিক। আমার মনে হয়, সব সময়ে একাগ্র নিয়মানুবর্তিতাই হলো এর মূল কথা। যে সময় যেটি করা তিনি সিদ্ধান্ত করতেন, তার ব্যতিক্রম তিনি কিছুতেই করতে চাইতেন না। সভাসমিতি করা, নিজের আহার-বিহার সবই এক ছন্দে বাঁধা থাকত। এর জন্য অনেকের যে সময় সময়

অপ্রতিভ বা লজ্জিত হতে হতো সে কথা তাঁর আত্মজীবনীতেই লেখা আছে—প্রত্যক্ষদর্শীরাও নানা জায়গায় বলেছেন তাঁদের ভাষণে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার উচ্চসম্মান লাভ করার দাম তাঁর কাছে বেশী মিলত না। অনেক সময় তিনি বলতেন, এটি বাঙ্গালী মস্তিষ্কের অপব্যবহার। এই প্রবন্ধ লেখককে সেইজন্য ছাত্রজীবনে ও প্রথম বয়সে অনেক বিদ্রূপ সহ্য করতে হয়েছে। তিনি ছিলেন বিশেষভাবে ছাত্রবৎসল—তবে গুণেরই কদর ছিল তাঁর কাছে। পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েও ছাত্ররা তাঁর কাছে গবেষণা করার সুযোগ পেত এবং যদি তিনি দেখতেন, তারা তাতে অসুলভ কৃতিত্ব দেখাচ্ছে তবে অনেক সময় উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতেন তাদের ও নানাভাবে তাদের সাহায্য করে যেতেন। সন্ধানী পাঠক এর অনেক উদাহরণ জোগাড় করতে পারবেন।

সারাজীবন এইভাবে দেশসেবায় নিজেকে ক্ষয় করে নিজের উপার্জিত প্রায় সব অর্থই বিজ্ঞান-সেবা ও দরিদ্র ছাত্রের সাহায্যের জন্য দিয়ে গিয়েছেন। ত্যাগই প্রকৃত কষ্টি-পাথর—সত্যযোগী পুরুষের সোনালী আভা সেইখানেই বিচ্ছুরিত হয়।

আচার্য ছিলেন অকৃতদার। ছাত্ররাই ছিল তাঁর যথাসর্বস্ব ও নিকটতম আত্মীয়-সরূপ। তারাও তাদের যথাসাধ্য তাঁকে সেবা করে সব সময় আচার্যের ঋণ-শোধের চেষ্টা করেছে। শতবার্ষিকীর নানা-বৈঠকে অনুরাগী বাঙ্গালী বলে এসেছেন, আচার্যের উপযুক্ত স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের আহুত স্মৃতিসভায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীকবীর বলেছিলেন ১ লক্ষ টাকা আসবে সরকারী তহবিল থেকে এবং বিশ্ববিদ্যালয় অগ্রণী হ'লে সহজেই তাঁর স্মৃতিদ্যোতক অধ্যাপক-পদ প্রতিষ্ঠা করতে অর্থের অভাব হ'বে না। এটি কিন্তু এখনও পর্যন্ত রূপায়িত হয়নি। বসুবিজ্ঞান মন্দিরে এক স্মৃতি-সভায় বন্ধুবর বাংলার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল ঘোষ মশায় বলেছিলেন, উপযুক্ত চেষ্টা হ'লে আচার্যদেবের নামে ৫০ লক্ষ টাকা তোলা সহজ। আমরা অবশ্য এখনও সেই উচ্চাঙ্কে উপনীত হতে পারিনি। বাঙালী ভাবপ্রবণ জাতি—সেই জন্য কোন এক বিষয়ে তার উৎসাহ ও উদ্দীপনা বেশী দিন টিঁকে থাকে না। তা ছাড়া এই দেশে এই ধরণের কল্যাণময় স্মৃতিরক্ষার সূচনা ও খসড়া নিয়তই হ'চ্ছে। মহাপুরুষরা এদেশে মহাপ্রয়াণ করছেন—তাঁদের জায়গা খালি থেকে যাচ্চে। তাঁদের সকলেরই উপযুক্ত স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থাও আমাদের কর্তব্য। তাই নানাভাবের টানা-পোড়েন ও আকর্ষণের হিঁড়কে শেষ অবধি আমরা আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে পারব কিনা কে বলবে? এ কৃত্যের শেষ পরিণতি এখনও ভবিষ্যতের অন্ধকারে।

স্মৃতিচারণ

আমার বিজ্ঞান চর্চার পুরাখণ্ড

ছেলেবেলা থেকে বিদেশ যাওয়ার খুব সখ। একুশ বৎসরে এম-এস্‌সি পাশ করা গেল। প্রফেসার মল্লিক সস্নেহে ডেকে বল্‌লেন—এত নম্বর পেয়েছ পরীক্ষায়, বড় বেমানান লাগছে হে। ভাবলাম এবার বোধহয় সরকারী বৃত্তি পেয়ে বিদেশ যাওয়া যাবে। তবে অদৃষ্ট খারাপ। রসায়ন ইঞ্জিনিয়ারিং ছেলেরা শিখে আসুক—সকলে চাচ্ছে। তা হলে স্বদেশী কলকারখানা গড়ে উঠবে—সম্পদও বাড়বে—স্বাবলম্বী হবো আমরা। আমার দৌড় তো শুধু গণিতশাস্ত্রে। কাজেই সে বৎসর কিমিয়ারই জয় হ'লো। সে বিজয়ী ছাত্র ফিরে এসে কিন্তু শিক্ষার গণ্ডীর মধ্যেই ঢুকেছিলেন —সে কথা এখানে অবান্তর হ'বে।

আচার্য রায় তখন প্রেসিডেন্সী থেকে অবসর নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান কলেজে যোগ দিয়েছেন। যুদ্ধ চলেছে ইউরোপে। স্যার আশুতোষ বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ প্রফেসার বেছেছিলেন। পালিত ও ঘোষের বদান্যতায় তা সম্ভব হয়েছে। তবে নির্বাচিতদের দু'জনে—দেবেন্দ্রমোহন বসু ও আগরকর—জার্মান দেশে উচ্চশিক্ষার অভিজ্ঞতা অর্জন করতে গিয়ে অন্তরীণ হয়ে পড়লেন। রামন তখনও সরকারী হিসাববিভাগে কৃতী কর্মচারী। নিজের অবসর ও খুশিমত, বৌবাজারে মহেন্দ্রলাল প্রতিষ্ঠিত আসোসিয়েসনে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন ও কাজের বিবরণী বিদেশী Phil Mag-এ বের হচ্ছে। আশুতোষ তাঁর উপর খুব ভরসা রাখেন—আমাদেরও একদিন বলেছিলেন, দেখো সে খুব বড় বিজ্ঞানী হ'বে। তবে আচার্য রায় ছাড়া ডাঃ প্রফুল্ল মিত্রও এসে বিজ্ঞান কলেজে যোগ দিয়েছেন। কয়েক বৎসর—স্বদেশীর প্রথম যুগে কিছুদিন Bengal Technical-এ কাজ করেছিলেন তিনি। পালিতের সঙ্গে মতের মিল হল না স্বদেশী কর্তাদের কাজেই তাঁরা পারশীবাগানের বাড়ি ছেড়ে গেলেন মুরারীপুকুর। তারকনাথের বিশ্বাস ছিল আশুতোষের উপর— যথাসর্বস্ব কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দান করে দিলেন। রাসবিহারীও তখন প্রথম কেতায় দান করেছেন দশ লাখ। কলকাতার সায়েন্স কলেজ তৈয়ারীর সময় তদারক করেছিলেন ডাঃ প্রফুল্ল মিত্র, তার ফলে তিনতলা বাড়ির সর্বত্র ঘরে ঘরে পাকা-নর্দমা কাটা। সবই তো রসায়নের Lab হবে! অবশ্য নিচে দক্ষিণ সারিতে একমাত্র কয়েকটি ঘরে কাজের টেবিল বসেছে—গ্যাস, বিদ্যুৎ ও জল সরবরাহ হচ্ছে।

আচার্য রায় ও ডাঃ প্রফুল্ল মিত্র এসে কাজ আরম্ভ করেছেন। আচার্য রায় থাকেন সেই দিকেরই দোতলার ঘরে। বেঙ্গল কেমিক্যালের অফিস ছেড়ে দিয়েছেন। অকৃতদার তিনি, কোন ঝঞ্ঝাট নেই। ছাত্ররাই সেবা করে। বিনা পয়সায় রয়েছেন, মস্ত ঘর-দুয়ার। ডাঃ মিত্র বাড়ি থেকে প্রায়ই ভালমন্দ খাবার তৈয়ারী করে Tiffin Carrier-এ আনছেন বা রায়-অনুরাগীরা দিয়ে যাচ্ছেন—সন্দেশ বা নানা মিষ্টান্ন। দিনের কাজ শেষ করে—সন্ধ্যায় ঘোড়ায়-টানা কম্পাসগাড়ি চড়ে—প্রত্যহ আচার্য রায় যান গড়ের মাঠে মনুমেণ্টের তলায়। সভা অবশ্য শুধু পুরনো বন্ধু ও ছাত্র, বা অনুরাগীদের নিয়ে বসে—অন্য চেলারা ও যায়। আমাদের দেবপ্রসাদ সে-সময়ের সেরা-ছাত্র, সব বিষয়ে মাথা সাফ। রিপন কলেজে পড়াচ্ছেন, হাইকোর্টে যাচ্ছেন আইন ব্যাবসায়ে ভাগ্যপরীক্ষা করতে। এদিকে জার্মান রণকৌশল বোঝেন ভাল, সব স্পষ্ট দেখছেন ও বিস্মিত শ্রোতাদের সুন্দর করে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। আমাদের বৎসরের জ্ঞান, মেঘনাথ সকলেই ১১০ কলেজ ষ্ট্রীটের মেসে থাকেন। সুরেশদা, নীলরতনদা ও তাঁদের শিষ্যরা সব স্বদেশী ও ডাঃ রায়ের ভক্ত। সান্ধ্য-সভার সভ্য সকলে। রাত হ'লে আচার্য রায় কলেজে ফেরেন—দোতলায় থাকেন, আলো জ্বালেন না। বহু পরিশ্রমে—কেউ বলতো Mercurous Nitrite সংক্রান্ত গবেষণা করে শরীর বিষিয়ে ফেলেছেন। তাঁর সেবক ছাত্রেরা নিজেরা পড়াশুনা করে। কখনও বা রাজনৈতিক আলোচনায় মেতে ওঠে। চারিদিকে নাম ভেকধারী লোকের যাতায়াত। লোকে বলতো তার মধ্যে পুলিশী টিকটিকিও থাকতো। প্রফুল্লচন্দ্র গান্ধীবাদী হয়েছেন—ঘরে পরেন খাটো লুঙ্গি—মাঝে মাঝে চরকা কাটেন—Soul-force বাড়াবার জন্য। তবে প্রত্যহ সকালে নেমে নিজে হাতে ল্যাবে কয়েকঘণ্টা চালান গবেষণার কাজ। সঙ্গে ছেলেরা কাজে সাহায্য করে—বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পালিতবৃত্তি-ভোগী অনেকে—কেউ বা অনাহারী ভলাণ্টিয়র। সে সময় একজন গরীব ছাত্র পুষছেন রায়, তাকে নিজে তৈয়ারী করে নিয়েছেন—তাঁর গবেষণার সহায় হয়েছে। তার বিশ্লেষণের ফলে আচার্য রায়ের খুব বিশ্বাস। আচার্য রায় তখন সৃষ্টিছাড়া নানা ধাতব যৌগিক নিয়ে ভাবছেন—গন্ধকের-ভ্যালেন্সী বাড়াচ্ছেন—সোনা-প্লাটিনামের নানা যৌগিক নিয়ে কারবার চলেছে ; আর যে রকম ভাবেন—প্রায় সবই ওই ছাত্রের বিশ্লেষণের সঙ্গে মেলে। ডিগ্রিধারীদের টিটকারী দেন। তাঁর হাতে গড়া ছেলের বিশ্লেষণের ক্ষমতা সকলের সেরা। ডাঃ মিত্র মনে অবিশ্বাসী হলেও—সামনে সায় দিয়ে যান। বাঙালীর ভদ্রতা ! অবশ্য অতি প্রশংসার ফলে সে একটু বিপথগামী

হয়ে পড়লো। ডাঃ রায়ের ভাণ্ডারের সুরাসার একটু তাড়াতাড়ি উবে যেতে লাগলো। প্ল্যাটিনম-সোনা-র যৌগিকগুলো হারাতে লাগলো। রায়ের মতের পরিবর্তন হয় তখন, তবু তিনি—সদয়-করুণাময়—ও ছাত্রবৎসল—ছেলেটির শুধু চাকরী গেল, তাকে অন্য কিছু অসুবিধায় পড়তে হয় নি।

এসব একটু পরের কথা। আমরা যারা কেমিস্ট্রি করি নি, ভাবছি কি করা যায়।

*   *   *

১৯১২।১৩ সালে (?) ডাঃ গণেশ প্রসাদ এলেন রাসবিহারী চেয়ারে ফলিত-গণিতের অধ্যাপক হয়ে। খুব সুনাম—জার্মানী থেকে নাকি ডাঃ ক্লাইনের কাছে গবেষণা করে এসেছেন। বেনারস থেকে কলকাতায় যোগ দিয়েছেন, সাদাসিধা মানুষ আচার্য রায়ের জীবনধারা—তাঁর আদর্শ। সমবায়-ম্যন্সনে রিক্ত আসবাবহীন ফ্ল্যাটে থাকেন। জার্মান বই ও এনসাইক্লোপিডিয়ায় ঘেরা সব সময়। আমরা সকলেই নাম শুনেছি। তাঁর প্রশ্নপত্র সৃষ্টিছাড়া কঠিন তথ্যে কণ্টকিত—মেধাবী ছাত্ররাও সকলে ভূমিসাৎ হয়ে পড়তো। আশুতোষের ডাকে নবনির্মিত বিজ্ঞান কলেজে যোগ দিয়েছেন। এ-যাবৎ প্রেসিডেন্সী কলেজই বিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষাদান একচেটিয়া করে রেখেছিল।

সেনেটের দলাদলিতে—আশুতোষের প্রতিপক্ষ প্রেসিডেন্সীর দল—তার বেশির ভাগ সরকারী কর্মচারী—সাহেবও অনেক। সরকার আশুতোষের প্রচেষ্টা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান পড়ান সুনজরে দেখছেন না। পালিত ও ঘোষের পয়সায় যে সব চেয়ার স্থাপিত হবে তাতে ভারতীয় ছাড়া অন্য কেউ বসতে পাবে না—এইটে সরকারের বিরাগ বাড়িয়ে রেখেছে। ভারতীয়েরা আবার কি বিজ্ঞান শিক্ষা দেবে? এতদিন চলেছে Cunningham, Harrison, Peake, Vredenberg-দের রাজত্ব। আচার্য রায়, তিনিও বহু দিন প্রাদেশিক শ্রেণীতেই কাজ করে গেলেন। অবশ্য ডাঃ জগদীশ বোসের তুলনা নেই। তিনি পদার্থবিদ্যা ছেড়ে জীববিদ্যায় ঝুঁকেছেন। তবু পদার্থবিদ্যার প্রফেসারি করছেন—আমরা বেশীর ভাগ দ্বিজেন-বাবু, চারুবাবু, বরদাবাবুর আশ্রয়ে। তবে যেদিন রেডিও তরঙ্গের কথা হয়, নানা পরীক্ষা দেখে মন খুশি হয়। বুক দশহাত ফুলে ওঠে—বলি মার্কিন কি করেছে—যা অমারা করতে পারতাম না। শেষ অবধি উপনিষদের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি খুঁজবেন

—ডাঃ বোস, সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। তবে গণিতের যুক্তিতে ততো দৃঢ় নন্, সব দেখতে পান জ্ঞানচোখে। পরে বসু-বিজ্ঞান মন্দিরে উঠে গিয়ে অবাধে প্রাণ-বিজ্ঞানের চর্চায় মন ঢেলে দিলেন।

ডাঃ গণেশপ্রসাদ এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন প্রফেসার। ছাত্ররা তাঁর কাছে অনুসন্ধানের শিক্ষানবিশী করতে ঝুঁকে পড়লো। গণেশপ্রসাদের কাছে গেল কলকাতার সেরা বিজ্ঞানের ছাত্ররা—তবে তারা অনেকেই গণেশের কাছে কম নম্বর পেয়েছিল এম-এসসি পরীক্ষায়। কিন্তু সে তো প্রেসিডেন্সী শিক্ষকদের দোষ—অন্তত তাই গণেশপ্রসাদের ধারণা। প্রাক্তন শিক্ষকদের বিষয়ে বিরুদ্ধ মন্তব্য শুনলেও নবীনেরা মাথা হেঁট করে বসে থাকেন—উত্তরের সাহস নেই। পাশ করে আমিও হাজির হলাম গণেশপ্রসাদের কাছে। আমার এম-এসসি পরীক্ষকও ছিলেন তিনি—তবে আমার অবস্থা পূর্বগামীদের মত অতো খারাপ ছিল না। তাই ডাঃ প্রসাদ প্রথমে একটু করুণা করেছিলেন—তবে শেষ অবধি গুরুনিন্দা হজম করা শক্ত দাঁড়াল, তখন আমার স্পষ্টভাষী বলে ভারি দুর্নাম। কাজেই গণেশপ্রসাদের বিরুদ্ধ মতের প্রত্যুত্তর দিয়েছিলাম। গণেশ চটে গেলেন—বললেন পরীক্ষায় ভাল করলে কি হবে—তোমার দ্বারা অনুসন্ধান হবে না। ব্যর্থমনোরথ হয়ে চলে এলাম। ভাবলাম নিজেই যা পারি করবো। অল্পস্বল্প কিছু করবার চেষ্টা করছি, এমন সময় বিহার সরকার কাগজে নবীন শিক্ষকের জন্য বিজ্ঞাপন দিলেন। ভাবছি আইন পড়ি নি—গণিত-বিজ্ঞান নিয়েই থাকবো, চেষ্টা করে দেখা যাক। প্রিন্সিপ্যাল, জেমস্, ডাঃ মল্লিক সকলের প্রশংসাপত্র সংগ্রহ করে দরখাস্ত করলাম। কিন্তু তখনও ভাগ্যবিধাতা বিমুখ রয়েছেন। ডাঃ মল্লিক একদিন আমাকে ডেকে বললেন বিহারের ডি-পি-আই আমাকে লিখেছেন—তোমার ছাত্র এত ভাল—যে আমাদের ঠিক দরকারে লাগবে না। কাজেই আবার কলকাতার চারিদিকেই নজর রাখতে হলো। আমাদের সময় শৈলেন ঘোষ—ছাত্রমহলে 'মামা' বলে প্রসিদ্ধ ছিল। পদার্থবিদ্যায় ভাল পাশ করেছে এক বছরে এক সঙ্গে। সেও বেকার, তবে তাঁর বুদ্ধির বলিহারি দিতে হয়। স্যর আশুতোষের সঙ্গে দেখা করেছে—তাকে বলেছে বিজ্ঞানের যে সব বিষয় প্রেসিডেন্সীতে পড়ান হয় না—তা তো আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাশ খুলে দিতে পারেন। অবশ্য নৈয়ায়িকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ-বিজ্ঞান বিভাগে নানাভাবের শিক্ষার বন্দোবস্ত ভেবে রেখেছেন। তবে পড়াবে কে? একদিন আমাদের ডেকে পাঠালেন স্যার আশুতোষ।

খাড়া সিঁড়ি বেয়ে পাশে লাইব্রেরীঘরে স্যার আশুতোষের খাস-কামরায় হাজির হলাম—আমি-মেঘনাদ-শৈলেন—অবশ্য ভয়ে ভক্তিতে সকলেই বিনীত নম্র—একেবারে গোবেচারীর ভাব। আশুতোষ শুনেছেন নব্যেরা চাচ্ছে নতুন নতুন বিষয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান হোক্। জিজ্ঞাসা করলেন—তোরা কী পড়াতে পারবি ?

'আজ্ঞে, যা বলবেন, তাই যথাসাধ্য চেষ্টা করবো।'

আশুতোষ হাসলেন—তখন পদার্থবিজ্ঞানে নানা নতুন আবিষ্কার হয়েছে। আমরা মাত্র নাম শুনেছি। বেশির ভাগ জার্মানীতে, নতুন উন্নতি ও নতুন আবিষ্কার। প্ল্যাঙ্ক, আইনস্টাইন, বোর—তখন শুধু নাম শুনেছে বাঙালী। জানতে গেলে পড়তে হবে জার্মান কেতাব, বা—অনুসন্ধান-পত্রিকা নানা ভাষায়। যুদ্ধের মধ্যে সেসব বেশির ভাগ ভারতে আসে না।

শেষ অবধি নতুন পথে প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে—আমাদের বিশেষ বৃত্তির ব্যবস্থা হলো—মাসিক ১২৫্। মেঘনাদের উপর ভার পড়লো Quantum বাদ নিয়ে পড়াশুনা—আমাকে পড়তে হবে Einstein এর Relativity Theory. স্বীকার করে এলাম—এক বৎসরের মধ্যে তৈরি হবো, এদিকে বই কোথায় পাওয়া যাবে ? Relativity-র বিষয় ইংরেজীতে বই ছিল, সেগুলি সংগ্রহ হলো, তবে Boltzmann-Kirch-hoff-Planck-এর লেখা কোথায় পাওয়া যাবে—হঠাৎ এক বুদ্ধি খেলে গেল। মাথায় জাগলো Dr. Bruhl-এর কথা।

ডাঃ ব্রূহল তখন শিবপুর কলেজে পদার্থবিজ্ঞান পড়ান—আর সেখানে নানা ধরণের সূক্ষ্ম-যন্ত্র—তৌলমাপ খাড়া করেছেন যা এদেশে প্রেসিডেন্সী কলেজেও ছিল না। পদার্থবিজ্ঞানে এম-এসসি-তে স্বহস্তে কাজের নিপুণতা দেখাতে যেতে হতো ব্রূহলের Laboratory-তে, সে বড় কঠিন ঠাঁই। বেশির ভাগ ছাত্র বিপদে পড়তেন। তবে তাঁর কাছে শিক্ষানবিশী করে কেউ কেউ বেশ পারদর্শী হয়ে উঠেছিল আমাদের পূর্বগামীদের মধ্যে। গল্প শুনেছি—ব্রূহল নাকি ছিলেন উদ্ভিতবিদ্যায় কৃতী ছাত্র। দেশে থাকতে স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটলো, ফুসফুসের প্রদাহ। ডাক্তাররা বললেন কিছুদিন গরম দেশে কাটালে ভাল হয়। তাই ভ্রাম্যমাণ ছাত্র হিসাবে—দেশ-বিদেশের গাছগাছড়ার বৈচিত্র্য নিরীক্ষণ-পর্যবেক্ষণ ও নমুনা সংগ্রহ করতে—পদব্রজেই দেশ ছেড়েছিলেন। দানুয়েবের তীর ধরে এসে তুর্কীদের শহর রুম কনস্টাণ্টিনোপোল। পরে মর্মরা সমুদ্র পার হয়ে এশিয়াখণ্ডে, তুর্কী সাম্রাজ্য পার হয়ে পারস্য দেশের মধ্যদিয়ে শেষ পর্যন্ত পৌচেছিলেন করাচী। সেখান

থেকে স্টীমারযোগে কলকাতা—তখন বোটানিক্যাল গার্ডেন দেখতে দেশ-বিদেশ থেকে বিজ্ঞানীরা আসতো।

ব্রুহল এদেশে এসে কিন্তু বিয়ে করে বসলেন। স্বদেশের সম্রাট তাঁর অনুমতির অপেক্ষা না রেখেই বৃত্তি ভোগী ছাত্রের এই কাজ সুনজরে দেখলেন না। দেশের বৃত্তি বন্ধ হয়ে গেল। সেই অবধি Dr. Bruhl এদেশে রয়েছেন—বিজ্ঞানের সব বিষয়েই পারদর্শী—সামান্য সহায়কের চাকরি থেকে শুরু করে উঠেছেন বহুদূর। পড়ার অভ্যাস চিরকাল, আর বিজ্ঞানের নানা বই সংগ্রহ করে রেখেছেন নিজের গ্রন্থাগারে। আমরা সেখানে অনেক মূল্যবান দুষ্প্রাপ্য বই আবিষ্কার করলাম —ধার নিয়ে এলাম—Planck. Boltzmann, Wien ইত্যাদি, আর কি চাই! মেঘনাদ কষ্ট করে German শিখেছেন, তাতে Intermediate পরীক্ষা পাশও করেছেন—আমি সবে শুরু করেছি। তবে ফরাসী পড়ি। আপেক্ষিকতাবাদের বই তখন কয়েকখানা ইংরেজীতে জোগাড় হলো। শৈলেন এদিকে আশুতোষের প্রিয়পাত্র হয়ে বসেছে। যদি নতুন বিষয়ের অধ্যাপনা শুরু হয় বিজ্ঞান কলেজে, তবে কোথায় কি প্রেক্ষাগার হবে—কোথায় বসবে বিদ্যুতের চাবি, কোথায় বা জলের কল, কত আনুমানিক খরচ হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বকীয় তহবিল থেকে, কোথায় পাওয়া যাবে নতুন ধরণের সূক্ষ্ম মানযন্ত্র নানা বিষয়ের। যুদ্ধের মধ্যে তো আমদানি একেবারেই নেই। শৈলেনের বাহাদুরী—সে অনেক খবর রাখতো।

জাতীয় শিক্ষায়তন একবার উচ্চবিজ্ঞান শিক্ষার জন্য বন্দোবস্ত করতে চেয়েছিলেন—সে সময়ে কেনা কতকগুলি উপযোগী যন্ত্র মুরারীপুকুরে পড়েছিল। সেন্ট জেভিয়র কলেজে কোন্ যন্ত্র রয়েছে যা উচ্চবিজ্ঞানের কাজে লাগে—শিবপুরেই বা কি পাওয়া যাবে, সবই শৈলেনের জানা। এমন কি স্যার আশুতোষও চাইলে কেউ-ই প্রত্যখ্যান করতে পারবে না সেই ভরসায় কৃষ্ণনাথ কলেজ বহরমপুর থেকেও যন্ত্রের সন্ধান হলো। কেমিস্টরা পছন্দ করলেন না নবযুবকদের এই ষড়যন্ত্র। তিনতলা বাড়িতে তো অন্য বিজ্ঞানের জন্য টেবিল চেয়ার বসে যাবে। তাঁরা বললেন আশুতোষ অল্পবয়সী কয়েকজনের কথায় যথাসময়ের আগেই নেমে পড়তে চান। দেবেন বসু ও রামনের আসার জন্য অপেক্ষা করুন বরং। এ কয়জন নবীনেরা কি এতবড় গুরুভার বইতে পারবে?

আশুতোষ ভেবে নিলেন যে তাঁর দলে আচার্য রায়কে টানতে পারলে বিশ্ববিদ্যালয়ের মন্ত্রণাগারে তাঁর মত চালাতে কষ্ট হবে না। আচার্য রায়েরও আমাদের

উপর খুব বেশি ভরসা ছিল না—তবে আমাদের সহধ্যায়ী জ্ঞান ইতিমধ্যেই তার বিখ্যাত থিওরীতে প্রথম পদক্ষেপ করে আচার্যের প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। বৃদ্ধ রায়ের নবীনের কার্যক্ষমতায় বিশ্বাস ছিল—কাজেই আশুতোশ অল্প কথায় তাঁর মতকে পরিবর্তিত করে নিজের সহায়ক করে ফেললেন। নতুন আইন চালু হলো। ১৯১৭ থেকে বিজ্ঞান কলেজেও পড়ান হবে স্নাতকোত্তর ছাত্রদের, ফলিতগণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন—অবশ্য প্রেসিডেন্সী কলেজে পুরনোভাবে পড়ান চলতে থাকবে। তা ছাড়া বিজ্ঞান কলেজেও পড়ান হবে বলে সব বিষয়ে কৃতী ছাত্রদের ডাক পড়লো। গণিতে গণেশপ্রসাদ প্রফেসার—তবে তিনি থাকতে চান অনুসন্ধান নিয়ে বেশির ভাগ। অন্যান্য বিষয় পড়াতে আমাদের ডাক পড়ল। এ এক অদ্ভুত ব্যাপার। পদার্থবিজ্ঞান শিক্ষার জন্য শৈলেন, মেঘনাদ ও আমি ছাড়া আসলেন জগদীশ বোসের কৃতী ছাত্ররা—সুশীল আচার্য ও শিশির মিত্র, যোগেশ মুখোপাধ্যায় ও ফণীন্দ্র ঘোষ বঙ্গবাসী কলেজ থেকে এলেন। যতীন শেঠ আমেরিকা গিয়েছিলেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে; কৃতী হয়ে ফিরেছেন—তাঁরও ডাক পড়লো।

প্রারম্ভেই এক হাঙ্গামা বাধলো। রাতে পুলিশ-সর্দার বসন্ত চাটুজ্যেকে কারা গুলি করেছে—গুপ্তচরেরা বিডন স্ট্রীটের শেঠ বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক আছে বলে সন্দেহ করল—তাদের বাড়ি তছ্‌নছ্ করে তল্লাসী হলো। বাড়িসুদ্ধ সকলকে ধরে নিয়ে গেল, অবশ্য দোষের কিছু পাওয়া যায় নি। তবে যতীন শেঠ অন্তরীণ হলেন। শৈলেন ঘোষ ইতিমধ্যে উচ্চশিক্ষার জন্য বিলাত যাবার সব বন্দোবস্ত করেছে। যাব ভাবছে—এমন সময় টেগার্ট সাহেব তার তলব করলেন। সেদিন যখন পেয়াদা এসেছিল শৈলেন বাড়ি ছিল না। পথে আসতে খবর পেয়ে গা-ঢাকা দিল। শেষ অবধি নানা বাধা অতিক্রম করে—যুদ্ধের মধ্যে ইউরোপ ঘুরে আমেরিকা পৌঁছে গেল। ২ জন কমে গেল। আমরা তবুও পশ্চাদ্‌পদ হলাম না। আশুতোষকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তা' রাখতে যথাসাধ্য চেষ্টা করতে লাগলাম। জ্ঞান ঘোষের Theory of Electrolytic Conduction-এর সম্পর্কে প্রবন্ধগুলি J.C.S.-এ ধারাবাহিকভাবে বের হচ্ছে। বিজ্ঞানীমহলে প্রশংসা হয়েছে। আচার্য রায় নবীনদের কেরামতিতে মুগ্ধ। জ্ঞান ঘোষ পালিতের বিদেশ যাবার বৃত্তি নিয়ে লণ্ডনে চলে গেলেন। মুখার্জীও পেলেন সেই সময়ে বৃত্তি।

একবার নিজের কথা আশুতোষের কাছে তুলতেই তিনি হেসে বললেন বিয়ে করেছ যে! অকৃতদার ছাত্র-বিজ্ঞানীদের জন্যই পালিত বৃত্তি। তারকনাথ পালিত

ভাবতেন—ছাত্ররা অকৃতদার না থাকলে বিদেশে সব টাকা পড়াতে ও বিজ্ঞানে খরচ করবে না। টাকা জমিয়ে দেশে পাঠাবার চেষ্টা করবে, নবপরিণীতাদের মনোরঞ্জন করতে চাইবে। তাই এই ব্যবস্থা। কাজেই সেবারও ব্যর্থমনোরথ হতে হলো।

*   *   *

মেঘনাদ ও আমি পদার্থবিদ্যা বিভাগ ও ফলিতগণিত। দু'ডিপার্টমেণ্টেই পড়াই—অবশ্য এর জন্য মুনাফা বেশি মেলেনা। ইতিহাস-সংস্কৃতি ইত্যাদি ব্যাপারে ব্যবস্থা স্বতন্ত্র। আশুতোষের মর্জি। ডাঃ দেবেন বোস ফিরে এসেছেন ১৯১৯। বিজ্ঞান কলেজে যোগ দিয়েছেন। প্রায় একই সময়ে রামন মনস্থির করে ফেলেন হিসাব বিভাগের চাকুরিতে ইস্তফা দিয়ে বিজ্ঞান কলেজে আসবেন। এসেই ডাক পড়লো সহায়কদের—এর আগে আমরাই সব ক্লাসে পড়াই, তিনি চাইলেন অনুসন্ধান কাজ জোরদার হোক, মেঘনাদ বেচারী হাতের কাজে তত পটু নয়—পালিত প্রফেসারের বিরাগভাজন হলেন। অন্য শিক্ষকেরা ঝুঁকলেন রামনের সঙ্গে গবেষণা করে ডাক্তার উপাধির চেষ্টায়। আলোর Diffraction নিয়ে রামন মেতে আছেন—ফণী ঘোষ, শিশির মিত্র, ডাক্তার হলেন। অভ্রের মধ্যে নানা রং কেন দেখা যায় তার অনুসন্ধান চালালেন ফণী ঘোষ। কোন বাধার পেছনে, আলোর তরঙ্গ ভেঙ্গেচুরে উঁকি-ঝুঁকি মারতে পারে, আবার উপযুক্ত সময়ে সেই ভাঙ্গা ঢেউ মিলে, নানা অদ্ভুত আলোর রেখা সৃষ্টিকরে—সেইসব ভাল করে বুঝলেন মিত্র। আমি ও মেঘনাদ বস্তুত গণিতের হিসাবই ভাল বুঝি। মিলেমিশে কিছু কাজ করে ছাপিয়েছি। তবে মেঘনাদের জ্যোতিষে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য। নক্ষত্রদের ঔজ্জ্বল্য ও সেই সম্পর্কে তাপের তারতম্য নিয়ে প্রবন্ধগুলি লিখে উচ্চ প্রশংসা পেলেন। ডক্টরেট পেলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। বিদেশে যাবার জন্য গুরুপ্রসন্ন ঘোষের বৃত্তি নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

১৯২১-এ কলকাতাতে রয়েছি—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। হার্টগ সাহেব এসেছেন প্রথম ভাইস-চ্যান্সেলর হয়ে। নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ে নবীন শিক্ষক সংগ্রহের কথা ভাবছেন। একদিন কলকাতায় ডেকে পাঠালেন। আমার কথা তাঁকে নাকি বলেছেন কোন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি। সেই দেখা-শুনার ফলে চিঠি পেলাম—১৯২১ সালে ঢাকায় রীডারের পদ পাবার জন্য ডাক পড়লো।

বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান কলেজ পত্তন থেকে শুরু করে শিক্ষকতা করেছিলাম—যথারীতি ৪ বৎসর। এইবার ঢাকা যাবার আহ্বান এলো।

পুরনো দিনের স্মৃতি

গত সোমবার (২৯শে আগষ্ট) যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ-বিজ্ঞানের কুঠীতে হাজির হতে হয়েছিল। সেখানে দেখি ডাঃ চ্যাটার্জী বৃষ্টির জল ধরে নিয়মমত পরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন। বললেন—কয়েক বছর ধরেই এ কাজ চলছে। আকাশ ধুয়ে নানা জাতের জড়কণা বৃষ্টির জলের সঙ্গে নেমে আসে। বাড়ীর ছাদে বা ময়দানে খোলা জায়গায় নানা আধারে বৃষ্টির জল ধরা হয়। তেজস্ক্রিয় কণাগুলির খবর তাদের বিকিরণ-বৈচিত্র্য পরীক্ষা করলে পাওয়া যায়।

চীনা জুজুর ভয়ে আমরা আজকাল সন্ত্রস্ত। কাগজে পড়ছি, তারা গত কয়েক মাসের মধ্যে ২।৩টি অ্যাটমবোমা ফাটিয়েছে। তাই চ্যাটার্জীকে জিজ্ঞাসা করলাম—প্রত্যেক বিস্ফোরণের পরে তেজস্ক্রিয় রেণুর ভারে উচ্চাকাশ তো বহুদিন দূষিত থাকবার কথা। উত্তুরে হাওয়ার প্রবাহে ভারতের আকাশে সেগুলি ছড়িয়ে পড়বেই ও শেষে বৃষ্টির জলের সঙ্গে নেমে আসবে নিশ্চয়ই নানা জায়গায়। যাদবপুরে পরীক্ষা করে বোমার মশলার বিষয়ে কিছু খবর কি পাওয়া গেছে ? চ্যাটার্জী বললেন—বিস্ফোরণের পর ইউরেনিয়ামের সমস্থানিক u-২৩৫ এখানকার বৃষ্টির জলে ধরা পড়েছে ; কাজেই u-২৩৫ প্রচুর পরিমাণে চীনা বোমাতে থাকবার কথা। সাধারণ ইউরেনিয়ামের সঙ্গে মেশানো থাকে u-২৩৫ খুব অল্পপরিমাণেই। চীন দেশে শুনেছি ইউরেনিয়ামের আকর আছে নানাস্থানে—তবে প্রভূত পরিশ্রম ও উন্নত বিজ্ঞানের প্রক্রিয়াগুলি নিপুণভাবে ও যথাযথ খাটিয়েই u-২৩৫ প্রচুর পরিমাণে নিষ্কাশন করা সম্ভব হয়েছে। এর দৌলতে অ্যাটম-বোমা তৈরি সম্ভব হয়েছে চীনদেশে এ-বছর।

*   *   *

নানা কথা ভাবতে ভাবতে বাড়ী ফিরলাম। প্রায় ২৪ বছর আগের এক সপ্তাহের কথা মনে জেগে উঠলো।

*   *   *

তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পুরাদমে চলছে। জাপানীরা এগিয়ে আসছে, সিঙ্গাপুর ও বর্মা দখল করেছে। ওদিকে চীনদেশেরও অনেকটা তারা কয়েক বছর অধিকার

করে বসে রয়েছে। চ্যাং-কাই-শেক আশ্রয় নিয়েছেন দক্ষিণ চীনের পার্বত্য অঞ্চলে, পাহাড়ের মধ্যে লুকিয়ে বসেছে চুং-কিং বিশ্ববিদ্যালয়—বোমার অভিযান থেকে আত্মরক্ষা করবার তাগিদে। তখন চীনদেশের দারুণ দুর্দিন। খাবার দুষ্প্রাপ্য। আবার রোগের প্রতিষেধক সাধারণ কোন ঔষধ মেলে না গ্রামদেশে, প্রায় সবই তখন বিদেশ থেকে আমদানি করতো চীনারা। তা ছাড়া সেখানে গরম কাপড়-চোপড়েরও অত্যন্ত অভাব। কালোবাজারীরা অগ্নিমূল্যে গ্রামের লোকের কাছে বিক্রী করছে—এসব অবশ্য মিত্রদেশ থেকে করুণাবশে যা সাধারণের জন্যে পাঠাতো, তার সবটা আত্মসাৎ করেই! ঢাকা থেকে আমেরিকান বিমান-বিহারীরা হরদম চুং কিং যাতায়াত করতো—বলতো সেখানে ছেঁড়া মোজা ও গেঞ্জী বিক্রী করে বেশ পয়সা করা যায়।

সে সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করছি। আমার এক ছাত্র Sulphonamide নিয়ে নানা গবেষণায় ব্যস্ত। ওদিকে জৈব-রসায়নের গবেষণা-কেন্দ্রে ডাঃ কালীপদ বসু নানাপ্রকার চাউল ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের বিশ্লেষণ করে চলেছেন। তাদের প্রত্যেকটির মধ্যে স্নেহ-কার্বোহাইড্রেট ও প্রোটিনের শতকরা কয়ভাগ করে বর্তমান রয়েছে, তা নিরূপণ করে তালিকা করছেন। তার মধ্যে Vitamin (খাদ্যপ্রাণ) সমূহের অবস্থানের খবরও থাকছে ও তাদের পরিক্ষণ নিরূপণের প্রয়াসও চলেছে। ঢাকার খুব কাছেই আমেরিকান বোমারু বিমানের ঘাঁটি। ঢাকা সহরের মধ্যে আমেরিকান, ইংরেজ ও ভারতীয় পল্টনের নানা হাসপাতাল বসেছে। নানাদেশের ডাক্তার ও বিজ্ঞানী এসে ঢাকায় রয়েছেন। তাঁরা মধ্যে মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-মন্দিরে বেড়াতে আসেন ও আমরাও তাঁদের কাছ থেকে নানা খবর পাই।

* * *

সেই সময় খবর এলো চীন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জৈব-রসায়নে অভিজ্ঞ পর্যটক এসেছেন ভারত ভ্রমণে। ভারতে নানাস্থানে কিভাবে নানা খাদ্যপ্রাণসমন্বিত বটিকা তৈরি হচ্ছে দেখতে। দক্ষিণ ভারতে টুটিকোরিনে দেখলেন, মাছের তেল থেকে Vitamin D-এর সংগ্রহ, আবার আফ্রিকা দেশের লাল তালের তেল থেকে Vitamin এর সংগ্রহ। Vitamin-এর অভাবে চীনা শিশুদের স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়েছে। তারই প্রতিকারের চেষ্টায় এই পর্যটন। রাজপুতানা, বোম্বাই, পাঞ্জাব, দিল্লী বেড়ানো শেষ হলো, সব শেষে পূর্বপ্রান্তের সহর ঢাকায় তিনি উপস্থিত হলেন।

শ্রীকালীপদ বসুর খাদ্যবিশ্লেষণ ও সংগ্রহের তালিকার কথা তিনি শুনেছিলেন। নিজেরও ওই বিষয়ে কিছু কাজ করা ছিল তাঁর, তাই কৌতূহলের উদ্রেক হয়েছে—কিভাবে ভারতে ওই প্রকারের অনুসন্ধান চালানো হয়।

*　　　　*　　　　*

চীনা বিজ্ঞানীকে সাদরে অভ্যর্থনা করলাম আমরা। ঢাকা-হল অফিসের একটি কামরা প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র দিয়ে তাঁর বাসের উপযোগী করে দেওয়া হলো। এক সপ্তাহেরও বেশী দিন তিনি আমাদের সঙ্গে কাটালেন।

*　　　　*　　　　*

নানা প্রসঙ্গের আলোচনা হচ্ছে। নিজে কিভাবে চীনদেশের উদ্ভিজ্জের মধ্যে Vitamin B ও C-এর সন্ধান পেয়েছেন, তার কথা। চীনদেশে রসায়ন শিল্পের তখন সবে পত্তন হয়েছে। গন্ধকাম্লের কারখানা মাত্র কয়েক জায়গায় গড়ে উঠেছে, অন্যান্য দরকারী জিনিষ ও ঔষধপত্র তখনও আসছে বিদেশ থেকে। পুরনো কেতায় জীবনযাত্রা চলেছে সাধারণ চৈনিকের, যদিও কয়েক বছর আগেই সুন-নত-সে-ন বিপ্লবের বন্যায় মাঞ্চু সাম্রাজ্যের উচ্ছেদ ঘটিয়েছেন। আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সহজেই Sulphonamide ও তাঁর নানা যৌগিকের প্রস্তুতি চলেছে শুনে প্রথমে তাঁর বিশ্বাস হলো না। আমাদের নিমন্ত্রণে এসে স্বচক্ষে প্রক্রিয়ার সব ধাপগুলিই ছাত্রকে অতিক্রম করে শুদ্ধবস্তুতে উপনীত হতে দেখলেন। এই প্রত্যক্ষ জ্ঞানদানের পরিবর্তে আমরা চাইলাম তাঁর কাছে সয়াবিন থেকে কিভাবে চীনদেশে দুধ তৈরি হয়, তার সন্ধান। কাশ্মীর থেকে আনা অনেক সয়াবিন শ্রীমান কালিপদ যত্ন করে রেখেছিলেন। তা থেকে যথানিয়মে দুধ তৈরি হলো, দুধ থেকে ছানা। চীনা হালুইকরেরা নাকি নানা মিষ্টান্ন এই ছানা থেকেই তৈরি করে। (আজকাল সন্দেশ নিয়ন্ত্রণের কল্যাণে এই সব বিদ্যা আমরা হাড়ে হাড়ে বুঝছি।)

*　　　　*　　　　*

বাংলায় দারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। কঙ্কালসার ভিখারীরা দ্বারে দ্বারে ফেন ভিক্ষা করছে, রাস্তায় বের হয়ে ২।৪টা মৃতদেহ দেখা প্রাত্যহিক ব্যাপার। সহরে লঙ্গরখানায় বাজরার খিচুড়ী পরিবেশন হচ্ছে। আমরা চেষ্টা করছি, গাছের পাতা থেকে বীরেশ গুহের ঘাসের চপের সমতুল্য কোন রুচিকর বস্তু পয়দা করা সম্ভব কিনা। চীনা বিজ্ঞানী আমার লেবরেটরীর অফিস ঘরে মধ্যে মধ্যে

বসেন। সবুজ ঘাসে ভরা পাশের ময়দানে ২।৪টা গরু সব সময় চরে বেড়াচ্ছে নিশ্চিত মনে।

কথা ওঠে দুর্ভিক্ষের—চীনা বিজ্ঞানী বলেন—আমি বুঝতেই পারি না, তোমাদের! চোখের সামনে দেখছি এদেশে গরু, ঘোড়া, ছাগল অফুরন্ত রয়েছে, তবু এখানে লোকে অনাহারে মরে কেন? আমাদের দেশে লোকেরা দরকার পড়লে হিংস্র বন্যজন্তু পর্যন্ত মেরে খেয়ে ফেলে। ফলে শেষ অবধি দাঁড়িয়েছে চীনে তোমাদের দেশের তুলনায় গোধন অনেক কম, সেখানে প্রসূতির দুধ না পেলে সদ্যোজাতদের সয়াবিনের দুধের উপর নির্ভর করতে হয়। অবশ্য প্রোটিন ইত্যাদি বেশ পর্যাপ্ত পরিমাণেই পাওয়া যায়, তবে অবশ্য দরকারী Calcium এতে কম আছে—তা চীনারা মুরগীর ডিমের খোলা গুঁড়িয়ে দুধে মিশিয়ে সে ঘাটতি পূরণ করে। যেদিন চীনা বিজ্ঞানী সয়াবিনের দুধ থেকে ছানা বের করেছিলেন, আমি একটু জেদ ও বড়াই করেই বাড়ীতে রান্না করে খেয়েছিলাম সে ছানা, ফলে সে রাত্রি অনিদ্রা ও অজীর্ণতায় কেটেছিল। তাই চীনা ছেলে-মেয়েরা সর্বভুক মনে হলো। জীবনযাত্রার প্রতিযোগিতায় তাদের সঙ্গে আমাদের ঠোকাঠুকি লাগলে অহিংসাপরায়ণ ভারতীয়দের তারা অনায়াসে হজম করবে, ভয় হলো মনে মনে।

*　　　　*　　　　*

দক্ষিণ চীনে বেরিবেরি রোগ নাকি প্রাচীনকাল থেকেই বাসা বেঁধে স্থিতিশীল। তবে সে দেশের প্রাচীনপন্থী চিকিৎসকেরা এই রোগের জন্যে একটা ফুলের বীজ ব্যবহার করে উপকার পেতেন। Plantagenus জাতির গাছ, তাঁর হলদে ফুল, অযত্নে সর্বত্রই হচ্ছে। চীনা ভাষায় নাম তর্জমা করলে দাঁড়াবে, "গাড়ীর সামনে হলুদ রং"; অর্থাৎ প্রতি গ্রামের প্রান্তরে এই গাছ অজস্র জন্মায়। আমাদের চীনা বিজ্ঞানী নিজে পরীক্ষা করে দেখেছেন, এর মধ্যে সত্য সত্যই Vitamin-B বিদ্যমান রয়েছে। এই ঔষধই এখন বেরিবেরির প্রতিষেধক বলে ভারতেও সর্বত্র চলছে। তা ছাড়া পাতাঝরা গোলাপের বোঁটাতে তিনি দেখেছেন Vitamin-C প্রচুর বর্তমান। ভারতের প্রাচীন প্রথা কবিরাজী মতে চিকিৎসার কথা তুলতে তিনি বললেন, আমাদের দেশেও পুরনো পদ্ধতি অনুসারে চিকিৎসা চলছে। রহস্যচ্ছলে বললেন—অনেক সময় সরকারী হাসপাতালে আরোগ্যের সংখ্যামান যথাসম্ভব উচ্চ ধাপে রাখতে যে সব রোগী আমরা সারাতে পারবো না বুঝি, তাদের অনেককে স্তোকবাক্য বলে বাড়ী পাঠিয়ে দিই। তবে সময় সময় এমনও হয় যে,

কয়েক মাস বা বছর বাদে তাদের মধ্যে কেউ বা আপাতদৃষ্টিতে নীরোগ অবস্থায় চলাফেরা করছে দেখা যায়। আমরা আশ্চর্য হয়ে খবর নিলে দেখা যায়, অনেক সময়েই দেশী বৈদ্যের চিকিৎসায় তারা বেশী সুফল পেয়েছে। এই দেশেও যে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নয়, তাও আমাকে বলতে হলো।

*　　　　*　　　　*

প্রথম প্রথম নবাগত চীনা আগন্তুকের ইংরেজী বুঝতে বেশ বেগ পেতে হচ্ছিল। শেষ অবধি কান তৈরি হলো। আলাপ জমলো—হলো ব্যক্তিগত নানা সুখ-দুঃখের কথা। বন্ধুবর উত্তর চীনের মুকদেন সহরের বাসিন্দা। জাপানীরা দেশ দখল করাতে সহর ছেড়ে চলে এসেছেন। যুদ্ধরত চীন-শক্তির সঙ্গে যোগ দিয়েছেন, সাধ্যমত তার সেবা করছেন। চুং কিং-এ চলে এসেছেন। চীনারা বিজয়ী জাপানের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন। এতে ত্রিশ বছর কেটে গেছে, দেশ ছেড়ে দক্ষিণের পার্বত্য ভূমিতে আশ্রয় নিয়েছেন, তবু আশা দৃঢ় হয়ে আছে মনে—একদিন জাপানীদের তাড়িয়ে মাতৃভূমিতে ফিরে যাবেন।

*　　　　*　　　　*

সপ্তাহখানেক বাদেই বিজ্ঞানী ঢাকা ছাড়লেন—তারপর আর খবর নেই। সে সময় মনে হয়েছিল চীনারা আমাদের নিকট জ্ঞাতি, (হিন্দী-চীনী ভাই ভাই !) দুই জাতিই বিরাট প্রাচীন ঐতিহ্যের অধিকারী ও হয়তো প্রাচীনপন্থী, তবে অগ্রগতিতে চীনারা আমাদের চেয়ে একটু পিছিয়ে রয়েছে। আজ ২৪ বছর বাদে মনে হচ্ছে, সত্যিই চীনা বিজ্ঞানীর প্রাণের আকাঙ্খা পূর্ণ হয়েছে। মুকদেন উদ্ধার হয়েছে। প্রাচীন ঐতিহ্যকে অবহেলা করে দ্রুতগতিতে চলেছে দুর্ধর্ষ এই জাত। প্রাচীন হলেও সে আজ বিদ্রোহী নবীন। সুবিধাবাদী সে, তাই পাতানো ভ্রাতৃ-প্রেমের মোহ কাটিয়েছে। চ্যাং অবশ্য দেশ ছেড়ে এখন ফরমোজায় আশ্রয় নিয়েছেন। প্রেসিডেন্ট মাও চলেছেন বিজয় গর্বে, বৃদ্ধ বয়সে তাঁর উত্তাল তরঙ্গসঙ্কুল নদী সন্তরণে পার হওয়া নবযুগের চীনজাতের দুর্জয় সাহসের প্রতীক।

*　　　　*　　　　*

শত্রুকে অশ্রদ্ধা করলেই বিজয়লক্ষ্মী অঙ্কগত হন না। আমাদের ২৪ বছরের অগ্রগতির ছবি চীনের সঙ্গে তুলনা করে গর্ব করার মত কিছু খুঁজে পাই না।

এর জন্যে ভারতের বিজ্ঞানীরা কতখানি দায়ী ?

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র স্মরণে

প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র হিসাবে আচার্য রায়ের সংস্পর্শে এলাম বাহান্ন বছর আগে। সাবেকী আমলের শেষ এন্‌ট্রান্স পরীক্ষা পাশ করে ভর্তি হই। ১৯০৯ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যাপারে অনেক নতুন নিয়ম চালু হয়েছে। যেমন, প্রথম বছর থেকেই ছাত্রের কর্তব্য দাঁড়াল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সঙ্গে পরিচয় সুরু করা। প্রত্যেক বিষয়ে নির্ধারিত কয়েকটি করণীয় লেবরেটরীতে প্রত্যেককে অভ্যাস করতে হবে।

স্বদেশীর যুগ। ভাল ছেলেরা বেশীর ভাগ বিজ্ঞান পড়তে চাইছে অথচ সব কলেজে ছাত্রদের কাজের সুব্যবস্থা তখনও গড়ে ওঠে নি। তাই নাম-করা ৩-৪-টি কলেজেই বিজ্ঞান বিভাগে ছাত্রদের ভিড়। আবার যাদের উচ্চাভিলাষ, পরে বিজ্ঞানী হবে তারা অনেকেই প্রেসিডেন্সী কলেজে এসেছে, কারণ জগদীশ বোস ও প্রফুল্ল রায়কে প্রত্যহ স্বচক্ষে দেখতে পাবে।

ডাক্তার রায় তখন প্রথম বছর থেকেই ইণ্টারের ছাত্রদের রসায়ন পড়াতেন। পুরনো বাড়ীর দোতলায় উত্তর-পূর্ব কোণে গ্যালারীতে ক্লাস বসতো। সেখানে অনেক সময় অন্য কলেজের ছাত্রেরাও এসে জুটতো ডাঃ রায়ের বক্তৃতা শুনতে। সরল ইংরেজীতে বক্তৃতা, বাগ্মিতার কোন চেষ্টা ছিল না—বরং নানা কথা বলে হাসি-ঠাট্টার মধ্য দিয়ে ডাঃ রায় চাইতেন, রসায়নের মূল কথা যাতে ছাত্রদের মনে গেঁথে যায়।

সে সময়ের হাবভাব ও অঙ্গভঙ্গী, তাঁর কাছে যারা রসায়ন পড়েছে, তাদের চিরকাল মনে থাকবে। আণবিক আকর্ষণ বোঝাতে গিয়ে তিনি পাশের সীতারাম বেয়ারাকে জড়িয়ে ধরলেন—এই প্রকার আরও কত কি। এতে ক্লাশে মাঝে মাঝে হাসির অট্টরোল উঠতো, তাতে তিনিও খুশী হতেন। গল্পচ্ছলে বলে যেতেন মহারথী বিজ্ঞানীদের কথা—লাভসিয়র, ডাল্‌টন, বার্জিলিয়স, পাস্তুর—আবার কখনো কখনো নাগার্জ্জুনের নাম শোনা যেত। ভারতে যারা অ্যালকেমীর চর্চা করতো, সে কথা শুনাতেন ছাত্রদের। পুরনো পুঁথির দু-চারটি শ্লোক

আওড়ালেন, আবার কখনও ইংরেজী সাহিত্য থেকে লম্বা উদ্ধৃতি হলো। এই সব মিলে সেই ২ বছরের ভাষণের স্মৃতি আমার মনের মধ্যে অপূর্ব আকার নিয়ে রয়েছে।

শান্তশিষ্ট সুবোধ বালকের সুনাম কলেজে আমার ছিল না—তাছাড়া গুরুজনের মুখের উপর প্রত্যুত্তর দেবার রোগে সারা জীবন ভুগছি। তাই কোনদিন বিশেষ কোন কারণে, যা আমার এখন মনে নেই—ডাঃ রায়ের মনে হয়েছিল, ক্লাশের বক্তৃতা নিজে যথেষ্ট মনোযোগ দিয়ে শুনছি না এবং নিকটের বন্ধুদেরও চিত্তবিক্ষেপ ঘটিয়েছি। তাতে আদেশ জারী হলো—বক্তৃতার সময় সকলের থেকে পৃথক হয়ে বসতে হবে মঞ্চের রেলিং-এর উপরে—সেখানে উপকরণ বোঝাই ক্লাসের টেবিল, যেখানে গুরুদেব স্বয়ং দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দেন প্রত্যহ। শাস্তির ফল আমার পক্ষে ভালই দাঁড়িয়ে গেল সবদিক থেকে। চোখ খারাপ, তাই কাছ থেকে এখন পরীক্ষাপর্বের প্রত্যেক অঙ্গটি নিখুঁতভাবে দেখতে পেতাম। পিছনের খাসকামরায় আচার্যের অনেক গুরুত্বপূর্ণ গবেষণায় তখন ব্যাপৃত থাকতো যে সব ছাত্রেরা, তাদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ও জমে গেল। নতুন অনেক পরীক্ষার কথা শুনতাম, কার্যবিধি দেখতাম—অবশ্য ক্লাস শেষ হবার পরে।

সত্য বলতে কি, গুরুর বিরাগভাজন হই নি কোন দিন—তাঁর সস্নেহ কিল-চড়-ঘুষি সর্বদাই জুটেছে!

সে সময় কলেজ উঠানের চালাঘরে আমাদের আবশ্যিক পরীক্ষাগুলি করতে হতো। সেখানে এক পাশে পঞ্চমবার্ষিকীর ছেলেরাও কিছুদিন কাজ করেছিলেন—কলেজের অদল-বদল তখনও পুরাপুরি হয় নি। পবিত্রবাবু তখন অমোদের হাতের কাজের তদারক করতেন। চঞ্চল প্রকৃতির ছাত্রদের বশে রাখতে তাঁকে মাঝে মাঝে বেশ বেগ পেতে হতো। যা পড়তাম বা দেখতাম আমরা উপরের ক্লাশে, তার মধ্যে কৌতূহল উদ্দীপক কিছু থাকলে তা স্বহস্তে লেবরেটরীতে করে দেখবার লোভ সংবরণ করা যেতো না অনেক সময়। হয়তো একদিন সোডিয়াম জলে ফেলা হলো, অথচ তাকে জলের মধ্যে ডুবিয়ে রাখবার জন্য সব সতর্কতা পালন করা হলো না। ফলে সশব্দে সোডিয়াম ধাতু ফেটে ছড়িয়ে পড়লো। ঘরের সব বুনসেন বাতি এক সঙ্গে হরিৎ আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। সভয়ে মাষ্টার, বেয়ারা দৌড়ে আসতো, কি না জানি অঘটন ঘটলো! কলেজের বাইরে, দেশে তখন বোমার হাঙ্গামা—শিক্ষকেরা সব সময় নজর রাখতেন—আইন বহির্ভূত

ব্যাপার কলেজে কিছু না ঘটে যায়। সব কথা সবিস্তারে বর্ণনা করে এখন কোন ফল হবে না। জটিল ব্যাপারের তদারকের ভার পড়তো বিচক্ষণ চন্দ্রভূষণ ভাদুড়ীর উপর—তাঁর গম্ভীর মুখে কাঁচা-পাকা প্রচণ্ড মোটা গোঁফ দেখে দুর্দান্ত ছেলেরাও ভয় পেত।

উচ্ছৃঙ্খলদের দৃঢ়হস্তে তিনি সুপথে চালিয়ে নিতেন। কলেজ জীবনের প্রথম দু-বছরই ডাঃ রায়ের কাছে পড়বার সুযোগ পেয়েছি। পরে অনেক সময় তাঁর সান্নিধ্য ও স্নেহ পেলেও তাঁর নিজের ছেলেদের মধ্যে গণ্য হই নি, কোন কালে। রসায়ন-মণ্ডলীতে ছিল আমার ধূমকেতুর মত আসা-যাওয়া—হয়তো বা তাই রসিকতা করতেন আচার্য আমাকে নিয়ে যে, আমি তাঁর বর্ণিত "বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক ও তার অপব্যবহারের" চলমান উজ্জ্বল উদাহরণ।

এম, এস-সি পাশ করি যে বছর, তার আগেই ডাঃ রায় সরকারী কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করে সায়েন্স কলেজের রসায়ন বিভাগের সর্বময় কর্তা হয়েছেন। তিনি চেয়েছিলেন, ৯২, সারকুলার রোডে সারা বাড়ী জুড়ে মাত্র রসায়ন-চর্চা হবে। এদিকে আমরা বেকার, কাজ চাই। শেষ অবধি ছলে, কৌশলে বন্ধুরা সকলে মিলে ডাঃ রায়ের পরিকল্পনা পাল্টে দেওয়া গেল। স্বয়ং স্যার আশুতোষ আমাদের দিকে ঝুঁকলেন। তাঁর অনুরোধে ডাঃ রায় মত বদ্‌লালেন। বাড়ীর উপরের তলায় অঙ্কশাস্ত্রের চর্চা ও উত্তরে পদার্থ-বিজ্ঞান শিক্ষার আয়োজন হলো। স্নাতকোত্তর শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয় নিজের হাতে নিলেন—সব বিষয়েরই। পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক হিসাবে তাই আরও চার বছর (১৯১৭-২১) আচার্য রায়ের সঙ্গে প্রত্যহই দেখা হতো। ডাঃ রায় স্বাস্থ্যের খাতিরে প্রতি সন্ধ্যায় ময়দানে কাটাতেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় মনুমেণ্টের তলায় তাঁর অনুগামীদের প্রকাণ্ড সভা বসতো। তার মধ্যে থাকতেন গণিতের গবেষক, জ্যোতির্বিজ্ঞানের অভিজ্ঞ অনুসন্ধানী, বিখ্যাত শিক্ষাব্রতী বা আইন ব্যবসায়ী, আরও অনেক অনুরাগী ছাত্রেরা। সেখানে ম্যাকেনসেন-যুদ্ধনীতি সমালোচিত হতো, কূট রাজনীতির ব্যাখ্যাও করতো কেউ কেউ। নিজে উপস্থিত থাকবার সৌভাগ্য হয় নি। যাঁরা প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন, তাঁরাই লিখেছেন সে কথা, এই আশা করছি। সেই সময়ে উত্তরবঙ্গে প্লাবনের ফলে দেশব্যাপী দারুণ দুর্দিন উপস্থিত হলো। সেই সঙ্কটত্রাণের জন্যে ডাঃ রায়কে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখেছি। রসায়ন বিভাগের কাজ বন্ধ হলো প্রায়। পুরনো কাপড়ের গাঁটরী ও চাউলের বস্তায় ভর্তি হয়ে উঠলো কলেজের অনেক

ঘর। স্বেচ্ছাসেবক ও সেবিকারা সর্বত্রই অবাধে বিচরণ করতে লাগলেন। সুভাষ বোস এগিয়ে এলেন দেশসেবায় এবং সকলে তাঁকে নেতা বলে আবাহন করলেন। ডাঃ রায় দেশকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন। এই বিপদের মধ্যে তাঁর গবেষণা কিছুকাল স্থগিত রইলো। ছেলেরাও প্রাণপণে খাটলো, তবে তারপর থেকে অধ্যয়নের ক্ষেত্র থেকে আর রাজনীতিকে দূরে রাখা চললো না। ফলে দেশে শিক্ষার সমস্যা অনেক জটিল হয়ে দাঁড়ালো। ডাঃ রায়ের এই সব আন্দোলনে যে সহানুভূতি ছিল—তা তাঁর ছাত্রেরা জানতো। নাম গোপন করে আন্দোলনের মধ্যে তারা অনেক সময় জড়িয়ে পড়তো। খদ্দরের যুগে তিনিও চরকা-কাটা সূতার লুঙ্গী ও কুর্তাবরণ করে নিলেন।

এ ভাবে কাজ করতে তাঁকে বহুদিন সায়েন্স কলেজে দেখা গেল।

ঢাকা যাবার পর মাঝে মাঝে তাঁর দর্শন মিলতো। কলকাতায় এলেই তাঁকে প্রণাম করতে যেতাম তাঁর কর্মশালায়। সে সময় তাঁর কাছে নতুন নতুন ছাত্রদের ভিড়।

মৃত্যুর কিছু পূর্বে তিনি বেশ অপটু হয়ে পড়েন। তখনও দেখা করতে হাজির হয়েছি,—তবে মনে হতো, হয়তো আর চিনতে পারছেন না আচার্যদেব।

১৮৮৯ সাল থেকে ডাঃ রায় শিক্ষাব্রতী ও দেশসেবায় পথিকৃৎ হয়ে জীবন সুরু করেছিলেন। তাঁর স্বাস্থ্য কোন কালেই ভাল ছিল না, রাতে ঘুম হতো না বহু বছর, ছেলেরা ভাবতো লেবরেটরীতে অত্যধিক দূষিত বায়ুর মধ্যে থেকে তাঁর স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙ্গে গেছে। তবু শেষ বয়সেও ছাত্রদের সস্নেহ অনুরোধ রেখে কাজে নিরস্ত হন নি। লেবরেটরী ছিল তাঁর ঘরবাড়ী। অবশেষে প্রদীপের তেল ফুরিয়ে এল। তাঁর তিরোভাব ঘটলো।

হিন্দু যুগে ভারতের রসায়ন-চর্চার ইতিকথা লিখে তিনি সর্বপ্রথম দেশ-বিদেশে যশস্বী হলেন। মারকিউরাস নাইট্রাইটও তাঁর আবিষ্কার। আমরা যখন প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়ি, তখন তাঁর ছাত্রেরা এমাইন নাইট্রাইট নিয়ে গবেষণা করছিলেন। এই সব গবেষণা গুরুত্বপূর্ণ ও জৈবরসায়নে এই ধরণের যৌগিক পদার্থের অস্তিত্ব তাঁরা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে দিয়েছিলেন পদার্থগুলিকে বিশুদ্ধ অবস্থায় কেলাসিত করে। তাতে ডাঃ রায়ের ছাত্রদের খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। দেশে ফিরে আসা অবধি আচার্য রায় নিত্যপ্রয়োজনীয় রাসায়নিক পদার্থ তৈরির ব্যবসায়ে

মন দিয়েছিলেন। বেঙ্গল কেমিক্যালের কারখানা তাঁরই কীর্তি। স্থাপনার প্রথম যুগের ইতিহাস তিনি আত্মচরিতে লিখে গেছেন।

শেষ জীবনেও অনেক মৌলিক গবেষণার পত্তন করেছিলেন সায়েন্স কলেজে। ছাত্র ও সহকর্মীরা ওই পথে বহু আবিষ্কার করে পরে যশ ও সুনাম অর্জন করেছেন।

নিরহঙ্কার, দানবীর, স্নেহপ্রবণ আচার্যদেবের পুণ্যমূর্তি সকল ছাত্রদের স্মৃতিপটে ভাস্বর হয়ে রয়েছে। নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে তিনি চেয়েছিলেন দেশে গবেষণার যুগ আনতে। দেশসেবায় আত্মসুখ বর্জন ও আত্মোৎসর্গের তিনি আদর্শস্বরূপ। তাঁর চেষ্টা যে কতদূর সফল হয়েছে, উত্তরকালের বৈজ্ঞানিক ইতিহাস তার সাক্ষী দেবে। তিনি সংসারের বন্ধনে জড়িয়ে পড়েন নি। ছাত্রেরাই ছিল তাঁর একান্ত আপনার জন। সব ছাত্র-প্রছাত্র, সারা বাংলা, ভারতের সকলে শাশ্বত কাল তাঁর গুণ কীর্তন করবে। তাঁর দিব্যস্মৃতি এই শতবর্ষ পূর্তির দিনে আমরা আন্তরিক শ্রদ্ধার সঙ্গে বরণ করছি। নগণ্য ছাত্রের মধ্যে একজনের এখানে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদিত রইলো।

মাদামকুরী সান্নিধ্যে

১৯২৪ সালের অক্টোবর। ইউরোপে যাবার প্রথম সুযোগ এসেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ২ বছর বিজ্ঞান-চর্চার ছুটি দিয়েছে। পারী উপস্থিত হয়েছি। এখানে আগে থেকেই অনেক বন্ধু ডাঃ মুখার্জ্জী, ডাঃ বাগচী—তাঁরা ধরে বসেছেন, ওইখানে তাঁদের সঙ্গেই থেকে যাই। অল্প কিছুদিন আগে ফোটনের সংখ্যায়ন সংক্রান্ত প্রবন্ধ জার্মান ভাষায় বের হয়েছে। বিজ্ঞানীদের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছে, কারণ আইনস্টাইন স্বয়ং তর্জমা করে প্রশংসার সঙ্গে ছাপিয়েছেন। আমি তখনও ভারতে। ইউরোপে এসেই দেখি সর্বত্র দুয়ার সহজেই খোলে। পারীতে প্রথম পৌঁছলাম। মনে আশা, নতুন কিছু শিখে যাব, যাতে দেশে ফিরে ছাত্রদের কাজে লাগতে পারি।

সহরের দর্শনীয় সবকিছু দেখবার বাসনা। বন্ধুরা পথ দেখাচ্ছেন।

যে মিউনিসিপাল স্কুলে রেডিয়ামের আবিষ্কার হয়েছিল, সেখানে পিয়ের কুরীর শিষ্য লাঁজ-ভ্যাঁ (Lange-vin) অধ্যক্ষতা করছেন। আমার প্রবন্ধ দেখেছেন—সাদরে অভ্যর্থনা করলেন। জিজ্ঞাসা করলেন—কি শিখতে চাই—কত দিন থাকবো ইত্যাদি। এঁরই পরিচয় পত্র নিয়ে গেলাম মাদাম কুরীর কাছে। ইচ্ছা—তাঁর ইনস্টিটিউটে কিছুদিন থেকে তেজস্ক্রিয়তা সম্পর্কিত কাজ নিজ হাতে করতে শিখি। ছোট খাসকামরায় প্রবেশ করবার অনুমতি পেলাম—বর্ষীয়সী মহিমময়ী মহিলা কালো পোষাক পরে রয়েছেন। ছবি দেখেছি আগে—চিনলাম ইনি সেই। তাঁর হাতে পরিচয় পত্র দিলাম। সস্নেহে আপ্যায়ন করলেন—বললেন, যাঁর কাছ থেকে সুপারিশ এনেছ—তাঁর কথা তো ঠেলতে পারি না। তুমি নিশ্চয়ই আমার কাছে কাজ করবার সুযোগ পাবে—অবশ্য এখনই নয়—৩।৪ মাস বাদে। তুমি ভাষাটা একটু দুরস্ত কর, তা না হলে লেবরেটরীতে কাজ করবার বড় অসুবিধা হবে। আর তোমার তো বিশেষ তাড়া নেই!

মাদাম বলছিলেন বিশুদ্ধ ইংরেজীতে অবলীলা-ক্রমে—প্রায় মিনিট দশেক হবে। কোন সুযোগ জুটলো না তখন জানাতে যে, চলনসই ফরাসী তখনই আমি জানি। এই নিয়ে দেশেই ১০ বছর চেষ্টা করেছি। মাদামের নির্দেশ শিরোধার্য করে ফিরলাম। তার পর ৪।৫ মাস পারী সহরে থেকে যথারীতি কিছুদিন রেডিয়াম ইনস্টিটিউটে কাজ করবার সুযোগ পেয়েছিলাম।

অটো হান স্মরণে

সন্ধ্যার রেডিওতে খবর শুনেছি—২৮শে জুলাই সকালে অটো হান মারা গেছেন, জার্মানীতে গোটিংগেন সহরের এক হাসপাতালে।

নিউট্রনের আঘাতে ইউরেনিয়াম পরমাণু দু-টুক্‌রা হয়ে ভেঙ্গে যায়, ১৯৩৯ সালে পাঁচ বছর গবেষণার পর এটি নিঃসংশয়ে প্রমাণ করলেন হান ও ষ্ট্রাস্‌মান। অল্প-পরেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সুরু হলো। জার্মেনীর বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ মিত্রশক্তি। শেষে জার্মেনীর হার হলো। তবে পরমাণু বিভাজনে বোমা তৈরি হলো কিন্তু আমেরিকায়। শেষ অবধি এই বোমা পড়লো জাপানে, নিরস্ত্র নিরীহ লক্ষ লোক প্রাণ হারালো হিরোশিমা ও নাগাসাকীতে। সারা জগতে আতঙ্ক ও বিভীষিকার শিহরণ জাগিয়ে সভ্যতার ইতিহাসে নবযুগের সূচনা হলো ১৯৪৫ সালের অগাষ্ট মাসে।

* * * *

বহুদিন আগের পুরনো কথা মনে পড়েছে। ১৯২৫ সালে জার্মানী পৌঁচেছি। ঢাকা থেকে পারী ঘুরে বার্লিন। এদিকে দেশ থেকে পাঠনো আমার বিজ্ঞানের প্রবন্ধ জার্মান ভাষায় তর্জমা হয়ে সবে ছাপা হয়েছে। বিজ্ঞানীমহলে আলোচনা সুরু হয়েছে সেই নিয়ে। প্রোফেসর আইনস্টাইন ভাল বলেছেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করে তাঁর সুপারিশ পত্রের দৌলতে সর্বত্র সব গবেষণাগারেই প্রবেশের অনুমতি সহজেই মিলছে।

কয়েক বছর আগে কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম সারা দেশের শিল্পপতিদের কাছে অর্থসাহায্য নিয়ে বিজ্ঞানের নানা বিষয়ে গবেষণাকেন্দ্র খুলেছিলেন।

বার্লিনের উপকণ্ঠে ডাহলেম। কাইজার উইলিয়াম-সংস্থা এখানে পাশাপাশি কয়েকটি বিখ্যাত গবেষণাগার স্থাপন করেছিলেন। বিজ্ঞানের ইতিহাসে সেগুলি প্রসিদ্ধ ও দ্রষ্টব্য স্থান হয়ে রয়েছে সব বিজ্ঞানীর কাছে। প্রোফেসর হাবর (Haber) এখানেই নাইট্রোজেন গ্যাসকে অ্যামোনিয়ায় রূপান্তরিত করে ধরে রাখবার উপায় উদ্ভাবন করে চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। জার্মেনীর কারখানায় এইভাবে প্রচুর

অ্যামোনিয়া তৈরি হতো প্রথম মহাযুদ্ধের আগেই। অ্যামোনিয়া থেকে নাইট্রিক অ্যাসিড, তাথেকে নানা বিস্ফোরক দ্রব্য তৈরি হবার সম্ভাবনা। লোকে বলে, এর উপর ভরসা রেখেই প্রবল নৌবহরের মালিক ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে জার্মেনী যুদ্ধে এগিয়েছিল।

হাবরের ভৌতরাসায়নিক কেন্দ্রের পাশে দেখলাম প্রকাণ্ড অট্টালিকা, এখানে তেজষ্ক্রিয়তা ও পরমাণুর বিকিরণ সম্পর্কে নানারূপ পরীক্ষা চালাচ্ছেন হান ও মাইটনার। মাত্র ২ বছরে নবতম বিজ্ঞানের যা কিছু শেখা যায়—পরে তা দেশে প্রচার করা যাবে—এই মৎলবেই নানা দেশ ঘোরা ও বিজ্ঞানের লেবরেটরীতে কাজ করবার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল আমার। তাই কয়েকবার হান ও মাইটনারের পরীক্ষাগারেও ঢুকেছিলাম।

হান তখনই নানা নতুন তেজষ্ক্রিয় মৌলিকের আবিষ্কার করে যশস্বী হয়েছিলেন। আরম্ভ করেছিলেন বিদ্যালয়ে জৈব রসায়ন নিয়ে গবেষণা। এতে পি-এইচ. ডি. ডিগ্রি লাভ করেন। কিছু দিন অধ্যাপকের সহকারী হিসাবে কাজ করে তাঁরই পরামর্শে ইংল্যাণ্ডে যান ১৯০৫ সালে। তখন মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ভাষা শিক্ষা, পরে কোন রাসায়নিক শিল্পসংস্থায় ঢুকবেন। সেই সময় জার্মেনীতে নানাদিকে দ্রুত কলকারখানা গড়ে উঠেছে, তবে ইংল্যাণ্ড তখন আদর্শ ও সব বিষয়ে তার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে চায় জার্মানী। তাই ইংরেজী ভাষা শিক্ষা দরকার বিজ্ঞানীর। হান গিয়েছিলেন র‍্যামজের (Ramsay) কাছে। এদিকে জোয়াকিমস্থালের (Joachimsthal) আকর থেকে ম্যাডাম কুরীর রেডিয়াম আবিষ্কারের ফলে ১৯০৩ সালের নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন কুরী দম্পতী। তাই সব দেশেই রেডিয়াম নিয়ে কাজ চলেছিল তখন।

সিংহলদেশের আকরে পাওয়া থোরিয়ানাইট—তাথেকে নিষ্কাশিত তেজষ্ক্রিয় মিশ্র পদার্থ ছিল র‍্যামজের কাছে। হানের উপর ভার পড়েছিল—তাথেকে বিশুদ্ধ অবস্থায় রেডিয়ামের যৌগিক বের করা। হান কিন্তু পেয়ে গেলেন রেডিয়াম ছাড়া সম্পূর্ণ নতুন একটি তেজষ্ক্রিয় মৌলিকের সন্ধান—রেডিও-থোরিয়াম আবিষ্কার করলেন। এই অপ্রত্যাশিত সাফল্যে হানের জীবনের গতি পরিবর্তিত হলো। শিল্পচর্চার পরিবর্তে তেজষ্ক্রিয়তা নিয়ে গবেষণা করে সারাজীবন কাটাবেন ঠিক করলেন। র‍্যামজের প্রশংসা—সুযশ ও সুপারিশ নিয়ে গেলেন ক্যানাডায় রাদারফোর্ডের কাছে। অল্পবয়স্ক বিজ্ঞানী রাদারফোর্ড নতুন কথা বলে বিস্মিত করেছেন,

তেজস্ক্রিয়তার ধর্ম সম্বন্ধে অনেক নতুন কথা বলেছেন, α-β-γ রশ্মির কথা। এর মধ্যে আবার প্রথম দুটি যে বিদ্যুৎ-আহিত জড় কণার বিকিরণ, চুম্বকের সাহায্যে তাও প্রমাণ করেছেন রাদারফোর্ড। এইখান থেকে উৎসাহ পেয়ে হান ফিরে এলেন দেশে। জার্মানীতে তখনও তেজস্ক্রিয়তা নিয়ে কাজ আরম্ভ হয় নি। তবে বিখ্যাত বিজ্ঞানী এমিল ফিসার বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন রসায়নের প্রধান অধ্যাপক। হানের অসামান্য প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে তাঁর প্রকাণ্ড ইনস্টিটিউটের নীচের ঘরে এক কোণে তাঁরই খোদ সহকারী হিসাবে কাজ দিলেন। এই ঘরে এক সময়ে কাঠের কাজ হতো, কোন আসবাব ছিল না। তবে অল্পে অল্পে গড়ে উঠল সব। হান নিজের হাতে Electroscope তৈরি করলেন, গন্ধকের ছিপির পরিবর্তে অ্যাম্বারের গুলি চালালেন। এই সামান্য পরিবেশ থেকে কিছুদিন বাদেই প্রতিষ্ঠা অর্জন করলেন মেসোথোরিয়াম আবিষ্কার করে—২।৩ বছরের মধ্যে নতুন দুটি মৌলিক তেজস্ক্রিয় উপাদান। এবার বার্লিনে তেজস্ক্রিয়তা শিক্ষার চলন হলো—হান বক্তৃতা দেবার অনুমতি পেলেন, প্রিভাট-ডোৎ-সেণ্ট-বিশ্ববিদ্যালয়ে তরুণ অধ্যাপকের স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠা হলো। ১৯০৭-'০৮ সালেই বিজ্ঞান চর্চায় উপযুক্ত সঙ্গিনী পেয়েছিলেন লিজে মাইটনারকে। একবয়সী ইনি, ভিয়েনার ইহুদী পরিবারে জন্ম। সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রী পেয়ে বার্লিনে এসেছিলেন প্লাঙ্কের কাছে নব্যবিজ্ঞান অধ্যয়ন করতে। তেজস্ক্রিয়তা তাঁকে আকর্ষণ করলো।

আলাপ-পরিচয় হবার পর হানের গবেষণাগারে কাজ করবার মনস্থ করলেন মাইটনার। সে যুগে ১৯০৭-'০৮ সালে জার্মেনীর, বিশেষ করে প্রুশিয়ার সামাজিক আবহাওয়া নিতান্ত প্রাচীন কেতার ছিল। প্রোফেসর ফিসার এই মহিলার সহ-যোগিতায় আপত্তি করলেন না—তবে তাঁর নির্দেশ মত ইনস্টিটিউটের যে সব ঘরে ছাত্রেরা কাজ করছে, সেখানে মিস মাইটনার কখনও যেতেন না। নীচের তলায় অল্পপরিসর ঘরের মধ্যে কাজ সুরু করেছিলেন—তেজস্ক্রিয়তা সম্পর্কে নানা গবেষণা এইখানেই সুরু। মাইটনার ছিলেন অদ্ভুত প্রতিভাশালিনী মহিলা—দু-জনের নিবিড় সাহচর্যে জার্মেনীতে তেজস্ক্রিয়-বিদ্যার প্রতিষ্ঠা হলো। আমি যখন গিয়ে পৌঁচেছি '২৫ সালের শীতকালে, তখন স্বল্প পরিবেশের পরিবর্তে হান ও মাইটনার চলে এসেছেন ডাহলেমের প্রকাণ্ড রাসায়নিক গবেষণা-কেন্দ্রে, দু-জনে মিলে আরও একটি তেজস্ক্রিয় আদিম উপাদান আবিষ্কার করেছেন—প্রোটো-অ্যাক্টীনিয়াম। হান পরিহাস করে বলতেন, তিনি একজন কিমিয়াবিদ মাত্র, জগৎ তো এখন পদার্থ-

বিজ্ঞানীর আয়ত্তে। প্লাঙ্ক ও আইনস্টাইন জার্মেনীর গগনে তখন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক, তাছাড়া লাউয়ে, হার্ৎসগ, হাবর। ডাহলেম তখন বিজ্ঞানতীর্থ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার ঝোঁক পড়লো, X-রশ্মির সাহায্যে কেলাসিত জড়ের গঠন-বৈচিত্র্য কি ভাবে উদ্ঘাটিত হচ্ছে, তারই রহস্য আয়ত্ত করবো। জুটে গেলাম তাই ডাহলেমের অন্য বিজ্ঞানাগারে—সেখানে পোলানির সঙ্গে সাহচর্য রেখে X-রশ্মি দিয়ে গঠন বিশ্লেষণের কাজ চলছিল। তাই প্রত্যহ ডাহলেমে যেতাম, মাঝে মাঝে মাইটনার-হানের সঙ্গে সাক্ষাৎ হতো। বিদেশী ভারতীয় তখন সকলের পরিচিত, হানের ছোট ছেলের সঙ্গে বোসখুড়োর পরিচয় করে দিয়েছেন মাইটনার।

* * * *

জনাব জাকির হোসেন আজকে ভারতের রাষ্ট্রপতি। সেই সময়ে ডক্টরেট উপাধি পেয়ে তিনি বার্লিন ছাড়বার উদ্যোগ করছেন—দেশে ফিরে আসবেন। ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রীরা মিলে বিদায়ভোজের আয়োজন করেছে Unter-den Linden-এর বিখ্যাত এক ভোজনাগারে। বহু বিখ্যাত অধ্যাপক ও রাজনীতিবিদেরা এসেছিলেন —তাঁদের মধ্যে হান, মাইটনার, হাবর, ল্যুডরস আরও অনেক—বীরেন চট্টোপাধ্যায়, তারক দাস ও আরও কত ভারতীয়ের নাম করবো! অনেকেই আর ইহজগতে নেই —তবে সেই সময়ের তোলা ছবি একখানা দেখে পুরনো অনেক কথা মনে পড়ে।

* * * *

দেশে ফিরেছি ১৯২৬-এর শেষ দিকে। পেলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের কাজ। ওদেশে শেখা X-ray দিয়ে বিশ্লেষণের কাজ চালু করেছি ঢাকায়। সেই সময় থেকে এই বিশেষ বিদ্যার চল হলো ভারতে। এখন নানা প্রদেশেও ওই বিশেষভাবে কেলাসিত নানা যৌগিকের গঠন-বৈচিত্র্য বিশ্লেষণ চলেছে। এই বিষয়ে ভারতীয়রা কিছু সাফল্যও অর্জন করেছে।

* * * *

দেশে ফিরে এসে নিজের কাজ ও বিজ্ঞানের খবর পাই দেশ-বিদেশের। ১৯৩৩ সালে জার্মেনীতে নাৎসী-অভ্যুত্থান, সুরু হলো ইহুদীদের উপর নানা অত্যাচার। হিনডেন্‌বার্গ প্রেসিডেণ্ট, হিটলার দেশনায়ক। বিকট আর্যামি সুরু হয়ে গেল। আমার জানাশোনা বহু লব্ধপ্রতিষ্ঠ বিজ্ঞানী, সেমেটিক-রক্তের মিশ্রণ ধমনীতে আছে বলে স্বদেশ ছেড়ে গেলেন। ফ্রাঙ্ক, আইনস্টাইন, বর্ন্, এ-ভাল্‌ড, ৎ-সিলার, মার্ক— এঁদের সকলের সঙ্গে বেশ হৃদ্যতা ছিল আমার। আর্যামি জার্মেনীকে পেয়ে বসলো।

সঙ্গে সঙ্গে সারা জার্মেনীতে কালো কামিজপরা স্বেচ্ছাসেবীরা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে সারা জায়গার শাসন যন্ত্র কেড়ে নিয়ে আঁকড়ে রইলেন। এই ঢেউ জার্মেনী ছাপিয়ে গেল—১৯৩৮ সালে অস্ট্রিয়াও এলো নাৎসীদের দখলে। বিদেশ থেকে চিঠিপত্র আসা বন্ধ হয়ে গেল। ইউরোপের খবর সব রহস্যময় যবনিকার আড়ালে ঢাকা পড়লো। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সুরু হয়ে গেল।

* * * *

হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীতে রুদ্রের তাণ্ডবলীলা চললো কিছু কাল। বাংলা দেশেও এর ঢেউ লেগেছিল। পরে এলো শান্তি। ১৯৪৫ সালে ঢাকা ছেড়ে চলে এসেছি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ভারত স্বাধীন হয়েছে। তার পরে ১৯৫১ সালে ইউনেস্কোর আমন্ত্রণে প্রথম ইউরোপ যাবার সুযোগ ঘটলো।

সেবার পারী ও ইংল্যাণ্ড ঘুরে ফিরে এলাম, সুখ-দুঃখ মেশানো নানা স্মৃতি নিয়ে। জার্মেনী যাওয়া ঘটে উঠলো না। পরের বছর ফরাসী দেশের কেন্দ্রীয় গবেষণা-সংস্থার কল্যাণে আবার ইউরোপে যাবার সুযোগ ঘটলো। পারীর কাজ সেরে বেরিয়ে পড়লাম দেশ ভ্রমণে—জার্মেনীর হাইডেলবার্গ সহরে পৌঁছলাম। সেখানে প্রোফেসর বো-তে-র কাছে মহাজাগতিক রশ্মি নিয়ে কাজ করতেন শ্রীশ্যামাদাস। ১৯২৫ সালে বো-তের সঙ্গে প্রথম পরিচয়। তখন তিনি প্রোফেসর গাইগারের সঙ্গে বার্লিনে Reichs-anstalt-এ কাজ করতেন। সেই প্রথম পরিচয় পরে বন্ধুতে দাঁড়িয়েছিল। দ্বিতীয় যুদ্ধের প্রাক্কালে কলকাতায় সায়েন্স কংগ্রেসে বো-তে (Bothe) জার্মেনী থেকে আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন। একসঙ্গে কয়েক দিন ঘুরে দ্রষ্টব্য অনেক স্থানের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম। ১৯৫২ সালে জার্মেনীর অনেক পরিবর্তন হয়েছে—বো-তে হাইডেলবার্গে ফিজিক্সের দুটি গবেষণা-কেন্দ্রের পরিচালনা করছেন। গবেষণাগারে কিন্তু অধ্যাপক বো-তের সাক্ষাৎ মিললো না। সম্প্রতি বো-তের স্ত্রী বিয়োগ হয়েছে। কিছুদিন সব কাজ থেকে অবসর নিয়ে বিশ্রাম করছেন দূরে বাভেরিয়ার ছোট এক গ্রামে। তবে তাঁর দু-জন যোগ্য সহকর্মী ডাঃ হানসেন ও ডাঃ হাঙ্কেল সঙ্গে করে ঘুরে সব দেখালেন। শেষে প্রস্তাব করলেন, আমি যদি সত্যই বো-তের সঙ্গে দেখা করতে চাই, তবে সংস্থার গাড়ীতে আমরা সকলেই বাভেরিয়ায় যেতে পারি। তাই হলো, প্রোফেসর হানসেন হলেন চালক। আমরা অর্থাৎ শ্যামাদাস, ৺বাসুদেব (ইনি তখন মারবুর্গে কাজ করছিলেন, আমার পৌঁছানোর খবর পেয়ে সঙ্গী হলেন এই যাত্রায়) আমি ও হানসেনের এক বান্ধবী। দূর পাল্লা—

শান-বাঁধানো সিগফ্রিড সড়ক দিয়ে Black Forest-এর ভিতর দিয়ে নানা সহর দেখতে দেখতে সন্ধ্যায় পৌঁছলাম কিম্ সে-র ধারে বাভেরিয়ার ছোট্ট একটি গ্রামে। বন্ধু খুব খুশি—ওখানে একটি ছোট হোটেলে রাত্রিবাস হলো। পরের দিন পাহাড়ে রাস্তার ভিতর দিয়ে বন্ধুর সঙ্গে ঘুরে বেড়ালাম অনেক ঘণ্টা। হিটলারের বেরেক্‌স্‌ গার্ডেন তখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। পার্বত্য ছোট সড়কে নানাভাবে মিত্রশক্তির অভিযানকে মরিয়া হয়ে বাধা দিতে চেয়েছিল নাৎসীরা। মাঝে মাঝে সাঁকো, গিরিপথ উড়িয়ে দিয়েছিল, তার চিহ্ন এখনো বর্তমান। দেখলাম সর্বত্র এখনো জার্মান দেশবাসীরা অবাধে যাতায়াত করতে পারেন না—এদিকে জিপে করে মনের আনন্দে আমেরিকানরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। ফিরে এলাম পূর্বের গ্রামে। রাত্রিশেষে বন্ধুর সৌজন্যে আবার সংস্থার মোটর গাড়ী চড়ে বেড়াবার অনুমতি পেলাম। ফিরে এসে হাইডেলবার্গ হয়ে আবার পৌঁছলাম গোটিংগেন সহরে। পুরনো গোটিংগেনের উপর মিত্রশক্তি বোমা বর্ষণ করে নি। সব অট্টালিকাই অটুট রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানশালায় হাজির হলাম। ১৯২৬ সালের এপ্রিল মাসে এসেছিলাম প্রথমে এই সহরে। মাক্‌স্‌ বর্ণ নতুন কোয়াণ্টাম বিজ্ঞান নিয়ে নিজের গবেষণার উপরে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। ফ্রাঙ্ক চালাচ্ছিলেন ইলেকট্রন নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা। জরডান হাইসেনবার্গ তখন তরুণ যুবা, তাঁদের অভিনব প্রচারে সারা জগৎকে চমৎকৃত করেছেন।

* * * *

১৯৫২ সালে প্রোফেসর পোলের পুরনো লেবরেটরীতে কাজ চলছে, ঘুরে দেখলাম আগের মত সর্বত্রই অবাধে প্রবেশ করতে পারছি। হাইসেনবার্গ এখনো বক্তৃতা দিচ্ছেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ে।

* * * *

কাইজার উইলিয়াম সংস্থার নাম আজ মাক্‌স্‌ প্লাঙ্ক সংস্থায় পরিণত হয়েছে প্রথম যুদ্ধের পরে কাইজার চলে গেলেন। সংস্থাটি টিঁকে ছিল। আমরা গিয়ে ডাহলেমে কাইজার উইলিয়াম সংস্থার পরীক্ষাগারে কাজ করেছি। সেবার হাবর অনেক চেষ্টা করে সংস্থাটিকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন—নামেরও বদল হয় নি। নাৎসীদের দৌরাত্ম্যে হাবরকে ডিরেক্টরের কাছে ইস্তফা দিয়ে দেশ ছেড়ে যেতে হয়েছিল। ভগ্ন-হৃদয়ে হাবর মারা যান ১৯৩৪ সালে, সুইজারল্যাণ্ডে। তাঁর শোক-সভায় সরকারী কর্মচারীদের যাওয়া নিষেধ করে দিয়েছিলেন নাৎসী শিক্ষামন্ত্রী।

প্রোফেসর লাউয়ে পুরনো বন্ধুর অন্তিমে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়েছিলেন বলে তাঁকে ভর্ৎসনা শুনতে হয়েছিল। এবার যুদ্ধের শেষে নামের বদল হয়েছে—কাইজারের পরিবর্তে সর্বত্র মাক্স্ প্লাঙ্ক। সংস্থাটির আর্থিক অবস্থা শোচনীয়, তবু টিঁকে আছে এটি। গোটিংগেনে সংস্থার প্রেসিডেন্ট অটো হান। মাক্স্ প্লাঙ্ক সংস্থার গাড়ীতেই চলাফেরা করছিলাম বো-তের সৌজন্যে, তবু ফটকের সামনে দাঁড়াতে হলো, দ্বাররক্ষীর ঘর থেকে টেলিফোনে প্রবেশের অনুমতি নিতে হলো। দোতলায় উঠে গেলাম প্রেসিডেন্টের কামরায়। ছোট ঘর, আসবাব প্রায় নেই বললেই চলে। একদিকে প্রেসিডেন্টের সেক্রেটারিয়েট টেবিল, সামনে দেয়াল-জোড়া প্রতিকৃতি—মাক্স্ প্লাঙ্ক অস্থিচর্মসার নব্বুই বছরের বৃদ্ধ। এঁরই কাছে কাছে ঘোরবার সুযোগ হয়েছিল '২৬ সালে ডাহলেমে। সাদরে আপ্যায়িত করলেন প্রেসিডেন্ট হান। পুরনো দিনের সব কথা—হঠাৎ সামনের টেবিলে অ্যালবাম খুলে—বললেন—তোমার আমার সাধের ডাহলেমের যুদ্ধের মধ্যে কি শোচনী অবস্থা। এই রসায়নাগারে হান নিজের গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছিলেন পরমাণু বিভাজনের সম্পর্কে, যুদ্ধের মধ্যেও। ১৯৪৪ সালে একদিন শত্রুর বোমার আঘাতে সব ভেঙ্গে-চুরে শেষ হয়ে গেল, হান সে শোক ভুলতে পারেন নি। জিজ্ঞাসা করলাম, তাঁর একমাত্র পুত্রের কথা, ডাহলেমে চলতে-ফিরতে দেখেছি, তখন হয়তো ৪।৫ বছরের বালক। ছেলের তখনও ডিগ্রী নেওয়া হয় নি। অনেক বাধাবিপত্তির মধ্যে বেচারীকে পড়শুনো চালাতে হয়েছিল। ১৯৪৫ সালে পরমাণু-বিভাজনে সফল হয়েছিলেন বলে হান নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। দেয়ালে একখানি ছোট ছবি, হান বিজয়মাল্যে ভূষিত হয়ে ফিরেছেন, প্লাঙ্ক তাঁকে অভ্যর্থনা করছেন। ছবিটি আমার ভাল লেগেছিল। অনেক অনুরোধের পর তার একটি ফটো-কপি সংগ্রহ করে নিয়ে এসেছি।

হানের কাছে বিদায় নিয়ে প্রোফেসর হাইসেনবার্গের সঙ্গে দেখা হলো। আগের থেকে জানাশোনা ছিল, বললেন এখানে কি আর দেখবে—শুধু খালি দেয়াল আর টেবিল। জায়গা পেয়েছি বটে, তবে এখনো যন্ত্রপাতি সংগ্রহ কিছু হয় নি। সেখানে যুবক বিজ্ঞানী আইগেন ও ভিকের সঙ্গে দেখা হলো। সন্ধ্যায় বিজ্ঞানের আলোচনায় ছিল আমার নিমন্ত্রণ। উপস্থিত হয়ে দেখি, নিরাভরণ এক হলে ছেলেরাই কোনক্রমে একটা জেনারেটর চালিয়ে বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদন করে বাতি জ্বালিয়েছে। যবনিকার উপর ছোট ছোট রেখাচিত্র। বিজ্ঞানের নতুন কাজের আলোচনা চলছে। তার পরের দিন জার্মেনী ছেড়ে পারীতে ফিরে এলাম।

*　　　　*　　　　*

১৯৩৪ সাল থেকে হানের পাঁচ বছরের কঠোর পরিশ্রমের ফলে নিউট্রনের আঘাতে যে ইউরেনিয়াম ধাতু থেকে বেরিয়াম উৎপন্ন হয়েছে, তা প্রমাণিত হলো। ১৯৩৮ সালের ডিসেম্বরের শেষে কাজ শেষ। তার মাত্র কয়েক মাস আগে মাইট-নারকে দেশ ছেড়ে চলে যেতে হয়েছে। অস্ট্রিয়া নাৎসী-কবলিত হবার পর তাঁকে আর নাৎসীদের হাত থেকে বাঁচানোর কোন রাস্তা ছিল না।

তাড়াতাড়ি হানের পরীক্ষার বিবরণী প্রকাশিত হলো। ইতিমধ্যেই হান নানা বাধা সত্ত্বেও এতদিনের সহকর্মী মাইটনারকে জানিয়েছিলেন পরীক্ষার ফল। মাইটনারই প্রথমে সন্তোষজনকভাবে সুযুক্তি দিয়ে দেখালেন, এতে ইউরেনিয়াম দু-ভাগে ভেঙ্গে যাচ্ছে। রাসায়নিক ভাষায় বলতে নিউট্রন+ইউরেনিয়াম=বেরিয়াম+ক্রিপ্টন।

*　　　　*　　　　*

সে কয় বছরের ইতিহাস, যা অটো হানের নামকে বিজ্ঞান-জগতে অমর করে রেখেছে, তা জানতে অটো হানের লেখা আত্মচরিত পড়তে হয়। রেডিও-থোরিয়াম থেকে ইউরেনিয়াম বিভাজন—ইংরেজীতে অনূদিত হয়েছে।

*　　　　*　　　　*

সুযোগ্য হস্তে গবেষণা পরিচালনা করেছিলেন হান আশি বছর বয়স পর্যন্ত। পরে সম্মানিত নায়কের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন শেষদিন অবধি। অল্প কয়েক দিন আগে সংস্থার গেটের সামনে মোটর থেকে নামতে গিয়ে পড়ে যান। অল্প আঘাত পেয়েছিলেন শিরদাঁড়ায় ও পিঠে, ডাক্তারেরা ভেবেছিলেন বেশী কিছু নয়। শেষে আবার বিপদ ঘনিয়ে এলো। কয়দিন অঘোরে কাটিয়ে ২৮শে জুলাই সকালে মারা গেলেন। সারা দেশ শোকে মুহ্যমান হয়ে রয়েছে। স্ত্রী এখনো রয়েছেন, তবে দুঃখের বিষয়—একমাত্র ছেলে ১৯৬১ সালে দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছে। নাতি আছে শুনেছি, ভগবান তাকে বাঁচিয়ে রাখুন।

কুমার হারীতকৃষ্ণ দেব

কুমার হারীতকৃষ্ণ দেব অকস্মাৎ পরলোক গমন করেছেন, শুক্রবার ২২ শে জুলাই ১৯৬৬। বিজ্ঞান পরিষদের প্রতিষ্ঠার পর থেকে তাঁর কাছে আমরা বরাবর প্রেরণা ও সহানুভূতি পেয়ে এসেছি। বিজ্ঞান প্রচারের নানা সভায়, পরিষদের আয়োজিত নানা উৎসবে এত বৎসর তাঁকে সব সময় কাছে পেয়েছি—এতদিন। বিজ্ঞান কলেজের বহু কর্মীদের সঙ্গে তাঁর আন্তরিক প্রীতির সম্পর্ক ছিল। তাঁর মহাপ্রয়াণে সকলে ভাবছি—একজন অকৃত্রিম সুহৃদকে হারালাম। হারীতকৃষ্ণ জন্মেছিলেন শোভাবাজারের প্রসিদ্ধ রাজপরিবারে—জানুয়ারী, ১৮৯৪ সালে।

প্রাচীন কালের সমৃদ্ধি ও সমারোহ অনেকাংশে অন্তর্হিত হলেও তাঁদের পৈত্রিক ভবনে সাহিত্য ও সঙ্গীতচর্চার আবহাওয়া তখনও বর্তমান ছিল। পিতামহ উপেন্দ্রকৃষ্ণ বাংলায় সামাজিক উপন্যাস লিখেছিলেন, এক সময়ে তার খুব আদর হয়েছিল। শৈশবে হারীতকৃষ্ণ, অন্যান্য নাতি-নাতনীদের সঙ্গে তাঁর কাছে অনেক রঙ্গরসের কাহিনী শুনতেন। হারীতের শ্লেষ ও কৌতুকপ্রবণতা হয়তো এইভাবে শিশুকাল থেকেই লালিত ও পুষ্ট হয়েছিল। পিতা অসীমকৃষ্ণের লাইব্রেরীতে নানাদেশের প্রাচীন ইতিহাসের সংগ্রহ ছিল। এই সব বই তিনি আগ্রহের সঙ্গে পড়তেন। গ্রীস, রোম, আরব, ভারত, ঈজিপ্ট সম্পর্কে তাঁর নতুন ধরণের নানা অভিমত ছিল। নিজের বৈঠকখানায় বন্ধুদের কাছে মাঝে মাঝে হাজির করতেন সে সব—তবে অভিজ্ঞ মহলে প্রতিষ্ঠা পেতে যে প্রকারের অনুসন্ধান বা পরিশ্রম করার দরকার, তাতে তাঁর বিশেষ রুচি ছিল না। শোভাবাজারের রাজবাটীতে বৈঠকী নৃত্য-গীত, সাহিত্য, নাটক আলোচনার ঐতিহ্য বহুদিনের। অসীমকৃষ্ণ গানবাজনার মধ্যেই নিবিড় আমোদ পেতেন—নিজে হারমনিয়াম বাজাতেন অপূর্ব সুন্দর—অনেক বিখ্যাত সুরকার, গায়কেরা তাঁর কাছে যাওয়া-আসা করতো—মাঝে মাঝে বাড়ীতে বসতো বিখ্যাত গায়ক বাদকের জলসা।

হারীতকৃষ্ণ এই আবহাওয়ার মধ্যে মানুষ হয়েছিলেন। নিজে ভাল গাইতে পারতেন—যত্ন করে শিখেছিলেন টপ্পা, ঠুংরী ও রবীন্দ্র সঙ্গীত। সমকালীনদের মধ্যে সমজদার বলে তাঁর সুখ্যাতি ছিল।

প্রথম কয়েক বৎসর স্কটিশ চার্চ কলেজে পড়াশুনা করে শেষে প্রেসিডেন্সী থেকে ইংরেজীতে এম. এ পাশ করেন। আইন শিক্ষা সুরু করেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেই সময়ে প্রমথ চৌধুরী মশায় ল' ক্লাসে অধ্যাপনা করতেন—হারীত ছিলেন তাঁর এক ছাত্র।

চৌধুরীর বীরবলী প্রবন্ধগুলি বের হয়ে গিয়েছে; চলিত বনাম সাধুভাষা আন্দোলনে দেশে তখন ভরা জোয়ার। "সবুজপত্র" বের হচ্ছে। চৌধুরী মশায়ের ব্রাইট স্ট্রীটের বাড়ীতে প্রতি হপ্তায় বসতো সাহিত্যের আসর। রবীন্দ্রনাথকে কখনও কখনও সেখানে দেখা যেত, সঙ্গীতের আসরে দিলীপ রায় প্রমুখ গানবাজনা করতেন। পরিণত বয়স্ক যশস্বী কৃতবিদ্যদের সঙ্গে অনেক নবীনদেরও সেখানে যাওয়া আসা ছিল। উত্তরকালে তাঁরা নানাভাবে যশস্বী হয়েছেন। নবীনদের মধ্যে ধূর্জটিপ্রসাদ তখন প্রমথ চৌধুরীর বিশেষ স্নেহের পাত্র—তাঁর সঙ্গী হারীতকৃষ্ণও সেখানে যাওয়া-আসা করতেন। চৌধুরী মশায় চাইতেন নবীনেরা কলম ধরুক, বাংলাভাষায় ইতিহাস-বিজ্ঞান-কাব্য-দর্শন সব বিষয়েই নিজেদের স্বকীয় মতবাদ—প্রবন্ধ লেখাতে ব্যক্ত করুক। এইভাবে তাঁরই উৎসাহে হারীত এবং আরও অনেকের বাংলা লেখায় হাতেখড়ি হয়।

প্রায় সেই সময়ে প্রাচীন ভারতের ও বিশ্বের ইতিহাস আলোচনার জন্যে—কলকাতায় নতুন স্নাতকোত্তর ক্লাস প্রথম খোলা হলো। দেবদত্ত ভাণ্ডারকর এলেন কারমাইকেল প্রফেসর হয়ে। প্রথম দিকের ছাত্র হিসাবে প্রবোধ বাগচী, ননী মজুমদার-রা তখন অধ্যয়ন সুরু করেছেন। হারীতকৃষ্ণ তাদের সঙ্গে গিয়ে জুটলেন। পিতার নিত্যসঙ্গী হিসাবে হারীতকৃষ্ণ ইতিমধ্যেই প্রাচীন কালের ইতিহাস পড়তে আরম্ভ করেছিলেন। এইবার অনুসন্ধানীদের সাহচর্যে গবেষণার কাজে নেমে পড়লেন। ডিগ্রী তাঁর লক্ষ্য নয়—রাখাল বন্দ্যোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ভাণ্ডারকর সকলেরই কাছে যাচ্ছেন—নতুন কথা শুনতে ও পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য আয়ত্ত করতে। আইন পড়া বন্ধ হলো। পিতার নানা কৌতুহলোদ্দীপক মতবৈশিষ্ট্যের ঐতিহাসিক ভিত্তি খোঁজবার আগ্রহ জাগলো। সুরু হলো সংস্কৃত—পালি—ভাষাতত্ত্ব-শিলালেখ—তাম্রশাসনের আলোচনা—পুরনো মুদ্রার পরিচিতি ইত্যাদি। নিজের পরিশ্রম ও সাধনায় একাজে সুনাম ও সিদ্ধি অর্জন করলেন। বিক্রমাদিত্য, অশোক, উদয়নের বিষয় নতুন কথা বলেছেন। ভারতে প্রাচীন পদ্ধতিতে বর্ষগণনার আলোচনা করেছেন। জ্যোতিষের আলোচনা করেছেন বা শক-যবনের কথা অথবা

বেদে উল্লিখিত পাণি-কপর্দী ও পৌলস্ত্যের আন্তর্জাতিক স্বরূপ নির্ধারনের প্রয়াস দেখা যাচ্ছে।

সারা জীবন এই সব নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন। শেষের কয় বৎসর ইচ্ছা হয়েছিল নিজের কতকগুলি মতবাদকে দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করবেন—এর জন্যে আবার নতুন উদ্যমে অধ্যয়ন ও আলোচনা সুরু করেছিলেন। তবে নানা ঝঞ্ঝাট ও অশান্তির দরুণ কাজটি শেষ করে যেতে পারেন নি—এটি বড়ই দুঃখের কথা। কিশোর বয়স থেকেই সুদর্শনকান্তি—সৌজন্য, ভদ্র ব্যবহার, মধুর কণ্ঠস্বর ও রঙ্গ-রস প্রবণতা—বন্ধু মহলে তাঁকে একান্ত প্রিয়জন করেছিল। সব সমাজেই তিনি অন্তরঙ্গের মত মিশে যেতে পারতেন। তাঁকে দেখা যেত হেদুয়ার সাঁতারের ক্লাবে—ইউনিভারসিটির নাট্য আয়োজনে, বঙ্গ সংস্কৃতির সাহিত্য ও সঙ্গীতের আসরে—কিশোর কল্যাণ পরিষদে ও আরও কত জায়গায়। কাতর বন্ধুরা আজ তাঁর মিষ্ট-স্বভাব, সহজ সহধর্মিতা, তাঁর হারমনিয়াম বাজনা—সঙ্গীত ও কৌতুক-কথা মনে করছে।

প্রথম বয়সে বিজ্ঞান, গণিত, ন্যায়শাস্ত্র নিয়ে অধ্যয়ন সুরু করেছিলেন—পরে "সবুজপত্র" ও "পরিচয়" গোষ্ঠীর সম্পর্কে এসে বুঝেছিলেন মাতৃভাষায় বিজ্ঞান প্রচারের বিপুল প্রয়োজনীয়তা। তাই সব সময় তাঁকে আমরা বিজ্ঞান সভায় সহৃদয় বন্ধুভাবে পেয়ে এসেছি।

অকৃতদার, সারাজীবন সরস্বতীর সেবা করেছেন তিনি, পয়সাকড়ির জন্যে নিজের আদর্শকে কখনও ক্ষুন্ন করেন নি। সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ অবস্থায় ২২শে জুলাই শোভাবাজার পৈত্রিক ভবনের বারান্দায়—তাঁর শেষ নিঃশ্বাস পড়েছে।

প্রবোধচন্দ্র বাগচী

ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচীর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় বিদেশে প্যারিসে, ১৯২৪ সালে।

দেশে থাকতেই তাঁর নামের সঙ্গে অবশ্য পরিচয় ছিল। কৃতীছাত্র হিসাবে তাঁর সুনাম শুনেছি অনেকের মুখে। কিন্তু সাক্ষাৎ পরিচয় হল বিদেশে। সেই পরিচয় অল্পদিনের মধ্যেই সখ্যে দাঁড়িয়ে গেল। শেষদিন পর্যন্ত সেই সখ্য নিবিড় ছিল।

১৯২৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে আমি প্রথম বিদেশ যাত্রা করি। ভারতের বাইরে যাওয়া সেই আমার প্রথম। বিদেশে গিয়ে কোথায় থাকব, কার সঙ্গে কিভাবে পরিচয় করব, সেদেশের আচার আচরণের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেব কিভাবে, এই রকম নানা প্রশ্ন মনে জেগেছিল। আর, এইসব প্রশ্ন সঙ্গে নিয়েই আমি যাত্রা করি। প্যারিসে পদার্পণ করেই আমার সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসা যেন হয়ে গেল। আমি সহায় পেয়ে গেলাম, বন্ধু পেয়ে গেলাম। ডক্টর বাগচীর সঙ্গে আমার পরিচয় হল। কিছুদিন আগে থেকে তিনি প্যারিসে ছিলেন। ডক্টর বাগচী তখনও ডক্টর নন। অধ্যাপক সিলভাঁ লেভির অধীনে তখন তিনি গবেষক ছাত্র। তাঁর বয়স তখন পঁচিশ ছাব্বিশ, আমার বয়স ঊনত্রিশ-ত্রিশ। প্রায় সমবয়সী একজন সুহৃদ পেয়ে বিদেশকে আর বিদেশ বলে মনে হল না।

ইণ্ডিয়ান স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন নামে প্যারিসে ভারতীয় ছাত্রদের একটি আড্ডা ছিল। ডক্টর বাগচী ছিলেন এর সেক্রেটারী। দেশে যে সব ছাত্র বিপ্লবী বলে মার্কামারা ছিল, সে আমলের ব্রিটিশ সরকার যাদের সুনজরে দেখতেন না, এই অ্যাসোসিয়েশন ছিল তাদের আশ্রয়। ইউরোপের বিভিন্ন শহরে এর শাখা ছিল, প্যারিসে ছিল প্রধান ঘাঁটি, 17 Rue du sommerard ছিল তার ঠিকানা। এই বাড়ীতে আমরা একত্র থাকতাম। একত্রে খাওয়াদাওয়া করতাম। তাই, অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্বটা পাকাপাকি হয়ে গেল।

ডক্টর বাগচী প্রফেসর লেভির খুব প্রিয় ছাত্র ছিলেন। প্রফেসর ও মাদাম লেভী খুব স্নেহ করতেন। ডক্টর বাগচীকে, বলতেন, 'আমার ছেলে'।

ইণ্ডোলজি নিয়ে তাঁদের গভীর গবেষণা ও অধ্যয়ন চলত। আমরা দূর থেকে দেখতাম। কেননা, ওই বিষয় সম্বন্ধে আমার আগ্রহ থাকলেও জ্ঞান ছিল না। আমার বিষয় ছিল বিজ্ঞান—ফিজিক্স।

বিজ্ঞানই আমার সাবজেকট। বৈজ্ঞানিকদের উপর টান হওয়া তাই আমার

পক্ষে স্বাভাবিক। যে সব বৈজ্ঞানিকের তখন খুব নাম ও প্রতিষ্ঠা, তাঁদের সঙ্গে পরিচিত হবার আমার খুব আগ্রহ হত। কিন্তু হঠাৎ তো কারো কাছে গিয়ে হাজির হওয়া যায় না।

এই সময় ডক্টর বাগচীর সহায়তা আমি পাই। তিনি প্রফেসর লেভির সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেন। লেভির কাছ থেকে পরিচয় পত্র নিয়ে আমি মাদাম কুরীর সঙ্গে দেখা করি। এরপর জার্মানীতে গিয়ে আইনস্টাইনের সঙ্গে দেখা হয়। অবশ্য আইনস্টাইনের সঙ্গে আমার পত্রযোগে পরিচয় ছিল দেশে থাকতেই।

ডক্টর বাগচীর আগেই আমি দেশে ফিরে আসি। আমি আসার সময় আমার অনেকগুলি বই ফেলে এসেছিলাম, ডক্টর বাগচী সঙ্গে করে নিয়ে আসেন।

দেশে এসে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে অনেকবার। যতই তাঁকে দেখেছি, কাজে তাঁর নিষ্ঠা দেখে ততই মুগ্ধ হতে হয়েছে।

তারপর আমি ঢাকায় চলে যাই। মাঝে মাঝে যখন কলকাতায় আসতাম, তখন তাঁর সঙ্গে দেখা হত। বৌদ্ধশাস্ত্র, ভারতের যোগশাস্ত্র ও তন্ত্রশাস্ত্রের গূঢ় রহস্য সম্বন্ধে গভীর জ্ঞানের পরিচয় পেয়েছি। তাঁর সঙ্গে আলাপে বুঝেছি, এ সব বিষয় সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ছিল খুবই নিবিড়। বিভিন্ন বই লিখে তিনি তাঁর গবেষণা লব্ধ যে সব জ্ঞান বিতরণ করে গিয়েছেন, তার চিরস্থায়ী মূল্য আছে।

অতি সহজ, কোমল ও উদার প্রকৃতির মানুষ ছিলেন তিনি। বিদেশে গিয়ে যে সব ছাত্র অসুবিধায় পড়ত, তিনি তখন তাদের সহায় হয়ে এগিয়ে যেতেন। টাকা জোগাড় করে তাদের সাহায্য করতেন। ভারতীয় ছাত্ররা বিদেশে গিয়ে যাতে জ্ঞানার্জন করতে পারে, তার জন্য তাঁর আগ্রহের অন্ত ছিল না। বিদেশে ভারতীয় বণিক্ সম্প্রদায়ের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে তিনি একটা ফাণ্ড তৈরী করেছিলেন।

মনে পড়ে তাঁর সুদূর প্রসারী দৃষ্টির কথা। চীনদেশের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ বহুকাল থেকে। মাঝে সেই যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে যায়। ভারতের সঙ্গে চীনদেশের এই আত্মীয়তার কথা তিনি বিস্মৃত তো হনই নি, বরঞ্চ সেই আত্মীয়তা পুনঃপ্রতিষ্ঠায় তাঁর উদ্যোগের পরিচয় তিনি দিয়ে গিয়েছেন। তিনি সর্বপ্রথম চীন সংস্কৃত অভিধান সম্পাদন করেন। এর দ্বারা তিনি চীন ও ভারতের প্রাচীন সম্পর্ক নূতন করে প্রতিষ্ঠা করেন।

স্মৃতিকথা

আজ সকাল থেকে শরীর অবসন্ন। কাল ডাক্তারের উপদেশ অবহেলা করে বের হয়েছিলাম। ব্যথার খোঁচায় সাহস কমে গিয়েছে। তবু আপনাদের সাদর আহ্বানের কথা স্মরণে উঠছে বারবার। তাই প্রিয় বন্ধু ৺প্রশান্তচন্দ্রের বিষয়ে কিছু লিখেছি—আশা করি সভায় উপস্থিত কেউ এটি পড়ে আমায় প্রতিশ্রুতির ঋণমুক্ত করবেন আংশিকভাবে।

বয়সের বেশী তফাৎ নয়—প্রশান্তচন্দ্র ৬/৭ মাসের বড়, তবে আলাপ হয়েছিল যখন আমরা শিক্ষার অ্যাপ্রেণ্টিসী শেষ করে কাজ সুরু করেছি—যা জীবনের প্রধান কাম্য বলে বেছে নেওয়া হলো। স্বদেশীয়ানার ভরা জোয়ার। আমাদের বছরে যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলমার্ক পেল কৃতী ছাত্র বলে—প্রায় সকলেই ছুটে গেল—আচার্য জগদীশ বোস কিম্বা আচার্য রায়ের লেবরেটোরীতে। আমরা সার আশুতোষকে ধরে বিজ্ঞান কলেজে স্নাতকোত্তর ক্লাসের আয়োজনে রাজী করালাম—যদিও তখন প্রথম মহাযুদ্ধে বিদেশ থেকে যন্ত্রপাতির আমদানী প্রায় অসম্ভব—খুঁজে বের করলাম আমরা কোথায় দামী যন্ত্রপাতি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে আছে—স্যার আশুতোষ আমাদের মুখ চেয়ে সে সব সংগ্রহ করে দিলেন—প্রভূত উৎসাহে যুবকেরা নতুন কাজে পা বাড়ালো।

প্রশান্তর একটু সুবিধা ছিল—যুদ্ধের মধ্যেই কেম্ব্রিজ থেকে জয়টীকা পরে ফিরে এসেছে—গণিত এবং ফিজিক্সে সে দেশেই অনুসন্ধানে আত্মনিয়োগ করবে কিছু দিন, এই ভেবে দেশে এসেছিল—প্রেসিডেন্সিতে তখন উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব, বিদেশী কেউ আসছে না। সরকার তাকে বসিয়ে দিলেন প্রফেসর করে। এইখানেই নতুন অনেক কাজ প্রশান্তকে ব্যস্ত করে রাখলো। নতুন বিজ্ঞানের রীতি পড়ে প্রশান্ত মুগ্ধ—পরিসংখ্যান রীতি এদেশের অনেক সমস্যার ও বহু আলোচিত প্রশ্নের উপর আলোকপাত করতে পারে কিনা ভাবতে বসলো। বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে সে লেগে গেল। হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণ-শূদ্রের স্তর বিভাগ ও মনুর বর্ণসঙ্করের ভীতি থাকা সত্ত্বেও উচ্চ স্তরের বাঙালী মোটামুটি পরিসংখ্যান সূত্রমতে প্রায় একই জনস্তর থেকে আসছে মনে হলো তার। পরিসংখ্যানের নির্ণীত মতে,

এদের আদি পুরুষ একই গোষ্ঠী ধরতে হবে। এর জন্যে অনেক মাপজোখ হলো—মাথার করোটির নানা বিশেষত্ব—হাত-পায়ের দৈর্ঘ্য আরও কত কি!

এদিকে প্রেসিডেন্সি কলেজে ফিজিক্স পড়ানো চলছে—আবার প্রথামত কিছু-দিন বাদে আলিপুরের হাওয়া ঘরের প্রধান হয়েও কাজ করতে হলো। নতুন পরিসংখ্যান রীতি নিবিড়ভাবে অধ্যয়ন ও প্রয়োগ করা শিখতে মহলানবিশের কাছে অনেক কৃতী ছাত্র ছুটে গেল—সে সময় যাঁরা একত্র হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনেকে সুনাম ও সুখ্যাতি অর্জন করে পরিসংখ্যানশাস্ত্রের পুরোভাগে রয়েছেন—ভারতীয়দের এই কৃতিত্বের জন্যে প্রশান্তর প্রশস্তি গাইতে হয়। বিদেশী সরকারকে সে বুঝালো এর সারবত্তা—দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি করতে গেলে আগে বুঝতে হবে বর্তমানে আমরা কিভাবে দুর্দশা বা তিমিরে আচ্ছন্ন আছি—তার জন্যে সারা দেশ ঘুরে তথ্য সংগ্রহের আয়োজন চালালো এবং বিশেষ ধরণের ব্যবস্থা অবলম্বন করলে কি হয়, তার মোটামুটি ফল—এসব ব্যাপারে পরিসংখ্যান রীতিই প্রমাণ—এটি সে সরকারকে বুঝিয়ে নতুন বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা করলো।

আরম্ভ হয়েছিল ব্রিটিশ যুগে—সুহরওয়ার্দীর আমলে—পরে নানা অদল-বদল হলো—দেশ স্বাধীন হলো—জওহরলাল এসে আশীর্বাদ করলেন এই প্রয়াসকে। মহলানবিশের অক্লান্ত পরিশ্রমে আম্রপালির চারদিকে-একটি প্রকাণ্ড শিক্ষা ও অনু-সন্ধান ক্ষেত্র গড়ে উঠলো—বটগাছের মত সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়লো—তাথেকে নানা প্রদেশে নানা সংস্থা—আজ সারা ভারতে আই. এস. আই-এর শাখা-প্রশাখা বিরাজ করছে। কেন্দ্রীয় সরকারেরও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা রূপায়িত করতে মহলানবিশের পরিকল্পনা অনুযায়ী যোজনা মন্দিরে যে বিশেষজ্ঞেরা বসে আছেন, তারই আশ্রয় ও পরামর্শ নিতে হচ্ছে।

আমি ও সাহা প্রথমে শুদ্ধ ফিজিক্স পড়াই। যুদ্ধ শেষ হয়েছে—এরই মধ্যে প্ল্যাঙ্ক—আইনষ্টাইন—বর—যাঁদের নাম এখন প্রাতঃস্মরণীয় বলে ঘরে ঘরে উচ্চারিত হচ্ছে, তাঁদের নতুন প্রচার আপেক্ষিতাবাদ বা সমষ্টিকণাবাদের সব শেষ কথা—যা যুদ্ধের মধ্যে লেখা হয়েছিল—তারই খবর আসতে সুরু হয়েছে মাত্র কয়েক বৎসর।

ডাঃ দেবেন বোস তখন অন্তরীণ থেকে মুক্তি পেয়ে জার্মেনী থেকে ফিরে এসে ৯২, আপার সারকুলার রোডে কাজ সুরু করেছেন। আমি তাঁর কাছে জার্মান শিখছি—আইনস্টাইনের নতুন নিবন্ধ আলোকের মহাকর্ষ ক্ষেত্রে বক্রগতি নিয়ে যা লেখা ছিল তারই তর্জমা করছি। ডাঃ সাহা নিজেই জার্মান ভাষা আয়ত্ত করেছিলেন

—তিনি সে সময়—আপেক্ষিকতাবাদের গণিতে যে শুদ্ধ রূপ দেওয়া হলো, মিন্‌কাউস্কির সেসব লেখা তর্জমা করলেন। প্রশান্তচন্দ্র ওই বিষয়ে শিক্ষকতা করতেন—তিনিও একটি জ্ঞানগর্ভ ভূমিকা লিখলেন। আমাদের যৌথ প্রয়াসে রিলেটিভিটির উপর এক সেট নিবন্ধ একসঙ্গে করে পুস্তিকাকারে কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রকাশ করলেন। বেশ কিছুদিন চলেছিল দেশ-বিদেশে। এখন বোধ হয় তা অপ্রাপ্য।

সাহা গেলেন এলাহাবাদ, আমি ঢাকায়। প্রশান্ত বহু দিন প্রফেসরী করে পরিপূর্ণ বয়সে অবসর গ্রহণ করলেন সরকারী কাজ থেকে—পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে ষ্ট্যাটিস্টিক্‌স পড়াবার সুবন্দোবস্ত করে গেলেন—তারপর প্রায় বিশ বৎসর একনিষ্ঠ-ভাবে সেবা করেছেন দেশমাতৃকার। তার স্থির বিশ্বাস ছিল পরিসংখ্যানের পরি-মাপেই আমরা সব সমস্যার বাস্তব রূপ প্রণিধান করতে পারবো ও সেই সঙ্গেই ভাবতে পারবো দেশের করণীয় কি? দেশ-বিদেশে তার প্রতিভার স্বীকৃতি মিলেছে, পৃথিবীর প্রায় দেশেই তিনি গিয়েছেন এবং বিশ্ব সংস্থা থেকে তার প্রজ্ঞার স্বীকৃতি হয়েছে।

জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত প্রশান্তর ধ্যান ছিল পরিসংখ্যান। নার্সিং হোমে যাবার আগে আমি দেখা করতে গিয়েছি—নানা গোলমাল উঠেছে আই. এস. আই-এর পরিচালনার ব্যাপারে—তবু সে সব কথা শেষ করে আমাকে দেখাতে চাইলে—নতুন এক পদ্ধতিতে কি ভাবে অগ্রসর হলে সহজে আর্থিক অবস্থার তুলনা করা যায়—ভাল কি মন্দ বোঝা যায় কত সহজে। তখনও তিনি নিঃসন্দেহ নন—রোগশয্যায় শুয়ে চেয়েছেন কর্মীদের সহযোগিতা। পরে শুনেছি যা তিনি ভেবে-ছিলেন, তারই কথানুসারে যে ফলাফল পেয়েছেন তার সহকারীরা, তা শীঘ্রই প্রকাশ হবে।

বিজ্ঞানের কথাই বেশী করে বলেছি। তবে প্রশান্ত যে বহু দিন গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের নিবিড় সাহচর্য করেছিলেন তা তো সকলেই জানে। তাঁর সঙ্গে দেশ-বিদেশে গিয়েছেন। আইনস্টাইনের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময় গুরুদেবের পাশে প্রশান্ত। বিশ্বভারতীর গোড়াপত্তনে বহু বৎসর সেখানে কর্মসচিব—পরে রথীন্দ্র-নাথের আমলে সরে এসেছিলেন—তবে চিরকাল দেশের কল্যাণকর সব কাজেই প্রশান্তর সহানুভূতি। প্রতিভার সামনে সে সব সময় উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছে। আচার্য ব্রজেন্দ্র শীলের সে একজন মহাভক্ত ছিল।

সমবয়সী কর্মীদের অনেকে তাঁর সাহায্য কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করবে। সাহাকে যে অর্থানুকুল্য করেছিলেন, তাতে তার বিদেশ যাত্রা সম্ভব হয়েছিল। রাজচন্দ্র বোস বা ৺সমর রায় তাঁর হাতে গড়ামানুষ—আরও কত উদাহরণ সকলের মনে পড়বে।

জীবনের সায়াহ্নে প্রশান্তকে ভারতের বাইরে কাটাতে হতো অনেক মাস—তবে ভারতে বিজ্ঞানের প্রগতি ছিল তাঁর স্থির লক্ষ্য। ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছেন—সেই সংস্থার অর্থসচিব হয়েছিলেন বহুকাল।

সরস্বতীর আরাধনা করা যায়—তবে প্রতিভার প্রকাশে নতুন রাস্তা তৈরী করে দেশের বহু লোকের কর্মপ্রচেষ্টার পথ করতে পারে—এইরূপ সৌভাগ্য কয়জনের জীবনে ঘটে? আমাদের বয়সী বিজ্ঞানীদের কথা ভাবতে গেলে সাহা ও মহলানবিশের মহান অবদানের কথা ওঠে এবং ভাবলে সম্ভ্রমে মাথা নত হয়। আজ বাঙালী বা ভারতীয়রা পরিসংখ্যানে দেশ-বিদেশে খ্যাতি লাভ করেছে—আজ আই-এস-আই-র আসন বিশ্বের দরবারে প্রধান স্তরে। এশিয়ার মধ্যে কলকাতার আম্রপালির নাম সর্বজনবিদিত। যে মহাপুরুষ অসম্ভবকে এই ভাবে সম্ভব করেছেন, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় আমরা মাথা নত করছি।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

জগদীশচন্দ্র

বহুদিন আগের কথা। আমরা তখন স্কুলের ছাত্র। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানশিক্ষার আমূল পরিবর্তন সাধিত হইল। ১৯০৮ সাল হইতে ইণ্টারমিডিয়েট সায়েন্স কোর্স সুরু হইল। স্বদেশী যুগ। স্কুলে ছাত্রাবস্থায় রাখীবন্ধনের দিনে রাস্তায় রাস্তায় 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে' গাইতে গাইতে ঘুরিয়াছি। বাঙ্গালীর প্রথম কাপড়ের কলের চাকা ঘুরিতে আরম্ভ করিয়াছে। জাতীয় শিক্ষাপরিষদের নূতনভাবে বিজ্ঞান শিক্ষার পরিকল্পনা ছেলেদের মুখে মুখে প্রচার হইতেছে। শিল্পোদ্যোগের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া দুই-চারজন বাঙ্গালীও জাপান হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

১৯০৯ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়া স্থির করিলাম বিজ্ঞান পড়িব। জগদীশ-চন্দ্রের আবিষ্কারের কাহিনী তখন তখন বাংলা সাময়িকীতে প্রায়ই ছাপা হয়। জড়ের মধ্যে প্রাণশক্তির অস্তিত্ব তিনি পরীক্ষার ভিত্তিতে প্রমাণ করিয়াছেন। সে কাহিনীর প্রচার শুধু আমাদের দেশে নহে, অধ্যাপক নিজে গিয়া দেশ-বিদেশে সুধীমণ্ডলীর কাছে পেশ করিয়াছেন এবং তাঁহারা সম্ভ্রমের সহিত তাহা শুনিয়াছেন।

প্রেসিডেন্সি কলেজে ঢুকিলে প্রথমেই এক কাচের ঘর নজরে পড়ে। তাহার মধ্যে রহস্যময় যন্ত্রপাতি লইয়া আচার্য জগদীশচন্দ্র গবেষণা করেন। কিশোর মনের বাসনা—এই বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানীর কাছে বিজ্ঞান শিক্ষা করিতে পারিলে জীবন ধন্য হইবে।

একতলার আরেক দিকে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রাসায়নিক গবেষণায় মগ্ন। এই দুই আচার্যের পায়ের কাছে বসিয়া বিজ্ঞানের প্রথম পরিচয় শুরু হইবে—এই আশায় আমার মত বহু ছাত্র তখন প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়িতে আসিল। প্রথম বৎসরে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের কাছে রসায়ন শিক্ষার সৌভাগ্য হইল। কিন্তু জগদীশচন্দ্রের কাছে পড়িবার সুযোগ আসিল আরও দুই বৎসর বাদে। ইতিমধ্যে, যাহারা একটু বেশী বাহিরের খবর রাখে, তাহাদের মতো আমিও মাঝে মাঝে লাইব্রেরীতে গিয়া 'Response in Living and Non-Living'—এর পাতা উল্টাই। জগদীশচন্দ্রের

গবেষণার তখন Magnetic Crescograph-এর যুগ। জগদীশচন্দ্রের নির্দেশমত সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি প্রেসিডেন্সি কলেজের কারখানাতে তৈয়ারী হয়। আমরা তাঁহার অধ্যাপনার জন্য উদগ্রীব হইয়া অপেক্ষা করি। আচার্য তখন তাঁহার গবেষণায় নিমগ্ন। কাজেই তাঁহার অবসর কম। তবু তাঁহার কাছে যে কয়দিন পড়িবার সৌভাগ্য হইয়াছিল, সে কয়দিনের কথা সারাজীবন স্মরণে থাকিবে। বিশেষতঃ যখন তাঁহার নিজের যন্ত্রের সাহায্যে বৈদ্যুতিক ঢেউ-এর বিষয় বলিতেন, সে কয়দিনের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

হার্টজ যখন এই ঢেউ-এর অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন তখন তাঁহার গবেষণার জন্য যে সকল যন্ত্র ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহা ঠিক ছাত্রদের ক্লাসঘরের উপযোগী নয়। জগদীশচন্দ্র নিজে গবেষণা করিয়া নূতন ধরণের Coherer আবিষ্কার করিলেন। এমন সূক্ষ্ম যন্ত্র নির্মাণ করিলেন যাহা হইতে খুব ছোট ছোট ঈথার তরঙ্গ নির্গত হয়, যাহার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য এক ইঞ্চির ছয় ভাগের একভাগ মাত্র। এটি ছিল ঈথারে সর্বাপেক্ষা ছোট বৈদ্যুতিক ঢেউ তুলিবার যন্ত্র। অল্প সময়ের মধ্যে অনায়াসেই তিনি ক্লাসঘরে প্রমাণ করিয়া দেখাইলেন যে, সাধারণ আলোক-তরঙ্গের সকল ধর্মই বৈদ্যুতিক তরঙ্গে বিদ্যমান।

এই যন্ত্রের কথা এবং তাঁহার মনোজ্ঞ পরীক্ষার কাহিনী বহুস্থানে বর্ণিত আছে। তাঁহার পরীক্ষা এবং যন্ত্র উদ্ভাবনের যে অপূর্ব দক্ষতা ছিল তাহা সর্বদেশে স্বীকৃত হইয়াছে। আজও বোধ-হয় সেই যন্ত্র, যাহার সাহায্যে তিনি আমাদের শিক্ষা দিয়াছিলেন, বসু বিজ্ঞান মন্দিরে রক্ষিত আছে।

নিজের বিজ্ঞানের তত্ত্বীয় দিকে ঝোঁক। কাজেই বি, এস-সির পর ফলিত গণিতের ক্লাশে ভর্তি হই। ইতিমধ্যে বেকার লেবরেটরীর বাড়ীতে জগদীশচন্দ্রের গবেষণাগার উঠিয়া গিয়াছে। আমাদের সিনিয়র ছাত্রেরা সেইখানে তখন মৌলিক গবেষণা করিবার সুযোগ পাইয়াছেন। আমরা কৌতূহলী হইয়া মাঝে মাঝে সেই রহস্যপূর্ণ লেবরেটরীর মধ্যে উঁকিঝুঁকি মারি। তাহার কিছুদিন পরে জগদীশচন্দ্র সরকারী কলেজ হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পর নিজের যথাসর্বস্ব উৎসর্গ করিয়া বসু বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠা করিলেন। তাহার পর হইতে বসু বিজ্ঞান মন্দিরে উদ্ভিদ-জীবন সম্পর্কে পূর্ণোদ্যমে গবেষণা চালাইলেন। অপরিসীম কৃতিত্ব ও যশঃসৌরভে দেশমাতৃকাকে মহিমান্বিত করিয়া ১৯৩৭ সালে তিনি পরলোক-গমন করেন।

বিজ্ঞানে তাঁহার অপূর্ব অবদান স্বীকৃতিলাভ করিয়াছে। ১৯২০ সালে তিনি ইংল্যাণ্ডের রয়েল সোসাইটির সদস্য নির্বাচিত হন। শেষ জীবনে যে সকল প্রশ্নের সদুত্তরের সন্ধানে নিজের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন তাঁহারই নির্দেশিত পন্থায় এখন তাঁহার ছাত্রবৃন্দ বসু বিজ্ঞান মন্দিরে সেই ক্ষেত্রে গবেষণা করিতেছেন। তাহা ছাড়া বসুবিজ্ঞান মন্দির এখন বিশুদ্ধ পদার্থবিদ্যারও গবেষণার স্থান। ডাঃ দেবেন্দ্রমোহন বসু এখন বিজ্ঞান মন্দিরে গবেষণা পরিচালনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

সারাজীবনের সঞ্চিত অর্থ তিনি বিজ্ঞান সাধনার জন্য উৎসর্গ করিয়া দেশের সামনে রাখিয়া গিয়াছেন এক অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাঁহার দৃষ্টান্তে বাংলার বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আবিষ্কারের কার্যে অনুপ্রাণিত হইয়াছেন।

৩০ নভেম্বর ১৯৫৮ তাঁহার জন্মশত-বার্ষিকী উৎসব। এক সময়ে যে তাঁহার ছাত্র হিসাবে তাঁহার কাছে যাইবার সুযোগ পাইয়াছিলাম তাহা এখন শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করি। এই উৎসব উপলক্ষে তাঁহার একজন ছাত্রের শ্রদ্ধাঞ্জলি এইখানে নিবেদিত হইল।

আশুতোষ

স্যর আশুতোষের তিরোধানের প্রায় চল্লিশ বৎসর পরে, তাঁর জন্মের শতবার্ষিকী উপলক্ষে সকলে তাঁকে স্মরণ করছে। আমাদের মধ্যে অনেকেরই তাঁকে দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। তাঁর দৃপ্ত আত্মনির্ভরতার কথা আমাদের মনে গেঁথে আছে। আজকাল যে সকল প্রতিষ্ঠানের জন্য বাঙ্গালী নিজে গর্ব অনুভব করে, তার অনেকগুলি সুরু হয়েছে তাঁর সময়ে—অনেক সময় প্রত্যক্ষভাবে তিনিই সেই নীতির উদ্ভাবন করেছিলেন। বিশেষ করে বিজ্ঞান কলেজের সকল কর্মীরা তাঁকে মনে রাখবেন। তারকনাথ পালিত ও রাসবিহারী ঘোষ এই দুই মহানুভব দাতার কল্যাণে আমাদের বিজ্ঞান কলেজের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছিল, আর স্যর আশুতোষ যদি এ বিষয়ে অগ্রণী না হতেন তাহলে তাঁদের মনে এই বিশ্বাস জাগত না যে এই অর্থ সত্যিই জনকল্যাণে উৎসর্গীত হবে।

গণিত সভার স্থাপয়িতা তিনি—কতবার দেখেছি তাঁকে—নানা কাজের মধ্যে থেকে তিনি সময় করে নিয়েছেন—নবীন কর্মীদের উৎসাহ দেবার জন্য সর্ব আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছেন। আজকে বিজ্ঞান কলেজে অনেক নূতন বিভাগ খোলা হয়েছে—তবে তাদের স্থাপনের পরিকল্পনাগুলি সবই তাঁর সময়ে গৃহীত হয়েছিল।

বাঙ্গালী আজ অনেক দুঃখকষ্টে আত্মহারা হয়ে পড়েছে। অনেক বিষয়ে অন্তর্দ্বন্দ্বে তার বলিষ্ঠ প্রচেষ্টা নির্জীব হয়ে গিয়েছে। যাঁরা শিক্ষা-দীক্ষার যে অনন্য সামান্য অবদানে বিশ্বাসী নন তাঁরাই হয়তো দেশের গঠনের কাজে নেতাগিরি করছেন।

তাই আমরা অনেক বিষয়ে নিরাশার গভীর গহবরে পড়ে গেছি—কি ভাবে এ থেকে মুক্তি হবে তা জানি না।

বাইরে লোক দেখানর কাজে আজ আমরা ব্যস্ত—তার মধ্যে নীরব আন্তরিকতা দেশে প্রতিষ্ঠা হারাতে বসেছে। বাংলার সেই অকুতোভয় বলিষ্ঠ শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রকৃত নায়কত্বের অভাব আজ আমাদের মনে গভীরভাবে ফুঠে উঠেছে।

যদি স্যর আশুতোষের শিক্ষা-সম্বন্ধীয় সব কাজের নিবিড় আলোচনা করে বাঙ্গালী তার উৎসাহ ও দেশসেবার প্রেরণা ফিরে পায় তাই হবে এই শতবর্ষ অনুষ্ঠানে অর্জিত দেবতার আশীর্বাদ।

বিজ্ঞান কলেজের কর্মীদের সঙ্গে একপ্রাণ হয়ে পুরানো দিনের এক কর্মী আমি স্যর আশুতোষের স্মৃতির উদ্দেশ্য আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়ে রাখলাম।

বিবেকানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দ আজ থেকে একশো বছর আগে এই কলকাতাতেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর নাম তখন ছিল নরেন্দ্রনাথ দত্ত। তাঁর বাল্যকালের কথা, তাঁর শিক্ষা জীবনের কথা এবং তারপর পরমহংস দেবের সংস্পর্শে এসে তাঁর জীবনের দিক পরিবর্তনের কথা আজ সুবিদিত। শিকাগো ধর্মমহাসভায় তাঁর সেই ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদানের পর তাঁর এবং তাঁর আদর্শের যে জয়যাত্রা শুরু হয় আজও তার গতি অব্যাহত। বর্তমানে আমাদের দেশে যে সমস্ত শক্তি কাজ করে চলেছে, তার মধ্যে তাঁর আদর্শাবলম্বী আন্দোলন একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছে।

স্বামী বিবেকানন্দ যে সময় জন্মগ্রহণ করেন, তা ভারতের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ সময়। তখন ইংরাজরা আমাদের দেশে সম্পূর্ণভাবে প্রভুত্ব বিস্তার করেছে এবং পশ্চিমী শিক্ষাব্যবস্থাও এদেশের মাটিতে শিকড় বিস্তার করেছে। রামমোহন প্রমুখ মনীষীরা অনেকদিন আগেই বুঝেছিলেন যে ভারতের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে তার প্রাচীন ঐতিহ্যের সঙ্গে এই পশ্চিমী ভাবধারার সমন্বয়ের সাফল্যের ওপর। পশ্চিমী সভ্যতার অন্ধ অনুকরণ অথবা তার প্রাচীন রীতিনীতি, সমাজব্যবস্থা ইত্যাদিতেও আঁকড়ে থাকা দুই-ই তাঁরা জানতেন ভারতের পক্ষে সমান ক্ষতিকর হবে। পূর্ব এবং পশ্চিমকে মেলানোর এই যে প্রচেষ্টা তাঁরা উনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই সুরু করেছিলেন, তাই পরিপূর্ণ সাফল্য লাভ করেছিল বিবেকানন্দের মধ্যে।

বিবেকানন্দের মন ছিলো যুক্তিবাদী। অন্ধ ভাবে কোনও কিছুকে সমর্থন করলে যে কোনও ভাল হতে পারে না একথা তিনি বিশ্বাস করতেন। আর কর্মের প্রতি তাঁর সহজাত আকর্ষণের জন্য পশ্চিমের কয়েকটি দিক তাঁর হৃদয়ে গভীরভাবে আলোড়ন তুলেছিলো। তাঁর প্রবাস থেকে লেখা কয়েকটি চিঠি পড়লে বুঝা যায় পশ্চিমের অগ্রগতি, কর্মের প্রতি নিষ্ঠা তাঁকে কতখানি বিস্মিত করেছিলো এবং স্বীয় দেশবাসীর আলস্য এবং কর্মবিমুখতা তাঁকে কি পরিমাণ

আহত করেছিলো। বার বার বিভিন্ন চিঠিতে তিনি তাঁর অনুরাগী বন্ধুদের এ প্রসঙ্গে বহু কথা লিখেছিলেন এবং এক নতুন ভারতবর্ষ তৈয়ারীর স্বপ্ন সেই তরুণ সন্ন্যাসীরা অনুক্ষণ দেখতেন।

বিবেকানন্দ বিশ্বাস করতেন যে জীবনকে উপোসী রেখে পারলৌকিক মঙ্গলের পিছনে ছুটা মরীচিকার পিছনে দৌড়ানোর মতোই নিরর্থক। খালি পেটে যে ধর্ম হয় না, তা তাঁর আগে খুব কমজনেই এমন করে বুঝেছিলেন। সেই জন্য যে আন্দোলনের সূত্রপাত তিনি করে গেলেন, তার অন্যতম প্রধান আদর্শ ছিল সেবার মধ্য দিয়ে মানুষের মঙ্গল সাধনা এবং মানুষের মঙ্গল বলতে তিনি তার সামগ্রিক কল্যাণ বুঝতেন। সাধারণ মানুষের জীবনের কোন অংশই তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি। শিক্ষা বিস্তার এবং নতুন ধর্মাদর্শ প্রচার দুয়েতেই তাই তাঁর সমান আগ্রহ ছিল।

শিক্ষা-বিস্তারের ক্ষেত্রে যখন তিনি ভাবতে শুরু করেন, তখন তিনি একথা সহজেই বুঝতে পেরেছিলেন, যে ভাষায় মানুষ তার মনের কথা বলে তাই শিক্ষার মাধ্যম হওয়া উচিত। বাংলা ভাষার সরলীকরণ তাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো। ঘোরানো-প্যাঁচানো লেখা, যাতে সারের থেকে বাগাড়ম্বর বেশী তা তাঁর কাছে অসহ্য ছিলো। শিক্ষাকে প্রতিটি মানুষের মনের কাছে পৌঁছে দিতে গেলে তা যে বিদেশী বা কৃত্রিম ভাষার সাহায্যে সম্ভবপর হবে না একথা তিনি আজ থেকে বহু আগেই বুঝতে পেরেছিলেন।

বিবেকানন্দ সব থেকে বেশী ঘৃণা করতেন অলসতাকে। ভারতের আলস্য তাঁকে এতখানি পীড়া দিয়েছিলো যে অসহিষ্ণু হয়ে তিনি মাঝে মাঝে এমন কথাও বলেছেন যে আলস্যের থেকে দুষ্টকার্যও ভালো। তাঁর নিজের মধ্যে অসীম শক্তির যে উৎস ছিল, তা সবসময় প্রকাশের পথ খুঁজত। সমস্ত জীবন এই অদম্য শক্তি তাঁকে পৃথিবীময় তাড়িয়ে নিয়ে ফিরেছে। আর যেখানেই তিনি গিয়েছেন সেখানেই মানুষ তাঁর মধ্যে এই প্রাণের প্রবাহ দেখে নিজেরাও উজ্জীবিত হয়ে উঠেছে। আমাদের দেশের মানুষকে তার মোহনিদ্রা থেকে জাগিয়ে তোলার কাজে সে যুগে তাঁর চেয়ে যোগ্যতর ব্যক্তি কেউ ছিলেন না।

কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য ভারতের আর এক বৈদান্তিক সন্ন্যাসী শংকরাচার্যের মত বিবেকানন্দ অকালে দেহত্যাগ করেন। কিন্তু শঙ্করও যেমন তাঁর সেই স্বল্প কালস্থায়ী—জীবনের মধ্যে সারা ভারত বারবার পরিক্রমা করে ভারতীয়দের মধ্যে

এক নতুন প্রাণরস সঞ্চার করার চেষ্টা করেছিলেন, স্বামীজীও তেমনি ঊনবিংশ শতাব্দীতে ঝড়ের মত ভারত এবং পশ্চিমের দেশগুলি-পরিভ্রমণ করে রামকৃষ্ণদেবের সর্বধর্মমত সমন্বয়-সাধনের নতুন বাণী প্রচার করেছিলেন। গোঁড়ামি-মুক্ত তাঁর এই নতুন ধর্মমতই শিকাগোতে এবং পরবর্তীকালে পশ্চিমকে এত অভিভূত করেছিলো।

আমরা বিবেকানন্দের—জীবনের মধ্যে বিজ্ঞান-মনস্কতা এবং আধ্যাত্মিকতার এক অভূতপূর্ব সমন্বয় দেখতে পাই। যে যুগে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন সে যুগে ভারতে এরকম শিক্ষার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সে শিক্ষার প্রয়োজন আজও ফুরোয় নি। ৩৯ বৎসরের জীবনে বিবেকানন্দ তাঁর আরব্ধ কাজের অল্পই সম্পূর্ণ করতে পেরেছিলেন। তাঁর দেহান্তরের পর তাঁর আদর্শে উদ্বুদ্ধ শিষ্যরা তাঁর কাজে প্রাণপাত করেন। সে কাজ হয়ত বহুলাংশে আজ সমাপ্ত হয়েছে। কিন্তু এখন আবার নতুন দিকে বহু নতুন সমস্যার সম্মুখীন আমরা হয়েছি। যে কোনও জাতির যে কোনও অবস্থাতেই দেহে এবং মনে শক্তিমান মানুষের সব সময় প্রয়োজন। কিন্তু আজকের এই দুর্দিনে আরও বিশেষ ভাবে মনে পড়ছে বিবেকানন্দের কথা, কারণ আজ তাঁরই ভাবধারায় যদি পুনরুজ্জীবিত করতে না পারি তবে বৃথাই আমরা তাঁর উত্তরাধিকার নিয়ে গর্ব করি। তাঁর আদর্শের উজ্জীবনই তাঁর জন্মশত-বার্ষিকী পালনের সার্থকতা। বিবেকানন্দ বলেছিলেন, Avalanche-এর মত ঝাঁপিয়ে পড়। আজ যদি আমরা নিজেদের সেই ত্যাগ আর শক্তির ব্রতে দীক্ষিত করতে পারি তবেই আমরা তাঁর সম্মান রাখতে পারব।

নেতাজী

নজরুলের গানে আছে "দুর্গম গিরি কান্তার মরু" পার হয়ে আমাদের অভিযানে নানা বাধাবিপত্তি অতিক্রম করতে হবে, কিন্তু নাবিকের লক্ষ্য স্থির থাকা চাই। সুভাষচন্দ্র বসু এক সময়ে চেয়েছিলেন অসাধ্য সাধন করতে, একশো বছরের উপর যে বৃটিশ্-শাসন এ দেশে কায়েম হয়েছিল তার গোড়ায় ঘা দিয়ে টলিয়ে দিতে এবং সুযোগ নিয়েছিলেন সেই সময়ে যখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে হিটলারের সঙ্গে বৃটিশ ও সম্মিলিত মিত্রশক্তির সংঘাত বাধে। এই দেশ থেকে পাহারার শ্যেনদৃষ্টি এড়িয়ে হাজার হাজার মাইল গোপনে অতিক্রম করে তিনি গিয়েছিলেন—তার খবর এখন অনেকাংশে আমরা জেনেছি—তবে সবটা পরিষ্কার নয়, বিশেষতঃ ইউরোপ গিয়ে কিভাবে হিটলার মুসোলিনীর সঙ্গে তাঁর সমঝোতা হয়েছিল সে বিষয় অনেকটা রহস্যের যবনিকায় ঢাকা। হিটলারী একনায়কত্ব ইউরোপের লোকেও মেনে নেয় নি সকলে। রোঁলার ডায়েরীতে সুভাষের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনার কথা আছে। কৌতুহলী পাঠক সে সব কথা খুঁজলে জানতে পারবেন।

এদেশে তখন কংগ্রেস নীতি গান্ধীবাদী। সকলে ভেবেছিলেন অসহযোগ চালিয়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যকে যুদ্ধের মধ্যে পঙ্গু করে দেবেন, আবার কম্যুনিস্টপন্থী যাঁরা ছিলেন তাঁরা অনেকে হিটলারের একনায়কত্বের বিরুদ্ধে প্রচার করছিলেন। তাই কংগ্রেসের অনুচরদের সঙ্গে তাঁদের মতদ্বৈধতা এবং পরস্পরের প্রতি দোষারোপের পালা সুরু হয়েছিল। সেই থেকে ঝগড়ার সুরু, এখনও শেষ হয় নি।

জাপানের সঙ্গে সুভাষ মিতালী করতে চেয়েছিলেন। তার আগে, শোনা যায়, রাসবিহারী বসু অনেক প্রচার চালিয়েছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন জাপান এশিয়ার ত্রাণকর্তারূপে রঙ্গমঞ্চে নামবে। সুভাষ এসেছিলেন সিঙ্গাপুরে এবং অল্প কিছুদিনের জন্য দেশের নানা জাতীয় সেপাইদের অধিনায়কত্ব করে অভিযান চালিয়ে কোহিমা পার হয়ে ভারতের জমিতে এসেছিলেন—সে সব কথা চিরকাল ভারতের ইতিহাসে অমর অক্ষরে লেখা থাকবে।

বহু শতাব্দী ধরে বিদেশী শত্রু ভারতের সীমানা পেরিয়ে এদেশে হামলা করেছে— পরস্পরের মধ্যে বিবদমান রাজশক্তিদের হতবল করেছে। সারা দেশকে অধীনতার অপমানে জর্জরিত করেছে। এই প্রথম ভারতের সন্তান ভারতমাতার শৃঙ্খল মোচন করবার জন্য প্রচণ্ড শক্তির বিরুদ্ধে নির্ভয়ে দাঁড়াতে সাহস করেছিলেন —সে কথা ভোলবার নয়, পরে অবশ্য কি হল জানা নেই—এই বীর সন্তান ভারত গগনে উল্কার মত আবির্ভূত হয়ে আবার কোথায় মিলিয়ে গেলেন সেটার ইতিহাস জানা নেই—নানা লোকে নানা কথা বলে—এ বিষয় অনেকটা আন্দাজী। আমার মনে হয়, সুভাষ বেঁচে থাকলে তিনি নিশ্চয়ই দেশে ফিরে আসতেন—লোকে যে বলে তিনি নির্যাতন এড়িয়ে আত্মগোপন করে আছেন সেটা তাঁর স্বভাবের সঙ্গে খাপ খায় না।

কলকাতা সহরের ময়দানের মধ্যে গান্ধীজীর অগ্রগামী মূর্তি স্থাপিত হয়েছে। কলকাতার শ্যামবাজারে পাঁচমাথার মোড়ে নেতাজীর ব্রোঞ্জ মূর্তি স্থাপিত হয়েছে। দুই-ই অবশ্য নির্ভীক অভিযানের প্রতীক—আমি এক বন্ধুকে বলেছিলাম এ যেন তীর্থ-সন্ধানী সন্ন্যাসীর পদযাত্রা। সুভাষের মূর্তি সেই ভাবের এক সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর রূপ। আজকে এই দুই নায়কের পেছনে অনুযাত্রী কে আছেন জানি না। কারণ দেশের মধ্যে এখন যাঁরা মুখর—তাঁরা অনেকেই গান্ধী বা সুভাষের আদর্শের কথা ভুলে গিয়েছেন। গণতন্ত্র বা বিশ্বতন্ত্র এসব অনেক ছেঁদো কথা আমরা শুনেছি। আমি বৃদ্ধ বয়সে রাস্তায় বাহির হই, কালো লাল নানা কালিতে নানা শ্লোগান দেখতে পাই—চোখের জ্যোতি ম্লান হয়ে এসেছে, দেশ-এর ভবিষ্যৎ দেখবার মত জ্যোতি আর নেই।

সৌম্যেন্দ্রনাথ

সৌম্যেন্দ্রনাথের সত্তর বৎসর পূর্তিতে তাঁর অনুরাগী ও ভক্তরা মিলে শুভেচ্ছা জানাবার আয়োজন করেছেন। তাঁদের সঙ্গে আমিও নিজে এগিয়ে এসেছি। ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছি, তিনি আরও বহুদিন আমাদের মধ্যে থেকে নিরলস, নিঃস্বার্থপর দেশ ও সংস্কৃতির পূজার এক উজ্জ্বল আদর্শ সামনে ধরে এদেশে যুবকদের উদ্বুদ্ধ করুন।

জীবনের সায়াহ্নে এসে মনে হচ্ছে আমাদের কালে যারা একত্রে যাত্রা করেছিলাম দেশমাতৃকার সেবা করতে—নানা ঘাতসংঘাতে কেটেছে তাদের জীবন। সে সময় বিদেশী শাসকের শৃঙ্খল ভাঙ্গাই ছিল প্রধান কাম্য—অন্য সব কিছু পরে গড়ে তোলা যাবে সহজেই—আমাদের দেশে বর্ষীয়ান কর্মীরা এইটি দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করতেন। সেই চেষ্টায় অনেক বন্ধু আত্মবলি দিয়েছেন— অনেকে কারাবরণ করেছেন—কেউ বা বিদেশ থেকে সক্রিয় সাহায্য আদায় করতে বিদেশে ছুটে গিয়েছেন—সে সব আজ ইতিহাসের পাতায় খুঁজলে পাওয়া যাবে।

দেশের সামনে ঠাকুরবংশের ইতিহাস এক চিরন্তন বিস্ময় হয়ে রইল। ভারতীয় চিত্রকলা পদ্ধতির পুনঃপ্রবর্তন করলেন অবনীন্দ্রনাথ—আড়ম্বরপূর্ণ পৌত্তলিকতা থেকে বিমুখ হয়ে একেশ্বরবাদের দিকে আত্মনিয়োগ করলেন দেবেন্দ্রনাথ। তাঁরই উৎসাহে নবীন সাধক পরিজনেরা বহিয়ে দিলেন সাহিত্যে চিত্রকলায় দেশের পুনরুজ্জীবনের জন্য বন্যার স্রোত—বাংলা ভাষায় রূপান্তরিত হলো দেশের পুরানো কথা-কাহিনী—অতীত থেকে বর্তমানে সেতুবন্ধ হয়ে রইলেন রবীন্দ্রনাথ।

আমরা দূরে দূরে ঘুরেছি ও পরে জেনেছি—এ সবের মধ্যে থেকেও সৌম্যেন্দ্রনাথের মনে আকাঙ্খা জেগেছিল স্বাধীনতাযজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়তে।

দেশবিদেশে তখন মধ্যযুগের শাসনতন্ত্র ভেঙ্গে বর্তমান কালের উপযোগী জনমতের প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলছিল।

ফরাসী বিপ্লবের বা আমেরিকার স্বাধীনতা অর্জনের কথা—আর রামমোহনের মত দেশের মনীষীদের কথা সব আদর্শবাদ পূর্ণ করতো না।

দু'শো বৎসর আগে থেকে ভারতের সম্পর্ক হয়েছিল ইউরোপীয় সভ্যজগতের সঙ্গে—এদেশের নিরক্ষতা অজ্ঞতা দূর করবার এই সুযোগে রামমোহনের মত যুগনায়কেরা আবাহন করেছিলেন এদেশে ইউরোপীয় শাসন, চেয়েছিলেন বহুদিন

এ সম্পর্ক স্থায়ী হলে আমরা হাজার বছরের পরাধীনতার গ্লানি মুছে ফেলতে পারবো।

তাই দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির বলিদান দিয়েও সে সময় দেশের সকলে চেয়েছিল বৃটিশ সান্নিধ্য।

তবে একশো বৎসর যেতে না যেতেই মানুষ ব্যস্ত হলো, বুঝলো বিদেশী শাসন ও দাসত্ব আমাদের মন পরমুখাপেক্ষী করে ফেলেছে।

পরে গান্ধী উঠলেন—প্রচার করলেন, শান্ত অসহযোগ, রবীন্দ্রনাথ শান্তি-নিকেতনে বিশ্বভারতীর ভিত্তি স্থাপন করলেন বিশ্বমানবতার আদর্শ পূজায়। তবু সৌম্যেন্দ্রনাথ গা ভাসালেন বিপদসঙ্কুল নতুন পথের সন্ধানে। মার্ক্স ও লেনিনের 'দেশে ঘুরে যাঁরা নতুন মশাল জ্বেলে এদেশে ভবিষ্যতের পথ নির্দেশ করতে চেয়েছিলেন তাঁদের সাথী হলেন।

সৌম্যেন্দ্রনাথের শিল্পীমন শুধু দেশসেবার নবদর্শনে ভরে নি। পুরাগত সংস্কৃতি তাঁকে চিরকাল আকৃষ্ট করেছে, তাই রাজনীতি করলেও আজ দেশের সকল সংস্কৃতির পূজায় তাঁর নিবিড় সাহায্য আমরা পেয়ে আসছি। কৃতজ্ঞতার সঙ্গে দেশবাসী সকলে দেখে আসছে সঙ্গীতের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর প্রচেষ্টা। সকল যুগমানবের কথায় তাঁর অদ্ভুত বাগ্মিতা সকলে আবিষ্ট মনে শুনছে।

কিছুদিন ধরে তাঁর বক্তৃতা শোনবার সুযোগ হয়েছে আমার নানা সাংস্কৃতিক আয়োজনে। অনেক সময়ে ভেবেছি—এই ধুরন্ধরই ঠাকুর পরিবারের ঐতিহ্য বজায় রেখেছেন। তাঁর কথা শুনে অনেক সময় পূর্ব স্মৃতি জেগে উঠে—বিচিত্রায় রবীন্দ্র-নাথের কথার রেশ যেন বাজতে থাকে মনের মণিকোঠায়।

বিদেশে এক বিজ্ঞানী বন্ধু বলেছিলেন—"তোমাদের দেশের জলহাওয়ায় যেমন অনেক নতুন ধরণের ফসল ফলে, তেমনি ঝরে পড়ে তারা আবার অতি সহজেই—ভগীরথের আনা জলধারা শুকিয়ে ওঠে গ্রীষ্ম দেশের উত্তাপে ও অবসাদে।

সৌম্যেন্দ্রনাথকে দেখে মনে হয় যে, সাধারণ সূত্রেরও ব্যতিক্রম থাকতে পারে।

আরও বহু বৎসর আমাদের মধ্যে থেকে, স্বাধীন চিন্তায় মন মগ্ন রেখে, বাগ্মিতায় সকলকে চমৎকৃত করে স্বদেশবাসীকে পথ নির্দেশ দিতে থাকুন।

ভাষণ

নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে

সাহিত্য সম্মেলনে বিজ্ঞানের কথা, মা'র বিসর্জনের দিনে ভাঙ্গা কাঁসির মত বেসুরো ঠেকবে। আশা করেছিলাম যে যোগ্যতর সাহিত্যরসিক কেউ, আপনাদের নানা দেশের নানা খবর দিয়ে খুশি করবেন—তা' কিছুতেই রাজী হ'লেন না কর্মকর্তারা! তাই যে ক'টি কথা জীবনের শেষে মনে উঠেছে তাই আজ শুনিয়ে যাব।

অল্প কয়েক দিন আগে সৌম্যেন্দ্র ঠাকুর এদেশে বিজ্ঞান চর্চার ইতিহাস শুরু থেকে আজ পর্যন্ত খুব সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন। রামমোহন ও অক্ষয়চন্দ্র চেয়েছিলেন যুক্তিতর্কের সাহায্যে দেশের কুসংস্কার দূর করতে, রবীন্দ্রনাথ বুঝিয়েছিলেন বিদেশী জাহাজে যে জ্ঞান আমাদের দেশে এসে পৌঁছেছে, দেশী নৌকা ও ডিঙ্গি মারফত সে সব বাংলার গ্রামে গ্রামে পৌঁছে দিতে। হাজার বছরের সাধনার যে বিজ্ঞান আমাদের গরীব দেশেরও কাজে আসে—তার জন্য তিনি চেয়েছিলেন মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান চর্চা শুরু করতে। যে সমস্ত শিল্প সম্ভার উৎপন্ন করে আগেকার বাঙ্গালী দেশ-বিদেশ থেকে নানা সম্পদ আহরণ করে বাংলার প্রতি ঘরে ঘরে লক্ষ্মীশ্রী ফুটিয়ে রাখতো, যা বিদেশীর ক্রূর শাসনে শুকিয়ে গেছে—প্রাচুর্যের বদলে সেখানে উঠেছে রোজই দারিদ্র্যের হাহাকার ধ্বনি, তিনি চেয়েছিলেন সত্যকারের শিক্ষার প্রচলন করে, সেই সব কুটির শিল্পের পুনরুজ্জীবন—যাতে কৃষক বোঝে কি ভাবে উন্নত প্রথায় চাষ করলে এ মাটিতে আবার সোনা ফলবে; প্রতি গ্রামে পরস্পরকে সাহায্য করলে কি ভাবে দুরূহ কাজকে সহজে নিস্পন্ন করা যাবে —এ সব। তারপর জগদীশচন্দ্র এলেন নিপুণ হাতে এই দেশের গড়া সূক্ষ্ম যন্ত্রে প্রাণের রহস্যের সন্ধান নিতে এবং নানা ভাবে প্রমাণ করলেন বিজ্ঞানের এই নতুন রাজত্বে কি ভাবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করে জাতির হারান আত্মসম্মান উদ্ধার করা যায়। ওদিকে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র চেয়েছিলেন বাঙ্গালীকে বাণিজ্যে নামাতে; দেশের চাহিদা, দেশের তৈরি জিনিষ দিয়ে মেটাবার চেষ্টা করতে—ও আরও কত কি। দেশের নানা আন্দোলনের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের চেষ্টা বাংলাভাষায় বাঙালীর বিজ্ঞান শিক্ষার

আয়োজনের প্রচেষ্টা আজ চাপা পড়ে গিয়েছে। শান্তিনিকেতনে ও শ্রীনিকেতনে কবির কল্পনাকে রূপ দেবার জন্য চেষ্টা চলেছিল কিছু দিন—কিন্তু আজ যে রাজনৈতিক ঝড় উঠেছে রাষ্ট্রভাষা নিয়ে—তার তাণ্ডবে আমাদের যা সত্যকারের শ্রেয় ও প্রেয় হিসাবে কর্তব্য তা আমরা অনেকেই ভুলে যেতে বসেছি। যে অল্প সংখ্যক শিক্ষিত আছেন দেশে, ভেবেছিলাম তাঁরা বুঝবেন যে শুধু তাঁরাই এ জগন্নাথের রথ টেনে নিয়ে যেতে পারবেন না। আজ যারা বেশীর ভাগ নিরক্ষর ও সামাজিক জাঁতার মধ্যে পড়ে চেপ্টে গিয়েছে তাদের চাঙ্গা করে সঙ্গে নিতে হবে। কিন্তু এখনো সে বিষয়ে আমরা একমত হতে পারিনি।

স্বাধীনতার যুগে আমরা তাড়াতাড়ি এগিয়ে যেতে চাই। বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে চাই সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে দাঁড়াতে, তাই ভাবতে বসি যে, একভাষার সুত্রে বাংলা ও অবাঙ্গালী সকলকে না বাঁধলে, আমাদের নিস্তার নেই। আবার মনে করি বিদেশী ইংরাজ যে ভাবে শাসন করে এসেছে—সেই বোধ হয় নিপুণতার শেষ কথা, তাই ইংরাজ চলে গেলেও ইংরাজী ভাষার মোহ আমাদের কাটে নি। একবার প্রথম গণনির্বাচনের ঠিক আগের বৎসর বিজ্ঞান কংগ্রেসের মধ্যে আমরা বিচার করেছিলাম কি ভাবে দেশের মধ্যে প্রচার কার্য চালান সহজ হবে। তখন কেউ কেউ এক লিপির কথা পেড়ে বসেছিলেন, হয়ত প্রাদেশিক ভাষার বিজ্ঞপ্তি দেওয়া দরকার হলেও রোমান লিপির সাহায্য পেলে মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে লোকের কাছে জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি পৌঁছে দেবার কাজ সহজ হবে। অবশ্য শেষ অবধি সে মতে সকলের সায় মেলেনি। সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন আমেরিকা থেকে প্রায় চল্লিশ বছর বাদে প্রত্যাগত এক ভারতীয়—তিনি একটা অদ্ভুত কথা বলে বসলেন। তিনি বললেন, আপনারা কেন ইংরাজীকেই সকলের ভাষা বলে চালান না—এতো আমেরিকায় সম্ভব হয়েছে, তবে নানা রকমের বাধার জট কেটে সহজেই আপনারা সহজ রাস্তা পেয়ে যাবেন। অনেকের মনে ধারণা আছে যে, ভারতের ঐক্য—এটা আমরা ইংরাজীর কল্যাণে বুঝতে শিখেছি। কাজেই ইংরাজী শিক্ষা কায়েম করলেই হয়তো সেই ঐক্য জ্ঞান অটুট থাকবে। তাঁরা ভেবে নিয়েছেন, দেশের মধ্যে শিক্ষিত-অশিক্ষিতের স্তর বিভেদ থাকবেই এবং উপরের স্তরে ইংরাজী জানালা দিয়ে যে যে জ্ঞান ঐ জানালা সমীপবর্তীদের উদ্ভাসিত করে তুলবে, তারই কিছু বুদ্ধিমানের মত নিম্নভাগে পরিবেশন করে নিজেদের স্বার্থবৃত্তি অনুযায়ী রঙ্গিন করে নিয়ে বর্ত্তমানে যে ধরনের স্তর বিন্যাস সমাজে আছে তা' চিরন্তনী করে রাখতে পারবেন। তাই

এখনো পর্যন্ত দেশের মন্ত্রী, উপাচার্যরা ও আরও অনেকে বলে চলেছেন—এই ভাবে বিদেশী ভাষার মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষার বন্দোবস্ত না রাখলে আমরা দেশের অমঙ্গল টেনে আনবো। মাঝে মাঝে শুনা যায় যে, ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষা বোধ হয় বিজ্ঞান প্রচারে সহায়তা করবেনা। নতুন পরিভাষা দরকার হবে প্রত্যেক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই, অতএব সেই রকম চেষ্টা এখন হতে শুরু হতে পারে—তবে আমার দুর্ভাগ্য যে সেদিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সমাবর্তন উৎসবে এক উল্টো সুরে আমি কয়েকটি কথা বলেছিলাম। রবীন্দ্রনাথের পর বাংলা ভাষা যে, কোন কাজে অপটু এ আমি স্বীকার করতে নারাজ। জলে না নেমে সাঁতার শেখানোর দুরাশার মত, ভাষাকে শিক্ষার বাহন করবার চেষ্টা না করে শুধু পরিভাষা সৃষ্টির চেষ্টা আমার কাছে হাস্যকর বলে মনে হয়েছে। অবশ্য তার পর থেকে অনেক বাক্ বিতণ্ডা চলছে নানা প্রদেশে; এদিকে নিজের দেশে আমি দেখেছি যে, দরকার হলে দেশের শিক্ষিত বিজ্ঞানীরা উপযুক্ত পাঠ্য পুস্তক লিখতে পারেন—তার উদাহরণ বিরল নয়। তবে এখানেও বেকার সমস্যার ভয় দেখিয়ে প্রগতির চেষ্টা সব ব্যর্থ করে দিতে চাইছেন অনেকে। হায়দরাবাদে মাতৃভাষার স্বপক্ষে ওকালতি করার পর এক বন্ধু লিখলেন যে—বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষার আয়োজন হ'লে বাঙ্গালীর বেকার সমস্যা আরও সঙ্গিন হয়ে দাঁড়াবে। তাই আর্থিক অবস্থায় কুলিয়ে গেলে অভিভাবক আমরা ছেলেদের পাঠিয়ে দিচ্ছি সেই সব শিক্ষায়তনে যেখানে নিম্নশ্রেণী থেকেই ইংরাজী মাধ্যমে সব শেখানোর বন্দোবস্ত রয়েছে। জাতির ভবিষ্যতের সঙ্গে তার শিক্ষা ও আদর্শের কথা ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। কাজেই সাহিত্যের আসরে তার উপযুক্ত আলোচনার অবতারণা করা শক্ত। একসময় এই ধরনের বুলি কানে আসতো—অধীন জাতের আবার রাজনীতি চর্চা কেন? এখন তারই প্রতিধ্বনি শুনছি—যে বাঙ্গালী চাকুরে জাত, তার ভাবনা ভাববে তার কর্তারা—সে যেভাবে খুঁটে খেতে পারে সেই ভাবে চলুক। সাহিত্য রচনা কিংবা ভাষার ভবিষ্যৎ ইত্যাদি বড় বড় কথায় তার কি দরকার।

ভাবের তরঙ্গ আমাদের দেশে একটু দেরীতে পৌঁছায়। অবশ্য আজকের দিনে ভাবনার বালাই জলাঞ্জলি দিয়েছি। আমাদের কাছে বিভিন্ন দেশের প্রচার বিভাগ থেকে যে খবর আসে—তাই তর্জমা করে প্রকাশ করেই নিশ্চিন্ত। তাকে যাচাই করে দেখবার মত সামর্থ্য নেই। আমরা ইতিহাস পড়ি, রুশ, জাপান, মিশর ইত্যাদি দেশের নব জাগরণের খবর পড়ি। কিন্তু যদি বলা যায়, এসব দেশে দ্রুত

প্রগতি সম্ভব হয়েছে বিজ্ঞান শিক্ষা মাতৃভাষায় চালু করার ফলে এবং সেই ভাবে আমাদের দেশে শিক্ষা-নীতিতে পরিবর্তন আনলে, আমরাও তাড়াতাড়ি এগিয়ে চলতে পারবো, তখনই তর্কের ধোঁয়ায় আসল কথা চাপা পড়ে যায়। জাপানের কথা আমি অনেক জায়গায় বলেছি। সেদিন এক জাপানী বিজ্ঞানী কলকাতায় বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, বললেন—আমরা বিজ্ঞান বিদেশীর কাছে শিখেছি এবং হয়তো এতে সত্যকারের মৌলিক অবদান আমাদের খুব বেশী নেই—তবে যা আমরা শিখেছি, সবই জাপানীর উপযুক্ত রূপ দিয়ে তাকে আপনার করে নিয়েছি। কাজেই শিল্প বাণিজ্যে আমরা এই প্রচণ্ড প্রতিযোগিতার মধ্যেও নিজেদের জাহির করে রেখেছি। এই বক্তৃতার পর এক বিজ্ঞানী বন্ধু জিজ্ঞাসা করলেন স্নাতকোত্তরদের বিজ্ঞান শিক্ষার বন্দোবস্ত তোমাদের কোন ভাষায় হয়—জাপানী! যখন উত্তর দিলেন সে ভাষা মাত্র একটি, সেটি জাপানীর মাতৃভাষা ও তারই ব্যবহার চলেছে স্কুল-কলেজে, তখন জিজ্ঞাসু একটু আশ্চর্য হলেন, কথাটা বিশ্বাস করতে তাঁর ইচ্ছা হচ্ছিল না। এঁরাই বলে আসছেন এদেশে ইংরাজী মাধ্যম ছাড়া উচ্চ বিজ্ঞান শেখানো সম্ভব নয়। তাই এই অবিশ্বাসের সুর। এ মনোভাব আমাদের অনেক দিনের। প্রায় চল্লিশ বৎসর আগে শিক্ষার্থী হয়ে যখন ফ্রান্স দেশে রয়েছি তখন ইংলণ্ড থেকে সে দেশে বেড়াতে এলেন বাঙ্গালী এক ডাক্তার বসু। একদিন সেখানের আড্ডায় ভারতীয় ও ফরাসী দুইই উপস্থিত ছিলেন—তাঁর মধ্যে তিনি হাজির। ডাক্তারি শিক্ষার কথা উঠলো, বন্ধুটি জিজ্ঞাসা করলেন—সে দেশে Anatomy কি ভাবে শেখানো হয়। যখন শুনলেন ও দেশে Gray's Anatomy চলে না—তখন তিনি চোখ কপালে তুললেন। এই ভাবে আমরা ভাবতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। কেউ যদি বলে Shakespeare ক্লাশে বাঙ্গলা ভাষায় পড়াচ্ছি তখনই ব্যঙ্গের হাসি আমাদের মুখে ভেসে উঠে। যদিও সনাতনী গ্রীক্ সাহিত্য কিংবা আধুনিক জার্মান সাহিত্য যে তাঁরা তর্জমায় উপভোগ করেন সেটা স্বীকার করতে তাঁরা দ্বিধা করেন না।

শত শত বৎসর দাসত্ব করে আমরা যে কিছু নিজেদের মত করে ভেবে, নিজেদের ভাষায় শিক্ষার বন্দোবস্ত করতে পারি এবং সেই শিক্ষার ফল সুদূর প্রসারী হয়ে দেশের লোককে উদ্বুদ্ধ ও সঞ্জীবিত করতে পারে, এ ভরসাও হয়না আমাদের। ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা নাই বা তুললাম। কারণ এ সব ব্যাপারে বড়বাবু কিংবা ম্যানেজার হলেই খুশি হব। চাকুরে বাঙ্গালীর তাঁর বেশী ভাবনার কি দরকার!

বিজ্ঞান শিক্ষার কথা পেড়ে অনেক দূর এসে পড়েছি। সব জায়গায় শুধু একই

কথা বলে বেড়াই এইটে আমার বদনাম হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাই একথা আর বেশী বাড়িয়ে আপনাদের মন খারাপ করে দেব না। বিবেকানন্দজীর শত বার্ষিকীর বৎসর আপনারা সকলে একত্র হয়েছেন। কামারপুকুরে যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম-স্থান। আশা করি, এই দুদিনে আমরা সুপথের নির্দেশ পাবো। হেম বাবুর বিখ্যাত কবিতার চরণ ক'টি বদলে নিলে হয়ত সে উৎসাহের বাণী কানে ও মনে সাহস আনতে পারে—

"কিসের লাগিয়া হলি দিশেহারা
জ্ঞান বুদ্ধি জ্যোতি তেমতি প্রখরা
তবে কেন ভুমে পড়ে লুটাও।"

সপ্ততিতম জন্মদিবসে

শ্রদ্ধেয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র, প্রিয়বন্ধু হুমায়ুন কবীর, আমার গুরুস্থানীয় ডাঃ দেবেন বোস, তাছাড়া আরো যাঁরা আমাকে ভালোবেসেছেন—আরো বহু লোক যাঁরা এখানে উপস্থিত, সকলকেই আমি নমস্কার জানাচ্ছি।

সত্তর বৎসর কেটে গেলো জীবনের। এর পরে বলা যেতে পারে, প্রতিদিনটি ভগবানের দয়ার দান। মানুষের মাপা যে সময়—সে অতীত হয়ে গিয়েছে; যতদিন পর্যন্ত মানুষ নিজের শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে বিজ্ঞানচর্চা বা সমাজ-নীতিতে রত থাকতে পারে—সে সময় অতীত হয়ে গিয়েছে। এখনো অনেক সময়, হয়তো অনুতাপ করবার রয়েছে, যে সব অকাজের দুই-একটির এখানে উল্লেখ থাকবে, সেগুলো একটু কম করলে সত্যকারের কাজ, আরো কিছু হয়তো করা যেতো! তবে সত্যিই কিছু করা যেতো কিনা একথা স্বয়ং অন্তর্যামীও এখন বলতে পারবেন না! কেননা মানুষের মন কখন যে কী ভাবে, সেটা মননশাস্ত্রের মধ্যে থাকলেও সবসময় নিজের স্থির অনুভব হয় না কিসে তার ইচ্ছা যায় বা কী সাধনায় তার রত থাকা উচিত। এ সব ক্ষেত্রে আগে জ্ঞানচক্ষুর উন্মীলন অবশ্য গুরুর দ্বারা হতো—এখন সেটাও নির্ভর করে ভগবানের কৃপার উপর।

আমাদের জীবন যে সময় আরম্ভ হয়েছিল, তখন তুমুল আন্দোলন চলছিল এ দেশে—সে কথা কালও এখানে বলেছি। আমরা যে কয়জন সে সময়ে প্রথমে বিজ্ঞানের দিকে ঝুঁকে দেশের জন্য কিছু-না-কিছু করতে পেরেছি, সবাই প্রায় একই সময়ে আমরা কলেজে ঢুকেছিলাম—এই কথা আজ মনে পড়ে। এর মধ্যে বহু বন্ধু চলে গিয়েছেন। তাঁদের কথা আমাদের দেশের ইতিহাসে লেখা থাকবে। তাঁরা যে শুধু বিজ্ঞানে নাম করেছেন তা নয়, অনেকেই গঠনমূলক কাজে কৃতিত্ব দেখিয়ে গেছেন, সেকথা বাঙালী ভুলতে পারবে না। ডাঃ সাহার কথা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। এক দিকে তিনি যেমন মহেন্দ্রলাল সরকারের প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান অ্যাসোসিয়েশনের রূপ বদলে দিয়েছেন, অন্য দিকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত করে দিয়েছেন যে বিশেষ বিষয়ের

পড়ানো ও অনুসন্ধান—সেটা এখন তাঁর নামের সঙ্গে জড়িত হয়ে রয়েছে। আজ একভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে, অন্য ভাবে ভারতবর্ষে যে নিউক্লিয়ার বিজ্ঞানের চর্চা চলেছে নানা স্থানে, তার অভিযান শুরু হয়েছিল ডাঃ মেঘনাদ সাহার বিশেষ প্ররোচনায়।

আমাদের ছাত্রাবস্থায় অল্প কিছু শিখবার পরই প্রথম মহাযুদ্ধ বেধে গেলো। নতুন নতুন অনেক আবিষ্কারের খবর পেলাম যুদ্ধ শেষ হবার পর। দেখা গেলো প্রতিযোগিতা করে দুই পক্ষই বিজ্ঞানে বহুদূর এগিয়ে গিয়েছে। আমরা বহুদিন তার খবর পাই নি—সে সময় বিদেশ থেকে বিজ্ঞানের কাগজ এদেশে বেশি আসতো না। আর আমাদের দেশে যে সব কেতাব পরীক্ষার জন্য পাঠ্য ব'লে বিবেচিত হতো—তাতেও সে সব খবর ওঠে নি। মনে আছে, বহুদিন অন্তরীণ অবস্থায় জার্মানীতে থেকে ডাঃ দেবেন বোস যে জ্ঞান আহরণ করে আনছেন, ফিরে আসার পর তাঁর কাছ থেকে খবর পাবো, এই মহাযুদ্ধের মধ্যে জার্মানীতে কিভাবে বিজ্ঞানের নানা বিষয়ের উন্নতি হয়েছে—সেই সুযোগের দিকে আমরা সতৃষ্ণনয়নে চেয়েছিলাম। আমার তখনো জার্মান ভাষার সঙ্গে পরিচয় হয় নি, আর ডাঃ সাহা অল্প কিছু পড়ে ইণ্টার পরীক্ষায় যোগ্যতা-সার্টিফিকেট জোগাড় করেছিলেন। আমাদের আকাঙ্ক্ষা ছিল অসীম। Dr. Brühl-এর বাড়ি গিয়ে, লাইব্রেরী খুঁজে খুঁজে দরকারী অনেক বই সংগ্রহ করেছিলাম, যা হয়তো Brühl সাহেব নিজেও পড়েননি। তবে তার মধ্যে Maxwell, Boltzmann, planck এবং আরো অনেক বিজ্ঞানীর লেখার মধ্যে যে খবর মিললো, তাতে আমরা একেবারে মোহিত হয়ে ডুবে গেলাম। এমন সময় এসে পড়লেন ডাঃ দেবেন বোস। জার্মানীতে মহামতি Planck-এর ৬০ বৎসর পূর্তি উৎসব উপলক্ষে যে সব বিবৃতি সে দেশের পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল—তিনি সঙ্গে এনেছিলেন সেগুলি। তার মধ্যে নতুন বিজ্ঞানের অনেক নতুন খবর—যা আমরা জানতাম না—অল্প কথায় তারই বিবরণী রয়েছে। তাঁকে আমরা ধরে বসলাম। তিনি পড়ে শোনাতেন—আমরা চেষ্টা করতাম, বিশেষ করে আমি (কারণ ডাঃ সাহা সবসময় উপস্থিত থাকতেন না)—সেই বিবৃতির প্রত্যেক কথার তর্জমা ক'রে নিজের মনোমত ইংরাজিতে রূপ দেবার। এতে একটা সুফল হয়েছিল। যেমন বিজ্ঞানের অনেক নতুন খবর পেলাম—আবার সরাসরি জার্মান ভাষার সঙ্গেও একটা পরিচয় হয়ে গেলো। সাহসও বেড়ে গেলো অনেক। ১৯১৯ সালে সূর্যগ্রহণের কিছু পরে, সারা বিশ্বের তথা আমাদের দেশের

কাগজেও একটি চমকপ্রদ ঘটনার খবর বের হলো—আইনস্টাইনের থিওরী সম্পূর্ণভাবে প্রমাণিত হয়ে গেছে। আমরা সকলে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। নিউটনের পরে আইনস্টাইন কী নতুন কথা বললেন, সকলেই তা জানবার জন্য ব্যাকুল। আমরা কষ্ট করে সেই সব প্রবন্ধ তর্জমা করি। কিছুটা আমি ও কিছু ডাঃ সাহা। বইও হলো। তার মুখবন্ধ লিখেছিলেন বন্ধু প্রশান্ত মহলানবিশ—তখন তিনি কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপক—Relativity পড়ান। বইখানি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছাপিয়েছিলেন ; অবশ্য ছাপিয়েছিলেন, এ কথা বোধ হয় তাঁদের মনেও নেই। বহুদিন বইখানি এই প্রাচ্যদেশে চলেছিল। তারপর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কিছু আগে জার্মানীতে জাতিবাদ জেগে উঠলো, এটি এমন বিকট রূপ নিলে, যে সেই দেশ থেকে অনার্য সব জাতিদের তাড়াবার সরাসরি বন্দোবস্ত হলো—বহু সংঘর্ষ হলো নানা শহরে, যার মধ্যে গুপ্তভাবে ছোরাছুরিরও ব্যবহার হলো অনেক। আমার গুরুদেব আইনস্টাইন তখন দেশের বাইরে—সেইখান থেকেই তিনি তার প্রতিবাদ করলেন। ফলে তাঁকেও দেশত্যাগ করতে হলো। আমাদের বইখানির চলনও বন্ধ হয়ে গেলো এর কিছু পরে।

মানুষ যখন জাতীয়তাবাদকে তার জীবনের শ্রেষ্ঠ জিনিস ব'লে মনে করে—তখন মানুষের কর্তব্য ও করণীয় বিষয়ে তাদের যে নিরিখ—সেটাও অত্যন্ত বিকৃত হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রেও তাই দেখা গেলো। আমি সে সময়ে ঢাকায়, বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করি। দুই-একজন জার্মান বন্ধুও ছিলেন সেখানে। তাঁরা বললেন, 'একি, আপনার বন্ধু এ কী করলেন।' আমার বন্ধু বলে যে তাঁরা আমার নাম তাঁর নামের সঙ্গে যুক্ত করলেন, এইটে আমার জীবনের সবচেয়ে বড় সৌভাগ্য বলে মনে হলো। কেননা যার জন্য আমার নাম—সেই প্রবন্ধ হাজার ছোট হলেও স্বয়ং আইনস্টাইন তর্জমা করেছিলেন—খুব কম লোকই এ রকম কথা ব'লে গর্ব করতে পারবে। এ বিষয়ে আবার সে সময় যা কিছু করণীয় বা বিস্তারের কথা ভাবা যেতো, আমার প্রবন্ধ হাতে পড়ার তিন মাসের মধ্যে সব কিছু শেষ করে দুখানা নিবন্ধও লিখেছিলেন তিনি। অবশ্য তারই মধ্যে এক জায়গায় আমার নামের বদলে ডাঃ ডি. বোসের নাম রয়েছে। এটা খুবই কৌতূহলোদ্দীপক, তবে এটা দেখেছি বিদেশীরা বসু পরিবার বলতে একটাই বোঝে অনেক সময়। এর অল্প পরেই বিদেশ যাবার সুযোগ হয়েছিল আমার। তখন বিদেশে তাঁর প্রশংসাই আমার ছাড়পত্র হয়েছিল। এর ফলে অল্প আয়াসেই এমন সব লোকের সঙ্গে দেখা

করার ও বিজ্ঞান আলোচনা করার সুযোগ জীবনে এসেছে—যা খুব কম লোকেরই ভাগ্যে জুটে থাকে। Madame Curie, Prof. Langevin কি Prof. Gehrcke বা আরো অনেক বিজ্ঞানী যাঁদের নাম বিজ্ঞান-জগতে চিরস্মরণীয় হয়েছে, এঁদের সকলের সঙ্গে কথাবার্তা বলার, তাঁদের কাজ কীভাবে চলেছে—এমন কি সাতমহল সুরক্ষিত পুরী ভেদ করে সেইসব রহস্যের সঙ্গেও আমার পরিচয় ঘটেছিল, যা সাধারণতঃ বিদেশীর চোখের অন্তরালে থাকতো। বার্লিনের সরকারী লাইব্রেরী Staat Bibliotheki থেকে বই ধার করতে পয়সা জমা রাখতে হতো না। অধ্যাপক আইনস্টাইনের ছাড়পত্র ছিল বলে সে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের মত আমিও একসঙ্গে তিন-চারখানা বই বাইরে নিতে পারতাম।

এ সব অবশ্য প্রাক্-হিটলারী যুগের কথা। সেই সময়ে প্রায় দুই বৎসর ইয়োরোপ-প্রবাসে কাটাতে পেরেছিলাম। কাজেই সেই সময়ের কথা বেশি করে মনে অছে। আমরা জ্ঞানের পূজারী বলে নিজেদের প্রচার করি, কিন্তু সে দেশে দেখেছি, সেইসময় সত্যকার জ্ঞানের পূজারীরা কী পরিমাণ শ্রদ্ধা ও ভক্তি পেতেন ওদেশের লোকের কাছে। আজকাল আর ঠিক সে রকমটি নেই। পরে উগ্র হিটলারীয় জাতীয়তাবাদীদের কাছে অনেক বিজ্ঞানী-অধ্যাপকদের নাজেহাল হতে হয়েছে—এ যাঁরা ইতিহাসের খবর রাখেন তাঁরাই জানেন। আমরা যারা একসময়ে ভেবেছিলাম বিজ্ঞানের চর্চা করে এমন-একটা কিছু ঐতিহ্যের প্রতিষ্ঠা করা যাবে এ দেশে, যার ফলে দেশ-বিদেশে ভারতবর্ষের নাম শুধু বেদান্তের দেশ বলে শ্রদ্ধা ও স্বীকৃতি পাবে তা নয়, বর্তমান ভারতবাসী—শুধু জগৎজোড়া নাম যে আর্যজাতির, তারই অবজ্ঞাত আত্মীয় হিসাবে চিরকাল গণিত থাকবে না—এ যুগের সভ্যতায় তাদের অবদানও স্বীকৃত হবে। জার্মানজাতও আমাদের উপনিষদ ও দর্শনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তারা মনে করে ভারতের প্রাচীন আর্য অধিবাসী, আর বর্তমান জার্মান জাতির মধ্যে একটা নিবিড় সম্পর্ক আছে। তবে তারা ভাবে বর্তমানে যারা এই ভূমিতে বাস করে, তারা শুধু সেই নামের অধিকারী—তাদের সঙ্গে ঠিক সেরকম আন্তরিক যোগ নেই সেই মহাজাতির। যেমন এখন গ্রীসে যে জাতি বাস করছে তাদের পূর্বপুরুষ মাসিডোনিয়ার পার্বত্য প্রদেশের অধিবাসী ছিল—তাদের ঠিক গ্রীক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী বলা যায় না। সেইরূপ আমাদের প্রতি জার্মানদের উন্নাসিক অনুকম্পাই প্রকট বলে মনে হতো অনেক সময়। অবশ্য আজ আমরাও কি নিজেদের বুকে হাত রেখে বলতে পারবো পূর্বপুরুষেরা যে সব কথা বলে গিয়েছেন

—তা আমরাও মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি? যেমন আমরা বলি সর্বভূতে সমদর্শন আমাদের ঐতিহ্য. আবার অন্য দিকে এই থীসিসও জাহির করছি যে আমাদের দেশে যে জাতিভেদ রয়েছে—এইটি পৃথিবীর সমস্যার একটা মস্ত বড় সমীকরণ। এ কথা অনেকেই বলছেন এবং এ দেশের অনেক লব্ধপ্রতিষ্ঠ দার্শনিকও আছেন যাঁরা এ বিষয়টি খুব ভাল করে বোঝাবেন। তবে তাঁরা করবেন চতুর্বর্ণের ওকালতি —আজকাল যে নানারকমের জাতের বর্ণালীর সৃষ্টি হয়েছে তার বিষয়ে তাঁরা নীরব থাকেন। ভারতবর্ষের স্বর্ণযুগের কথা বলে আমরা বড়াই করি, তবে সে সময়ে এ দেশের মধ্যেই যে সব অনগ্রসর জাতি ছিল, তাদের প্রতি আমাদের ব্যবহারের কথা সব সময় বলতে চাই না। তবু মাঝে-মাঝে বেরিয়ে পড়ে সে সব কথা। যেমন রামরাজত্বে বেচারি অনার্য শম্বুককে বড়ই খারাপ অবস্থায় পড়তে হয়েছিল। কেননা তিনি চেষ্টা করেছিলেন—আর্যরা যে সব জিনিস নিয়ে বড় হয়েছে, তপস্যা করে তিনিও সেই সব পেতে চেয়েছিলেন। তার ফলে নাকি আর্যদের দেশে অনাবৃষ্টি হলো এবং আর্যরা দেখলেন এমন লোককে বাঁচতে দেওয়া ঠিক হবে না। অতএব রাম-রাজত্বেও তাঁর মৃত্যুদণ্ড হলো। কথাটা কিছু অবান্তর ঠেকবে--- তবে ছাত্রাবস্থায় আমাদের মনোভাব বুঝতে গেলে এইটুকু বলা দরকার যে, আমরা একেবারে পুরাকালের অবস্থা ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলাম এ দেশে, তা ঠিক নয়। দেশকে স্বাধীন দেখতে চেয়েছিলেন আমাদের অনেকে---সেই সময়ে অনেকে নানাভাবে চিন্তা করতে শুরু করেছিলেন, ইংরেজকে হটানো যাবে কী করে।

কিছুদিন আগে যেমন 'আংরেজী হঠাও'-আন্দোলনের মধ্যে গিয়ে জুটেছিলাম, তেমনি তখনকার দিনে 'ইংরাজ হটাও' এই বাণী নিয়ে চিন্তা করতে-করতে আমরা নানা দিকে নানা ভাবের স্রোতে ভেসে গেছি। আমাদের কেউ কেউ ভেবেছিলেন এ দেশের জনসাধারণকে শিক্ষা দিতে হবে। সাধারণ লোককে বুঝতে হবে তারাও এই দেশেরই। কিন্তু এই বুঝতে গেলে, তাদের গুরুদেব বা তার ভিটার যে জমিদার—তাঁরা এই কথা বলছেন বলেই তাঁদের বিশ্বাস করতে হবে সেকথা, তা নয়—তাঁদের লেখাপড়া শিখিয়ে এটি মনে-প্রাণে অনুভব করানো দরকার। এ জন্যে আমরা কলকাতা শহরে জনশিক্ষার কিছু বন্দোবস্ত করেছিলাম। নৈশ বিদ্যালয় খোলা হয়েছিল—তা কিন্তু বেশিদিন টিঁকে থাকে নি। ইংরেজ মনে করলে, এখানেও হয়তো বোমা তৈরীর ফরমূলা শেখানো হচ্ছে। কাজেই সেগুলি খুব বেশি দিন চালানো যায় নি। সে সব এখন লোকের মনে থাকবার কথা

নয়। আরেক দিকে, যাঁরা বোমাতে বিশ্বাস করতেন, তাঁরা বলতেন—দেখ, এ সব ছেলেমানুষী কোরো না। একবার ইংরাজ তাড়াই, তারপর দেখো, সব ঠিক করে ফেলবো। ইংরাজ আজ চলে গিয়েছে। আমার যে সব উগ্রপন্থী বন্ধু, তাঁরাও চলে গেছেন অনেকে—কেউ কেউ যাঁরা আছেন তাঁরা এখন বলছেন—তাই তো! অত সোজা নয় সর্বসাধারণের শিক্ষার আয়োজন, যা ভেবেছিলাম! মাঝে মাঝে মনে হয় আমাদের পুরাতনী মনোভাব—সর্বভূতে সমভাব, সেইটুকুও যদি আমাদের সত্যসত্যই থাকতো তবে আজকের দুর্দিনে যে নানারকমের নতুন বিপদ মাথা তুলছে—সেগুলি কি অঙ্কুরেই বিনষ্ট হতো না? ঠিক কিছু বলা শক্ত। তবে আজকের দিনেও আমাদের ভারতে এমন জ্যোতিষী অনেক আছেন—যাঁরা বিশ্বাস করেন—যা ঘটবে, যা করবো আমরা, সবই নাকি আগে থেকেই আমাদের কপালে লেখা আছে। শুধু এ জন্মের নয়, আগের দুই জন্ম, পরের তিন জন্ম, সবই জাতকের রাশিচক্র কেটে পাওয়া যাবে। এ আমাদের অনেকের মজ্জাগত বিশ্বাস। এমন কি আমার এক মুসলমান বন্ধু একবার কাশীতে গিয়ে তাঁর ছক কাটিয়ে দেখলেন যে তাঁর স্ত্রীর নামের প্রথম অক্ষর পর্যন্ত তার থেকে বেরিয়ে পড়লো। তিনি অত্যন্ত বিচলিত হয়ে ফিরলেন—আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এটা এরা কি করলো ও কী-ভাবে?' ভারতের বিজ্ঞানীকে এরকম অনেক কুটিল প্রশ্নেরও জবাবদিহি করতে হয়। যেমন জন্মজন্মান্তরের কথার সঙ্গে বৈজ্ঞানিক বিবর্তনবাদের সমন্বয় কি সম্ভব? বিজ্ঞানী শরণ নেন দার্শনিকের—দার্শনিকরা একটু হাসেন মাত্র! বিজ্ঞানীরা মনে করেন তাঁদের বলা উচিত,—এই শাস্ত্র, দর্শন-জ্ঞান, কি ধর্ম—এসব এমন কিছু নয়। মানুষ প্রত্যহ যে কাজ করার প্রেরণা পাচ্ছে সেটা নষ্ট হয়ে যাবে এ সবের প্রভাবে। যদি বলা যায়, যাই করো আর তাই করো—শেষে যা দাঁড়াবে সবই আগে থেকে লেখা আছে—তাহলে তো কারুর কাজ করার চেষ্টা হবে না। আজকের দিনে যা মনে করছি—আমরা আজ যার জ্বালায় জ্বলছি—সে জ্বালা নিবারণ করতে কারোর চেষ্টা হবে না। তারজন্য তারকেশ্বরে বা কালীঘাটে ধন্না দিলেই হবে। জন্মান্তরবাদ বিজ্ঞানীদের কাছে প্রকাণ্ড রহস্য। এর মর্ম ভেদ করতে অনেক বিজ্ঞানী মাথা কুটছেন। আমার মনে আছে এক-দিনের ঘটনা। এক সাধুর কাছে গিয়ে এই প্রশ্নের অবতারণা করেছিলাম। তাঁকে আমি খুব শ্রদ্ধা করতাম—বন্ধুবর বিধুভূষণ রায়ও তাঁকে শক্তিশালী মহাপুরুষ বলে বিশ্বাস করতেন, কারণ সায়েন্স কলেজে মারাত্মক রোগে তিনি যখন হতজ্ঞান

হয়ে পড়েছিলেন, সেই সময় ঐ সাধুর করুণায় তিনি বেঁচে উঠেছিলেন বলে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। সাধুকে একদিন সুযোগমতো আমরা দুজনে জিজ্ঞাসা করলাম, 'বাবা জন্মান্তর কি সত্য?' তিনি উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ।' কিন্তু আমরা দুজনে কেউই মনকে মানাতে পারছি না। তাকে বারবার জিজ্ঞাসা করছি, 'আচ্ছা আপনি বলছেন যে জন্মান্তর আছে, এটা কি আপনি নিজে জেনেছেন?' তিনি উত্তর দিলেন, 'তাঁকে বলেছেন আর একজন যোগী।' এতে কি বিধুভূষণ, কি আমি, কেউই সন্তুষ্ট হলাম না। বারবার ওই একই প্রশ্ন, নানাভাবে। শেষ অবধি তিনি একটা গান ধরলেন ও ভাবে তন্ময় হয়ে তাঁর চোখের জল পড়তে লাগলো। গানের ভাবার্থ—"মা তুমি আমাকে কোথায় ফেললে? এই অরণ্যে কাঁটা-বনে আমার সারা অঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল—মা তুমি আমাকে কোলে তুলে নাও।" সেদিন বিফলমনোরথ হয়ে ফিরে এলাম। তারপর থেকে মাঝে-মাঝে মনে হয় বাঙালী জাতি আজকের দিনে নানাভাবে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। হয়তো মা একদিন এদের কোলে তুলে নেবেন, তবু সেই সঙ্গে মনে হয় মাকে এইরকম ভাবে বিব্রত করার আগে নিজেরা যেটুকু পারি যন্ত্রণা উপশম করতে, সেটুকু করে দেখাই ভাল। এই করে দেখার জন্য যে চিন্তা ও আত্মবিশ্বাস দরকার তা আনতে সকলকে নাস্তিক হতে হবে, তা নয়। শুধু মনে রাখতে হবে যে হাজার হাজার বছরে পৃথিবী অনেক বদলেছে। আগের দিনের প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধির মধ্য দিয়ে যে আনন্দ উছলে পড়তো আমাদের দেশে—এখন আর সে পরিবেশ নেই। আজকের যে সব সমস্যা, তা আগেকার মানুষের হৃদয়ঙ্গম হতো না। কাজেই পুরনো চিন্তাধারার মধ্যে সে সমস্যা সমাধানের সূত্রও পাওয়া যাবে না। প্রত্যেক শতাব্দী হাজির করছে জাতির সামনে নানা রকমের সমস্যা। এই বৈষম্য, এই সমস্যার সমাধান—আমাদেরই দায়িত্ব।

রূপকথার রাজপুত্র একদিন Sphinx রাক্ষসীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—মানুষের ভবিষ্যৎ কি ও তার কি করা উচিত। রাক্ষসী উত্তর দিয়েছিল, 'মানুষের উচিত ছিল—না জন্মানো। আর যদি বা জন্মালে তো যত শীঘ্র পারে সে মরে যাক—তাতেই তার মঙ্গল। রাক্ষসী অন্তর্হিত হয়েছে—তবু সেই নিদারুণ নিরাশার বাণী আমাদের মনে ভেসে ওঠে মধ্যে-মধ্যে, বিশেষ করে যখন বিপদে কুল খুঁজে পায় না মানুষ। তবে ইতিহাস ইঙ্গিতে জানাচ্ছে যে, মানুষের মনও বদ্‌লে চলেছে। দ্বেষ-হিংসার বিরাম হয় নি সত্য—মানুষ গোলাগুলি চালাচ্ছে, হত্যা করছে, কিন্তু

তারই মাঝে আবার চেষ্টা চলছে আর্তের ত্রাণের জন্য। নিজের পকেট থেকে পয়সা খরচ করছে বা নিজের জমির ধান থেকে বাঁচিয়ে উপবাসীদের খাওয়াচ্ছে। নিরাশার ঘন অন্ধকারের মধ্যে হয়তো মানব-ভবিষ্যতের সুদিনের সংকেত মিলবে—এই সব ছোট ঘটনার মধ্যে।

নানা কারণে মনে হয়—আমরা যৌবনে যে সব স্বপ্ন দেখেছিলাম—তার অতি অল্পই হয়তো বাস্তবে পরিণত হয়েছে। তবু এখন থেকে নৈরাশ্যের ভারে বাঙ্গালীর বসে পড়লে চলবে না—এই ভেবে যে, দিনের পিঠে দিনের-নীরস-পাতা উল্টানো ছাড়া আর আমাদের কিছু করবার নেই—কিংবা আগে থেকে সবই ঠিক করা আছে, আমাদের নতুন পথ খোঁজবারও কোন দরকার নেই, এই মনোভাবের পরিবর্তন নিতান্ত দরকার। এই দেশের আচার্য জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, ডাঃ সাহা—তাঁরা সারা জীবন উৎসর্গ ক'রে গেলেন বিজ্ঞানের সেবায়—তার ফলে কেবলমাত্র ডিগ্রি কিংবা চাকরী, এইটেই বাঙালীর পক্ষে শেষ কথা হয়ে দাঁড়াবে বা নতুন ব্যবস্থায় সরকারী চাকরীর শতকরা এতটা অংশ বাঙালীর থাকা উচিত এই মনোভাবেই পর্যবসিত হবে, বাঙালীজাতির আদর্শবাদ—এটা ভাবতে ইচ্ছা যায় না। পরের জন্য ভাবা বাঙালীর পক্ষে নতুন নয়। বাঙালী নিজের ছোট স্বার্থ বলি দিয়ে অনেক সময় তার মহৎ স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করতে চেয়েছে। তাই মনে হয় বাঙালীর কাছে পাওয়া চাই বড় রকমের কিছু, যেটা দেশের জীবনসমস্যার সমীকরণে কাজে লাগতে পারে। এই সার্বিক দৃষ্টি বাঙালীজাতির আছে বলে আমার ধারণা। বাঙালীর ঐতিহ্যও এ বিষয়ে আমার পক্ষে সাক্ষ্য দেবে। শ্রদ্ধেয় বন্ধু প্রফুল্লচন্দ্র আজ মুখ্যমন্ত্রী হয়ে বসেছেন—প্রথম জীবনে সমাজসেবার জন্যে কত চেষ্টা করেছেন তিনি—আজকে তাঁর সে অভিজ্ঞতা দেশের ও সমাজের কল্যাণে ফলপ্রসূ হবে বলেই আমার ধারণা। তবে কেউ কেউ নৈরাশ্যের সুরে বলবেন, শ্রীকৃষ্ণ যখন মথুরার সিংহাসনে বসে-ছিলেন তখন তিনি রাজকার্যের চাপে বৃন্দাবনের কথা ভুলেছিলেন। আমি আশাবাদী। আমি ভাবি কলিকালে শ্রীকৃষ্ণের সে অবস্থা নাও হতে পারেতো। বাঙালীর মানবিকতা বা বিশ্বপ্রীতি প্রতীচ্য থেকে নতুন আমদানী নয়। প্রাতঃস্মরণীয় রামমোহন রায়ের বিষয়ে পড়েছিলাম—তিনি একদিন শুনলেন, দক্ষিণ আমেরিকার কোন দেশের লোক নাকি স্বাধীনতা লাভ করেছে—আনন্দের উচ্ছ্বাসে সেদিন একটা ভোজের আয়োজন করলেন তিনি। এটা শুধু লোক দেখানো বহিরাচার

মাত্র বলে আমি ভাবতে পারি না। কারণ ভোজের মধ্যে অন্য লোকদের সঙ্গে নিজের মনের আনন্দ প্রকাশ ওইখানেই তাঁর শেষ হয়েছিল। সেকথা পরের দিন খবরের কাগজে বড় বড় অক্ষরে ছাপা হয়েছিল বলে মনে হয় না, কিংবা রাজা রামমোহনকে কোনো ডিগ্রি বা খেতাব দেওয়া হয়েছিল বলেও জানা নেই। এই যে মনের ভাব—মানুষ মাত্রেই মানুষের একান্ত আপনজন—এটা হয়তো আছে সকলেরই মনে, তবু কার্যক্ষেত্রে নিজেদের ছোট স্বার্থকে আমরা বড় করে দেখি বলেই সে ভাব মনের মধ্যে তলিয়ে যায়।

নানা দেশ ঘুরে-ঘুরে অনেক বিচিত্র অভিজ্ঞতা জমেছে। ঢাকায় থাকতে হিন্দু ও মুসলমানের নানা রকম গোলমালের মধ্য দিয়ে নানা জায়গায় যেতে হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে দেখেছি স্নেহ কি সহানুভূতি মুসলমানের জন্য হিন্দুর, কি হিন্দুর জন্যে মুসলমানের, একেবারেই দুষ্প্রাপ্য নয়। অবশ্য আমরা ধর্মের নামে খুব বেশি মেতে উঠি। তাই আমি ধার্মিকদের ভয় করি—বিশেষ যখন ধর্মের কথা তাঁরা বেশি করে বলেন, সে সময় তাঁদের কাছে না ঘেঁষাই শ্রেয়। চীনদেশে নাকি ধর্মের এতটা প্রতাপ নেই। সেইজন্যে তারা তাড়াতাড়ি অনেকদূর এগোতে পেরেছে। যদিও শোনা যাচ্ছে যে great leap forward তাড়াতাড়ি চালু করতে গিয়ে তারা শেষ অবধি খানায় প'ড়ে গিয়েছে। বরাবরই বাংলাদেশের একটা স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ছিল—আমরা খুব বেশী ধর্মধ্বজী ছিলাম না কোনও কালে। হিন্দু-মুসলমান এক পঙক্তিতে খাওয়াও খুব বিরল ছিল না—আবার সাহিত্যে মুসলমান ও হিন্দু লেখকেরা ঘেঁষাঘেঁষি করে ব'সে আসর জমিয়ে রেখেছিলেন। একসময় আমরা ভেবেছিলাম যে হিন্দু-মুসলমান আমরা দুজনে বাংলামায়ের সংসার একত্রে গড়ে তুলবো। বাংলার মাটিতে কত লোকের, কত হিন্দু-মুসলমানের আশা-ভরসা মিশিয়ে রয়েছে—তার কথা এখন কে বলবে। ইচ্ছা ছিল আমাদের এখানে আমরা এমন একটা সম্প্রীতি গ'ড়ে তুলব, যা সত্যই এ পৃথিবীকে উপহার দেওয়ার জিনিস হবে। কিন্তু সে সব আশা-ভরসার কাল্পনিক প্রাসাদ মাটিতে ভেঙে পড়েছে। কালের যে নিদারুণ রূপ ফুটে উঠছে দিন দিন—তার তাড়নে আমরা শেষ অবধি কোথায় গিয়ে ঠেকবো কেউই এখন বলতে পারে না।

ছোট-ছোট ছেলে মেয়েরা বিজ্ঞানের জন্য উৎসাহ নিয়ে যারা আজকে এসে জুটেছ—তোমাদের আমার বলার ইচ্ছা করে যে শুধু পরীক্ষা-পাশের জন্য বিজ্ঞানের দিকে ঝুঁকো না। দেশকে বুঝতে, দেশের সব সমস্যা জানতে, এ দেশের মানুষের

দুঃখের কারণ খুঁজতে এবং অন্য অন্য দেশে মানুষের জন্য মানুষ কি করছে—তার পরিচয় পেতে যেমন এক হিসাবে চাই সাহিত্যে প্রবেশ লাভ, তেমনি চাই বিজ্ঞানের চর্চা। তার মাধ্যমে জানবে মানুষ কতটুকু কি করতে পারে সেই মানুষের দুঃখ দূর করতে। বিজ্ঞানের প্রতি তোমাদের আকর্ষণ এই জিজ্ঞাসার ভিত্তিতে হওয়া উচিত। আজকের দিনে অনবরত এই কথা শোনা যাচ্ছে যে মানুষ আর পৃথিবীতে থাকতে চায় না। দিনকতক বাদে সে উড়ে চ'লে যাবে হয় মঙ্গলগ্রহে, নয় আরো অনেক দূরে। আমরা হয়তো পৃথিবীর অবস্থা এমন খারাপ ক'রে ফেলেছি যে এখানে আর থাকার সহজ উপায় নেই। সভ্য জাতির কে একজন বলেছিলেন—'লক্ষ কোটি টাকা খরচ ক'রে আমরা একটা রকেট ছুঁড়ে দিচ্ছি—সেই টাকা যদি এইভাবে না উড়িয়ে আমাদের দেওয়া হতো, তা হ'লে হয়তো অল্প আয়াসেই এমন-একটা কিছু করা সম্ভব হতো—যাতে দেশের লক্ষ লোকের ক্ষুধা দূর হয়। সে সব কথা কেইবা কাকে বলবে? এ সব কথা বলবার জন্য আপনারা রইলেন—আমি এইখানেই চুপ করলাম।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে

আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন সমারোহে প্রধান অতিথিরূপে যোগদান করার আমন্ত্রণ পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করছি। এদিকে বয়স আশীর কোটায় পৌঁছেচে, শরীর অপটু; মনও তার সাবলীল সচ্ছন্দতা হারাতে বসেছে, তাই একটু সঙ্কোচ জেগেছে কি বলবো? এই সুধীজনের আসরে চারিদিকে জীবন্ত বুদ্ধিদীপ্ত নবীনদের মুখ দেখছি—এঁরা বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাসে অধ্যয়ন শেষ করেছেন—অনুসন্ধানে যশস্বী হয়েছেন, নতুন আলোকপাত করেছেন জড়ের ও জীবনের নানা সমস্যার উপর। তাই এখন বেশী করে মনে পড়ছে পুরানো কথা। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে আমি একদিন ছাড়পত্র নিয়ে বের হয়েছিলাম। পরে জীবনের এই দীর্ঘপথে নানা বিপরীত অবস্থার সম্মুখীন হ'তে হয়েছে, মনে জমেছে অনেক রকমের অভিজ্ঞতা—তাতে আছে পরাজয়ের দৈন্য, জয়ের আনন্দ—মহাপুরুষের সংসর্গ ও বিশেষ করে পরাধীনতার গ্লানি মুছে স্বাধীন জাতির পংক্তিতে বসতে পাওয়ার অনির্বচনীয় আত্মপ্রসাদ। হয়ত পুরোগামী বর্ষীয়ানের অভিজ্ঞতা থেকে নবীন যাত্রীরা কিছু পথ চলার সঙ্কেত পেতে পারেন—এই ভরসায় বলতে শুরু করলাম।

স্কুলের পড়া তখনও শেষ হয়নি— এলো দেশে স্বদেশীয়ানার জোয়ার। কিশোর বয়সে রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছি—রাখীবন্ধনের গান গেয়ে অনুভব করতে চেয়েছি, ভাই ভাই আমরা সকলে, জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলেই ভারতমাতার সন্তান। দীন ভারত মাতার দুঃখ দূর করতে হবে, পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙ্গতে হবে—বিদেশীর নিষ্করুণ শাসন ও শোষণনীতি থেকে বাঁচিয়ে তুলতে হ'বে পুরাতন ঐতিহ্য সম্পন্ন একটা মহাজাতিকে। তাদের সেকেলের বংশধরদের মধ্যে বর্তমানের মনোভাব জাগিয়ে তুলতে হবে—নিরক্ষরতা দূর করতে হবে। সেদিনের যুবকেরা ভবিতব্যের চ্যালেঞ্জ এইভাবে বুঝেছিল। সেদিন রাস্তায় রাস্তায় সভাসমিতিতে কত বাগ্মী দেশভক্ত মহা-পুরুষেরা বক্তৃতা করতেন, দেশবাসী যুবকদের উদ্বুদ্ধ করতে চাইতেন। সে সব গল্প করতে ইচ্ছা হয়।

প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করে প্রেসিডেন্সী কলেজে জায়গা পেলাম। চিরস্মরণীয় দেশমান্য শিক্ষকদের কাছে পড়বার সৌভাগ্য হয়েছিল। আচার্য জগদীশচন্দ্রের

কাছে তাঁর বেতার ঢেউয়ের আবিষ্কারের কথা শুনেছি। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের কাছে রসায়নের হাতে-খড়ি হয়েছে। প্রোঃ পার্সিভ্যালের কাছে ইংরেজী পড়ার অসামান্য সুযোগ পেয়েছিলাম। এসব কথা এখনো বলতে গর্ব বোধ করি।

কলেজের ছয় বৎসর শেষ করার আগেই প্রথম মহাযুদ্ধ সুরু হয়ে গেল। স্বদেশী আন্দোলনের বিরুদ্ধে জেগে উঠেছিল সর্বত্র বিদেশী শোষকের নিষ্করুণ অত্যাচার। ফলে খোলা রাজনীতি তলিয়ে গিয়ে বিপ্লবের যুগ ডেকে আনলো বাংলা-বিহার-উত্তরপ্রদেশ-পাঞ্জাব-মহারাষ্ট্র সর্বত্রই। কত মহাপ্রাণ দেশের জন্য আত্মবলি দিলেন, সহযাত্রী কত দেশবিদেশে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো। জীবনের দীর্ঘপথে কত বন্ধুকে কতভাবে হারিয়েছি। কতজন সর্বস্ব পণ করেছিল আদর্শের মান বজায় রাখতে—অসাধ্য সাধনের চেষ্টা করেছিল দেশমাতৃকার পরাধীনতা দূর করতে। আজ স্বাধীনতার যুগে তাদের মনে পড়া স্বাভাবিক।

স্যার আশুতোষ চেয়েছিলেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় নববিজ্ঞান মন্দির গড়ে তুলতে—সেখানে পূজারী তন্ত্রধার সবই হবে ভারতীয়। বিদেশী শাসকের প্রতিকূলতা সত্ত্বেও অর্থের অভাব হলো না—দাতারা চিরস্মরণীয় হয়ে রইলেন। কৃতজ্ঞ মুগ্ধ স্বদেশবাসী তাঁদের মর্মর মূর্তি কলেজের দ্বারপথে বসিয়ে রেখেছে। স্নাতকোত্তর ক্লাস খোলা হলো নতুন কলেজে। বিশেষ করে প্রথমেই রসায়নের ব্যবস্থা হলো। প্রফুল্লচন্দ্র সরকারী কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করে হাল ধরলেন পালিত প্রফেসর হয়ে। চিরকুমার সাধক ইনি কলেজের একটি ঘরে অবসর সময়েও রয়ে গেলেন। কাছে জুটে গেল অনেক নবীন ছাত্র—তাঁকে ঘিরে থাকতো, সেবা করতো অষ্টপ্রহর।

যুদ্ধের মধ্যে নানা অসুবিধা সত্ত্বেও স্যার আশুতোষ রাজী হলেন আমাদের মত কয়েকজন যুবকদের নিয়ে ফিজিক্সের স্নাতকোত্তর ক্লাশ খুলতে। পরে অবশ্য সরকারী কাজে ইস্তফা দিয়ে সি. ভি. রামন এসে হাল ধরলেন। আরও নবীন উৎসাহে ছেলেরা অনুসন্ধানে মেতে উঠলো। ইতিহাসের পাতায় উঠলো বিজ্ঞান কলেজের নানা অবদান। প্রোঃ রামন নোবেল প্রাইজ পেলেন ঐই কোলকাতা থেকেই। ইতিমধ্যেই তাঁর সহকর্মীরা আরও অনেক যশস্বী হয়েছেন—কেতাবে উঠেছে তাঁদের গবেষণার কথা।

স্যার আশুতোষের নেতৃত্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বলিষ্ঠ গবেষণাকেন্দ্র গড়ে উঠলো রসায়ন, জীববিদ্যা, ইতিহাস, দর্শন ইত্যাদি সর্বশাস্ত্রে। তখনো বিদেশী শাসকের হাতে শাসন দণ্ড রয়েছে। তবু ভবিষ্যতের আহ্বানে বিশ্ব প্রতি-

যোগিতার অঙ্গনে নেমে পড়েছে তরুণেরা, নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও তাঁরা এগিয়ে চলতে পেরেছিল, জয়মাল্য পরিয়েছিল দেশমাতৃকার কণ্ঠে। তাদের আদর্শবাদ ও আত্মবিশ্বাসে, তাদের বুদ্ধিমত্তায় ও কর্মনৈপুণ্যে আশুতোষ বিশ্বাস করতেন। তারাও যথাসাধ্য নিজেদের বিশ্বাসের উপযুক্ত আধার বলে প্রমাণ করতে চেয়েছিল। এই সব কানে বাজবে অবান্তর বলে, তবে আজকের দিনে নানা প্রতিকূল ঘটনার সংঘাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল ছবি কিছু নিষ্প্রভ ঠেকছে। তবুও আমি আশাবাদী বলে পুরনো কথার প্রগল্‌ভতার মধ্য দিয়ে এইটুকু বলতে চাচ্ছি, দক্ষ পরিচালনা করে ছাত্রদের মধ্যে আদর্শের কথা জাগিয়ে তুলতে পারলে তারাও আবার আগের মতই সর্বস্ব পণ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনামকে বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে পারবে।

এসব প্রায় পঞ্চাশ বছর আগেকার কথা।

পরে নিয়তির আবর্তে ভেসে গেলাম ঢাকায়। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কারের জন্য কমিশন বসেছিল। দেশবিদেশ থেকে কত সুধী অভিজ্ঞ ব্যক্তি তাতে ছিলেন। বহু সাক্ষ্যসাবুদ সমালোচনার পর বিস্তৃত ভাবে উচ্চশিক্ষা এদেশে প্রবর্তন করার যে ছক তৈয়ারী হয়েছিল তারই নির্দেশ যথাসাধ্য মেনে নতুন নতুন বিশ্ব-বিদ্যালয় গড়ে উঠলো নানা প্রদেশে। কোলকাতা অবশ্য তা মানলে না। তারই অনুসরণে ঢাকায় এক আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সূচনা হলো। আমরা কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন ডাক পেলাম—সেখানে নতুন ভাবে শিক্ষাধারাকে প্রবর্তন করতে।

ইতিমধ্যে দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়ার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। গান্ধিজী আসরে নেমে নন-কোঅপারেশনের ডাক দিয়েছেন। মেধাবী ছাত্রের কেউ কেউ গবেষণার পথ ছেড়ে চরকা হাতে দেশ সংগঠনে নেমে পড়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যেও সে ঢেউ উঠেছিল—কিন্তু তাতে স্থায়ী কোন পরিবর্তন আনলে না।

বিদেশী শাসক ইতিমধ্যেই হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ভেদ নীতির বিষ-বীজ বপন করেছেন। রাজনীতিতে দেশের নায়কদের মধ্যে তার প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। স্বদেশীর যুগে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীস্টান—এ সবই ছিল এক ভারত মাতার সন্তান। পরস্পরের মধ্যে ঐক্যের বন্ধন দৃঢ় করে বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে—এই ছিল সাধনার মূলনীতি। পরে এলো খিলাফৎ, মুসলমানদের ধর্মরাজ্যের স্বপ্ন। শাসকের নিপুণ হস্তে সেটা ভেদনীতির প্রধান অস্ত্র যোগান দিলে।

ঢাকায় পঁচিশ বৎসর নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যে কেটেছে। বার বার

দেখা গেছে রাজনৈতিক নায়কের আকর্ষণ ও প্রভাব, দরদী শিক্ষকের থেকে অনেক বেশি। তবু সেই প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও জাতিধর্মনির্বিশেষে শিক্ষকের কৃত্য করে যেতে হয়েছিল প্রতিদিন। তবে আজ বাংলাদেশে যা ঘটছে তাতে মনে হয় দীর্ঘ পঁচিশ বৎসরের অধ্যাপনা একেবারে বিফল হয়নি। পূর্বপাকিস্তান মরে বাংলাদেশ গড়ে উঠেছে—সেখানে জাতিধর্মনির্বিশেষে শাসন চলবে এই আশার কথা শুনেছি। তবে দাঙ্গা-হাঙ্গামাও চলছে। নানা প্রতিদ্বন্দ্বিশক্তির সংঘাতের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশের ভবিষ্যত কি ভাবে গড়ে উঠবে তা কিছু সময় না গেলে বোঝা দুষ্কর।

কোলকাতায় ফিরে এলাম পঁচিশ বৎসর পরে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হতে চলেছে। এদিকে Cripps মিশন ফিরে গেছে। Direct action-এর হুমকি শোনা যাচ্ছে। এক বৎসর পরেই বিরাট খুনোখুনি শুরু হলো। শেষ অবধি এলো স্বাধীনতা—বাঙ্গালী এর জন্য স্বপ্ন দেখেছিল। এর জন্য তার দেশও দুভাগ হয়েছে আর কত লক্ষ পরিবার উদ্বাস্তু সর্বহারা হয়েছে বাংলা ও পাঞ্জাবের।

স্বাধীনতার জন্য বাঙ্গালী অনেক কিছু বিসর্জন দিতে পশ্চাদপদ হয়নি। এমন অনেকে হয়ত আছেন আমার শ্রোতাদের মধ্যে, লোকসানের কথায় পূর্ববঙ্গের ছেলেবেলাকার পরিবেশ ও ঘর দুয়ারের কথা মনে পড়বে ও ঠেলে উঠবে একটা নির্বাক ক্রন্দন। তবু আমার মনে হয় দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর পরে একবার হিসাব নিকাশের কথা ভাবলে মন্দ হয় না। হয়ত ভবিষ্যতের পরিকল্পনার আগে করলে সেটা আমাদের কাজে আসতে পারে। কেউ কেউ হয়ত বলে বসবেন বাঙ্গালীর লাভ লোকসানের হিসাব বড় সেকেলে শোনাচ্ছে, যখন বিশ্বমানব প্রীতির কাছে জাতীয়তাবাদই নরম সুরে গাইতে হয়। কোন বন্ধুর হয়তো মনে পড়বে ভারতের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে সুখ্যাতির সংগে এই মতের সমর্থন করে ডিগ্রী পেয়েছেন এক বিদ্বান—"পুরাকালে ভারত বলে কোন দেশসত্ত্বার কল্পনা এখানকার লোকদের মনে উঠতো না, ইংরাজ আসাতে তবে এটা গজিয়ে উঠেছে।" আশি বৎসরে এসে আমি স্বীকার করছি যে এখনো সেকেলে রয়ে গেছি বলেই বাঙ্গালীকে মনে হয় আপনার জন, তার সুখ দুঃখের কথা মনের অনেকটা ভরে থাকে।

স্বাধীনতার এই পঁচিশ বৎসরে বাঙ্গালী হারিয়েছে অনেক। দেশ বিদেশে তার প্রতিষ্ঠা ছিল। লোকে তার বিদ্যার জ্ঞানের কদর করতো। আজকাল নানা প্রদেশে যে বিরোধী মনোভাব জেগে উঠেছে তা নিয়ে আমরা কি করবো?

ভাবতে হয় আবার অন্যান্য দেশের তুলনায় আমরা অনেক হারিয়েছি। সেকালে বিজ্ঞান শিখতে আমরা ছুটেছিলাম, যাতে দেশের সমৃদ্ধি বাড়ে ব্যবসা গড়ে উঠে। নতুন নতুন এই সব ভাবতাম, আর ভাবতাম ঠিক রাস্তা দেখিয়েছেন পি. সি. রায় বেঙ্গল কেমিক্যাল স্থাপনা করে। স্বদেশী যুগের প্রথমে যে সব কলকারখানা খোলা হয়েছিল তার প্রায় সবই একে একে বন্ধ হতে বসেছে, নয় অন্য প্রদেশে চলে যাচ্ছে। বাঙ্গালীর গর্ব করার মত বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠান বলে যা বলা যায় তা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর হয়ে দাঁড়িয়েছে।

নিরক্ষরতা দূরের কাজে, শিল্প প্রতিষ্ঠান বিস্তারে আমরা অন্য প্রদেশের তুলনায় অনেক পিছনে পড়ে আছি।

দেশের সব যুবকের উপর এক মস্ত দায়িত্ব এসে পড়েছে—নতুন পরিস্থিতিতে কি ভাবে বাঙ্গালীর শ্রীবৃদ্ধি হয় সেটা ভেবে দেখতে। কি ভাবে আবার বাঙ্গালীকে তার পুরানো আসনে প্রতিষ্ঠিত করা যায় সেইজন্য সচেষ্ট হতে দেশের যুবকদের অনুরোধ করে এই বক্তৃতার উপসংহার করলাম। (১৮ই জুন, ১৯৭৩।)

নানা চিন্তা

কথা প্রসঙ্গে

কথার পরে পরে কতকগুলো কথা মনে হচ্ছে। একটা হচ্ছে এই যে, আমার বন্ধু নির্মলকুমার (বসু) বললেন, "আমাদের দেশের ধর্মস্রষ্টা বা মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিরা এসবকথা অনেক আগেই বলেগেছেন। তাঁরা দুঃখকে ভালকরেই বুঝতেন"।

আমরা যখন ইস্কুলের ছাত্র তখন আমাদের মধ্যে নানারকমের লোক ছিল। একজন একদিন হঠাৎ নিয়ে এল সাংখ্যের বই, তার প্রথম কথা রয়েছে মানুষের যত রকম দুঃখ তার নিবারণ করার চেষ্টা হচ্ছে মানুষের প্রধান কর্তব্য। অবশ্য ঐতিহাসিকরা বিবেচনা করবেন একথা বুদ্ধদেব আগে বলেছিলেন কি তাঁরা আগে বলেছিলেন। ওকথা ছেড়ে দিলে বিজ্ঞানের কথা হচ্ছে এই যে, এনিয়ে আমাদের ধার্মিকেরা যে ভাবে উত্তর দিতে চেয়েছিলেন বিজ্ঞানের উত্তর ঠিক তা নয়। বুদ্ধদেব যখন কিসা গোতমীকে বললেন যে, "যাও তুমি, যার বাড়ীতে কেউ মরেনি সেখান থেকে নিয়ে এস সর্ষে, তাহলে আমি তোমার ছেলেকে বাঁচিয়ে দিচ্ছি"—এটা সহানুভূতির চূড়ান্ত হতে পারে, মানুষকে অন্তর্দৃষ্টি দিতে পারে; কিন্তু তার বেশী নয়। এর সঙ্গে ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংলণ্ডের মনোভাব একটু আপনারা বিচার করে দেখুন। হঠাৎ কয়েকটা লোক বসন্তে মারা গেল। তাদের বাঁচাবার কথাই শুধু হল না, লক্ষ লক্ষ লোকের সামনে ঐরকম বিপদপাতের জন্য এই বলে সান্ত্বনা দিলে না যে এটা ভগবানের মার। বরঞ্চ তারা মনে করল যে আমাদের কোথাও একটা ঘাটতি হয়ে গেছে। অতএব এর জন্য তৎপর হতে হবে। ভগবান মানুষের দুঃখ এমন ভাবে দিয়েছেন যে তাকে যদি বলা যায় সেটা নেই, তাহলে সত্যি সত্যি জগৎ নেই একথাই বলতে হবে। আর জগৎ যদি না থাকে তাহলে আমরাও নেই। শেষ অবধি গিয়ে দাঁড়াবে অদ্বৈতবাদে।

আজকে আমি রমন মহর্ষির বই পড়ছিলাম—তাঁর জীবনী। তাতে দেখা গেল, ভারতবর্ষের যে সাধনা মূর্ত হয়ে অরুণাচলে ছিল তার ভেতরে এই ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, যেটা ঐভাবে দুঃখে প্রবৃত্ত বৈদেশিকের মনের ভেতরে সাড়া দিয়েছে। কিন্তু শোকে অভিভূত হয়ে সান্ত্বনা পাওয়ার কথা এক, আর লক্ষণের মত বলিষ্ঠভাবে লাঠি হাতে করে বেরনো—মানুষের কে শত্রু আছে তাকে নিপাত করব, এই দুটো

আলাদা। এই মনোভাব মানুষ এক দিনে পায়নি—ক্রমশ পেয়েছে। এই বিংশ শতাব্দীতে এতদিনের সাধনার ফলে অন্ততঃ এটুকু পেয়েছে বলা যেতে পারে।

আমি সনাতনীদের এই কথাটি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, আমার বন্ধু যেমন বলতেন ঠাট্টা করে, সবই 'ব্যাদে আছে',—'বেদে আছে' এই মনোভাবটা অনেক সময়ে যদি নিদান করতে হয় তাহলে মাঝে মাঝে শক্ত কথাই বলতে হয়। আমি অবশ্য খুব ভক্তিমান,—আমি বোধ হয় পৃথিবীর মধ্যে সবার থেকে বেশি শ্রদ্ধা করি বুদ্ধদেবকে। এবং সঙ্গে সঙ্গে বলি, বুদ্ধদেবকে আমরা আড়াই হাজার বৎসর বাদে জয়ন্তী করে দিয়ে,—অন্ততঃ তাঁর প্রতি এত বছর ধরে যে অবিচার করে এসেছি তার কিছু দাম দেবার চেষ্টা করেছি। যদিও তাঁকে আমরা ভগবান করেছি। এরকম অনেক লোককে,—আমাদের একটা উপায় হচ্ছে তাঁকে ভগবানের তক্তাতে বসিয়ে দিলেই তাঁর কথা শোনবার আর দরকার নেই। আগেকার কথা আমি বলব না, সম্প্রতি-ভারতবর্ষেও অনেক কিছু ঘটে গেছে—যা থেকে আপনাদের সহজেই এসব কথা মনে পড়বে। আজকের দিনেও আপনারা রবীন্দ্রনাথকে পূজা করে তক্তে বসিয়ে দিচ্ছেন। তার পরে রবীন্দ্রনাথের কোন কথা ভাববার দরকার থাকবে না। আমরা তাঁকে মিউজিয়াম-পিসের মধ্যে তুলে নিলাম।

আর আমাদের দেশের কথাতে দু'চারটে কথা মনে হয় যে, অন্ততঃ আমরা যারা বিজ্ঞানী, তাদের কতকগুলো কথা মনে রাখতে হবে। একবার পরিহাসচ্ছলে আমাদের দেশের এক নেতা বলেছিলেন আর একজন বিশেষ কোন নেতার বিষয়ে যিনি সনাতনী। বলেছিলেন, "লোকটি এমন—সোজা ছুরি যদি তার মধ্যে চালিয়ে দাও তাহলে সেটা cork screw হয়ে বেরিয়ে আসবে।" আমাদের দেশে লোকের মনোভাব হয়ত এই ধরনের। খুব সোজা সরল সত্য কথা বললে সেটা অনেক সময় কাব্য হয়ে বেরিয়ে আসবে। অদ্ভুত মনোভাব। এইটে আমার বার বার মনে হয় যে আমাদের কথাও যেমন, চলনও তেমনি এবং বিজ্ঞানেও প্রায় তাই। যে মনোভাব বলিষ্ঠ, যেটা থাকে বলে কোদালকে কোদাল বলা,—সেটা যেন আমাদের মনে বিশেষ নেই। আমাদের সবই কাব্য! কাব্য-মধু খেয়ে আমরা একেবারে এমন মাতোয়ারা হয়ে আছি যে চোখের সামনে আর কিছু দেখি না। অবশ্য কেউ হয়ত দেখে যে, স্রষ্টা এই পৃথিবীটাকে এত সুন্দর করে তোলেন নি যা দেখেই সে ভুলে যাবে যে তার ভেতরে এত দুঃখ কষ্ট আছে। কিন্তু

রবীন্দ্রনাথের বিষয়ে আমার যেটা আশ্চর্য লাগে সেটা হচ্ছে তাঁর শিশুর মতো মনোভাব। শিশু যখন পৃথিবীতে আসে তখন তার সঙ্গে পরিচয় নেই কিছুরই, অথচ সব জিনিসে সে আনন্দের আস্বাদ পায়। এই মনোভাব মানুষের হওয়া উচিত বলে, আমাদের ও অন্য দেশেরও বহু মহাপুরুষ বলে গিয়েছেন। যেমন যীশু বলেছেন, ছেলেদের আমার কাছে আসতে দাও। শোনা যাচ্ছে, অরুণাচলের রমন-ঋষির কাছেও ছেলেরা অনায়াসে চলে যেত। কিন্তু অন্য বহু লোক এসে তাঁর মুখ থেকে কোন কথাই পেত না। এই শিশুর মনোভাব পরে মানুষের বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চলে গিয়ে পাটোয়ারী বুদ্ধি ইত্যাদি নানারকম জিনিস তার মধ্যে ঢোকে, সেটাকে এমন একটা অবস্থায় নিয়ে আসে যাতে তার কাছে সত্যও বিকৃত হয়ে দাঁড়ায়।

যা বলছিলাম, সবই প্রায় কাব্য হয়ে যায় এদেশে। তাই ধর্ম-ধ্বজীরা যখন এই ধরণের অনেক কিছু বলে যান এবং তাঁদের চোখ দিয়ে অনবরত দুঃখের অশ্রু গড়িয়ে পড়ে তখন আমার মনে হয় যে ঘরের কোণে বসে কেবলমাত্র ভগবানের ওপর দোহাই না পেড়ে এবং মাথা না ঠুকে যদি প্রতীচ্যের লোকেরা বেরিয়ে পড়ে যে মানুষের শত্রুকে আমরা দমন করব তাহলে, সেটা হবে ঐ চিরন্তনী সত্যের মধ্যে একটা নিম্নস্তরের মনোভাব, এই বলে নিজেদের কিছু বাহবা নেবার কোন দরকার নেই। কবে আমরা বুঝব যে এই ধরনের মনোভাব,—যেটা সেই আদিযুগ থেকে মানুষ বিস্ময়ের চোখে যখন পৃথিবীকে দেখেছে তখন থেকেই তার মনে হয়েছে—হয়ত প্রস্ফুটিত হতে কোন ভাষাতে দেরি লেগেছে, কোন ভাষায় হয়তো প্রথমেই ফুটেছে। কিন্তু এই মনোভাব যে চিরকালই সমস্ত কাজের ভেতরে ওতঃপ্রোতভাবে দেশের মানুষের মধ্যে ছিল না—যাঁরা একটু খোলা চোখে দেশের ইতিহাস অনুধাবন করবেন, তাঁরাই তা বুঝতে পারবেন। যখন আমরা এদিকে সংখ্যাসূত্র পড়ছি তখন আমাদের আর একটা বই সঙ্গে সঙ্গে পকেটে থাকত, সেটা হচ্ছে মার্ৎসিনির 'On the Duties of Man!' আজকালকার ছাত্ররা বোধ হয় এসব বই কখনো চোখেও দেখেনি। কিন্তু তখন, আমরা যখন ছাত্র ছিলাম, আমাদের মনে অত্যন্ত গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল এই দুই ধর্মের পদ্ধতি। একটা হচ্ছে বলিষ্ঠভাবে পৃথিবীকে প্রত্যাখ্যান করা যার মূলকথা—মায়ার প্রপঞ্চ সবই। তাতে নিজের মধ্যে যদি চলে যাই তাহলে ভাবা যেতে পারে—এই যে দেহ, এ দেহকে যদি ছুরি দিয়ে কাটি, আমাদের গায়ে যদি বিদ্ধ করে দিই বিষাক্ত বাণ, তাহলে ভেতরের আত্মাকে কেউ তো হত্যা করতে পারবে না। খুব ভালো কথা। অতএব যুদ্ধ কর,

বাণ এবং অস্ত্রও চালাও, এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বজন স্বজাতি সর্বকিছুই বধ করে চল। আর যখন মনে হবে যে নিজেদের সঙ্গে ঠিক মতো মিলছে না, তখন যেবেচারী শূদ্র, যার সাহস হয়েছে সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করতে, তখন বলব তারই দরুণ পৃথিবীতে দ্বাদশ বৎসর অবৃষ্টি, রাজার উচিত হচ্ছে প্রথমেই তার মুণ্ডচ্ছেদ করা। এসব কথা ভুললে চলবে না, কেননা আমরা উপনিষদের বাণী দিয়ে পুষ্ট নই। সত্যি-কারের হিন্দু সমাজ পুষ্ট হচ্ছে লোক মুখে নানা ভাবে পুরাণ-শাস্ত্র থেকে মানুষের উপভোগ্য যে সমস্ত আখ্যায়িকা দেশের মধ্যে চলিত আছে তারই ওপর। এই বিশ্বাস সবদেশেই ছিল। আমি যে আমার নিজের দেশকে ভালোবাসি না, তা নয়। তবে আমি বলি, এই ভালোবাসা যদি এমন রূপ নেয় যাতে পদে পদে সত্যের অপলাপ করতে হয়, তাহলে সে ভালোবাসার কোন দাম নেই। যাকে গ্রহণ করতে হবে, যার প্রতি পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করতে হবে, তার যদি সমস্ত দোষ পর্যন্ত আমি গুণ বলে বর্ণনা করি, তাহলে সে কাব্যের জগতেই চলে! মানুষের মধ্যে সেই মনোভাব আনা অত্যন্ত দুষ্কর। আজকাল ছেলেদের মধ্যে সে মনোভাব হতে পারে কিনা তা আমি জানি না। তবে আমরা যা সৃষ্টি করেছি, আমরা যা সব গড়ে তুলেছি, সেগুলিকে আমরা যে ভাবে দেখি, হয়ত বিদেশীদের মন সেগুলি সে ভাবে নেয় না।

একটা গল্প বলি। বিদেশী একটি লোক এসেছিলেন, যিনি চেকোস্লোভাকিয়ার, বাটানগরের সঙ্গে বিশেষ করে তাঁর সম্পর্ক ছিল। রবীন্দ্র-উৎসব সম্প্রতি যে সব হয়েছে তার মধ্যে তিনি ছিলেন। সব দেখে-টেকে এসে তাঁর দু'একজন বন্ধুর সঙ্গে এবং যে তাঁকে সমস্ত জিনিস দেখিয়েছে তার সঙ্গে কথা হল। তাঁকে তিনি বললেন, "দেখ, একটা জিনিস আমি দেখলুম, এ আমি আমার দেশের ডিরেক্টারকে না বলেই পারি না। তোমরা যাই বল না কেন, আমায় কিন্তু বলতেই হবে।" সে বেচারী, যে পথপ্রদর্শক হয়ে তাঁর সঙ্গে ঘুরেছিল, সে অত্যন্ত ভয় পেয়ে গেল। ভাবল যে আমার হয়ত কি একটা দোষ হয়ে গিয়েছে। হয়ত এমন একটা কিছু করলাম, এরকম একজন মহামান্য অতিথি, তাঁকে হয়ত আমরা পুরোপুরি মাত্রায় শ্রদ্ধা দেখাতে পারিনি, কি হয়েছে, কি...বৃত্তান্ত। অনেকবার তাঁকে ধরাধরি করাতে শেষকালে বললেন, "দেখ, আমার চোখে যেটা লাগল সেটা অদ্ভুত জিনিস। এই শান্তিনিকেতনে কেউ জুতো পরে না।" এই বাটার লোক আমাদের সভ্যতাকে কি চোখে দেখেছে সেটা তোমরা কিছুটা বুঝতে পারলে। অনেক সময়ে মৌখিক

তারিফ হয়ত আমাদের লোককে তারা জানায় কিন্তু মনের মধ্যে হয়ত বলে যে এদের দেশের লোক জুতো পরে না।

তাছাড়া আমাদের বাঙলা ভাষায় যে বিজ্ঞানের চর্চা করা উচিত, রবীন্দ্রনাথ কতদিন আগে বলে গিয়েছেন, তা সত্ত্বেও আমাদের দেশের মন কি নড়াতে পারা গিয়েছে? তোমরাই জানো, আমি তো চিরকাল বেঁচে থাকবো না,—অবশ্য আমাকে লোকে বলে ঐ একটি লোক আছে—আর কেউ চায় না, আর রবীন্দ্রনাথ চাইতেন। তিনি তো কবি মানুষ, তিনি তো বোঝেন না—বৈজ্ঞানিক উন্নতি বা সমৃদ্ধি হতে গেলে বিদেশের সঙ্গে যোগ রাখতে হয়। বিদেশের সঙ্গে যোগ রাখা, মানে তার সঙ্গে সঙ্গে সে যে ভাষা বলবে—সেই বুলি কাটা এবং পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে যদি তা আসে ত সেই কথাটাই আবার যথা সম্ভব সেই ভাষাতেই উত্তর দেওয়া, এই হচ্ছে আমাদের জ্ঞানের প্রধান নিরিখ।

বিদেশী ভাষায় শিক্ষা দেওয়ার একটাই ফল,—বুঝে না বুঝে মুখস্থ করা। আইনস্টাইন একবার বলেছিলেন, নিজের দেশে। সেখানেও এইরকম হয়েছিল যে অনেক বিদ্যের ভারে তাঁকে মুমূর্ষু হয়ে পড়তে হত এবং তিনি এক জায়গায় বলেছেন যে, "পরীক্ষা দেবার পর এক বছর লাগল আমাকে এই যা মুখস্থ টুখস্থ করে পাশ করতে হয়েছে তার থেকে আবার একটা মনোভাব ফিরিয়ে আনতে, যাতে আমি সব বিষয়ে উদ্ভাবনী শক্তিকে সামনে রেখে, উদ্ভাবনী শক্তি অনুসারে তাকে ভাবতে পারি।" তিনি আরও একটা কথা বলেছেন যে, নানান রকম নিয়ম, সিলেবাস ইত্যাদির ভিতর দিয়ে ভালো করে বেঁধে প্রতি ঘণ্টায় 'এই করতে হবে' রুটিন রেখে এবং প্রতি বৎসর কি প্রতি মাসে পরীক্ষা দিতে হবে—এরকম করলে আমাদের দেশের যে উদ্ভাবনী শক্তি সেটা ঠিক বেরুবে না। সৃজনী শক্তি চায় স্বাধীনতা, সে স্বাধীনতা এ নয় যে পরীক্ষা হলে বই নিয়ে গিয়ে উত্তর লেখা—কিংবা মনোমত প্রশ্ন না পেলে খাতা-পত্তর ছিঁড়ে দিয়ে উঠে চলে আসা। এটা ঠিক নয়। তিনি ভেবেছিলেন যে মানুষকে বিশ্বাস করতে হবে, যে বিজ্ঞান-সাধনা করতে এসেছে, সে সেই রকম সাধকের মনোবৃত্তি আছে বলেই এই রকম বিরস বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে রাজী হয়েছে। এগিয়ে চলতে চেয়েছে এই রকম বন্ধুর পথে। অন্ততঃ তাকে এই স্বাধীনতাটুকু দাও যাতে এর ভেতর থেকে তার চিত্তাকর্ষক বলে যা যা মনে হয়, সেই জিনিস নিয়ে তারই রস সংগ্রহ করতে সে পারে। এই রকম ধরনের স্বাধীনতা না হলে সেখানে যাকে আমরা বলি

talent, যেটা আজকাল বসু বিজ্ঞান মন্দিরে খোঁজাখুঁজি চলছে বলে শুনেছি, সেটা বিকশিত হবে না। কেন না একটা বাঘ বা ভাল্লুককে ধরে নিয়ে এসে যদি অনবরত বলা হয় "খিদে থাক্ আর না থাক্ তোকে গুঁতিয়ে খাওয়াব" তাহলে তার ক্ষুধা চলে যায়। আমার বন্ধু শিবসুন্দরের দাদার একটা গল্পের কথা মনে হল। সংক্ষেপে গল্পটা এই—তাঁর দাদা গিয়েছিলেন নিমন্ত্রিত হয়ে। সেখানে নানা রকম খাওয়ার দ্বারা আপ্যায়িত হলেন, শেষ পর্বে ছিল রসগোল্লার হাঁড়ি। তিনি যখন বললেন, একটার বেশি দুটো খেতে পারবেন না, তখন গৃহস্বামী, যিনি তাঁদের নিমন্ত্রণ করেছিলেন, তিনি অভ্যাগতদের বললেন (একটু গোলাপী নেশার আমেজ ছিল)—"কি রকম, আমি এত পয়সা খরচ করে রসগোল্লা নিয়ে এলাম, তুমি খাবে না ? তোমাকে মেরে খাওয়াব।" আমাদের শিক্ষার ব্যাপারে অনেক সময়ে তাই দেখা যায়। বিশেষ করে আজকের দিনে যা শোনা যাচ্ছে, শিক্ষার নতুন সংস্করণ যা বেরোচ্ছে, তার ব্যবস্থা দেখে প্রাণে ভয় আসে। এ সমস্ত জিনিস অন্য দেশে নিজের মাতৃভাষার মাধ্যমে শেখান হয়। তখন সেটা সহজ ও সরল হলেও তারা যখন চায় ছেলেদের কাছে বহু পরিমাণে বহু জিনিসের সঙ্গে পরিচয়, তখন তারা প্রথমেই বুঝতে চায় যে এটা সম্ভব হবে কিনা এত অল্প বয়স্ক ছেলেদের মধ্যে। কিন্তু আমাদের কর্তারা সে সব বিষয় ভাবেন না। তাঁরা ভাবেন একটু তাড়াতাড়ি এগিয়ে যেতে হবে। এতদিন পর্যন্ত কিছুই করা হয়নি। আর যদি বা চীন আমাদের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে তাহলে তো আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। অতএব পাঁচবছরের ছেলেকে পর্যন্ত নিয়ে তাকে বিজ্ঞানের সমস্ত কঠিন বস্তুর সঙ্গে অন্ততঃ পরিচয় করিয়ে দেওয়া দরকার। এই পরিচয়ের উপায় হল বই। এবং ঐ বিষয়ে সরকারকে সাহায্য করছে গ্রন্থলেখক এবং শিক্ষক। কেননা তাঁরা প্রত্যেক বৎসর বই বদলাচ্ছেন। একজনকে চেষ্টা করা হল সাত বৎসর বয়সেতে কিছু অঙ্ক শেখাবার। খানিকদূর পারলেন কি পারলেন না—তার পরের ক্লাসের লোককে আর একখানা বই দেওয়া হল যাতে আর একটু ভালো করে শেখাতে পারে। এইভাবেই চলছে। অভিভাবকগুলি জেরবার, কারণ তিনটি করে ছেলেকে যদি লেখাপড়া শেখাতে হয় তাহোলে তার চৌর্যবৃত্তি করা ছাড়া আর কোন উপায় আছে বলে তো আমি মনে করি না।

আমাদের ভাবপ্রবণ দেশে সবাই ওপর থেকেই স্বপ্ন দেখে। কত খাদ, কত পাহাড় অতিক্রম করে তারপরে কাঞ্চনজঙ্ঘার শিখরে উঠতে হবে, সে কথা

ভুলে গিয়ে মনে করে আমরা এরোপ্লেনে চড়ে একেবারে কাঞ্চনজঙ্ঘার ওপর গিয়ে নেমে পড়ব। এই ধরনের মনোভাব কি সত্য? তাহোলে সত্য ও মিথ্যার মধ্যে তো কোন তফাতই নেই—কারণ আজ যা সত্য, চিরন্তন সত্যের সঙ্গে যদি তার তুলনা করা যায়—কোনটাই সত্য বলা যাবে না। ব্যবহারবিদরা ঠিক করলেন যে, কোন কথা যা বহু বার উচ্চারণ করা যাবে সেই কথাই সত্য হয়ে দাঁড়াবে। এটা আমার নিজের কথা নয়, এটা হিটলার বিশ্বাস করতেন এবং সুইডেনের লেখক 'বোইয়ার' একটা বই লিখেছিলেন, তার নাম দিয়েছেন "The Power of a lie." আমাদের দেশে এখন খুব সমীহ করে কথা বলতে হয়, অসত্য কারুকে বলবার জো নেই—কারণ সেটা আপেক্ষিকতাবাদের মাধ্যমে একটা বিশেষ রকম দৃষ্টিভঙ্গিতে সত্য হয়ে দাঁড়াবে। কাজেই এই সমস্ত নানান রকম কথা আমাদের মনে রাখতে হবে।

এর থেকে যেটা ফুটে উঠছে সেটা এই যে, আমাদের দেশের সাধারণ নিয়মের মধ্য দিয়ে যিনি যান নি, যিনি সাদা চোখে দেখেছিলেন সমস্ত জিনিসকে, যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরুতদের হাতে পড়েন নি, যিনি চেষ্টা করেছিলেন জানালার খড়খড়ি তুলে আকাশের দৃশ্য কিংবা জলে পাখি চরা দেখতে—সব জিনিস দেখে তাঁর মনে যে বিস্ময় হয়েছিল সে পরিচয়, সেই আনন্দ, আমরা পাই কি!

বিজ্ঞানীদের অনেক সময়ে পথের খোরাক হল এই যে, নানা-রকম দুঃখকষ্ট হবে—বাড়ীতে গেলে বৌয়ের মুখঝামটা খেতে হবে যে, "তুমি এতক্ষণ কি করে এলে—বাড়ীতে যে চাল বাড়ন্ত এ খবর তুমি রাখছ না?" কিন্তু এর মধ্যে সত্যিকারের আলোচনার ভেতর দিয়ে যে মনের আনন্দ পাওয়া যায়, সে আনন্দের বর্ণনা স্বার্থের ভিত্তিতে নয়। পৃথিবীর উপকার, এ কথা ভাবলেও নয়। তার জবাব দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। এর এমন একটা আকর্ষণী শক্তি আছে যে, মানুষের মন স্বভাবতঃই অভিভূত হয়ে পড়ে। সেই মন বুঝে একজন যে শুধু আর একজনকে বোঝাবে তা নয়, তাতেই সে মোহিত হয়ে যায়। আমাদের সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-তারকা, এ সবের বিষয়ে আলোচনা করে আমরা অনেক রকম গোলমাল সৃষ্টি করেছি যে ভগবান যেন আমাদের জন্যই এতসব করে এসেছেন। রবীন্দ্রনাথের কবিত্বের মধ্যেও সে সব কথা আছে—আমার জন্য তুমি এসেছ এতকাল ধরে। কিন্তু জ্যোতির্বেত্তা একবার আকাশের দিকে

তাকালে দেখবেন লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি জগৎ ব্রহ্মাণ্ড নীহারিকা নক্ষত্র। অবশ্য এত দূর যে তার মধ্যে কোন ছোট পৃথিবী দেখা যায় না। তবে কেউ কেউ বলতে আরম্ভ করেছেন "অন্তত আমাদের মতো একটা অবস্থা কোথাও হবে হয়ত"। কিন্তু সংখ্যায়ন তত্ত্বের মূল কথা হচ্ছে যে সাধারণ নিয়ম অনুসরণ করে যদি নানা-রকমের প্রাথমিক অবস্থা থেকে চলা শুরু করা যায় তাহলে বহুদিন বাদে যে অবস্থায় আমরা এসে পৌঁছব—তার মধ্যে একটা মোটামুটি সাদৃশ্য থাকবে। তোমরা তা জানো, অবশ্য যারা Boltzmann এর Entropy-র কথা আলোচনা করেছ। অনেকসময় আমাদের এই সব কথাই ভাবতে হয় যে শুধু বস্তুজগতের বিষয়ে একথা খাটে কিংবা বস্তুজগতের মধ্যেই যে প্রাণের প্রকাশ তার বিশ্লেষণ করতেও কি সেই নিয়মই খাটাতে হবে? অর্থাৎ আমরা যেমন যুগ যুগ ধরে নানা রকম অভিব্যক্তির ভেতর দিয়ে বর্তমানের মানুষে এসে পৌঁছেচি এই ধরনের কোন রকমের প্রাণী দূর নক্ষত্রলোকে থাকতেও বা পারে।

যারা সোভিয়েটের নানা রকম বই পড়ো তারা দেখবে যে জুলেভার্নের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এই ধরনের গল্পটল্প তারাও লিখছে। 'Andromeda' বলে একটা গল্প লিখেছে তার মধ্যেও এই ধরনের কথাবার্তা। কিন্তু এতো গেল গল্প। লোকে আশা করছে, বেতার-বার্তার মধ্যে যে নানা রকম আকস্মিক অদ্ভুত রকমের আওয়াজ শুনতে পাই তার ভিতরে ন্যূনতম কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় হয়ত আছে, আর সেটা বিচার করলে জানা যাবে যে, বহু দূরের কোন নীহারিকামণ্ডলীর ভেতরে আমাদেরই মতো কোন গ্রহে হয়ত এরকম চিৎশক্তির বিকাশ হয়েছে। এ সমস্ত কথা মানুষ ভাবতে শুরু করেছে, এবং এ ভাবনা শুধু কেবলমাত্র নিজের দুঃখ নিরসন নয়। এটা একটা অদ্ভুত রকমের মনোভাব, এটা শুধু বিস্ময় নয়—যেন কতকটা স্রষ্টার মনোভাব। স্রষ্টার যে সৃষ্টি তার ভেতর দিয়ে তার সঙ্গে তাল রেখে ভাববার চেষ্টা করে, তার মূলসূত্রটা ধরবার যেন একটা চেষ্টা। এটা শুধু মাত্র কবিত্বে পাওয়া যায় না—বিজ্ঞানীর মধ্যেও এরকম মনোভাব আজকাল রয়েছে। কাজেই জ্যোতির্বিজ্ঞানের মধ্যে তোমরা দেখতে পাবে অনেক সময়ে তারা ভাবছে, কিভাবে নীহারিকামণ্ডলীর সৃষ্টি হল, আর কি ভাবেই বা নক্ষত্রমণ্ডলী হল? ভগবান ঠিক একই সময়ে সব সৃষ্টি করে তারপর নাকে সর্ষে তেল দিয়ে ঘুমুলেন, আর বললেন, "যা হয় হোক।" না এখন পর্যন্ত প্রতি মুহূর্তে জগৎ প্রসূত হচ্ছে, অবার বিনষ্ট হচ্ছে? সব কথা ঠিক আমাদের দেশের পুরাণে

পাওয়া যাবে না। অবশ্য হয়ত কেউ বলবেন যে, গীতার অষ্টাদশ পর্বের মধ্যে দেখবেন ভগবানের মুখ দিয়ে কত লক্ষ লক্ষ জীব ঢুকছে আর বেরুচ্ছে। এ আলাদা কথা। অবশ্য আমার মনে হয় যে বর্তমানকে সহজভাবে স্বীকার করাই ভালো। আমাদের মনের মধ্যে একটা বিরুদ্ধভাব আছে। যদি কেউ বলে যে, আমাদের অতীতকালে কিছু ছিল না, আমরা সহজেই চটে যাই।

আমার এক বন্ধু বেদের মধ্যে এক শ্লোক থেকে প্রমাণ করেছিলেন যে, তখনকার লোকেদের নিশ্চয় এরোপ্লেনের সঙ্গে পরিচয় ছিল। এরকম অনেক শ্লোক বের করা যায়। রামায়ণের কিছু শ্লোক থেকে অনেকে বলেছেন যে তারা কামানও জানত, ইত্যাদি অনেক ধরনের কথা।

এতে বলতে ইচ্ছে করে যেটা জানত সেটা হচ্ছে এই যে, হিংসা, দ্বেষ এখনকার মতন তখনও ছিল। আমার বন্ধু নির্মলকুমারের আনুকূল্যে তাঁর ওখানে গিয়ে হরপ্পার কতগুলো মাথা দেখলাম, তাঁরা খুঁজে বের করেছেন যে, কে বা কারা কতগুলো লোককে বেশ নির্মমভাবে হত্যা করেছিল বলেই মনে হয়। অবশ্য তারা কারা তা জানা নেই। এই হত্যাকাণ্ড চলছে আজকের দিনেও এবং কেউ যদি কথাটা বিশেষ করে বলতে পেরে থাকে যে এটার শেষ চাই—কেন না, জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে মানুষ সমাজ এক,—একথা কেবল বিজ্ঞানীরাই বলেছেন। আমি সেইজন্য বর্তমান বিজ্ঞানীদের নমস্কার করছি। আর ভবিষ্যতে তোমরা যারা বিজ্ঞান-সাধক আছ, আমরা মনে করি যে, আমরা যা দেখে যাইনি তোমরা হয়ত দেখে যেতে পারবে, যাতে অনুভূতি নিবিড় হবে, যাতে তোমাদের প্রত্যেকের মনের মধ্যে একটা স্থির ধারণা থেকে যাবে যে মানুষমাত্রেই এক এবং সকলে মিলে আমাদের এই মানবসভ্যতার সৌধ রচনা করতে হবে।

রবীন্দ্রনাথ সেই মহামানবের আসার কথা বলে গেছেন। তিনি বলেছেন, তিনি পদশব্দ শুনেছেন। তাঁর লেখার মধ্যে দিয়ে আমরা তাঁর মনোভাব পাওয়ার চেষ্টা করি। দেখা যায় যে তিনি বোধ হয় সব সময়ে খুব গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন না। কিন্তু যেটা ছিল তাঁর, সমস্ত রকমের বাক্যজালের ভেতর দিয়েও চিরন্তন সত্য, যে সত্য হয়ত রূপায়িত হয় নি, যে সত্য নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চলেছে, সেই সত্যের পদধ্বনি তিনি শুনতে পেয়েছিলেন।

তোমাদের ধন্যবাদ

মাঘ, ১৩৭০

বাঙলা দেশ ডাক দিয়েছে

জন্ম শহরে, এই কলকাতায়। ছেলেবেলা যখন স্কুলে পড়ি তখন দেশে এসেছিল স্বদেশী জোয়ার। তখনকার দিনে রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদি সকলেই নেমেছিলেন। প্রচার করেছিলেন বাঙ্গালীর ঐক্য। আমরাও রাখীবন্ধন করেছিলাম, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছিলাম, গেয়েছিলাম "আমার সোনার বাংলার" গান। তারপর কত কী হলো। দেশের ছেলেমহলে এল বিপুল আকাঙ্ক্ষা। বিদেশী কব্জা থেকে দেশকে মুক্ত করতে হবে, ইত্যাদি নানা কথা। পথ খুঁজে বেড়িয়েছে লোকে, প্রাণ দিয়েছে অনেক। তার একসময় মনে হয়েছিল হিন্দুর ঐতিহ্য হয়তো বেশী দামী। কাজেই অনেকে স্বীকার করে নিলেন দেশ ভাগ করা যাক। হয়তো এইভাবে আমরা আবার জাতি হিসেবে মাথা তুলে উঠতে পারব।

দেশ ভাগ হয়ে গেছে আজ তেইশ বছর—হিন্দুস্থান পাকিস্তান। ভাবা গিয়েছিল এই ভাবেই দেশের লোকের সুখ-স্বচ্ছন্দতা বাড়বে। মনের মতো করে গড়তে পারবে দেশ। কিন্তু তাও হয়নি। হঠাৎ দেখা গেল পূর্ববঙ্গে এক বিপুল অভ্যুত্থান। বাঙ্গালী যারা থাকতেন পূর্ববঙ্গে তারা নানা ভাবে কষ্ট পেয়েছেন। সম্প্রতি দৈব-দুর্বিপাকে, ঝড়-ঝাপটে বহু লক্ষ লোক মারা গিয়েছে। তার ওপর মিলিটারি শাসনের গুঁতো। দুঃখের মধ্যেও শাসক সম্প্রদায় দেশের লোকের ত্রাণকার্যে গড়িমসি করেছেন। তারপর এল ওপার বাংলার গণ-নির্বাচন। দেখা গেল নানা কষ্ট ও দুঃখের মধ্যে বাঙ্গালী এক হয়ে আওয়ামী লীগের পেছনে দাঁড়িয়েছে। এক বাক্যে স্বায়ত্তশাসন চাইছে সকলে। শাসকদের শোষণ-নীতি আর বরদাস্ত করবে না। নানান রকম কারসাজি দেখা গেল। মিটমাট করবার নানা কথা উঠল, এখন বোঝা যাচ্ছে সেটা শুধু ছল। পূর্ববঙ্গে সৈন্যসম্ভার এনে ফেলাবার যতটুকু সময় লাগে ততটুকুর জন্য নিত্য বৈঠক ও বোঝাপড়ার কারসাজি। হঠাৎ একদিন শাসকপ্রভুরা মনে করলেন এবার দমননীতি চাপানো যাক। ধরপাকড় আরম্ভ হলো, গুলি-গোলা চালাল, যাঁরা শিক্ষিত, ভাবুক, লেখক যাঁরা এই মিলিটারি শাসনের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল তাঁদের অনেককেই প্রাণ দিতে হয়েছে। যে সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য ঢাকা ও রাজসাহী বিশ্ববিদ্যালয়

ঘিরেছিল তাও নিঃশেষে বিনষ্ট করার চেষ্টা দেখা যাচ্ছে। তবে সাবাস বাঙ্গালী, এর মধ্যে সে মাথা নোয়ায় নি। লড়ে যাচ্ছে। ঘরের ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত রুখে দাঁড়িয়েছে। ওপর থেকে বোমা বর্ষণ হচ্ছে, মেসিনগানে কাতারে কাতারে লোক মারছে। রাস্তায় হাজারে হাজারে লোকের মৃতদেহ পড়ে রয়েছে, তবুও যুদ্ধ চলেছে। সাতকোটি বাঙ্গালীর জীবনমরণ পণ। তারা নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখবে। এ মিলিটারি জবরদস্তি সহ্য করবে না।

সেদিন জ্ঞানবৃদ্ধেরা আলাচনা করেছেন, জাতির ঐক্য বলতে কী বোঝায় ? এক সময় ভেবেছিলেন অনেকেই—ধর্মের ভিত্তিতেই জাতির একতা গড়ে তুলতে হয়। কিন্তু বাঙালী ভুল করেছে। তবে ভবিষ্যতে বিশ্বের দরবারে মানুষের ঐতিহ্য যে ওতঃপ্রোতভাবে দেশের মাটির সঙ্গে জড়ানো, তাই প্রমাণের একটা ধাপ এগিয়ে দিল বাঙ্গালীর এই বিপুল প্রচেষ্টা।

যাঁরা মানুষে বিশ্বাস করেন তাঁরা ভাবছেন এই বিপর্যয়ে একাত্ম বঙ্গজাতির জয় হোক। আমারও এই আশা। জয় বাংলা। (১৮ই এপ্রিল, ১৯৭১)

অনুবাদ

বিশ্ব-প্রকৃতির সত্তাবোধের কল্পনায় ম্যাক্সওয়েলের প্রভাব

[অনুবাদকের কৈফিয়ৎ—১৯৩১ সনে ম্যাক্সওয়েলের জন্মের শতবর্ষপূর্তি হয়েছিল। সেই সময় কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎসবে অনেক জগদ্বিখ্যাত মনীষী ভাষণ দিয়েছিলেন—তার কতকগুলি একত্রিত করে যে একটি ছোট পুস্তিকা প্রকাশিত হয়, আইনস্টাইনের এই ভাষণ তার মধ্যে রয়েছে। নিম্নলিখিত প্রবন্ধ সেই ভাষণের আক্ষরিক অনুবাদ নয়, তবে, তাঁর সমগ্র ভাবধারা বাংলায় প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছি। স. ব.]

বহির্জগৎ চলে নিজের নিয়মে, দর্শকের মুখাপেক্ষী সে নয়—এই বিশ্বাসই হলো সব বিজ্ঞানের ভিত্তি। কিন্তু ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি, তার সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটায় না—তাই নানাভাবের অনুমান, জল্পনা-কল্পনার মাধ্যমে আমরা বহির্জগৎকে বুঝতে চাই। কাজেই প্রকৃতির সৎরূপ সম্বন্ধে যে ধরণের কল্পনা আজ চলছে—তা নিত্য বা অপরিবর্তনীয় নয়। দরকার হলে আমরা তাকে সংশোধন করতে রাজী। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি এতকাল ধরে যে সব খবর সংগ্রহ করেছে, যতদূর সম্ভব তার সমগ্রতাকে যুক্তিযুক্তভাবে সাজাতে যদি বিজ্ঞানের মূল সংজ্ঞাগুলির সংশোধন দরকার হয়, তবে তা করতে বিজ্ঞানী পশ্চাৎপদ হবেন না। পদার্থবিদ্যার প্রগতির দিকে একবার তাকালেই বোঝা যায় যে, বিজ্ঞানের এই স্বতঃসিদ্ধ ও সংজ্ঞাগুলি দিনে দিনে কিরূপ বিপুলভাবে পরিবর্তিত হয়েছে।

পদার্থবিদ্যার তত্ত্বালোচনার ভিত্তি প্রথমে স্থাপন করেছিলেন নিউটন, পরে তড়িৎ-চুম্বকের ক্ষেত্রে ম্যাক্সওয়েল ও ফ্যারাডের অনুসন্ধানের ফলে তাতে প্রগাঢ় পরিবর্তন এসে পড়লো, আর আমাদের বস্তুরূপের পরিকল্পনাও সেই সঙ্গে অনেক বদ্‌লে গেল। এই আমার বক্তব্য। পরিষ্কারভাবে বোঝাবার জন্যে পদার্থবিদ্যা সুরুতে কিভাবে এগিয়েছিল, আর পরে আবার তার কি পরিণতি ঘটলো, সেই বিষয় সংক্ষেপে এখানে আলোচনা করবো। নিউটনের মতে—বাস্তব জগতের বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করতে হলে চাই দেশ, কাল, জড়াণু ও বলের (যা অণুগুলির মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ঘটায়) ধারণা ; কারণ জগতের প্রক্রিয়াগুলিকে

ভাবতে হচ্ছে দেশের বিস্তৃত আশ্রয়ে, জড়-কণাদের সুনিয়মিত গতিবিধির বলে। এই পরিবর্তনশীল জগতের যথার্থ রূপ বুঝতে হলে জড়কণাই আমাদের একমাত্র সহায়।

অবশ্য অণুকণার ধারণা ইন্দ্রিয়বোধ্য বস্তুগুলি থেকেই নিঃসারিত হয়েছে। তবে বস্তুর প্রসার, আকৃতি বা তার দিগ্‌দেশের মধ্যে বিশেষভাবে অবস্থানের কথা ছেড়ে দিতে হয়েছে এবং তাতে নিহিত গুণাগুণের কথাও বাদ পড়েছে। অণুর বিষয়ে রয়ে গেছে, শুধু জড়ভার ও গতি ; আবার তার সঙ্গে জুড়ে দিতে হয়েছে বলের কথা, যার ফলে অণুগুলির পরস্পরের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলতে পারে।

আমাদের অন্তঃচেতনার বস্তুবোধ থেকেই উঠেছে জড়াণুর এই কল্পনা, আবার বস্তুকে এখন বুঝতে হচ্ছে জড়কণারই সমষ্টি হিসাবে। লক্ষণীয় শুধু এই যে, জগতের ব্যাখ্যা অণুর গতিবিধির কল্পনাকে আশ্রয় করেই হয়েছে। প্রত্যেক প্রাকৃতিক ক্রিয়াকে বুঝতে বা ভাবতে হবে যে, এটা মুখ্যতঃ জড়কণার গতির ব্যাপার আর ওই গতিও সব সময় নিউটনের নিয়ম মেনেই চলেছে।

এই তত্ত্ব যোজনার যে অংশ বিশেষভাবে আমাদের অপরিতোষ ঘটিয়েছিল, অনন্যনিরপেক্ষ দেশ ও কালের কল্পনার আলোচনা ছেড়ে দিলেও বলতে হবে, সেটি আলোকতত্ত্ব। নিজের মতের সঙ্গে তাত্ত্বিক সামঞ্জস্য রাখতে এখানে নিউটনকে জ্যোতিরেণুর আশ্রয় নিতে হয়েছিল। এই জ্যোতিরেণুও জড়ধর্মী। তবে আলো শোষণ করলে জড়কণার কি পরিবর্তন ঘটে, এই সমস্যার সমাধান জরুরী হয়ে দাঁড়িয়েছিল সেই সময়েই এবং সকল বিজ্ঞানীই তখনও তার প্রয়োজনীয়তা নিশ্চয়ই অনুভব করতেন। তাছাড়া এর ফলে বিশ্বে আমদানী হলো দু-রকমের কণা—ভারী বস্তুকণা ও হাল্কা জ্যোতিকণা। এটিই দাঁড়ালো অস্বস্তির কথা ! আবার পরে হলো তৃতীয় কণার আবির্ভাব—এটি বিদ্যুতের কণা। ইনি ধর্মতঃ আবার প্রথম দুটি থেকেই একেবারে স্বতন্ত্র। ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া কিভাব চলেছে এদের মধ্যে, তাও ভাবতে হলো স্বেচ্ছামত ; অর্থাৎ সেই কল্পনার পক্ষে কোন যুক্তির অবতারণা চললো না। এই সবই মূল ভিত্তির দৌর্বল্যের পরিচায়ক হয়ে দাঁড়ালো। তবুও স্বীকার করতে হবে, বাস্তবের কল্পনা এই ভাবেই অনেক দূর এগুলো। তবে কেন আবার আমাদের মনে উঠলো যে, এই রাস্তা ছাড়তেই হবে ?

গণিতের পোষাকে সাজিয়ে নিজের মত প্রকাশ করবার জন্যে নিউটনকে

উদ্ভাবন করতে হয় সম্পূর্ণ নতুন ধরণের গণনা—Differential Coefficient এবং এরই সাহায্যে জড়ের গতির নিয়ম Differential সমীকরণের রূপে প্রকাশ পেল। মানবের বুদ্ধিবিক্রমের এই প্রকাশ যে আর কেউ কখনও অতিক্রম করবে, এ অসম্ভব ঠেকে আমার কাছে। তবে এর জন্যে সমীকরণগুলিতে Partial Differential Coefficient ঢুকাতে হয়নি নিউটনকে। সে রকম সমীকরণের অনুশীলন নিউটন যথারীতি আরম্ভ করেন নি। কিন্তু গতির ফলে ও বলপ্রয়োগে যে সব বস্তু অবিকৃত থাকে না, তাদের সম্পর্কে গতিশাস্ত্র নির্মাণ করতে এই ধরণের গণনার দরকার হবেই—বিশেষ করে যখন এই সব বস্তু ঠিক কি রকম কণা-গোষ্ঠী দিয়ে তৈরি, তার বিচার প্রথম ধাপেই করা অনেকাংশে নিষ্প্রয়োজন। তাই, ঠিক এই ভাবেই ঢুকলো Partial Differential-এর সমীকরণ, পদার্থতত্ত্বে। এলো দরকারের সময় সাহায্য করতে—অল্পে অল্পে সে কিন্তু দখল করে নিলে সারা জমিতে কর্তৃত্ব। ঊনবিংশ শতাব্দী থেকেই এই পরিবর্তন সুরু হলো—তখনই বহু ঘটনা দৃষ্টিপথে এসে জমেছে, যার তাগিদে অন্ততঃ আলোর ঊর্মিল কল্পনাটি সর্বমান্য হয়ে উঠলো—জ্যোতিরেণু ভেসে গেল। সর্বরিক্ত শূন্যের মধ্যে আলোর প্রকাশ ইথরের কম্পন হিসাবে ভাবতে হলো—আবার এই ইথরকেও কণায় গঠিত ভাবাটি দাঁড়ালো অপ্রাসঙ্গিক। এইবার এসে পড়লো স্বাভাবিক ও সরলভাবে প্রাকৃতিক ঘটনা বুঝাতে এমন সব সমীকরণ যাতে সরাসরি Partial Differential Coefficient এসে ঢুকেছে।

এই ভাবে পদার্থবিদ্যার এক বিশেষ পরিচ্ছেদে অবিচ্ছিন্ন ক্ষেত্রের কল্পনা জড়কণার পাশে এসে পৌঁছে গেল। এই উভয়কে মিলিয়ে তবে বাস্তব প্রকৃতিকে বুঝতে হবে। কঠোর যুক্তির ছন্দে যাঁদের মন বাঁধা, তাঁরা এই ভাবের দ্বৈতবাদে অস্বস্তি বোধ করলেও আজ অবধি এই দ্বন্দ্ব বিলুপ্ত হয়ে যায় নি।

যদিও শুধু কণার উপর নির্ভর করে রইলো না বাস্তবের ছবির ভূমিকা, তবুও সবটাই গতিশাস্ত্রের অনুগামী রইলো প্রকৃতির সৎরূপের এই বর্ণনা। ভারী বস্তুকণার সরল চলনই যে প্রকৃত সব বিপর্যয়ের মূলে, এই ব্যাখ্যাই জারী রইলো। বাস্তবিক এটি আর অন্য কোন ভাবে চিন্তনীয় ছিল না।

শেষে এলো তত্ত্বশাস্ত্রে বিপ্লবের বিপুল বন্যা। এরই সঙ্গে চিরকাল যুক্ত থাকবে তিন বিজ্ঞানীর নাম—ফ্যারাডে, ম্যাক্সওয়েল ও হার্ৎস। এই বিপ্লবের নেতৃত্বেও সিংহের ভূমিকা নিলেন ম্যাক্সওয়েল। যা কিছু জানা ছিল তাঁর সময়ে আলোক-বিজ্ঞান ও

তড়িৎ-চুম্বক সম্পর্কে, তিনি দেখলেন সবই তাঁর প্রসিদ্ধ সমীকরণ-যুগ্ম দিয়েই বর্ণনা করা চলে। এর মধ্যে বিদ্যুৎ-চৌম্বক ক্ষেত্রে তীব্রতার তারতম্য হলো সমীকরণের দ্বারা বর্ণনার বিষয়। অবশ্য এটা ঠিক—বস্তু-সমষ্টির গতির বিধান মানও তাদের উপর নির্ভর করে, যার যোজনায় ম্যাক্সওয়েলও চেয়েছিলেন এ-রকম একটা মডেল খাড়া করতে, কিন্তু তাঁর লেখার মধ্যে অনেক রকমের মডেল পাশাপাশি দেখা যায়। তাই মনে হয়, কোনটার উপরই তাঁর গভীর নির্ভরতা ছিল না। পরিষ্কার হয়ে উঠলো এই প্রধান কথাটি—সমীকরণ-যুগ্মেরই দরকার রয়েছে সকলের আগে। ক্ষেত্রদ্যোতক যে সব সংজ্ঞা ঢুকেছে তারা প্রথম থেকেই অন্য-নিরপেক্ষ, অন্য কোন অপেক্ষাকৃত সহজ কল্পনার উপর তাদের দাঁড় করানো যায় না। এই শতাব্দীর সন্ধিক্ষণ থেকেই সকলে মেনে নিয়েছেন, বিদ্যুৎ-চৌম্বক ক্ষেত্রের এই পরিকল্পনাকে। এর সংজ্ঞা যে আরও সরল করা যাবে না, তাও স্বীকৃত হয়েছে। যাঁরা বিচক্ষণ তত্ত্ববাদী, তাঁরাও বিশ্বাস করেন না যে, ম্যাক্সওয়েল সমীকরণকে কোন বিশেষ যুক্তির অবতারণা করে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব অথবা জড়গতি-বিধানের বশে আনা সম্ভব হবে তাকে, কোন উপায়ে বা কোন কালে। বরং চেষ্টা সুরু হলো উল্টাভাবে, ক্ষেত্র-ধর্মের অনুসরণে বস্তুধর্মকে বোঝবার চেষ্টা—তার ভরের কারণ নির্দেশের চেষ্টা চললো ম্যাক্সওয়েলের যুক্তি অনুসরণ করে ; কিন্তু শেষ অবধি সে পথে সাফল্য এল না। ম্যাক্সওয়েল জীবনব্যাপী সাধনার বলে বিজ্ঞানের নানা ক্ষেত্রে নানা দরকারী তথ্য উদঘাটিত করেছেন। এখন সে সবের আলোচনা ছেড়ে দিয়ে একাগ্র মনে শুধু এটুকুই চিন্তা করা যাক, প্রকৃতির সংস্বরূপ কল্পনার তিনি কতটুকু পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। তাহলে প্রথমেই বলা চলবে, তিনি প্রচার করে গিয়েছেন—বস্তুকণা ও জগতের গতিবিধি দুই-ই Partial Differential-এর সমীকরণ অনুযায়ী বুঝতে হবে। ম্যাক্সওয়েলের সময় থেকেই আমরা ভাবতে আরম্ভ করেছি, প্রকৃতির সংস্বরূপ অবিচ্ছিন্ন ক্ষেত্ররূপে, যার গতি বা পরিবর্তনের নিয়ামক হলো বিশেষ ধরণের সমীকরণমালা, তার মধ্যে Partial Differential Coefficient-ই প্রধান। এই সমীকরণগুলিকে পুরনো গতিশাস্ত্রের নিয়ম দিয়ে প্রমাণ করা যাবে না। এই ভাবে আমাদের কল্পনার রাজ্যে ঘটলো একটা প্রকাণ্ড ওলট-পালট। নিউটনের পরেই ম্যাক্সওয়েলের এই ভাবের নবকল্পনা সর্বাপেক্ষা বেশী ফলপ্রসূ হয়েছে কিন্তু স্বীকার করতেই হবে, যত কিছু আমরা ভেবেছি সম্পাদ্য বা কর্তব্য, তার সবগুলি এখনো আমরা আয়ত্ত করতে পারি নি। যে পথে আমরা বেশী সাফল্য

অর্জন করেছি, তা দুটি ভিন্নধর্মী করণীয় প্রস্তুতির সংমিশ্রণে তৈরি। বিজ্ঞানে এই ধরণের অবস্থা থেকেই বোঝা যাচ্ছে—এই পরিস্থিতি বেশী দিন টিকবে না এবং এই আপোষের মনোভাবও যুক্তিযুক্ত হেতু-শাস্ত্রের অনুমোদিত নয়। অবশ্য লরে'ৎসের ইলেকট্রনীয় তত্ত্ববিধি আলোচনা করতে প্রথম থেকেই মেনে নিতে হয়—বাস্তবকে বুঝতে ক্ষেত্র ও ইলেকট্রন কণা—দুইয়েরই অবতারণা করতে হবে একই সঙ্গে। কারণ দুটি ধারণা পরস্পরকে সম্পূর্ণ করছে প্রকৃতির সত্তাবোধে। আরও পরে এলো আপেক্ষিকতাবাদ—তার সাধারণ কিংবা বিশেষরূপে, যদিও এই দুটিই ক্ষেত্রিক কল্পনা আশ্রয় করে রয়েছে, তবুও তারই মধ্য থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বস্তুকণা-বাদের অবতারণা বাদ দেওয়া যায় নি—কিংবা বস্তুকণার যে প্রকার Total Differential Coefficient-এর সমীকরণ লাগে, তারও দূরীকরণ সম্ভব হয়নি।

যে তত্ত্বশাস্ত্র অধুনা বেশী চলছে ও বিশেষ করে নানা ক্ষেত্রে সাফল্য এনেছে, সে এক নতুন সৃষ্টি, অর্থাৎ কোয়াণ্টাম বিজ্ঞান। সেটি উপরে বর্ণিত দুটি ধারা থেকেই পৃথক। আগের দুই ধারার নামকরণ করা যায়—নিউটনীয় বা ম্যাক্সওয়েলীয়। যে সব উপাদান—এই নতুন শাস্ত্রবিধির অন্তর্ভুক্ত তারা কেউ প্রকৃতির বাস্তব রূপবর্ণনা-প্রয়াসের ফল নয়। এই শাস্ত্রে আলোচনা ও মননের বস্তু হলো—বিশেষ কোন প্রাকৃতিক বস্তু বা ঘটনার আবির্ভাবের সম্ভাবনা—কোন্‌খানে কত দাঁড়াচ্ছে। আমি মনেকরি ডিরাকই এই নব শাস্ত্রের এমন কাঠামো খাড়া করেছেন, যাকে বলা যায়—কি যুক্তিতে, কি বর্ণনা-পদ্ধতিতে সবচেয়ে নিখুঁত। তিনিই বলছেন—যুক্তি দিয়ে বোঝানো সোজা নয়—ফোটনের মধ্যে এমন কি বৈশিষ্ট্য আছে, যার অনুসারে বলা চলবে, যদি তলাশ্রয়কারী কোন নিকোল তার পথে তির্যকভাবে পড়ে, তবে ফোটন, কখন সেটিকে অতিক্রম করে দূরে এগুবে, আর কখনই বা বাধা পেয়ে পরাবর্তিত হবে। আমি এক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে এক মত। আমি কিন্তু ভাবছি—বিজ্ঞানীরা চিরকাল প্রাকৃতিক ঘটনার এইরূপে তির্যক বর্ণনাতে সন্তুষ্ট থাকবেন না। এমন কি, শেষ অবধি যদি কোয়াণ্টাম-বাদ ও সাধারণ আপেক্ষিকতা-যুক্তিবাদের সামঞ্জস্য সাধন সম্ভব হয়—তখন তাঁদের ফিরে এসে আবার প্রকৃতি-বর্ণনার ব্যাপারে ম্যাক্সওয়েলীয় প্রস্তুতিকে ফিরিয়ে আনতে হবে; অর্থাৎ তখন প্রাকৃতিক সৎরূপের বর্ণনা Partial Differential সমীকরণের আশ্রয়ে হবে ও সর্বত্রই আবশ্যিক একজাতীয় সমীকরণ চালু থাকবে এবং তার ব্যতিক্রম ঘটেছে—এরূপ কোন সঙ্কট-স্থান কোথাও মিলবে না।

গণিত ক্ষেত্রে উদ্ভাবনের মনস্তাত্ত্বিক বিচার

বিজ্ঞানে উদ্ভাবনীর পিছনে যে মনস্তত্ত্ব বিরাজ করে সেই বিষয়ে গণিত বিজ্ঞানী জ্যাক হাদামার যে পুস্তিকা প্রকাশ করেন সেই পুস্তিকার নির্বাচিত অংশের অনুবাদ দেওয়া হয়েছে। সংকলিত প্রবন্ধটির নাম দেওয়া যেতে পারে "গণিত ক্ষেত্রে উদ্ভাবনের মনস্তাত্ত্বিক বিচার।" কোন অন্বেষণের সাধারণ পথ নির্দেশ কি ভাবে করা যায়? বিশেষ কোন সমস্যা সমাধানের পূর্বে প্রশ্ন উঠে—আমরা কি করতে চাই ও সমস্যাটির স্বরূপ কি!

সেনাপতি ক্লাপারেও সমন্বয়ের কেন্দ্রে এক আলোচনা সভার উদ্বোধনের সময় বলেছিলেন যে, আবিষ্কার দুই ধরনের হয়। প্রথমটিতে লক্ষ্য স্থির রয়েছে, কিন্তু কি ভাবে আমরা সেখানে পৌঁছতে পারি, তার উপায় উদ্ভাবন করাই উদ্দেশ্য। মন আসল পথ খুঁজছে, সমস্যা নিরসনের পদ্ধতি আবিষ্কারে সে ব্যস্ত। অথবা প্রথমেই সত্যের আবিষ্কার হল, পরে ভাবনা উঠে—এই জ্ঞানকে আমরা কোন্ কাজে লাগাতে পারি, অর্থাৎ মন তখন জানতে চায়—এই পথ আমাকে কোথায় পৌঁছে দেবে। বিশেষ বিশেষ সমস্যার খোঁজ চলে—উত্তর তো আমাদের আয়ত্তাধীন। যদিও কথাটি অদ্ভুত শোনায় তবুও বলা যায় যে, দ্বিতীয় ভাবে আবিষ্করণেই আমরা বেশী অভ্যস্ত এবং বিজ্ঞানের প্রগতির ফলে এইটেই সাধারণ নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোন বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্যে এখন আর মূল সত্য খুঁজতে হয় না—এই মনোভাব নিয়ে সভ্যতার প্রগতি প্রকল্প বিরচিত হচ্ছে।

যীশু খ্রীষ্টের আবির্ভাবের চার শত বৎসরেরও আগে গ্রীকরা যখন বৃত্তাভাসের (Ellipse) বিষয় গবেষণা করেন ওই বিশেষ রেখা তখন কোন এক M—বিন্দুর গতিপথ মাত্র (যে পথে M—বিন্দু, দুটি স্থিরকেন্দ্র P and P′ থেকে তার অবস্থান দূরত্বের সমষ্টিকে অপরিবর্তিত রেখে চলতে পারে)। তবু ঐ রেখাচিত্রের বহু উল্লেখযোগ্য ও মনোহরী গুণাবলী তাঁরা আবিষ্কার করেছিলেন। কিন্তু তাদের ন্যূনতম কোন প্রয়োগই তাঁরা কল্পনা করতে পারেন নি। অথচ এই সব আবিষ্কার ও অনুসন্ধান না হলে কেপ্‌লার গ্রহরাজির গতিবৈশিষ্ট্যের কোন সূত্রই আবিষ্কার করতে পারতেন না, বিশ্বজোড়া মহাকর্ষের সন্ধানও নিউটনের মিলত না। এবার নিছক প্রয়োগ-ক্ষেত্রের কথা ভাবা যাক। এখানেও বৈজ্ঞানিক সমাধানের

রীতি ওই একই নিয়মের অধীন। যেমন, প্রথমে বেলুন-ভরার জন্য হাইড্রোজেন কিংবা জ্বালানী গ্যাসের কথা। এই দুইয়ের ব্যবহারে অগ্নিকাণ্ড ঘটে বেলুন ফেঁসে গিয়ে সর্বনাশ ঘটবার ভয় প্রচণ্ড। তাই এখন আমরা অদাহ্য গ্যাসের দ্বারাই বেলুন ভরছি এই উন্নতি সম্ভব হয়েছে দুটি কারণে।

প্রথম, সূর্যের আবহমণ্ডলে কোন্ জিনিস আছে বা কোন্ জিনিস নেই, তা আজ নির্ণয় করা গেছে (ফলে হিলিয়ামের আবিষ্কার) 'দ্বিতীয় কারণ, র‍্যালে (Rayleigh) রামসে (Ramsay) প্রমুখ বিজ্ঞানীদের গবেষণা। নাইট্রোজেনের ঘনত্ব দশ হাজারের মধ্যে এক ভাগেরও কম ভুল করে নির্ধারণ করবার উপায় বের হয়েছে। এর পূর্বে এই ধরনের মাপজোখে হাজারে এক অংশেরও বেশী ভুল হত। ফলে পৃথিবীর আবহমণ্ডলে হিলিয়ামাদি অজস্র গ্যাসের সন্ধান মিলল।

এই দুই সমস্যার মর্মোদ্ঘাটনের ফলেই নতুন প্রয়োগের সম্ভাবনার কথা উঠল। অন্যভাবে চিন্তা করলে আমাদের স্বীকার করতে হবে যে, জ্ঞানের প্রয়োগই নানা ফলপ্রসূ ও নব নব তত্ত্ব সন্ধানের প্রাণস্বরূপ। প্রয়োগ ক্ষেত্রে অনেক নতুন প্রশ্ন ও সমস্যা ওঠে, যা নিরাকরণের জন্য নতুন উদ্ভাবনের দরকার হয়।
প্রয়োগ ও তত্ত্ববিচারের সম্পর্কে উপমা দিয়ে বলা যায়, এ যেন এক উদ্ভিদ ও তার পল্লব। উদ্ভিদ পল্লবকে বহন করে আছে, আবার পল্লব যোগাচ্ছে উদ্ভিদের পুষ্টির জন্য খাবার।

পদার্থবিদ্যা থেকে বহু উদাহরণ সংগ্রহ না করেই এই কথাটি মনোযোগ দিয়ে ভাবা যেতে পারে যে, গণিতের ভিত্তিস্বরূপ যে গ্রীক জ্যামিতি-বিজ্ঞান, তাও প্রয়োগের তাগিদেই জন্ম হয়েছিল—যা তার নাম থেকেই বোঝা যাবে—অর্থাৎ জমি জরিপের তাগিদেই এর সৃষ্টি। এই উদাহরণটি কিন্তু ঠিক সাধারণের পর্যায়ে পড়ে না। কারণ প্রয়োগের তাগিদ সঞ্চিত জ্ঞানের সাহায্যে মেটাবার চেষ্টা করা হয়ে থাকে।

বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের তত্ত্ব যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক না কেন, সাধারণত তার প্রয়োগ ঘটে সেই আবিষ্কারের অনেক পরে। (যদিও সময়ের এই ব্যবধান আজকাল অনেক কমে যাচ্ছে—বেতারবার্তা প্রেরণ হাৎ'সীয় তরঙ্গের আবিষ্কারের অল্প পরেই সম্ভব হয়েছে। কিংবা, বর্তমানে পরমাণুনিহিত শক্তির প্রয়োগ অল্পদিনের মধ্যেই ঘটেছে।) তবু গণিতশাস্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ কোন গবেষণা যে প্রয়োজনের তাগিদে হয়েছে তার উদাহরণ মেলা দুষ্কর, বরং বলতে হয় বিজ্ঞানীর জানবার বা বোঝবার আকাঙ্ক্ষা

থেকেই তার অনুপ্রেরণা আসে। সেই জন্যই বলি গণিতবিদরা উপরে লিখিত দুটি কারণের মধ্যে কেবল দ্বিতীয়টিকেই হয়ত স্বীকার করবেন।

এবার আসা যাক গবেষণার বিষয় নির্বাচন প্রসঙ্গে।

প্রয়োগের কথা বাদ দিই—কারণ প্রয়োগ সম্ভব বলে তা ঘটতে লাগবে সাধারণত বহু বৎসর। তবুও গণিতে আবিষ্কার বিশুদ্ধ তত্ত্বের রাজত্বেই অল্প বিস্তর নতুন তথ্যের খবর দিতে পারে। তবে অনেক সময় তারা থাকে আমাদের একেবারে অজানা; যেমন, যে বিজ্ঞানীরা সূর্যমণ্ডলের উপাদানের বিশ্লেষণ করেছিলেন, তাঁরা অদাহ্য বেলুনের সম্ভাবনা ভাবতে পারেন নি।

তাই প্রশ্ন ওঠে, কিভাবে গবেষণার বিষয় নির্বাচন করতে হবে। এই বাছাই করাই হল সবচেয়ে শক্ত কাজ। গবেষণার বিশেষ দরকারী অঙ্গই হল এটি, এবং এই বিষয়-নির্বাচন দেখেই আমরা নববিজ্ঞানীর গুণের বিচার করি।

নতুন গবেষক ছাত্রদের গুণের বিচার আমরা অনেক সময় এর ভিত্তিতেই করি। ছাত্রেরা অনেক সময় জিজ্ঞাসা করে—সে কোন্ ক্ষেত্র অন্বেষণের জন্যে বেছে নেবে! কেউ জিজ্ঞাসা করলে অবশ্য আমি খুশী হয়েই জবাব দিই। এইখানে তবু স্বীকার করছি (অবশ্য বেশীর ভাগ প্রাথমিক যাচাই হিসাবে) যে ছাত্রেরা আমাকে এই ধরনের প্রশ্ন করে তাদের আমি দ্বিতীয় শ্রেণীর বলে ভেবে রাখি।

অনুসন্ধানের অন্য আর এক ক্ষেত্রের বিখ্যাত ভারতীয় কৃষ্টির গবেষক সিলভ্যাঁ লেভিরও ছিল এই অভিমত। তিনি বলতেন, "এই ধরনের প্রশ্ন করলেই এই মর্মে জবাব দেবার ইচ্ছা হত আমার, নবীন বন্ধু হে, তুমি তো তিন চার বৎসর ধরে আমার বক্তৃতা শুনেছ; তার মধ্যে এমন কোন জিনিসই কি তুমি খুঁজে পেলে না, যার বিষয়ে আরও গভীরভাবে বিচার করবার দরকার আছে বলে তোমার মনে ঠেকল!"

সত্য সত্যই কিন্তু এই বিশেষ দরকারী ও কঠিন কাজের কি হদিস দেওয়া যেতে পারে? উত্তর দিতে দ্বিধা হয় না।

আবিষ্কারের উপায়ের নির্দেশ দিতে পয়ঁকারেও (Poincare) একই ভাবের কথা বলেছেন। প্রেরণা ও উপায়—এই দুয়েরই বিষয়ে বলতে একই অনুভূতির কথা পাড়তে হয়। সেটি কর্মীর বিশেষ এক প্রকারের রসবোধ; তার রসাস্বাদ ও সৌন্দর্য অনুভূতির বিশেষ এক ভাবের ক্ষমতা। এর প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বের দিকে পয়ঁকারে আমাদের সকলকে দৃষ্টি বিশেষ করে দিতে বলেছেন। র‍্যানাঁও (Renan)

এই ভাবেরই কথা বলেছেন (এ জেনে কৌতূহল বাড়বে হয়ত)। লেখকের রচনা আলোচনা করতে যেমন, বিজ্ঞানীর চিন্তানীতির 'মধ্যে আমরা তাঁদের পছন্দের বৈশিষ্ট্যের খবর পাই—আবার তেমনি বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির পছন্দই শৈলীর উৎকর্ষ বিচারে শেষ অবধি নির্ভরযোগ্য মাপকাঠি হয়ে দাঁড়ায়।

অন্বেষণের ফল ভবিষ্যতে কি দাঁড়াবে অনেক সময় তা আমাদের একেবারেই অজানা থেকে যায়। তাই সত্য বলতে কি একমাত্র সুন্দরের অনুভূতিই আমাদের এই সময় শিক্ষা দেয় ও পথ দেখায় এবং অন্য কোন উপায় আমার জানা নেই যার উপরে নির্ভর করে ভবিষ্যতের সম্ভাবনার ছবি আমরা মনের মধ্যে গড়ে তুলতে পারি। এ নিয়ে তর্কের অবতারণা আমার কাছে শুধু কথার খেলা বলে মনে হয়। কিছু জানবার আগেই অনুভূতির কথা। আমরা অনুভব করি, অন্বেষণের কাজে এই ভাবে এগুলে পরিশ্রম সার্থক হবে। কোন প্রশ্নের মনোহারিতাই আমাদের আকর্ষণ করে এবং এর সমাধান বিজ্ঞানচর্চার সাহায্য করবে—এই কথাই শুধু মনের মধ্যে তখন ভেসে ওঠে। তখন ভাবিনা ভবিষ্যতে প্রয়োগ ক্ষেত্রে এটি কোন কাজে আসবে কি-না।

এই বোধকে কেউবা নিজের খুশিমতো সুন্দরের অনুভূতি বলতে পারেন, আবার কেউ বা এই অভিধায় সম্ভবত আপত্তি করবেন। অবশ্য গ্রীক গণিতবিদেরা যখন বৃত্তাভাসের ধর্ম নির্ধারণে নিযুক্ত ছিলেন, তখন তাঁদের মনোভাব এই ধরনের ছিল এটি সকলকেই স্বীকার করতে হবে ; কারণ, এর জন্য অন্য কোন ভাবনা সে সময় সম্ভব ছিল না।

পরে প্রয়োগের কথা। যদিও প্রথমে তার বিষয়ে কোন ধারণাই সম্ভব নয়, তবু বেশী সময় দেখা যায় যে, প্রথম অনুভূতি যদি সুষ্ঠুভাবে হয়ে থাকে তবে পরিণামে তার প্রয়োগও অনেক সময়ই ঘটে যায়। নিজের বিষয়ে যে দু'চারটি কথা মনে পড়ছে, উদাহরণ হিসাবে তার উল্লেখ করি। অবশ্য নিজের কথা বার বার তোলবার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি, তবু এই সব বিষয়ই আমার বিশেষ জানা আছে বলেই এদের অবতারণা।

ডাক্তার ডিগ্রির জন্য আমি যখন প্রবন্ধ পেশ করতে যাচ্ছি তখন হারমিট (Hermite) বললেন তোমার তত্ত্বসূত্রগুলির প্রয়োগ দেখাতে পারলে ভাল হয়। সে সময় আমার কিছুই মনে এলো না। তবে প্রথমে থিসিসের পাণ্ডুলিপি জমা দেওয়া ও পরে মৌখিক পরীক্ষা—এই কয়দিনের মধ্যেই আবিষ্কার করলাম

ইনস্টিটিউট-এ প্রাইজের বিষয় বলে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উল্লেখ রয়েছে। পরে দেখলাম, আমি যে তত্ত্বের আবিষ্কারের কথা থিসিসে জানিয়েছি—তারই সাহায্যে সেই বিশেষ প্রশ্নের সমাধানও সম্ভব হল, আমি কিন্তু শুধু নিজের কৌতূহল চরিতার্থ করতে থিসিসে প্রশ্নের আলোচনা শুরু করেছিলাম। তাই সে সময় অনুভূতি আমাকে সুপথেই নিয়ে গিয়েছিল বলতে হবে।

কয়েক বৎসর বাদে ওই ধরণের একটি প্রশ্নের আলোচনা করতে করতে পেলাম একটি সুন্দর তথ্য সহজভাবেই। বিষয়টি বন্ধুবর প্রফেসর ডুহেমকে (Duhem) জানালাম। তিনি পদার্থবিদ্যার অধ্যাপনা করতেন, জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার এই আবিষ্কার কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাবে ? আমি উত্তর দিলাম এখন পর্যন্ত ওকথা আমি ভাবিনি। শ্রীডুহেম যেমন বিখ্যাত পদার্থবিদ্ তেমনি একজন সুযোগ্য চিত্রশিল্পীও ছিলেন। তিনি বললেন, তোমার সঙ্গে একজন চিত্রকরের তুলনা করা যেতে পারে। সে নিজের খেয়াল মত ঘরে বসেই প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি এঁকে ফেলেছে ; পরে বাইরে গিয়ে দেখছে, ওই ধরণের ছবির সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির কোন দৃশ্যের মিল আছে কিনা। কথার তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করলাম, তবুও প্রয়োগের কথা প্রথমে না ভাবাতে কোন দোষ হয় নি ; কারণ পরে তার উপযুক্ত প্রয়োগক্ষেত্র মিলে গেল।

১৮৯৩ সালে বীজগণিতের নির্ধারকবন্ধনী (Determinant) সংক্রান্ত একটি প্রশ্ন আমার কৌতূহল জাগায়। উত্তর মিলল, কিন্তু তখন মনে কোন সন্দেহ জাগেনি যে, এই সমাধানের কোন বিশেষ প্রয়োগ হতে পারে। শুধু চিত্তাকর্ষক প্রশ্ন বলেই তার অনুশীলন উচিত, এই ছিল আমার মনোভাব। পরে ১৯০০ সালে প্রকাশিত হল ফ্রেডহলম (Fredholm)-এর বিখ্যাত প্রবন্ধ, দেখা গেল ১৮৯৩ সালে যে উত্তর পেয়েছিলাম, তার বিশেষ প্রয়োজন ছিল ও প্রয়োগও হল।

বর্তমান যুগে পদার্থবিজ্ঞানে ঘটছে এমন সব চমকপ্রদ ব্যাপার যা ভাবলে বিস্ময়ে অবাক হতে হয়। ১৯১৩ সালে গ্রুপ থিয়োরির অনুশীলন করতে করতে কারতাঁ (Cartan) দেখেন একটি বিশেষ ধরনের জ্যামিতিক ও analytic পরিবর্তন পদ্ধতি অপরিবর্তিত থাকে। ওই সময়ে এই ধরনের পরাবর্তের কোন বিশেষ দ্যোতনা সম্ভব ছিল না—শুধু তার তদগত সৌন্দর্যই চোখে পড়ল। পনেরো বৎসর বাদে ইলেকট্রন নিয়ে পরীক্ষা করতে করতে পদার্থবিদেরা তার অনেক অদ্ভুত

ধর্ম ও আচরণ আবিষ্কার করলেন। ১৯১৩ সালে কারতাঁ-র (Cartan) আবিষ্কার ছাড়া এক্ষেত্রে ওইসব গুণের সমাবেশ সম্যক হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব হত না।

কিন্তু, বর্তমান যুগের Function-এর কলনশাস্ত্র পর্যালোচনা করলে এর যোগ্যতম উদাহরণ মিলবে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে জ্যাঁ বারনুলী (Jean Bernoulli) চেয়েছিলেন এমন এক রেখাপথ আবিষ্কার করতে—যেটি A এবং B বিন্দু দুটিতে যোগ করে এমনভাবে অবস্থান করবে যে, যে কোন বস্তুকণা মাধ্যাকর্ষণের বশে A থেকে B-তে গড়িয়ে পড়বে ওই রেখাপথে, সর্বাপেক্ষা অল্প সময়ের মধ্যে। আগের আগের দিনে যে সব কথার আলোচনা হয়েছিল, তার সঙ্গে এই প্রশ্নের কোন সাদৃশ্য ছিল না। অথচ এর নিজস্ব সৌন্দর্য ছিল এর প্রধান আকর্ষণ। অবশ্য তন্মাত্র-কলন শাস্ত্রের (Infinitesimal Calculas) অনেক প্রশ্নের সঙ্গে এর সাদৃশ্য চোখে ঠেকবে।

সে সময় কেউ আন্দাজ করতে পারত না এভাবে যে পরাবর্তনের কলন-বিদ্যার (Calculas of variation) জন্ম হল, পরবর্তীকালে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বা ঊনবিংশ শতকের প্রাক্কালে, সেটি বলবিজ্ঞানে প্রযুক্ত হয়ে অনেক উন্নতি ও প্রগতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

আরও আশ্চর্য হতে হয় এই দেখে যে, এই প্রাথমিক কল্পনার প্রসার ঘটল ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বিখ্যাত বিজ্ঞানী ভলটেরার (Volterra) দক্ষ এবং শক্তিশালী প্রেরণার ফলে। Function নিয়ে এই ধরনের গণনা-নীতি বিখ্যাত ইটালীয়ান বিজ্ঞানী কেনই বা করলেন, যে নীতি এতকাল তন্মাত্রিক-কলনে সংখ্যা নিয়ে চালু ছিল অর্থাৎ তিনি কোন Function বিশেষকে অবিচ্ছিন্ন পরিবর্তনীয় বিশ্বসারিক একক হিসাবে ভাবতে গেলেন কোন্ প্রেরণায়? মনে হয় শুধু গণিতশাস্ত্রের সংযোজনাকে সুসমঞ্জসভাবে সম্পূর্ণ করে তুলতে চেয়েছিলেন তিনি—বাস্তুবিদ্ যেমন চান হঠাৎ কোন বাহির প্রসার করে—তৈরী কোন ইমারতের শ্রীবৃদ্ধি করতে। এই রকমের সুসঙ্গতসৃষ্টি যে Function ঘটিত অনেক প্রশ্নের সমাধানে সাহায্য করবে, এটা তখনই ভাবা সম্ভব ছিল—কিন্তু এই Functional (এই নতুন নামে এই নতুন কল্পনার আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে আজকাল) কোন সময়ে বাস্তব জগতের সম্পর্কে আসবে—সেই সময় এই ভাবনা নিশ্চয়ই ভিত্তি-হীন বাতুলতা মনে হত। মনে হত এই Function ঘটিত কল্পনা বিশুদ্ধ গণিত-রাজ্যে সূক্ষ্মতম মানস-সৃষ্টি মাত্র হয়ে থাকবে।

কিন্তু আজ এই বাতুলতাই চালু হতে বসল। বর্তমান পদার্থবিদদের কাছে এটি যতই দুর্বোধ্য ও কষ্টকল্পিত ঠেকুক না কেন (তরঙ্গ-গণিতের নতুন থিয়োরিতে) এই নতুন ধরনের পরিকল্পনা গণিতের ভাষায় কোন জড় জগতের ঘটনাকে রূপ দিতে গেলে একেবারে অপরিহার্য ঠেকছে, যদিও এর যথাযথ ব্যবহার শুধু সেই সব অল্পসংখ্যক বিজ্ঞানীই করতে পারছেন যাঁদের এই বিশেষ উচ্চ ও জটিল হিসাবের সঙ্গে পরিচয় আছে। পদার্থ-বিজ্ঞানে পরিদৃশ্যমান পরিমেয়কে, যেমন গতি, চাপ ইত্যাদিকে, আমরা এখনও সংখ্যাবাচক সংজ্ঞা দিয়েই ভাবতে অভ্যস্ত। এর পরে তাদের কাউকেই সে রীতিতে ভাবা চলবে না, তাদের গণিতের Functional হিসাবে ভাবতে হবে।

ওয়ালাস (Wallace) যে দ্বিধার কথা তুলেছেন, আবিষ্কারের পথে সৌন্দর্যবোধকে চালক হিসাবে দেখবার বিপক্ষে, আমি যে কয়টি উদাহরণ উপরে দিলাম—তাতেই তার অসারতা প্রমাণিত হবে। বরং গণিতের রাজ্যে একমাত্র সুন্দরের অনুভূতিই আমাদের সাধনার সক্রিয় সহায় হতে পারে। আমাদের ধারণাও ভাবনার পথ নির্দেশ করতে বিষয়-বস্তুর আকর্ষণীয়তা কতদূর কার্যকর হতে পারে, উপরের কথাগুলি তারই উদাহরণ হিসাবে গ্রহণ করা যায়।

মনের সঙ্গে যোগসূত্র অবিচ্ছিন্ন রাখতে আকর্ষণীয় বিষয়বস্তুর প্রতি চিত্তের এই আনুগত্যের সত্যই বিশেষ প্রয়োজন আছে।

আইনস্টাইন ও আপেক্ষিকবাদ সম্পর্কে

পাউলি

[আপেক্ষিকবাদ প্রচারের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে আইনস্টাইনকে সম্বর্ধনা জানাতে ১৯৫৫ সালে বার্ণে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সভায়—মূল সভাপতি Wolf-gang Pauli-র পঠিত ভাষণ।—মূল জার্মান থেকে অনুবাদ]

পদার্থ-বিজ্ঞানের সঙ্গে তারা-বিজ্ঞানের কথা জুড়ে নিয়ে এই দুইয়ের পরি-প্রেক্ষিতে আপেক্ষিকবাদের আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই বুঝতে হবে, প্রকৃতি-বিজ্ঞানের সঙ্গে যেমন একদিকে গণিতের, তেমনি অন্যদিকে বোধতত্ত্বের সম্পর্ক কি। ওই দুই জ্ঞানের সঙ্গে পদার্থবিদ্যার সম্পর্ক সপ্তদশ শতকের সুরু থেকেই আরম্ভ হয়েছে—এরাই ছেপে তুলেছে তার লক্ষণীয় বিশেষ রূপটি। আপেক্ষিকতার কল্যাণে আজ সেই রূপটি নতুন করে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বিশিষ্ট আপেক্ষিকতার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে শুদ্ধগণিতের সমষ্টি-তত্ত্ব (group theory)। বহুদিনের পরীক্ষার ফলে গালিলিও-নিউটনের বলবিজ্ঞান যখন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হলো, তারই মধ্যে পাওয়া গেল এক বিশেষ সমষ্টি-তত্ত্ব। বলবিজ্ঞানে ধরা হয়, বর্ণনার কাজে দ্রষ্টা তার সকল রকম চলনই সমতুল্য ভাবতে পারেন যদি (এখানে গণিতের কথায় বলা যাক) ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় দর্শক যে সব বিভিন্ন অক্ষত্রয়ীদের নির্বাচন করছেন—একটুও দিক পরিবর্তন না করে মাত্র ত্বরণহীন গতিবেগের বশে তাদের এক-কে অন্যের অবস্থায় এনে ফেলা সম্ভব হয়। এই ভাবে এক থেকে অন্যে যেতে (ভিন্ন অক্ষত্রয়ীর ভিত্তিতে একই ঘটনার বর্ণনা করতে) গণিতের যে পরিবর্তন-সূত্র ভাবতে হয় (দেশ-কাল বাচক সংখ্যাগুলির মধ্যে), তাকে বলা হয়—সংক্ষেপে পরিবর্তক। তাদের সর্বসমষ্টিকে বলা হয় বলবিজ্ঞানের গ্রুপ। সমষ্টি-তত্ত্ব মনে রাখলে বস্তুর স্থির ভাবের বিশেষ আলোচনার দরকার নেই। সমবেগে একই দিকে সে সঞ্চরণ করছে—এই ভাবলেই চলে।

কারণ বলবিজ্ঞানসঙ্গত সমষ্টির অন্তর্গত উপযুক্ত এক পরিবর্তকের দ্বারা স্থির-স্থিতি থেকে তার সমচলন অবস্থার উদ্ভব হতে পারে। জাড্যগুণের বর্ণনা অবশ্য এই ভাবে বিজ্ঞানে দেওয়া হতো না। তবে উনবিংশ শতাব্দীতে গ্রুপের পরিকল্পনা যখন পূর্ণভাবে ফুটলো, তখন বলবিজ্ঞানের মধ্যে গ্রুপের গণনাও কল্পনায় চলে এলো। বিদ্যুতের গতিবিজ্ঞানও তখন প্রগতির এক শিখরে পৌঁচেছে। সেই তুঙ্গে পাই ম্যাক্সওয়েল (Maxwell) ও লরেন্সের (Lorentz) ক্ষেত্রবাদ (Field

theory) ও তার বিশেষ সমতাজ্ঞাপক সূত্রগুলি, যা লিখতে আমাদের আংশিক ভেদাঙ্কের (Partial differential coefficients) ব্যবহার করতে হয়।

বলবিজ্ঞানের পরিবর্তকগুলি কিন্তু এই সূত্রগুলির রূপ বদ্‌লে দেয়। তখন চোখে ঠেকে যে, বলবিজ্ঞানের সমষ্টির (Group) সঙ্গে সমীকরণগুলি খাপ খাচ্ছে না—বিশেষ যখন দেখা গেল, উৎসের গতির সঙ্গে তারই বিকিরিত আলোর বেগের কোন সম্পর্ক থাকছে না এবং সমীকরণগুলি থেকে এক ফল হিসাবে এই তথ্যটিও বেরিয়ে এসেছে। তখন প্রশ্ন উঠলো—তবে কি বিজ্ঞান সূত্রগুলির সঙ্গে প্রকৃতপক্ষে কোন গ্রূপের সঙ্গতি সব সময় নাও থাকতে পারে অথবা পুরাপুরি সঙ্গতি বজায় রাখতে এইবার কোন নতুন সমষ্টির যোজনা করতে হবে, যা জড় ও বিদ্যুৎ উভয়ের ক্ষেত্রেই খাটবে (অর্থাৎ সব সময়ে বজায় থাকবে সূত্রগুলির নিত্যরূপ)? রায় দাঁড়ালো শেষ অবধি দ্বিতীয় সম্ভাবনার পক্ষে। দুই রকমের হিসাবে একই ধারণায় আমরা এসেছি। প্রথমে চেষ্টা চললো নতুন এক সর্বব্যাপী সমষ্টির সন্ধান—যে গোষ্ঠীর প্রত্যেকটি ম্যাক্সওয়েল-লরেন্স সমজ্ঞার (Equations) রূপ অপরিবর্তিত রাখবে। এই পথে এগিয়েছিলেন গণিতবিদ্ পঁয়কারে (Poincare)।

দ্বিতীয় উপায়টি এইরূপ—যে সব পরিকল্পনার ভিত্তিতে বলবিজ্ঞানের সূত্র গড়া সম্ভব হয়েছে, তার বিশেষ করে সমীক্ষা ও পুনরালোচনা করা। আইনস্টাইন চললেন এই পথে। ভিন্ন ভিন্ন অক্ষত্রয়ী বিভিন্ন রূপ সমচলনে রত থাকলেও দেখা যায় বলবিজ্ঞানের সূত্রগুলিকে একই নিত্যরূপে লেখা সম্ভব। বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ঘটনা ঘটলেও তাদের এককালীনতা ভাবা সম্ভব। সুতরাং অসীম বেগে সঙ্কেতবার্তা প্রেরণের বিজ্ঞানসম্মত সম্ভাবনা আছে, এও স্বীকার করতে হয়। বলবিজ্ঞানের সূত্র অটুট রেখেও অসীম বেগ সম্ভব দাঁড়াচ্ছে। তবে অসীমত্ব বাদ দিয়ে সব রকম সঙ্কেত প্রেরণের একটা সুনির্ধারিত সর্বোচ্চ গতিসীমা আছে ভাবলে—দেশ-নির্দেশক অক্ষগুলির পরিবর্তনের সঙ্গে সময়-মানেরও পরিবর্তন হচ্ছে মানতে হবে। এইভাবে পাওয়া গেল বিশেষ এক ধরণের পরিবর্তক সমষ্টি, যাতে যুগপৎ দেশের ও কালের মান বদ্‌লায়। গণিতের ভাষায় এর বিশেষত্ব ব্যক্ত করতে গেলে ধরতে হয়, বিভেদ-জ্ঞাপক দেশ কাল মানের তন্মাত্র (Differential) দিয়ে একটি দ্বিঘাত রূপ (Quadratic form) লেখা যাবে, যার সর্বমুখে মানচিহ্ন এক নয়, তবু সব গ্রূপ পরিবর্তনের মধ্যে জাহির থাকবে এটির অব্যয়ীভাব। এই ভাবের আলোচনার পথে আইনস্টাইন যে সমষ্টি আবিষ্কার করলেন, দেখা গেল উপরের

দ্বিঘাত রূপের সঙ্গে সঙ্গে ম্যাক্সওয়েল-লরেন্স সমজ্ঞাগুলিরও নিত্যরূপ বজায় থাকছে তার প্রত্যেক পরিবর্তনে। অবশ্য এই সমষ্টির কল্পিত সর্বোচ্চ গতিবেগ মহাশূন্যে আলোকবেগের সঙ্গে অভিন্ন (সমকালীনতার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে তাই আইন-স্টাইন আলোক-সঙ্কেতের আশ্রয় নিয়েছেন)। আগে লরেন্সের এক মোটামুটি হিসাব ছিল। আইনস্টাইন ও পঁয়কারে তাথেকে আরও একধাপ এগিয়ে গেছেন। বস্তুতঃ লরেন্স এসেছিলেন খুব কাছে, তবে তাঁর বর্ণনার সঙ্গে শেষের সিদ্ধান্তের অল্প একটু প্রভেদ ছিল।

ভিন্ন পথে বের হয়েও আইনস্টাইন ও পঁয়কারে দুজনে এক সিদ্ধান্তেই পৌঁছলেন। শুদ্ধগণিত ও কাল্পনিক পরীক্ষার ফলের মধ্যে এই সঙ্গতি দেখে আমার মনে প্রাকৃত জগতের শুধু পরীক্ষায় অর্জিত অভিজ্ঞতা সমষ্টির উপর বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়ে গিয়েছে। এই রীতিতে অনুসন্ধান চালিয়ে পদার্থবিদ্যায় আমরা যে সফলকাম হতে পারি, প্রথম থেকে বস্তুর সত্য স্বরূপের বিষয় সুদৃঢ় জ্ঞান বা ধারণা না নিয়েই আমরা প্রকৃতির অনুসন্ধান সুরু করতে পারি, বিশিষ্ট আপেক্ষিকবাদের উপর লেখা আইনস্টাইনের প্রাচীন প্রবন্ধগুলিই তার প্রমাণ। কোন প্রাথমিক ধারণার উপর নির্ভর না করে বা নিজেকে কোন সুদৃঢ় নিয়মাবলীর অধীন না রেখে বিজ্ঞানী যে অপার কল্পনা-সমুদ্রে সন্তরণ শিক্ষা করতে পারেন, তার নির্দেশ আমরা বহুবার আইনস্টাইনের কাছেই পেয়েছি। হয়তো আপ্তলব্ধ বস্তুজ্ঞানের সীমাহীন সমুদ্রে নেমে সে প্রেরণা পায়, তবে শুদ্ধযুক্তির সাহায্যে নিজের কল্পনা-যোজনাকে সে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারে না।

ইথার বিজ্ঞানীর অজানা। নাম মাত্রেই তার কোন রূপ স্বতঃউদ্ভাসিত হয় না বিজ্ঞানীর মনে। এমন কি, আইনস্টাইনের সময় থেকেই সে মেনে নিয়েছে এই আদেশবাণী যে, ইথারের অস্থির অবস্থার কোন প্রতিমাই গড়া চলবে না। এই মূলনীতির উপর নতুন আলোক পড়েছে আপেক্ষিকতার মহাকর্ষতত্ত্ব থেকে বা, যা আইনস্টাইন একলা খাড়া করলেন ১৯০৮—'১৬ সালের মধ্যে—সেই সার্বিক আপেক্ষিকবাদের ফলে। এতে রীমানের (Riemann) গড়া দেশবর্তুলতার (Curvature) সার্বিক গণনা ও মিন্‌কাউস্‌কীর (Minkowski) দেশ-কালের নিরবচ্ছিন্নতার (Continuum) উপর ভিত্তি করে বিশিষ্টবাদের চতুর্মাত্রিক সূত্ররূপ সবই বজায় রাখা হয়েছে, তবে সেই রইলো অত্যল্পতনু ক্ষেত্রের মান সীমার মধ্যে। বৃহত্তর দেশের পরিপ্রেক্ষিতে আরও সাধারণ ক্ষেত্রের কল্পনা

করতে হয়। সেখানে নিত্য অন্তরমানকে লিখতে দেশ ও কালের তন্মাত্র নিয়ে দশ অক্ষর সমন্বিত এক দ্বিঘাত রূপ ব্যবহার করতে হয়। এরও মানচিহ্ন সর্বদিকে এক থাকে না। নিরবচ্ছিন্ন রাজ্যের এই নতুন জ্যামিতিতে তনু-মান ক্ষেত্রের মধ্যে ইউক্লিডীয় নীতিঅপরিবর্তিত রইলো, আবার বৃহত্তর দেশকাল ক্ষেত্রে অক্ষপরিবর্তক-গুলি পরিবর্ধিত হয়ে দাঁড়ালো এক সাধারণ নিয়মানুগত জ্ঞাপক সমষ্টিতে—যেখানে শুধু পরিবর্তনক্রমের বিষমতা বা বিচ্ছিন্নতা নেই এবং সব পরিবর্তক উপরিলিখিত সাধারণ দ্বিঘাতের মান বজায় রাখবে। সার্বিক আলোচনার সিদ্ধান্ত শেষে এই রূপ নিলেও আইনস্টাইন প্রথমে এটি ধরে গণনা সুরু করেন নি। তিনি ত্বরণগতি সুসম রেখে চলমান এক দর্শকের দেশ-কাল ক্ষেত্রের কথা উঠিয়েছেন, আবার বিকল্পে ভেবেছেন আর এক দর্শকের ক্ষেত্রকে, যে একভাবী (Homogeneous) মহাকর্ষ ক্ষেত্রে স্থির রয়েছে এবং এই বিশ্বাসে আলোচনা চালিয়েছেন যে, সব ব্যাপারে এই দুজনের বর্ণনা সমতুল্য হবে। এই বিশ্বাসের মূলে ছিল এই ধারণা—জাড্য ও ভরসংখ্যা যা বলবিজ্ঞানে এক নেওয়া হয়, সে বস্তুতঃ এই সমতুলনীয়তারই নির্দেশ দিচ্ছে।

নিউটনের সময় থেকেই ভর ও জড়-সংখ্যা যে এক, এটি জানা ছিল—তবে মাত্র এই জ্ঞান থেকে দেশ-কালের বিষয়ে এইরূপ এক সাধারণ সিদ্ধান্তে আইনস্টাইনের আগে কেউ উপনীত হন নি। সমতুলনীয়তাকে মূলনীতি ভেবে দেশ-কালের চতুরঙ্গ গণিতের সঙ্গে সুসঙ্গতি বজায় রইলো আরও একটি কল্পনায়, অল্প কথায় আইনস্টাইন যাকে বলেছেন G-ক্ষেত্র। মহাকর্ষের পরীক্ষিত ফলগুলির সঙ্গে এইভাবে সঙ্গতি বজায় রাখা গিয়েছে, কারণ তন্মাত্র নিয়ে গণনার সরল নীতিতে G-ক্ষেত্র থেকে ঐ সঙ্গতি এসে যায়। সঙ্গে সঙ্গে খুব সাধারণ সার্বিক পরিবর্তক সমষ্টির সঙ্গে সর্বক্ষেত্রে সঙ্গতি বজায় থাকবে, এও হৃদয়ঙ্গম হয়। তবে নিউটন থিওরীর বস্তুর স্থিরস্থিতির ক্ষেত্রে সুপরিচিত অংশ, বিভেদাঙ্ক দিয়ে লেখা পোয়সঁ (Poisson) সমীকরণের পরিবর্তে সার্বিক মতবাদে দশটি ক্ষেত্র-সমজ্ঞা জুটলো। এই বার সমীকরণগুলির বামে বসলো রীমানের বর্তুলতাজ্ঞাপক Tensor থেকে বিশেষভাবে নির্বাচন, সংযোজন ও সঙ্কোচনের (Contraction) ফলে প্রাপ্ত এক দশাঙ্গিক Tensor—এটি লাপ্লাস-পোয়স্-স'র বিভেদ-প্রবচনের (Expression) বদলে বসলো। ডাইনে ভর-ঘনত্বের বদলে এলো যুগপৎ শক্তি ও ভরবেগ-জ্ঞাপক এক Tensor। বিশিষ্ট আপেক্ষিকতার যুক্তিরীতি অনুসরণ করে আইনস্টাইন ভর ও কার্যশক্তির সমতুল্যতা-জ্ঞাপক এক বিশেষ সমকীরণ

কিছুকাল আগে উদ্‌ঘাটিত করেছিলেন ($E=mc^2$)। ডাইনের Tensorটি সার্বিক আপেক্ষিকতার ক্ষেত্রে এই রূপ নিয়ে সেই নীতিকেই প্রকাশ করছে। তবে এই Tensor বা মহাকর্ষের শক্তির মান বুঝাতে ভরের সঙ্গে যে নিত্যসংখ্যা আসে, তাকে অভিজ্ঞতার উপলব্ধি হিসাবেই ধরতে হবে। ওটি সার্বিকবাদে ওই বিশেষ রূপেই প্রতিভাত হয়েছে (এতে কোন গভীর রহস্যভেদের খবর নেই বস্তুতত্ত্বের)।

প্রকৃতি-দর্শন ও তার যুগক্রমে পরিণতির সঙ্গে সার্বিক মতবাদের নানাভাবের সম্পর্ক রয়েছে। আরিস্টটলের (Aristotole) সময় ত্রিধা-দেশের যে পদার্থসুলভ গুণের কল্পনা ছিল, সেই জাল কেটে দেকার্ট (Descartes), গালিলিও (Galileo), নিউটনের সময় দেশের স্বতন্ত্র অন্যানিরপেক্ষ ভিন্নরূপ কল্পনাই প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল। এখন আইনস্টাইনের G-ক্ষেত্র এসে দেশ-কালের উপর বস্তু-সুলভ গুণের পুনরারোপ করলে—আবার গণিতের সাহায্যে তারও বর্ণনা জোগালে। তবে আরিস্টটল খুঁজেছিলেন দেশে স্থিতিবিন্দুর একটা নিত্য অপরিবর্তনীয় রূপ—যাতে বস্তুসুলভ গুণের আশ্লেষ মাত্র ছিল। G-ক্ষেত্র কিন্তু নির্ভর করছে বস্তুর অবস্থানের উপর এবং প্রাকৃতিক সূত্র অনুসারেই এসব নির্দিষ্ট করা সম্ভব ভাবা হয়েছে। আইনস্টাইনের G-ক্ষেত্র এক হিসাবে ইথারেরই নবরূপ, তবে সংজ্ঞা হিসাবে বস্তু থেকে তার স্বাতন্ত্র্য মানতে হয়। আইনস্টাইন বার বার লিখেছেন, বস্তুর সঙ্গে একভাবের ঐক্য রেখে G-ক্ষেত্রের বিলুপ্তি যদি বস্তুহীনতার সঙ্গে সঙ্গেই ঘটতো, তাহলে তিনি মনে বেশী স্বস্তি অনুভব করতেন। এই কল্পনাকে তিনি বলেছেন মাকের প্রযুক্তি (Principle)। সর্বনিরপেক্ষ দেশ কল্পনার বিপক্ষে যুক্তিসঙ্গত আলোচনা করে প্রোফেসর মাক্ প্রথম থেকে আপেক্ষিকবাদের ভাবনার পথ পরিষ্কার করে রেখেছিলেন। তাই তাঁর প্রতি আইনস্টাইন এইভাবে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। কিন্তু সকলেই বলছে ও বলেছে (এই বৈঠকে)—সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও নতুন কোন কল্পনার আশ্রয় না নিয়ে মাত্র আপেক্ষিক সমজ্ঞা সূত্রের দ্বারা মাক-নীতিকে প্রতিষ্ঠিত করা যাবে না। আর ওসব ক্ষেত্রেই নতুন কল্পনাগুলির যৌক্তিকতা প্রমাণ বিশেষ কষ্টসাধ্য ব্যাপার থাকবে। তাই G-ক্ষেত্র থাকলে বস্তুহীন হলেও দেশ-কালকে সর্বশূন্যও বলা যাবে না।

এর পর থেকে দেশকাল পরিকল্পনার বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে উন্নতিকরণ বা বিবর্তন ভবিষ্যতের করণীয় হিসাবেই উন্মুক্ত হয়ে রয়েছে। তন্মাত্রিক বা বৃহত্তর প্রদেশের বিষয়ে সমানভাবেই একথা বলা চলে। সনাতনী ক্ষেত্রসংজ্ঞা (Field-

Concept) ও তাঁর গুণাবলীর বিচারও তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত রয়েছে। এদের ভাবনা সর্বদাই আইনস্টাইনের চিন্তা ও মন ভরে থাকতো। আমি নিজে সেই সব বিজ্ঞানীর দলে, যাঁরা ভাবছেন ঘটনা-সম্ভাব্যতাকে প্রাথমিক সংজ্ঞা হিসাবে মেনে তারই ভিত্তিতে আজকাল যে কোয়াণ্টাম বিজ্ঞান গড়ে উঠেছে, সেটিই আইনস্টাইনের রীতি অনুসরণ করে আরও এগিয়ে যাবার যথার্থ প্রয়াস। এই বিজ্ঞানে পরস্পরকে পূর্ণ ও সার্থক করতে যে সব পরীক্ষা-পদ্ধতি ভাবতে হয়, আপেক্ষিকবাদের দর্শকের বিভিন্ন গতিভঙ্গীর সঙ্গে তাদের তুলনা চলতে পারে। আবার Action একক 'h'-এর মধ্যে এই সত্য প্রকাশ পাচ্ছে—আণবিক জগতে যাবতীয় ঘটনাকে যদৃচ্ছা বিশ্লেষণ করবার একটা অলঙ্ঘনীয় সীমা আছে। বিশিষ্ট আপেক্ষিকতার ক্ষেত্রে তুলনা করতে সঙ্কেতের সর্বোচ্চ গতিসীমার কথা ভাবতে হয়। সার্বিক আলোচনায় অক্ষ-পরিবর্তক গোষ্ঠীর কথা ওঠে, যার সাহায্যে বিভিন্ন দর্শকের দেশ-কাল ধারণাগুলিকে সংযুক্ত করা যায় ও সেই সমষ্টির কতকগুলি সাধারণ গুণের কথা আমরা বিবেচনা করে থাকি। সেইরূপ কোয়াণ্টাম বিজ্ঞানের পরীক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে ইউনিটারী (Unitary) পরিবর্তক গোষ্ঠী অনুরূপ ভূমিকা নিয়েছে।

সংখ্যায়নে গণনার যে সাধারণ পদ্ধতি আছে, তার সঙ্গে মিলিয়ে আমরা কতকগুলি কাল্পনিক বিশেষ পরীক্ষার আয়োজন ও আলোচনা করতে পারি—কোয়াণ্টামবাদে এই বিষয়ে আইনস্টাইনকেই পথপ্রদর্শক হিসেবে ভাবা যায় এবং তাঁরই পর থেকে পদার্থ-বিজ্ঞানের বর্তমান রীতি এসে দাঁড়িয়েছে। আইনস্টাইন নিজে কিন্তু কতকগুলি সনাতনী পদ্ধতিতে স্থিরবিশ্বাসী ছিলেন। ঘটনার প্রত্যেক অঙ্গীটির নির্দেশ ও বর্ণনা না দিতে পারলে বিজ্ঞানীর কর্তব্যের কিয়দংশ অপূর্ণ রয়ে গেল বলে তিনি মনে করতেন। তাঁর মন পিছনে অতীতের পদ্ধতির দিকে অনেক আশা নিয়ে ফিরে থাকতো। অবশ্য একেবারে বলবিজ্ঞানের ভরবিন্দুর কল্পনায় ফিরতে চাইত না—তবে তাঁর মন চেয়েছিল সার্বিক আপেক্ষিকতাসম্বাদী ক্ষেত্রের দিকে যার সব সময়ে জ্যামিতিক উপায়ে বর্ণনা সম্ভব। এই আকাঙ্ক্ষার কারণ নির্দেশ করতে তিনি বলেছেন পুরাণী রীতিসম্মত প্রত্যেক ঘটনার সত্য রূপায়ণ ত্যাগ করে সম্ভাব্যতাকে আশ্রয় করলে আমরা সকলে এমন একটি প্রবণতার দিকে ঝুঁকবো, যাতে আশঙ্কা হয়, সত্য থেকে অলীক স্বপ্ন বা ভ্রমাত্মক ধারণা পৃথক করা ক্রমশঃ অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। আমার মত বিজ্ঞানীরা (কিন্তু) বলি, কোয়াণ্টামবাদে প্রাকৃতিক বর্ণনায় তার নৈর্ব্যক্তিক রূপ এইভাবে বজায় থাকে—যখন দেখি সংখ্যায়নের হিসাবে যা

পাওয়া যায়, বহুবার পরীক্ষার ফলের মধ্যেও তাই মিললো—তবেই তা প্রমাণ হলো বলা চলে। পরীক্ষায় এই ধরণের ফল পেলেই বলা যাবে সেটি বিশেষ ধরণের পরীক্ষা ও আয়োজনের উপর নির্ভর করছে না। এই ধরণের আলোচনা বেশীক্ষণ চালাতে আমি অনিচ্ছুক। আইনস্টাইন স্বীকার করেছেন, তিনি এমন বিশেষ ক্ষেত্র-বিজ্ঞান খাড়া করতে পারেন নি—যাতে আণবিক ঘটনায় বিশেষত্বগুলি প্রতিফলিত হয়েছে। আবার সনাতন পদ্ধতিতে ক্ষেত্রের কল্পনার উপর নির্ভর করে প্রাকৃত ঘটনার যে বর্ণনা অসম্ভব বলে প্রমাণ করা যায় নি, তাও তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন। আমার মত অনেক বিজ্ঞনী আইনস্টাইনের কোয়াণ্টাম সম্পর্কিত দৃষ্টি-ভঙ্গীর অনুমোদন করেন না। তবে চিরাগত 'ism' মার্কা দর্শনবাদের বিরুদ্ধে যে সব কথা তিনি বলেছেন, তাতে আমরা সহজেই সায় দেব। কোন বিশেষ দার্শনিক মতবাদ যে খাঁটি সত্য বা নিছক মিথ্যা, এটি তিনি বলতে রাজী নন। তাদের দোষ-গুণের আপেক্ষিক বিচারই তাঁর কাম্য। হয়তো সকলের মধ্যেই বিজ্ঞানী কোন কোন বিষয়ে নিজের পথের নির্দেশ পেতে পারেন। Library of living philosophers বইয়ের (684) পাতায় সমালোচকের উত্তরে তিনি লিখেছেন—বিজ্ঞানী হয়তো তখন Realist, যখন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞান নিরপেক্ষ হয়ে তিনি জগতের বর্ণনা করতে বসেন। আবার বিভিন্ন সংজ্ঞা ও চিন্তারীতিকে মনের স্বাধীন সৃষ্টি বলে যখন ভাবেন, তখন তিনি Idealist, অর্থাৎ তাঁর মানসিক সৃষ্টি দৃশ্য বা ইন্দ্রিয়জ্ঞানের বশ্য বা তদনুগ নয়। আবার মানসিক সৃষ্টি তখনই সঙ্গত বলে বিবেচনার যোগ্য মনে করেন, যখন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞান পরম্পরায় সম্পর্কগুলির যুক্তি-যুক্ত প্রতিরূপ সে দিতে পারছে—তখন তাঁকে বলা যাবে positivist। আবার যদি তাঁর মত এই হয় যে, তর্ক বিবেচনায় যা সহজ সরল ঠেকে, সেই ভাবনা-ধারণাই হলো অনুসন্ধানীর প্রকৃত কার্যকরী হাতিয়ার, তখন তাকে Platonic বা Pythagoras-এর অনুগামী ভাবা যাবে। উপরের বাক্য কয়টিতে আমার মন সহজেই সায় দেয়। কারণ কোন 'ism' মানবার পন্থা আমার চিন্তাবৃত্তির অপরিচিত ও একান্তই অসম্ভব ঠেকে আমার পক্ষে।

ভবিষ্যৎ বিজ্ঞানে যখনি পরীক্ষালব্ধ জ্ঞান, আর যুক্তিমাত্র-নির্ভর গণিতের তাত্ত্বিক যোজনার মধ্যে তৌল বা মূল্য নির্ধারণ করতে হবে, আমার আশা হয় আইনস্টাইনের বিরাট ব্যক্তিত্ব, যা তাঁর সৃজন ও চিন্তাশক্তির মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে—সে অবস্থায় ও চিরকালই পদার্থ-বিজ্ঞানীদের পথ নির্দেশ দিতে থাকবে।

হয়েল-নারলিকারের মহাকর্ষের নতুন থিওরী

[এই থিওরীর কথা নানা কাগজে নানাভাবে বেরিয়েছে, তবে ৯ই জুলাই, ১৯৬৪ Paris-এর Le Monde পত্রিকায় যে বিবরণী বের হয়েছে তার সারাংশ (প্রায় তর্জমা)—স. ব.]

প্রত্যেক বস্তুর ভরের মধ্যেও বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের ছায়া।

পদার্থবিজ্ঞানে এমন সব সূত্র আছে—যা বুঝতে গেলে মনে হবে, এ যেন জ্ঞান-ধারণার শেষ ধাপে পৌঁচেছি। বহু সূত্রের প্রমাণ দেওয়া যায়—কিন্তু এইগুলির ব্যুৎপত্তি কি ভাবে করবো—আমরা জানি না।

এরা প্রাথমিক গ্রাহ্য—এদের ভিত্তিতে আমরা বিজ্ঞানময় জগৎ গড়ে তুলেছি। বিজ্ঞানী এ-সবে এমন অভ্যস্ত যে, তাঁর কাছে এগুলি স্বতঃসিদ্ধ ঠেকবে।

তবে হঠাৎ একদিন কোন অনুসন্ধানী যদি প্রশ্ন করে বলেন—ওই বিশেষ সূত্রটি কেন মানবো ? তখন প্রতিদিন যা স্বতঃসিদ্ধ ঠেকতো, তাকে আর সে ভাবে দেখা চলবে না। আমরা তখন বুঝি—এর মধ্যে প্রমাণ করবার কিছু হয়তো রয়ে গেছে।

তিন-শ' বছর আগে আবিষ্কৃত নিউটনের মহাকর্ষতত্ত্ব নিয়ে আজকাল সেইরূপ কথা উঠছে।

এতদিন—প্রাথমিক সত্য হিসাবে কোন প্রশ্ন না করেই একে মেনে এসেছেন বিজ্ঞানীরা, শুধু দার্শনিকেরা সাহস করতেন—জিজ্ঞাসা করতে এই রহস্যের অন্তর কথা।

পদার্থবিদ্ ভাবতেন, জগতের তো এই ভাবেই সৃষ্টি হয়েছে—বস্তু দুইটি পরস্পরকে আকর্ষণ করে—তার শক্তি-মান ভরের সাক্ষাৎ ও আপেক্ষিক দূরত্বের বর্গের বিপরীত আনুপাতিক। ব্যস, এতে কারোর কিছু বলবার নেই ! কিন্তু এই শতকের প্রথম দিকে আইনস্টাইন আরামপ্রিয় বুদ্ধিজীবীদের শান্তিভঙ্গ করে বসলেন। সার্বিক আপেক্ষিকবাদে মহাকর্ষের উৎপত্তির কারণ বোঝাতে গিয়ে এই ভাবের কথা উঠলো। বস্তুর পরস্পরের আকর্ষণের কারণ হলো দেশকালের বিকার—যদিও এই বিকৃতি বস্তুদের অবস্থানের ফলেই ঘটছে। এই নতুন মতে

গ্রহগুলি ঋজু-পথেই চলেছে, তবে সূর্য আছে তাই তার সন্নিহিত দেশ বেঁকে গিয়েছে; তাই তাদের চলনও দৃশ্যতঃ বক্র ঠেকছে ও সনাতনী জ্যামিতির ভাষায় পথগুলিকে বৃত্তাভাসই বলতে হয়। এই লেখা পড়ে ভাবতে পার, সত্য বলতে প্রগতি বুঝি খুব অল্পই হয়েছে। যে সব ঘটনা পরম্পরা আমাদের জানা ছিল, তার বর্ণনাই করেছেন অন্যভাবে আইনস্টাইন। তিনি বলছেন দেশ বেঁকেছে, গতিপথ নয় (যা তাঁর আগে বলতেন নিউটন)—একথা কিন্তু সত্য নয়। আপেক্ষিকবাদ থেকে গতির যে নিয়ম পাওয়া যায়, বহু ক্ষেত্রে নিউটনের হিসাবের সঙ্গে মিললেও সব সময়ই তা বলা চলবে না। বিশেষ করে ভর অতিগুণ বৃদ্ধি পেলে এ প্রভেদও প্রকট হবে। তবে আইনস্টাইনের গণনায় যখন নিউটনের গণিত থেকে ভিন্ন ফল বের হয়, পরীক্ষা করে তার সত্যতা যাচাই করা চলে; যেমন—সূর্যমণ্ডল ঘেঁষে আসবার ফলে দূর তারকার আলোকের রেখার বক্রতা বা বুধগ্রহের পেরিহেলিয়ন বিন্দুর মৃদু চলন (যা আগের নিউটনীয় গণনায় পাওয়া যেত না)!

নিবিষ্ট চিত্তে পর্যবেক্ষণ করলে নতুন মতের কতক অংশ এখনো রহস্যময় ঠেকবে। আইনস্টাইন (বা অন্য কেউ) বস্তুভরের স্বরূপ নিয়ে কোন প্রশ্নই তোলেন নি। সকলেরই জানা, বস্তুর ভর যে গুণ ব্যক্ত করছে, তা মহাকর্ষণেও কাজ করছে, আবার জাড্য হিসাবে বল-বিজ্ঞানেও ঢুকেছে! আপেক্ষিকতা তত্ত্বেও ভর বস্তুকণাটিরই নিজস্ব গুণ।

এইটিকে অস্বীকার করে ইংরেজ বিজ্ঞানী হয়েল ও ভারতীয় গণিতবিদ্ নারলিকার বস্তুত্বের রহস্য ভেদ করতে নতুন এক পদক্ষেপ করেছেন। তাঁরা বলেছেন, যে কোন বস্তুর ভর সারা জগতের বস্তুত্বের সঙ্গে গ্রথিত—তার অন্যনিরপেক্ষ নিজস্ব গুণ নয়। জগৎ যদি ভিন্নভাবে গঠিত হতো, বস্তুকণার ভরও ভিন্ন সংখ্যা দিয়ে ব্যক্ত করতে হতো।

এঁদের মতে, প্রত্যেক বস্তু যা আমাদের চিদ্‌জগতে প্রতীয়মান বা আমরা প্রত্যেকেই, জগতের সামগ্রিক গঠনের উপর নির্ভর করে আছি। তাই প্রতিপদেই জগৎ ও ব্রহ্মাণ্ডের কথা এসে পড়বে। এই নতুন মত সত্যই বস্তুস্বরূপ ঠিকভাবে ব্যক্ত করতে পেরেছে বা এটি গণিতজ্ঞের স্বপ্নাবেশ মাত্র, এ-বিষয়ে এত শীঘ্র কিছুই বলা যায় না।

এমন কোন পরীক্ষার কথা ওঠে নি—যা থেকে নতুন মত প্রমাণিত হতে পারে (যার ফল নতুন মতের স্বপক্ষে হবে ও নিউটনীয় গণিত বা আপেক্ষিকবাদ সে

ক্ষেত্রে ভিন্ন ফল দেবে)। তবে শুদ্ধতত্ত্ব বিচারে বর্তমানে নবমতের একটু সুবিধা আছে বলে মনে হয়। প্রথমেই বলা যায়, নবমত আপেক্ষিকতত্ত্বের বিরোধী নয়—যেমন এক হিসাবে আপেক্ষিকতা নিউটনের মতের পরিপন্থী নয়। অবস্থাবিশেষে হয়েল-নারলিকারের সাধারণ সূত্রের বিশিষ্টরূপ বলে আপেক্ষিকতা সমীজ্ঞাগুলিকে বলা চলবে। নিখিল দেশকালে বস্তুমাত্রেরই ভর যদি নিত্য থাকে, তাহলে নতুন মত ও পুরাতন সার্বিক আপেক্ষিকতা একই সমীজ্ঞা-গোষ্ঠী দেবে। ঠিক এই ভাবেই আমরা বলে থাকি, নিউটনীয় গণিত বা সার্বিক বাদ মোটামুটি অভিন্ন, অর্থাৎ যখন অতি বৃহৎ বস্তুর ভর নিয়ে আমাদের হিসাব করতে হয় না। তবু নতুন মতের পক্ষে কতকগুলি কথা বলা যায়—যেমন এই ধরনের বিবেচনা পদ্ধতিতে বলা যায়, মহাকর্ষ কেন সব বস্তুকে পরস্পরের কাছে টানে—দূরে ঠেলে দেয় না। তাছাড়া মহাকর্ষ শক্তির মাত্রা প্রকাশে যে বিশেষ নিত্যসংখ্যা ব্যবহার করতে হয়, অর্থাৎ— $\left(P=\frac{Gmm'}{r^2}\right)$এর G তার প্রকৃতি ও পরিমাণ এই মতে হিসাব করা সম্ভব।

যদি আমরা ব্রহ্মাণ্ডের অর্ধাংশ উড়িয়ে দিতে পারতাম !

অদ্ভুত কিছু কথায় নবমতের স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ পেয়েছে। ভাবা যাক, জগতের অর্ধাংশ থেকে সব বস্তু বিলীন হয়ে গেল। নিউটন ও আইনস্টাইনের মতে, গ্রহবেষ্টিত সূর্যমণ্ডলে কোন পরিবর্তন দেখা যাবে না। পৃথিবী সূর্য থেকে সমান দূরত্ব বজায় রেখেই ঘুরে বেড়াবে। সূর্য ও তার ঔজ্জ্বল্য অপরিবর্তিত রেখে বিকিরণ করে চলবে। (আপাত দৃষ্টিতে হয়েল-নারলিকার জানিয়েছেন, সূর্যমণ্ডলের এই নির্বিকার বিশিষ্ট বিজ্ঞানী মাক্ শিক্ষার পরিপন্থী ঠেকবে) হয়েল ও নারলিকারের মতে কিন্তু তখন সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যে আকর্ষণ দ্বিগুণ বেড়ে যাবে, পৃথিবী সূর্যের অনেক কাছে চলে আসবে, সূর্যও নিজে সঙ্কুচিত হয়ে পড়বে অনেকগুণ, তার ঔজ্জ্বল্যও অতি মাত্রায় বৃদ্ধি পাবে।

এই প্রলয়ে প্রাণের অভিব্যক্তি যে সবই ঘুচে যাবে, একথা বলা বাহুল্য মাত্র। অবশ্য জগতের অর্ধাংশ উড়িয়ে দেওয়া শুধু মনে মনে কল্পনায় সম্ভব হতে পারে। তাই নবমতের সত্যতার প্রমাণ করতে ঢের অল্প চমকপ্রদ পরীক্ষার আয়োজন ভেবে বের করতে হবে।

মাও-মালরো সংবাদ

[দেশের কাগজে আঁদ্রে-মালরোর কথা মাঝে মাঝে বের হয়। ১৯০১ সালে নভেম্বরে এর জন্ম। পড়া শেষ করে অল্প বয়সে একবার ইন্দোচায়নায় বেড়িয়ে যান—তখন সেখানে ফরাসীরা রাজত্ব করছে—সেই সময় চীনদেশেও গিয়েছিলেন, চ্যাং কাই-সেকের সঙ্গেও ছিলেন কিছুদিন। ১৯২৮ সালের দিকে দেশে ফিরে নানা আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন ও মুখ্যত নিজের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে নানা বই লিখে লেখক বলে সুনাম অর্জন করেছেন। স্পেনে যখন জনতন্ত্র কিছু-দিন প্রতিষ্ঠিত হয়ে ফ্রাঙ্কো ও হিটলার প্রমুখ মিত্র শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়েছিল তখন মালরো, স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে রিপাব্লিকের পক্ষে যুদ্ধ করেছিলেন—হাওয়াই যুদ্ধ জাহাজের এক নায়ক হিসাবে। সেবার হার হলো, রিপাব্লিকের পতন হলো। আহত হয়ে মালরো পালিয়ে এলেন—শত্রুরা এঁকে ধরবার জন্য খুবই চেষ্টা করেছিল। দ্বিতীয় মহাসমরে নেমেছিলেন, ট্যাঙ্ক-বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন—যদিও তখন বয়স প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি……একবার আহত হয়ে ধরা পড়লেন—পালিয়ে এলেন দেশে—এদিকে ফরাসী দেশ তখন হিটলারের কবলে। ১৯৪৪ সালে মুক্তি সংগ্রামের মধ্যে গেরিলা বাহিনীর নেতৃত্ব করে জার্মান-প্রতিরোধে নানা বিপজ্জনক অবস্থায় পড়েছিলেন—ধরাও পড়েছিলেন। শেষ অবধি জার্মানীর হার হলো—মালরো মুক্তি পেলেন।

জেনারেল দ্য-গলের উপর মালরোর শ্রদ্ধা খুব—তাছাড়া এঁকে প্রেসিডেন্ট বিশ্বস্ত দূত হিসাবে পাঠিয়েছেন নানা জায়গায়। সেই সূত্রে আমাদের দেশেও বার কয়েক এসেছেন—নেহরুর মৃত্যুর পর ও সম্প্রতি এসেছেন কিছুদিন আগে। এখন ইনি দ্য-গল তন্ত্রের একজন সচিব। ১৯৬৫ সালে বিশেষ দূত হিসাবে আবার চীনদেশে গিয়েছিলেন সেখানে মাও-র সঙ্গে ও চীনদেশের অনেক নেতাদের সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা হয়।

১৯৬৭ সালে তাঁর antimemoires বলে একখানি বই বের হয়েছে—এতে তাঁর জীবনের নানা দিনের কথার স্মৃতি নতুন করে ভেবে লিখেছেন—নানা বর্ণনা—

নেহরুর সঙ্গে সাক্ষাৎকার, ভারতের নানাস্থানে পর্যটন ইত্যাদি। তাতে মাও-এর সঙ্গে কথাবার্তার যে বিবরণী আছে তাই তর্জমা করেছি। এতে চিন্তাশীল পাঠকের অনেক মনের খোরাক জোটাবে বলে আমার বিশ্বাস। এই তর্জমা ছাপাবার আগে মন্ত্রীমশায় শ্রী মালরোর কাছে যথারীতি অনুমতি চেয়েছিলাম, তাও পেয়েছি। সেই জন্য তাঁকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আজকাল পৃথিবীর যে ৪।৫ টি লোকের কথা আমরা সব সময়ে শুনছি, যাঁদের কার্যকলাপের ফল বহুদূর বিস্তৃত হবে দেশ ও কালে—তাঁদের মধ্যে একজন হলেন মাও-সে-তুং। এঁর বিষয়ে প্রায় প্রত্যহ নানা কথা পড়ছি কাগজে। ভারতের সঙ্গে চীনদেশের আজ সদ্ভাব বেশি নেই—যদিও একসময়ে আমরা চীনাদের বন্ধুত্বের জন্য বিশেষ যত্নবান হয়েছিলাম। নানা সংঘাতের মধ্যে দিয়ে আমরা চলেছি। বিশ বৎসরে এশিয়ার যে পরিবর্তন এসেছে তার মধ্যে চীনদেশের পরিবর্তন বিশ্বজনকে বেশি চমৎকৃত করেছে। চীনাদের কর্মকুশলতা বিশ্ববিখ্যাত। আমাদের দেশে আজও সস্তায় অনেক চীনদেশের তৈরি জিনিস বিক্রি হচ্ছে—যা আমাদের বিস্ময় উদ্রেক করবে।

তাছাড়া অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে চীনদেশে চার-পাঁচবার আণবিক বিস্ফোরণ ঘটেছে। সবই চীনা বিজ্ঞানীদের কাজ। এর আলোচনা, সম্ভাবনা সবই এদেশে কাগজে ও বিধান সভায় আলোচিত হচ্ছে।

মাও-সে-তুং চীনদেশের ভাগ্যবিধাতা। তাঁর মনের চিন্তাধারার এই সংবাদে কিছু রেখাপাত হয়েছে বলে আমার কৌতূহল হয়েছিল। তাই এই কটি পাতা সোজাসুজি বাংলাদেশের পাঠকদের জন্য অনুবাদ করেছি।—সত্যেন বোস]

॥ মালরো ॥

(পিকিং-এ) ফেরত এলাম। কাল টেলিফোন এসেছিল—সন্ধ্যাবেলায়—যেন আমি দূতাবাস ছেড়ে না যাই। আজ বেলা ১টায় আবার ফোন—বিকাল ৩টায় আমায় চাই। এ অবশ্য রাষ্ট্রপতি লিউ-শাউ-চি-র সঙ্গে দেখা করার ব্যবস্থা, তবে আমাদের দূতকে জানান হয়েছে—বোধ হয় সেখানে 'মাও' থাকবেন।

বেলা ৩টায় (হাজির হলাম)। লোকপ্রাসাদের সামনে বড় বড় থামের উপরে পদ্মকাটা—আর লালে রঙীন। প্রায় ১০০ মিটার অলিন্দ পার হয়ে যাচ্ছি—তার শেষে এক হলঘরে আলোকে পেছন করে আছেন প্রায় বিশজন, সাম্য বজায়

রাখতে দুটি সারি? না বস্তুত একটাই সারি, তবে একটু দূরে সরে বসেছেন, সামনের ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে—সকলে। মধ্যে বোধ হয় মাও-সে-তুং। ঘরে ঢুকে দেখতে পেলাম সবার মুখ। আমি লিউ-শাও-চির দিকে এগিয়েছি—আমার হাতে চিঠি তো রাষ্ট্রপতির নামে—তখনও সকলে নিশ্চল বসে। "রাষ্ট্রপতি মহোদয়, সৌভাগ্যবশে—আপনার নামে ফরাসী দেশের রাষ্ট্রপতি—আমাদের জেনারেল দ্য-গলের লেখা চিঠি এনেছি। আপনার ও চেয়ারম্যান মাও-সে-তুং এর কাছে আমাকে পাঠিয়েছেন আমাদের প্রেসিডেন্ট—তাঁর ভাব-ভাবনা নিজমুখে ব্যাখ্যা করতে।" মাও-র দিকে ফিরে আবার তাঁকে বলার কথা কয়টি উচ্চারণ করছি—(তখন) দেখি আমার চিঠির তর্জমা তাঁর কাছে এসে গিয়েছে।

যেন আমাদের অনেকদিনের পরিচয়, এই ভাবের হৃদ্যতার সঙ্গে কথা শুরু করলেন—ভাবটা যেন "রাজনীতি চুলোয় যাক।" তবে বললেন "ইয়েনান ঘুরে আসছেন না? দেখে কি মনে হল?"—উত্তর করলাম, "খুব গভীর ছাপ পড়েছে মনে—সব যেন অদৃশ্য—অরূপের পুরাণ মন্দির।" অনুবাদিকা (ইনি চ্যু-এন-লাই-এর কাছেও ছিলেন) অনায়াসে তর্জমা করে একটু থামলেন—যেন আরও পরিষ্কার করে বোঝাই কি বলতে চাই। —"সকলে আশা করবে ইয়েনানের মিউজিয়ামে দেখবে লম্বা পদযাত্রার ছবি—কত পর্বত, অরণ্য বা জলাভূমি। কিন্তু ও অভিযান গৌণ, দ্বিতীয় লাইনে পড়ছে। প্রথম লাইন জুড়ে রয়েছে বল্লম গাঁইতি হাতিয়ার সব—গাছের গুঁড়ি-কোঁদা টেলিগ্রাফের তার জড়িয়ে শক্তকরা কামান—এই সব। বিপ্লবের পথের অভাব ও ক্লেশ জমা রয়েছে যেন এ যাদুঘরে। এ সব পার হয়েছি। গেলাম গুহার মধ্যে—যেখানে সহচরদের নিয়ে আপনি ছিলেন। মনে আগের ধারণা গভীর হল—বিশেষত যখন আপনার বিপক্ষের ঐশ্বর্যের কথা এই সময়ে মনে এলো একসঙ্গে। মনে পড়লো দেখেছিলাম ফরাসী বিপ্লবের দিনে রবস্‌পিয়েরের দুপ্‌লে—ছুতোরের বাড়িতে ছিলেন—এক কুটরীতে। অবশ্য পর্বত, কারুশাল থেকে মনকে বেশি অভিভূত করবেই। তবে বর্তমান যাদুঘরের উপরে আপনার আশ্রয় মিশরীয় কবরের কথা মনে করিয়ে দেয়।"

—"কিন্তু, দল জড় হবার কোঠাগুলি ত সেরূপ নয়।"—

"না তার জানালায় সব কাচ দেওয়া—তবে স্বেচ্ছাব্রতী সন্ন্যাসীর রিক্ততার কথা সেখানেও মনে হয়। এই রিক্ততার পেছনে প্রচ্ছন্ন শক্তির কথাও মনে জাগায়—আমাদের ধর্মীয় সন্ন্যাসীর আশ্রমেও এই ভাবই আছে।"

সকলে বসেছি আমরা বেতের চেয়ারে, হাতলের উপর ছোট সাদা কাপড়। এ যেন গরমদেশের কোন রেল স্টেশনে যাত্রীদের অপেক্ষা করার ঘর। পার হয়ে গুদামঘরগুলিতে আগস্ট মাসের দুরন্ত রৌদ্র এসে পড়েছে। এইবার অল্প আলোতেও মাও-কে চিনলাম। মার্শাল (চেন-ই)-এর মত এক ধরণের গোল মুখ, যুবার মত নিটোল ও চিক্কন—চিবুকের উপর সেই বিখ্যাত আঁচিল, যেন বৌদ্ধতিলক। এত সৌম্যভাব তো আশা করি নি—তাঁর কোপন স্বভাবেরই খ্যাতি। তাঁর পাশেই প্রেসিডেন্টের লম্বা মুখ—অশ্বমুখ। দুজনের পেছনে দাঁড়িয়ে সাদা পোষাক পরা এক নার্স।

মাও বলেছেন—"দরিদ্র লড়াই করবে—একবার ঠিক করে বসলে সব সময় ধনীদের হারিয়ে দেবেই।" আপনাদের বিপ্লবের কথাই ভাবুন।

আমাদের সামরিক স্কুলে তো অন্যরকমের কথা শুনেছিলাম। অশিক্ষিত জনে অস্ত্র ধরলেও শিক্ষিত সৈন্যের বিরুদ্ধে বহুদিন লড়াই চালাতে পারে নি কখনও। আর গ্রাম্য কৃষকদের হাঙ্গামাকে কি বিপ্লব বলা যাবে? বোধ হয় মাও বলতে চাচ্ছেন—বর্তমানে চীনের মত দেশে সৈন্যদের অবস্থা আমাদের দেশের মধ্য যুগের সিপাহীদলের মতো। এখানে স্বেচ্ছাসেবকদের উত্তেজিত করে বিপুল দল খাড়া করতে পারবে যে, সেই নিশ্চয়ই জিতবে কারণ কিছুই রক্ষা করতে হবে না ঃ নিজেরা শেষ অবধি টিকে যাওয়াই এখানে বড় কথা। চ্যাং কাই-সেক ১৯২৭ সনে সাংঘাই ও হান্-কু-তে কম্যুনিষ্টদের বিধ্বস্ত করে দেবার পর মাও কৃষকদের বাহিনী গড়ে তুললেন। কিন্তু রুশেরা, যারা মার্কস ও লেনিবাদ প্রচার করতো আর চীনারাও, যারা তাদের উপর সরাসরি বিশ্বাস করেছিল, তারা সবাই নীতিবিচার করে ধরে রেখেছিল—শুধু কৃষকেরা একলা কখনও জয়ী হতে পারবে না। ট্রৎস্কিবাদী ও স্টালিনপন্থী—দুই দলেরই একমত। শুধু একা এঁরই (মাও) স্থিরবিশ্বাস ছিল কৃষকের বিজয়ী হয়ে ক্ষমতা হস্তগত করা সম্ভব। সেই হল, এতেই সব বদলে গেল। জিজ্ঞসা করলাম, "কিভাবে এই বিশ্বাসের জন্ম? কোন সময় মাত্র বর্শাধারী কৃষকদল নিয়ে রুশপন্থী মার্কস্টি কমিন্টার্ণের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন?"

—"আমার বিশ্বাস আস্তে আস্তে পাকা হয় নি, এটি সব সময়ই সত্য বলে জানতাম আমি।"

আমার দ্য গলের একটা কথা মনে হল। একবার,—"কখন আবার রাজশক্তি

হাতে নিতে পারবেন—ভেবেছিলেন ?” এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন—“সব সময়”।

মাও আবার বললেন, “তবে একটা যুক্তিপুর্ণ উত্তর আছে আপনার প্রশ্নের। চ্যাং কাইসেক-এর কাছে সাংঘাইতে হেরে আমরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লাম। আমি ঠিক করলাম নিজের গ্রামে আশ্রয় নিই। তার আগে চ্যাংচা-য় ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়ে গেছে। আর তখন বিদ্রোহীদের ছিন্নমুণ্ড সব লাঠির আগায় বসান দেখেছি। তবে সে সব তখন ভুলে ছিলাম। গ্রাম থেকে তিন কিলোমিটার দূর পর্যন্ত কোন গাছের চার মিটার অবধি বাকল ছিল না। ক্ষুধায় লোকে সব খেয়ে ফেলেছিল। যারা ক্ষুধার তাড়নায় গাছের ছাল খেয়ে ফেলে তাদের নিয়েই সাংঘাইএর মোটর চালক ও কুলীদের দল থেকে ভাল যোদ্ধা তৈরি করা সম্ভব হলো।...বরোডিনো কিন্তু কৃষকদের একেবারে বুঝতো না।”

আমি উত্তর করলাম—“একদিন স্টালিনের সামনে গর্কি আমায় বলেছিলেন সব দেশের কৃষক স্বভাবে এক।”

“হ্যাঁ, আপনাদের ভবঘুরে কবি গর্কি বা স্টালিন কেউ-ই জানতেন না, চাষাদের মধ্যে কি আছে। অবশ্য আপনার দেশের কুলাকের সঙ্গে অনগ্রসর দেশের দীন গ্রামবাসীদের মিশিয়ে, এক কোটায় ফেলা সুবুদ্ধির পরিচয় নয়। শুদ্ধ মার্কস্-সূত্র বলেতো কিছু নেই—অবস্থাবিশেষে কাজ করতে মার্কস্‌বাদকে মানিয়ে রূপ দিতে হবে, যেমন এ চীনদেশে, যেখানে মানুষ দুরবস্থায় পড়ে গাছের বাকলও খেয়ে চলেছে। তারপর স্টালিন”—থেমে গেলেন—কি বলতে চাচ্ছিলেন স্টালিন সম্পর্কে।—“তাঁর তো সেমিনারিতে শেখা বিদ্যা।” এখন বেঁচে থাকলে মাও-এর বিষয়ে কি ভাবতেন? মাও-র পিকিং দখলের আগে পর্যন্ত স্টালিন মনে করতেন যে চ্যাং কাই-সেক-এর সামরিক উত্থান-এই মাও-এর দলকে গুঁড়িয়ে দেবে। এদের তো স্টালিনবাদী বলা চলে না। একবার তো ’২৭ সালে সাংঘাইতে চ্যাং এদের বিপর্যস্ত করেছিলেন। আবার ১৯৫৬ সালে কম্যুনিস্ট পার্টির বিংশতিতম কংগ্রেসের গোপন বৈঠকে ক্রুশেভ বলেছিলেন, স্টালিন স্থির করেছিলেন চীনা কম্যুনিস্টদের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করবেন। তবে উত্তর কোরিয়ায় সব ফ্যাক্টরী তিনি অটুট অবস্থায় ছেড়ে এসেছিলেন। তবে যেখানে মাওপন্থীরা দখল করলো, সেখানকার সব কারখানা আগে ভেঙ্গে চুরে দিয়েছিলেন স্টালিন। ‘মাও’ কে তিনি গেরিলা যুদ্ধের বিষয়ে একখানা বই

পাঠিয়েছিলেন। 'মাও' সেটি দিলে লিউ শাও-চিকে, বললেন—"তুমি পড়ো এখানা। বুঝবে কিভাবে চললে আজ আমরা সব শেষ হয়ে যেতাম।" যে কোন চীনা কম্যুনিস্টের চেয়ে লি-লি-আনকে বেশি বিশ্বাস করতেন স্টালিন —কারণ সে তো মস্কো স্কুলে তৈরী। স্টালিনের সমালোচনা বা তাঁর কৃষকের প্রতি তাচ্ছিল্যের বিরুদ্ধে মাও-এর যত বিরাগ, তাঁর ছাঁটাই নীতির ততো বিপক্ষে মনে হলো না। তাঁর অসামান্য যুদ্ধ পরিচালনা, কম্যুনিস্টদের চক্রবন্দী করার বিরুদ্ধে লড়াই, কুলাকের গ্রাম্য মনোভাবের অবসান ঘটিয়ে কম্যুনিজম্ প্রচারে বিশেষ সাহায্য করা—এ সব কাজের জন্য স্টালিনের প্রতি শ্রদ্ধা গভীর ছিল 'মাও'-এর।

অন্য সব দপ্তরের মতো—এ কামরাতেও আমাদের উপর টাঙান ছিল চারজনের ছবি—

মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন ও স্টালিন।

মাও-এর সময় নব্য চীনারা অনেকেই দু-চার-টা কথা শিখেই ফ্রান্সে হাজির হতো, সেখানে কারখানায় কাজ করতে করতে বিপ্লবী হয়ে উঠতো। (চু-এন-লাই বিলাঁকুরে—কম্যুনিস্ট পার্টির স্থাপনা করেছিলেন)। যদিও মাও ছিলেন এই দলের সভ্য তবু তিনি চীনের বাইরে যান নি এবং তাঁর মনে চিরকাল বেশির ভাগ বিদেশ ফেরত বিপ্লবীদের উপর অবিশ্বাস ছিল—সেই এক অবিশ্বাসই ছিল কমিনটার্নের দূতেদের উপর।

মাও বলেছেন "১৯১৯ সালে আমার উপর ছিল হু-নানের ছাত্র সমাজের ভার। আমরা প্রথমে চাইতাম প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন। যুদ্ধবীর চাও-হেং-টির সঙ্গে একত্রে লড়েছি। তবে পরের বৎসর তিনি ঘুরে আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন। আমরা গুঁড়ো হয়ে গেলাম। আমি বুঝলাম যে, এই সব যুদ্ধবীরদের ঠাণ্ডা করতে একমাত্র দেশের জনসংঘই পারবে। সেই সময় কম্যুনিস্ট ইস্তাহার (Manifesto) পড়ছি ও কারিগরী লোকদের নিয়ে দল গড়ছি। তবে আমি নিজে সৈনিক ছিলাম। বুঝতাম, শুধু কারখানার লোক দিয়ে বিপুল সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধপনা চলবে না।"

আমি বললাম—"আমাদের দেশের বিপ্লবে সংগ্রামী ছিল বেশির ভাগ চাষার ছেলে। তারা শেষে নেপোলিয়নের যোদ্ধা হয়ে দাঁড়াল। কি করে এটা হয়ে ছিল—তাও বুঝি। তবে কি ভাবে আপনার জনবাহিনী গড়ে উঠল? কি করে

তাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারলেন? শুনেছি যে ইয়েনানে শেষে হাজির হয়েছিল ২০,০০০ যোদ্ধা। তার মধ্যে মাত্র ৭,০০০ ছিল দক্ষিণ দেশের। লোকে বলে এটা প্রচারের ফলে। তবে প্রচারে তো পৃষ্ঠপোষকের দলই বাড়ে, যোদ্ধা তো তৈরী হয় না?"

—"কেন্দ্র হিসাবে কিছু কারিগর তো ছিলই, তবে বিপ্লবী সেনার মধ্যে এদের অস্তিত্বের কথা কেউ বলে না। কিয়াংসি তে বহু লোক সঙ্গে ছিল। তার মধ্যে যারা ভাল তাদের বাছাই করে নিয়েছি। নিজের থেকেই সেই দীর্ঘ পদযাত্রা তারা বরণ করেছিল। যারা রয়ে গেল তাঁরা বিপদেই পড়লো। চ্যাং তো ১০ লক্ষেরও বেশি লোক শেষ করে দিয়েছে। যোদ্ধাদের ঘৃণা, অবিশ্বাস ও ভয় করতো গ্রামীন লোকে। তবে তাড়াতাড়ি জানলো তারা—এ লাল ফৌজ তাদেরই। প্রায় সব জায়গাই লোকে তাদের ভালভাবেই রেখেছে। ফৌজীরাও সব সময় সাহায্য করেছে—বিশেষত তাদের শস্য কাটতে। দেশের লোক দেখে বুঝলো আমাদের মধ্যে বড় ছোট শ্রেণী বিভাগ নেই। সকলে এক রকম খাই-পরি। ফৌজীদের সভাসমিতিতে মত প্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল। তারাই দলের পয়সার ও রসদের হিসাব রাখতো—তা ছাড়া যারা অফিসার, তাদের অন্য কাউকে অপমান বা প্রহার করার ক্ষমতা ছিল না। দেশে শ্রেণী ভেদের সম্পর্ক আমরা যত্ন করে বুঝেছিলাম। যেখানে এই সৈন্য থাকতো, লোকেরা বুঝতো, তারা কী রক্ষা করতে লড়াইয়ে নেমেছে। চাষাদের তো চোখ আছে। বিপক্ষের দল ছিল আমাদের থেকে সংখ্যায় বেশী। তাদের আবার আমেরিকান-রা সাহায্য করছে। তবুও অনেক সময় আমাদের কাছে তারা পরাজিত হয়েছে। কৃষকেরা বুঝতো—এ জয় হলো তাদেরই। অবশ্য যুদ্ধও বিদ্যা হিসাবে শিখতে হয়। তবে রাজনীতি করার থেকে যুদ্ধ করতে শেখা বেশী সোজা। শুধু যেখানে যুদ্ধ হচ্ছে সেখানে বেশি সাহসী বা বেশি লোক থাকার দরকার। মাঝে মাঝে হার হতো আমাদের, সে তো ঠেকানো যায় না। তবে বেশির ভাগই জিতবো—এই দরকার।"

—"হার হলেও, আপনি তার থেকে অনেক সুবিধা করে নিতে পেরেছেন।"

—"সুবিধা! যা ভেবেছিলাম তার থেকে বেশিই পেয়েছি। কতক দিক থেকে বিবেচনা করলে লম্বা পাড়ি তো দাঁড়ায়, হেরে হটে যাওয়া। তবু শেষ অবধি এটি বিজয় অভিযানে দাঁড়িয়ে গেল। কারণ অনেক দূর গিয়েছি। (এখানে অনুবাদিকা বলেছেন প্রায় ১০ হাজার কিলোমিটার)। যেখানে যাই সর্বত্র গ্রামীণরা

বুঝেছিল আমরা তাদের দলে। আর সে বিষয়ে সংশয় থাকলে কুয়ো-মিন্-টাং-এর সৈনিকদের ব্যবহারে সেটা ঘুরে বিশ্বাসে দাঁড়িয়ে যেত। তাদের দমন-কথা না তোলাই ভাল।

'মাও' চ্যাং কাই-সেকের অত্যাচারের ইঙ্গিত করছিলেন। অবশ্য তাঁর দমনও বেশ কার্যকর ছিল। মুক্তিফৌজ যেখান দিয়ে যেত, ধনীদের সম্পত্তি লুঠ করতো, বড় জমিদারদের উচ্ছেদ করতো, চাষাকে ঋণ থেকে মুক্তি দিত। মাও এর যুদ্ধ-নীতি প্রায় লোক মুখের ছড়ায় দাঁড়িয়েছিল—

শত্রু যখন এগিয়ে আসে আমরা
তখন পালিয়ে যাই,
তারা যখন ঘুমের ঘোরে আমরা
তাদের ঘর জ্বালাই।
লড়াই করে কাবু তারা বলে যখন
রেহাই দাও,
আমরা তখন ঝাঁপিয়ে পড়ি,
শত্রুরা সব হয় উধাও।

এই 'আমরা' অর্থে গ্রামীন দল—ফৌজ-কারিগর—বর্বর যুগের সকল কর্মী। বিধ্বংসী চীনা জাতি অমর—এখানে মরণের স্থান নেই। এত দিনের পুরনো চীনা-সভ্যতা, তাই জনগণও শৃঙ্খলা আর নিয়মের অনুগত। তা ছাড়া চাষার মুক্তি বাহিনীতে যোগ দেওয়া—তার ঘরে বসে থাকার জীবন থেকে অনেক বেশি ভদ্র ও অনেক কম কষ্টের। সে লিখতে-পড়তে শিখছে ও ফৌজ এর ম'ধ্য অনেক বন্ধুও পেয়ে যাচ্ছে। এই মুক্তি বাহিনীর চীন দেশের মধ্য দিয়ে লম্বা পাড়ি—প্রচারে অনেক বেশি কার্যকর হয়েছিল বক্তৃতার থেকে। যে সব রাস্তা দিয়ে তারা হেঁটেছে, যেখানে তাদের মৃতদেহ ছড়িয়ে গেছে—সেখানকার কৃষকেরা সকলে বিদ্রাহী হয়ে উঠেছে।

জিজ্ঞাসা করলাম, "আবার কাকে কেন্দ্র করে প্রচার চালাতেন ?"

—"চাষার জীবনের কথা ভাল করে ভাবুন। সব সময়ই দুঃখ। বিশেষ করে, সৈন্য যখন গ্রামে ঢুকে ছাউনি ফেলে, তখন। তবে, কখনও এত খারাপ হয় নি তাদের ভাগ্য—যেমন কুয়ো-মিন্-টাং রাজত্বের শেষের দিকে দাঁড়িয়েছিল। সন্দেহ করা কি—জ্যান্ত কবর। কৃষকেরা প্রার্থনা করতো পরজন্মে যেন শ্বাপদ-যোনি হয়।

এ হলেও হয়ত কম কষ্ট হবে। "ওই ·····চ্যাং কাই-সেক আসছে"—বলে ভগবানের নাম করতো পুরুত, যাদুকর ; যেন মৃত্যু আসন্ন। গ্রামীণরা আগে পুঁজি-বাদের নামও শোনে নি। কুয়ো-মিন্-টাং-এর তোপের মুখে তাদের সামন্ত শাসনের সঙ্গে পরিচয় ঘটলো।"

—"প্রথম দিকে আমাদের যুদ্ধকে কৃষক বিদ্রোহ বলা যায়। প্রজাকে জমিদারের শাসন থেকে মুক্ত করা—এ শুধু মত প্রকাশের স্বাধীনতা বা সভা করে ভোটের স্বাধীনতা নয়, এ বেঁচে থাকার স্বাধিকার।"

"ব্যক্তি স্বাধীনতা থেকে সৌভ্রাত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হল এর লক্ষ্য। আমরা না নামতেই, এ সব শুরু হয়েছিল অথবা তার উদ্যোগ চলেছিল। কিন্তু অনেক সময় এ সব ছিল নৈরাস্যের বিক্ষেপ। আমরা তাদের আশা জাগালাম। যে সব প্রদেশ স্বতন্ত্র হতে পেরেছিল, জীবন যাত্রা সেখানে কম ভয়াবহ মনে হতো। চ্যাং কাই-সেকের ফৌজ অপপ্রচার করতো—আমাদের হাতে এসে পড়া মানে জীবন্ত সমাধি। এজন্য যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসাবে আমাদেরও প্রচার চালাতে হতো। এমন সব লোক দিয়ে এসব হতো যারা নিজে শুনেছে, সত্য স্বচক্ষে দেখেছে বলতে পারে। অবশ্য এ শুধু তারাই করতো যাদের আত্মীয় কাউকে বিপক্ষের দিকে ফেলে আসে নি।"

"এই ভাবে আমাদের গেরিলাবাহিনী যতদূর সম্ভব বাড়িয়ে চলেছিলাম। লোকের মনে আশা ভরসা জাগাতে ; অন্যায়ের প্রতিশোধ নেবার জন্য নয়। বিশেষ তাগিদেই এ সবের সৃষ্টি। কৃষককে আমাদের উত্তেজনা দিয়ে বিদ্রোহ করাতে হয় নি। আমরা শুধু এদের সংহত ও সুসংবদ্ধ করেছিলাম। বিপ্লব এলো, জীবনের পটভূমিতে যেন ভাবের সংঘর্ষের মহানাটক! লোকের মন যুক্তি তর্ক দিয়ে জয় করতে হয়নি, আশা জাগিয়েছি, আত্মবিশ্বাস ও ভ্রাতৃভাব ফিরিয়ে এনেছি। দুর্ভিক্ষের সামনে সাম্য, সৌহার্দ্য জেগেছিল ধর্মের নিবিড় অনুভূতির মত। নিজের জমি, খাদ্য বা আইন সংস্কারের জন্য সংগ্রাম করতে করতে গ্রামীণদের বিশ্বাস হয়েছিল যে, এই সংগ্রাম তাদের ও তাদের সন্তানদের বেঁচে থাকার জন্য। গাছ জন্মাতে যেমন বীজ চাই তেমনি দরকার উপযুক্ত জমি। মরুতে বীজ ছড়ালে গাছ জন্মাবে না। মুক্তি ফৌজের কথা মনে পড়ে ; অনেক স্থানে তারা বীজের কাজ করেছে ; কোথাও বা বন্দীরা বাড়ি ফিরে সেটাই করছিল। তবে এক বিশেষ অবস্থায় পড়ে জমি তৈয়ার হয়েছিল। কুয়ো-মিন্-টাং-এর রাজত্বের শেষ ভাগে গ্রামে জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। লম্বা পদযাত্রায় অল্পে অল্পে যুক্ত হয়ে সব

মিলে প্রায় দেড় লক্ষে দাঁড়িয়েছিল। বেশির ভাগ হয়েছিল পিকিং নেবার সময়। বন্দীরা আমাদের সঙ্গে থাকতো চার পাঁচদিন। তারা সচক্ষে দেখতো, তাদের সঙ্গে আমাদের যোদ্ধাদের পার্থক্য।"

"তাদের খেতে হয়ত কম মিলতো, আমাদেরও তখন সেই অবস্থা। তবু তারা ভাবত বেঁচে গিয়েছে। চার পাঁচ দিন বাদে তাদের সব একত্র করতুম। যারা যেতে চায় তাদের বিদায়ের জন্য একটা ছোট অনুষ্ঠান হতো, যেন তারা আমাদেরই স্বজন। এর পরে, অনেকের হয়ত মত বদলাতো, চলে যাবার কথা উঠতো না। আমাদের সঙ্গে থেকে তারা সাহসী যোদ্ধায় পরিবর্তিত হতো। কিসের জন্য এই লড়াই তা তারা বুঝতে পারতো।"

—"যারা নানা পরীক্ষার মধ্য দিয়ে পাকা যোদ্ধা ও অনুচরে পরিণত হয়েছে তাদের সঙ্গে মেলামেশা করাতেই বোধ হয় এই ফল।"

—"তা তো বটেই। সেপাহীর সঙ্গে তার দলের সম্পর্ক দেশের লোকের সঙ্গে ফৌজের সম্পর্কের মতই প্রয়োজন। আমি বলি জলের সঙ্গে মীন। মুক্তি ফৌজের মধ্যে বন্দীরা মিশে গেল। তাছাড়া যারা নতুন জুটেছে তাদের প্রথমে এমন যুদ্ধে পাঠাতে হয় যেখানে তারা জিতবেই। অবশ্য কিছু পরে, অন্য রকম করা চলে। সব সময় আমরা শত্রুর আহতদেরও শুশ্রূষা করেছি। বন্দীদের সকলকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে যেতে পারতাম না, তবে তাতে বিশেষ ক্ষতি হতো না। যখন পিকিং-এর বিরুদ্ধে অভিযান চালাই বিপক্ষের সৈন্যরা বুঝেছিল, হেরে ধরা পড়লে বেশি বিপদে পড়বে না। তারা তাই আত্মসমর্পণ করেছিল দলে দলে। এমন কি সেনা-নায়করাও।"

—"জয় অবশ্যম্ভাবী, ফৌজের এই স্থির বিশ্বাস গড়া বড় তুচ্ছ কাজ নয়।" আমার মনে পড়লো রুশ দেশ থেকে নেপোলিয়নের হটে আসার সময়ে কথাবার্তাটি —"কর্তা, দুইটি রুশ ব্যাটারী আমাদের দলে দলে হত্যা করে চলেছে। আজ্ঞা দিন আমাদের একদলকে—তারা ওগুলি দখল করুক।" আমি একথা বলাতে মাও হাসলেন, আর বললেন ঃ

—স্মরণ করবেন, আমাদের আগে এদেশে শিশু বা স্ত্রী লোকদের কথা কেউ ভাবে নি। অবশ্য চাষাদের কথা তো নয়-ই। সকলে বুঝলো এই প্রথম লোকে ভাবছে তাদের কথা। পশ্চিমে যখনই এই সব বিপ্লবের কথা আলোচনা হয় সকলে ভাবে যেন রুশ দেশের মত প্রচারের ফলেই এটি হয়েছে।

প্রচার অবশ্য হয়েছে তবে সেটা কতকটা ফরাসী বিপ্লবের কালে যেমন হয়েছিল; কারণ আপনাদের মত এখানেও গ্রামের কৃষকদের জন্যই মুলত এ বিপ্লব। প্রচার অর্থে যদি স্বেচ্ছাসেবকদের লড়াই বা গেরিলা যুদ্ধের লিখন বা পদ্ধতি শেখান হয় তা হলে ওকাজ আমরা করেছি প্রচুর। তবে বক্তৃতা নয়……। আপনি জানেন, আমি বলে আসছি বহুকাল ধরে—লোকের কাছে যা পেয়েছি, শিখেছি অস্পষ্টভাবে, তাই পরিষ্কার ও নিখুঁত করে তাদের আবার শেখাতে হচ্ছে। গ্রামের লোক কেন এত বেশি আমাদের কাছে জুটছে? আমরা ডাকতাম তাদের সব 'তিক্ত অভিজ্ঞতার' কথা প্রকাশ করতে।"

"এই তিক্ত অভিজ্ঞতার প্রদর্শনীতে প্রকাশ্য ভাবে পুরুষ বা স্ত্রী তার নিজের দুঃখের কথা গ্রামের সকলের কাছে বলে যেত। শ্রোতারা অনেকে ভাবত, এভাবে আমাদেরও অনেক ভুগতে হয়েছে, পরে তারাও বলতো, তাদের দুঃখ। এদের মধ্যে কষ্টের কাহিনী অনেক, চলেছে অনেকদিন, এটি অত্যাচারের বিরুদ্ধে চিরন্তন প্রতিবাদ। কতকগুলি নিছক নির্মম বর্বরতার কথা। (আমাকে এই ধরণের একটা গল্প বলেছিল—পত্নী গেল সেনাপতির কাছে জিজ্ঞাসা করতে—তার স্বামী যে কয়েদ ছিল তার কি হল? উত্তর পেল—দেখ, আছে সামনের বাগানে। দেখল মুণ্ডহীন শবদেহ, মাথা বুকে বসান। সেই স্বামীর মাথা বুকে নিয়ে স্ত্রীর কি আর্তনাদ! সেপাই এলো তার হাত থেকে কেড়ে নিতে। তখন এমন অমানুষী শক্তিতে সে লড়াই করলে যেন অশরীরীর ভর হয়েছে তার উপর। সিপাহীরা ভয়ে সরে এলো। সকলের এ গল্পটি জানা। কারণ মেয়েটি একথা বহু জমায়েতে বলেছে, পরে ঐ দলপতি ধরা পড়লে শাস্তি দিতে নখ দিয়ে সে তার চোখ উপড়ে নিয়েছে)। এই ধরণের অনেক দুঃখের গল্প বলেছি। কোথাও মনগড়া মিথ্যা নয়।"

—"প্রথমে কিভাবে নিয়ম মানতে শেখাতেন নবাগতকে?"

—"আমাদের কোন আইন-কানুন ছিল না, তবে সেপাইকে সব সময় তিনটা নিয়ম মানতে হতো। প্রথম, নিজের জন্য কোন জিনিস আত্মসাৎ না করা, জমিদারের বাড়ি লুটের সব মাল কমিশরিয়েটে জমা দেওয়া, আর হুকুম তক্ষণি প্রতিপালন করা। চাষী গরিবের কাছে আমরা কিছু নিতাম না। সবই নির্ভর করে দলের পরিবেশের উপর। যে দলটি বেশ নিয়ম মানে, তার মধ্যে জুটলে, যোদ্ধার আপনি নিয়ম মানার অভ্যাস হয়। সুস্থ-সবল স্বেচ্ছাসেবক নিয়ম মেনে চলবেই, আর আমাদের ফৌজ তো স্বেচ্ছাসেবক নিয়েই। 'মস্তিষ্ক ধোলাই' হতো, বন্দীদের

মধ্যে এ কথাটা খুব চালু রয়েছে—তবে বস্তুত কি এটি। বন্দীরা ভাবত আমাদের বিরুদ্ধে এ যুদ্ধ করা হচ্ছে কেন ? আর গ্রামীণকে শেখান—ফ্যাসিষ্ট জোটের জবর-দস্তির বিরুদ্ধে কম্যুনিজমতো একটা রক্ষাকবচ বা বীমা মাত্র।"

আমার মনে পড়লো, মানুষেরা গাছের বাকল খেয়েছে, নেহরুও দুর্ভিক্ষের সময় যে সব কথা বলেছিলেন, আর 'মস্তিষ্ক ধোলাই' যে অনেক সময় ওই ধরণের নির্দোষ ব্যাপার ছিল না, তাও আমি জানতাম। আত্মসমীক্ষা অনেক সময় দোষা-রোপে পরিণত হতে পারে, পরে তার থেকে একঘরে বা কারাগারে প্রাণদণ্ড পর্যন্ত হতে পারে। তোমার মাথার খুলির মধ্যে যে শত্রু ঢুকেছে তার বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়াও —এ বাক্যের ফল বিবিধ।

১৯৪২ সনে ইয়েনানে মাও স্বেচ্ছাসেবকদের কৃষক বা কারিগরের মত পরিশ্রম করতে আদেশ দিয়েছিলেন। (উপত্যকার যে সব জায়গায় মাও নিজে চাষ করেছিলেন, তাও আমাকে দেখান হয়েছিল)। তিনি চীনাদের পুনঃ সংস্কারের আদেশও দিয়েছিলেন। সকলকে এই কাজে হৃদয় উৎসর্গ করতে ডাক দিয়ে-ছিলেন। জনগণ আনুষ্ঠানিক ভাবে শপথ নিয়েছিল, একমাত্র পার্টির জন্যই তাদের হৃদয় স্পন্দিত হবে। এবং হরতন মার্কা লম্বা নিশান নিয়ে চলতো সবাই। পরে আবার সেগুলি বড় বড় ঘুড়ি করে উড়ান হয়েছিল।

মাও আবার শুরু করলেন—"দক্ষিণ দেশ ছেড়ে এসেছিলাম, ইয়েনানও ছেড়ে-ছিলাম, তবে পরে আবার দখল করলাম দক্ষিণ ও ইয়েনান। উত্তরে এসেছিলাম, রুশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের সম্ভাবনা ছিল। এখানে নিশ্চিন্ত হলাম চারিদিক থেকে ঘেরাও হবো না। তখন কয়েক লক্ষ লোক চ্যাং কাই-সেকের দলে। পরে বুনিয়াদ দৃঢ় করেছি, পার্টির দল বাড়িয়েছি, দেশের মানুষকে সংঘবদ্ধ করেছি তাইনান থেকে পিকিং পর্যন্ত সব দেশে।"

উত্তরে আমি বললাম—"সোভিয়েট দেশে দেখেছি পার্টিই লাল সেনাবাহিনী গড়েছে, এখানে আমার মনে হচ্ছে মুক্তি ফৌজই দল গড়েছে এ দেশের অনেক জায়গায়।"

—"অবশ্য আমরা কখনই 'বন্দুক' কে পার্টির আদেষ্টা করে তুলি নি। তবে এটা ঠিক যে, অষ্টম বাহিনী উত্তরে একটা শক্তিশালী পার্টি তৈয়ারি করেছিল। তাতে ছিল সব শ্রেণীর লোক—স্কুল কলেজের ছাত্র ও নানা সমিতির সভ্যরা।

ইয়েনান অবশ্য বন্দুক দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। বন্দুক কামানের মুখে সবই সৃষ্টি করা যায়।

"ইয়েনানে কিন্তু নতুন এক শ্রেণীর লোক পেয়েছিলাম, যা কখনও দক্ষিণে পাই নি কিংবা লম্বা পাড়ি দিতে কোথাও দেখিনি।

এরা দেশপ্রেমিক বুর্জোয়া—এরা বুদ্ধিবিহারী। এরা সকলেই জাপানের বিরুদ্ধে সংগ্রামে এই দলকেই তাদের বলে সর্বান্তঃকরণে মেনে নিয়েছিল।

ইয়েনানে শাসনকার্য নির্বাহ করবার সমস্যাটা উঠলো। আর শুনে হয়ত আশ্চর্য হবেন, শত্রু আমাদের বাধ্য না করলে, আমরা এগিয়ে হয়ত আক্রমণ করতাম না তাদের। তারা ভেবেছিল আমাদের জলসই করতে পারবে ঠেঙিয়ে। হ্যাঁ, চ্যাং কাই-সেক-এর সেনাপতিরা তার কাছে ও আমেরিকানদেরও অনেক মিথ্যা কথা বলেছিল। চ্যাং ভেবেছিলেন পুরনো চলতি রীতি মাফিক আমরা সম্মুখ যুদ্ধে নামবো। আমাদের দল তার থেকে অনেক বেশি না হওয়া পর্যন্ত আমরা সম্মুখ সমর চাই নি। চ্যাং-কাই-সেকের অনেক সৈন্য শহর রক্ষা করতে অচল হয়েছিল—আমরা কোথাও শহর গুলিকে আক্রমণ করিনি।"

—"এই জন্যই বোধ হয় রুশেরা আপনাদের দলকে গণনার মধ্যে ধরতো না।"

—"যদি কারিগরী মজুর ছাড়া বিপ্লব করা অসম্ভব হতো আমরাও তো বিপ্লব করতে পারি না—এ স্বতঃসিদ্ধ। রুশিয়ার টান ছিল চ্যাং-কাই-সেকের দিকে। তিনি যখন চীন দেশ থেকে পালালেন সোভিয়েট দূতই তাঁর কাছে বিদায় নিলেন—সব শেষে।"

—"পরে পুষ্ট পাকা ফলের মত আপনাদের থলিতে পড়লো শহরগুলি।'

—"রুশিয়ার ভুল, তবে আমাদের হিসাবেও ভুল ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এশিয়ার এই অধঃপতন—সবটাই যে বিদেশী শাসনের ফল, এ বলা চলে না। জাপান তো পশ্চিমীভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। প্রথমে লোকে বলেছিল, শীঘ্রই সে অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়বে। কিন্তু সত্য এই—বাইরের আচারে পশ্চিমীভাবে পরিবর্তিত হলেও তারা মনে প্রাণে জাপানীই রয়ে গিয়েছে।"

—"চেয়ারম্যান মাও, আপনি তো চীন দেশের 'নব প্রতিষ্ঠা' করেছেন। তার প্রকাশ দেখি নানাপ্রকার বিজ্ঞাপনে, আপনার কবিতার মধ্যেও। সারা চীন দেশের এ সামরিক ভাবতো অন্য দর্শকেরা নিন্দা করে।" একথা আমি বলাতে সকলের

কান খাড়া হয়ে উঠলো। (বলে কি!) মাও কিন্তু বেশ শান্তভাবেই উত্তর করলেন।

"হ্যাঁ বেশ, তবে আপনি কি ভেবেছেন, প্রাচীন কেতায়, ক্ষেত্রে লাঙলে চাষ করে আপনি কলের যুগে প্রতিযোগিতা চালাতে পারবেন?"

—"অবশ্য সময় লাগবে—কয়েক ডজন বৎসর।"

—"আর আমাদের বন্ধুও তো চাই। যাদের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করতে হবে তার মধ্যে আছেন আপনারা, আর ইন্দোনেশিয়া আবার যদিও এসেছে। তার সঙ্গে এখনো কথাবার্তা হয়নি। তারও আমাদের সঙ্গে এবং আপনাদের সঙ্গেও মিল হবার ক্ষেত্র রয়েছে। আপনি নিজের দেশের বিদেশ সম্পর্কের মন্ত্রীরূপে বলেছিলেন 'সারা বিশ্ব যে সোভিয়েট বা যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকার তাঁবেদার হবে, তা চান না।' আমি দেখছি এরা দু'জনে শেষ অবধি হোলি-এ্যালায়েন্স (Holy alliance) বা পুণ্যডোরের মৈত্রীবন্ধন করবে। আপনারা অবশ্য আমেরিকানদের থেকে নিজেদের স্বাধীন রাখার কথা প্রকাশ করেছেন।"

—"হ্যাঁ আমরা স্বাধীন তবে তাঁদেরও তো বন্ধু বটেই।"

কথাবার্তার সুরু থেকে সিগারেট মুখে নেওয়া বা তা ছাইদানে রাখা ছাড়া অন্য কোন অঙ্গভঙ্গী দেখি নি। 'মাও'-র সর্বাঙ্গে সমাহিত নিশ্চলতা। তবে এ দেখে তাঁকে অসুস্থ মনে হয়নি—বরং যেন ব্রোঞ্জের তৈয়ারি মহারাজ সমাসীন রয়েছেন। হঠাৎ হাত দুটি উপরে আকাশের দিকে তুলে—আবার তক্ষুনি ঝপ করে নামালেন, বললেন—হ্যাঁ ঃ তাঁরা ব-ন্ধু-রা—আপনাদেরও আমাদেরও ...।"

এর সুর কতকটা—যেন বেশ মজার খেলা!

—"যুক্তরাষ্ট্র" বলতে আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদ—আর বৃটেন তো এখন ডবল—দু'মুখো—খেলা চালাচ্ছে।"

আমি বললাম তখন—"বৃটেন তো আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীদের পেছনে। আর মালয়েশিয়ার কথাও ভুলবেন না।"

মাও বললেন—"এসব ভাল ব্যাপার চলেছে" কিন্তু সুর মৃদু করে যেন স্বগতোক্তিতে বললেন—"যা দরকার সাধ্যমত সবই করেছি আমরা, তবে দশ-বিশ বছরে কি হবে—কে জানে? কাল কি হবে—ভাবি না। তবে কিছুদিন আগে রাশিয়া বিপুল লোহার কারখানা গড়ে তুলেছিল, সঙ্গে সঙ্গে তারা তুর্কী স্থানের প্রান্তরের সীমান্ত ব্যাপক খুঁটিগুলি সরিয়েছিল। ফলে চীনা রক্ষীরা পাগল হয়ে

উঠেছিল ইউরেনিয়াম খনি দখলে রাখার জন্য। অবশ্য পরস্পরের সৌহার্দ্যের ফলে খুঁটিগুলি পুরান জায়গায় আবার পোঁতা হয়েছে। রুশ রক্ষীরা এখন শান্ত ভাবে চোখ বুজিয়ে আছে।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—"বাধাবিঘ্ন তো এখনো বেশ জোরদার দেখছি।"

—"অবশ্য দেশপ্রেমিক বুর্জোয়া বুদ্ধি-বিহারীরা তো আছেনই—তাঁরা অনেক সম্ভাবনা জাগিয়েছেন।"

—"বুদ্ধিবিহারীরা কেন ?"

—"তারা তো মার্কসের পরিপন্থী। দেশমুক্তির পর তাঁদের আমরা টেনে নিয়েছি, যদিও আগে তাঁরা যুক্ত ছিলেন কুয়োমিন্-টাং এর সঙ্গে। আমাদের মধ্যে মার্কসীয় পণ্ডিত তো খুব কম, তাই তাঁদের প্রভাব একেবারে লুপ্ত হয়নি বিশেষ করে যুবক সম্প্রদায়ের উপর—"

হঠাৎ নজরে পড়লো দেয়ালে টাঙান সব ছবি—পুরনো মাঞ্চু আমলের পতাকা। মার্শালের দপ্তরে বা চু-এন-লাইয়ের ঘরেও—সেই একই রকম। যে সব বর্তমান বাস্তব ঘেঁষা সোসিয়ালিস্ট ছবি দেখেছি এ শহরে, তার একটাও নেই।

এখন আমাদের রাষ্ট্রদূত বললেন—"আমি ভ্রমণের মধ্যে যে সব যুবকদের দেখেছি, তারা সবাই তো আপনার ভাবের সঙ্গে গভীর ভাবে যুক্ত।"

মাও জানতেন আমাদের রাষ্ট্রদূত লুসিয়া পাই ডাকারে কিছুদিন জাতীয় শিক্ষা সচিব ও বিশ্ববিদ্যালয়ের রেকটর ছিলেন। যেখানেই থাকেন ইনি সুযোগ পেলেই সর্বত্র প্রফেসর ও ছাত্রদের সঙ্গে মেশেন। ইনি অল্প মান্দারিণ ভাষাও বলেন। আর আমাদের আবাসের কয়েকজন কর্মচারীর জন্ম চীনদেশে ; তাঁরা চীনভাষা চলনসই বলতে পারেন।

—"হ্যাঁ ঃ এভাবের কথাও বলা যায়।" মাও বললেন। ভদ্রতা করে আলোচনার মোড় ঘোরানর প্রয়াস তা নয়। নেহরু বা দ্যগলের মত মাও যুবকদের কথার উপর খুব দাম দিয়ে থাকেন। তিনি বোধ হয় ভাবেন, যুবায় নানা ভাবের মত পোষণ করে। তাঁর থেকে ভিন্ন হতেও পারে হয়ত সে মত। তিনি জানতেন, আমাদের দূত মশায় চীন দেশের নতুন শিক্ষাব্যবস্থা ভালভাবেই অধ্যয়ন করেছেন। এই ব্যবস্থা—আধা কাজকর্ম, আধা পড়াশুনা আবার পরীক্ষা হলে ছাত্রদের পাঠ্য-পুস্তক সঙ্গে করে আনার ব্যবস্থাও।

মাও জিজ্ঞাসা করলেন। "কতদিন আপনি পিকিং-এ রয়েছেন ?

—"চৌদ্দ মাস হবে। এর মধ্যে রেলপথে ক্যান্টনে গিয়েছি, দক্ষিণ কেন্দ্র সমূহে বেড়িয়ে এসেছি, ইচ্ছা ছিল তাই, হুনানে যাবার সময় আপনার জন্মস্থানও দেখে এসেছি। উত্তরপূর্বাঞ্চল সেওচান-এ গিয়েছিলাম। আমরা দু'জনে আবার ইয়েনান দেখার আগে লোই-যাং ও সিনান দেখে এসেছি।

সব স্থানেই লোকেদের সঙ্গে মেলামেশা হয়েছে। এ অবশ্য খুব ভাসাভাসা। তবে পিকিং-এ ছাত্র ও শিক্ষকসমাজের সঙ্গে সত্যকারের যোগস্থাপন করতে পেরেছি। আমার কথা এই—তাদের ভবিষ্যতের ছবি আপনি যা মনে এঁকেছেন' তারা সেইদিকেই ঝুঁকেছে।"

মাও বললেন—"মাত্র একদিক দেখেছেন, অন্যদিকে হয়ত আপনার নজর এড়িয়ে গিয়েছে।"

—"তবুও যা দেখেছি তাতে এই ধারণাই আমার মনে বদ্ধমূল হয়েছে। অবশ্য নব্যসমাজের তো নানা দিক, জটিল ব্যাপার।"

—"হাংচাও-এ চন্দ্রমল্লিকা (Crysanthemum)-র প্রদর্শনী দেখেছেন ?—কত ফুল—কত নাম—নর্তকী, পাগলিনী! সন্ধ্যায় রঙীন মন্দির। রেণু-ছড়ান বন্ধু। কত ভিন্ন ধরণের মনের ঝোঁক থাকলেও এখন একত্র রয়েছে, তবে ঝগড়া বাধলো বলে।"

দেশের সকলে বলছে—ভাই—ভাই—আর ভবিষ্যৎ। একাই মাও-এর মুখে ভিন্ন সুর। আমার ছেলেবেলায় পড়া ইতিহাসের এক ছবি মনে পড়লো—সার্লমান দূর থেকে দেখছেন—প্রথম নরম্যানরা রাইন নদী ধরে আসছে।

"কৃষি কি শিল্প—কোন সমস্যারই সমাধান হয় নি। বিপ্লবের মধ্যে সন্তান পালন—তাদের মানুষ করা—সে কাজে ও লাগতে হবে—"

মাও নিজের সন্তানদের কৃষকদের কাছে ফেলে এসেছেন দীর্ঘ পথযাত্রার সময়। তাদের আর পাওয়া যায়নি। তারা কোথাও কোন কম্যুনে কত ত্রিশ বর্ষীয় যুবকদের মধ্যে মিশে গেছে, তাদের মধ্যে কারও মাও সেতুং নাম নয়। সেখানে যৌবনের নানা পরীক্ষার জন্য তৈরী হচ্ছে তারা।

মাও-এর কথার আভাসে সকলে চুপ। আগে তাঁদের মধ্যে কি বলবেন মাও। চীনের পুনরুত্থান বিষয় জানবার একটু কৌতূহল ও চাঞ্চল্য লক্ষ্য করেছিলাম। বোধ হয় তারা ভেবেছিলেন "আণবিক বিস্ফোরণের" ও পরীক্ষার কথা হবে। আড়াই কোটি যুব-কম্যুনিস্টদের মধ্যে বুদ্ধিবিহারী প্রায় চল্লিশ লাখ। হয়ত মাও

যা বলতে চাইছেন কোন এক বৈপ্লবিক মত—যেমন বাগানে তার একশো-ফুল-এর মতবাদ। এ মত তো আবার শেষে চেপে দিলেন নিজে। শত বিভিন্ন ফুল ফুটুক, নানা স্কুলের মতের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলুক। মাও একবার এই ফতোয়া দিয়েছিলেন।

তখন ভেবেছিলেন—নবচীন গড়ে উঠেছে। তার্কিকদের তাই তিনি আহ্বান জানিয়েছিলেন—তারা বলবে কতভাবে গঠনের কাজ চালান যায়। এই সমীক্ষা তো কম্যুনিস্টের প্রিয়। তিনি ভেবেছিলেন—এই সব সমালোচনার উপর বুনিয়াদ করে উপযুক্ত সংস্কারের কাজে হাত দেওয়া যাবে। এলো শুধু নঙর্থক তর্ক সমালোচনা, পার্টি সৃজনকেই তারা সমালোচনার বিষয় করে তুললে। আবার পুরনো কঠোর শাসন ফিরে এলো। সব বুদ্ধিবিহারীদের পাঠিয়ে দেওয়া হল জনপ্রিয় কম্যুনে, সেখানে তাদের নিজেদের ঠিক আদর্শে আবার মানিয়ে নিতে।

কিন্তু মাও সত্যই পার্টিলাইনের পরিবর্তন চেয়েছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন শুধু আত্মসমীক্ষা মাত্র না হলে এই সব সমালোচনার ভিত্তিতেই পার্টির পুনর্গঠন করবেন। এক বিশেষভাবে (উপরি উপরি) দেখলে দেখা যাবে ব্যবস্থা চলেছে আগেরই মত। নির্দেশের কথায় কিছু বদল হয় নি। যৌবন পূর্ণ বিকশিত করুক নিজেকে। তবে তিনি কি ভাবলেন—যুবক কম্যুনিস্টরা সমবয়স্ক সকলকে "বড় লাফ দিয়ে এগিয়ে চলো"-র মত বড় কাজে টেনে নিতে পারবে? হয়ত বা আবার নিজের দলের যাচাই চাচ্ছেন। তাই 'শত ফুলের' পর দমনপর্ব। তখন প্রতিবাদী যুবকদের সরান হ'ল, তা ছাড়া পার্টির লোকেরা যারা প্রতিবাদ করে ফেললে, তারাও গেল। একই ঢিলে দুই পাখী (মরল)। যুবকদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার হল, সবদলের যাচাই-ছাঁটাইও হল।

চ্যু-এন-লাই ইঙ্গিত করেছিলেন অনগ্রসর জাতি পশ্চিম দেশকে অবরোধ করবে। সেই কথাই হয়ত মাও-এর মনে রয়েছে। তিনি বলেছিলেন, চীনা যুবক সম্প্রদায়কে ভবিষ্যৎ বিশ্ব থেকে সরিয়ে রাখা যায় না। চীনাদের নির্দেশেই যে পৃথিবীতে মুক্তি আসবে—এও কি বিশ্বাস করেন মাও! এদিকে যুক্তরাষ্ট্র তো পরিষ্কারভাবে চাচ্ছেন এই বিপ্লবী আন্দোলনকে ঘিরে সীমাবদ্ধ করে রাখতে। বিপ্লবী মহাজাতির পুরোহিতদের প্রচার অনেক দূরপ্রসারী—অনেক বেশি সে দখলে আনতে চাচ্ছে—এইটাই কূটনীতির কথা। রাশিয়া সুন-য়্যাৎ-শানের কাছে দূত পাঠিয়েছিলেন বরোদিনকে। ইনি হংকং টাইম্‌স্‌ কাগজের সাংবাদিকদের

সঙ্গে কথাবার্তায় বলেছিলেন প্রটেস্টান্ট মিশনারীরা কিভাবে কাজ করছেন আপনারা বোঝেন তো? আমাদের কার্যধারা তাহলে বুঝবেন। অবশ্য সেকথা ১৯২৫ সালে। এখন ১৯৬৫তে সোমালীও প্রেসিডেন্ট এসেছেন, তিনলক্ষ দর্শকের ভিড়, দুই হাজার নর্তকী অভ্যর্থনায় হাজির। তারপর কি! স্টালিনের বিশ্বাস ছিল লাল ফৌজে, কমিণ্টার্নে'র উপর নয়। মাও ভাবছেন, অনগ্রসর জাতিদের সাহায্যে বিশ্বে প্রভুত্ব দখল করবেন—যেমন মজদুর বিপ্লব ঘটিয়ে সারা বিশ্ব তাঁর অধীনে আনতে চেয়েছিলেন স্টালিন। বিপ্লবের জয়। এখন সোমালীর প্রেসিডেন্ট, ভিট্নাম সংগ্রাম, গ্রামে গেরিলা যুদ্ধ প্রচার, এইগুলির মধ্যে মাও-এর স্পার্টান নীতি তার যৌক্তিকতা খুঁজছে। মাও আশীষবাণী পাঠাচ্ছেন হানয়ে, সন্ত ডমিনিগো বা সোমালী দেশে—আর তিব্বতীয় প্রতিদ্বন্দ্বীদের ঠাণ্ডা করে জলসই করছেন। সোমালী কি কন্‌গো দেশে প্রতীক হিসাবে সাহায্যদান বা ভিট্‌নাম রক্ষা ও তিব্বতে কম্যুনিজম্ প্রচার—পুরাতনী এই সাম্রাজ্যের বুকে এই দুই যমজ পোষ্য শিশু। দ্যা-নাং-এ ভিট্‌নাম গেরিলা সেনা মরছে—তার জন্য চীনে চাষা ক্ষেতে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করছে।

চীনেরা সব অবদলিত জাতিদের সাহায্যে করতে আসবে। (সে কবে?) তারা আজ অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়ে যাচ্ছে। তবে সেই লড়াইয়ের মধ্যেই সৌভ্রাত্র বন্ধন জমে উঠেছে। মাও বলেছেন, সাম্রাজ্যবাদ আর চলবে না রাজনীতির ক্ষেত্রে। তার পরে অবশ্য পুঁজিবাদও যাবে। মুক্তি ফৌজ যেমন কৌশলে চ্যাং কাই-সেক-এর সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল—মাও এদের দুয়ের সঙ্গে সেইভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালাচ্ছেন। অবশ্য শেষ নিষ্পত্তি হতে চীন দেশেই যুদ্ধ হবে, কারণ মাও তো দেশের বাইরে যুদ্ধ লাগতে যাবেন না। ইতিমধ্যে লম্বাপাড়ি ইতিহাসের পাতায় গাঁথা হয়ে রইল। যাঁরা চ্যাং-এর সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে টিকে বেঁচে রয়েছেন তাঁরাই বিচক্ষণ বিপ্লবী-প্রবর বলে স্বীকৃত হয়েছেন। মাও বলছেন যে শিল্পসমস্যাগুলির সুরাহা হয়নি কিন্তু এর জন্য তাঁকে ব্যস্তও মনে হয় না। তিনি এক বিষয়ে স্থিরনিশ্চয় চীন নিজেকে নতুন করে গড়েছে। কৃষি-সমস্যারও সমাধান হয় নি—এটি সত্য। তবে তাঁর মতে দেশে যত চাষের জমি, সর্বত্রই চাষ হচ্ছে। কাজেই ফসলের পরিমাণ অল্পই বাড়ান সম্ভব, অবশ্য অনেকে বলে পশু-চারণ প্রান্তরকে কৃষির আওতায় আনলে ফসলের পরিমাণ দ্বিগুণ হবে। এক সঙ্গে পুরনো লাঙল আর আণবিক বোমা—চিরকাল থাকতে পারে না। মাও মনে স্থির করেছেন চাষকে

বর্তমান যুগের উপযোগী করতে বা শিল্প-রাজ্যে উন্নতি ঘটাতে হলে দেশে সর্ব-শক্তিমান সংহতি গড়ে তুলতে হবে—যারা ক্ষমতা হাতে নিয়ে প্রাকৃতিক সব শক্তি নিয়ন্ত্রিত করবে, চাষের ক্ষেতে বা শিল্পের কারখানায় লোককে আদেশ দেবে, পথ দেখাবে—যেন একজন মহারাজ তাঁর সৈন্য-সামন্ত চালনা করছেন। চাষা ও শিল্পীর মধ্যে যোগসূত্র বজায় থাকবে, তবে কর্মকৌশলের আগে রাজনীতির স্থান। সোভিয়েট দেশের অধিবাসীরা হয়ত বেশি বিচক্ষণ। তাদের যুবকরা কতকটা রাজনীতি বাদ দিয়েই থাকতে পারে, তবে সে বিষয়ে তাদের অভিমানের গরিমা প্রবল। এদিকে চীন প্রতিদিনে ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে—দ্বন্দ্ব বিজয়ের মধ্য দিয়েই বড় হচ্ছে। গত যুদ্ধের আগে রুশিয়ার যেমন বিপক্ষের প্রয়োজন ছিল আজ সেইভাবে চীনের শত্রুর প্রয়োজন। ভাত খেতেও তাকে সংযম করতে হয়, তবে দুর্ভিক্ষের সঙ্গে তুলনায় এখন সে অনেক বেশি পেয়েছে মনে হবে। অল্পে অল্পে দূর হয়েছে অনেক বাধা কষ্ট—সাম্রাজ্য বা কুও মিন্-টাং যুগের সম্পত্তিবানেরা আজ সবাই গতাসু হয়েছেন। জাপানী অধিকারের বা চ্যাং কাই-সেক-এর সময়ের সকল ধনিকরা আজ সরে পড়েছেন। আগের দিনের নিরক্ষর কিয়াংসি অধিবাসী বা বর্তমান তাইপিং-এর বিপ্লবী এবং মুক্তিফৌজের দৌলতে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত তিব্বতী দাসরা ও আছে। জাতীয়সংখ্যালঘু স্কুলে শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। তবে যাদের সঙ্গে আমাদের লুসিয়া পাই মিশেছেন, বর্তমান সেই ছাত্রসমাজের মধ্যে মিল কিই বা আছে। অবশ্য পুনঃপ্রত্যাবর্তন, পুনঃসমীক্ষা—এসবের ভয়ও আছেই। সে কথা মাও-ও তুলেছেন, তবে সে অতীতকালের কথা আমরা ভাল করে জানি না। হয়তো পুরানের প্রতি যুব জনের ভাবের আবেগ মাত্র। বিশেষ করে ভাবতে হয়, এ বিষয়ে তাদের সাক্ষৎ অভিজ্ঞতা নেই।

আজ ২৮ কোটি চীনার—যাদের বয়স সতেরোর কম, তাদের পিকিং দখলের আগেকার দিনের কোন স্মৃতি মনের মধ্যে থাকার কথা নয়।

অনুবাদিকা শেষ করেছেন। সকলে চুপ করে রয়েছেন। মাও-এর প্রতি তাঁর সহকর্মীদের মনোভাব জানবার কৌতূহল হচ্ছে আমার। প্রথম নজরে লাগে সৌভ্রাত্র মেশান সম্ভ্রম—রুশে কেন্দ্রীয় কমিটির লেনিনের প্রতি যেমনটি ছিল—অবশ্য স্টালিনের প্রতি নয়ই। তবে আমার কাছে যে বিবৃতি দিলেন মাও, তা মনে হলো বস্তুত এক কাল্পনিক বিপক্ষকে মনের সামনে রেখে এই বাচনের সুযোগে উত্তর দিয়ে যাচ্ছেন।

মনে হয়, এত সব বাণীর ভারার্থ দেশে এই রকমই চলবে—তোমরা চাও বা না চাও। তাঁরা সকলে মনোযোগ দিয়ে চুপ করে শুনলেন। দেখে মনে হয় বিচারালয়ে বিতর্ক সভায় সকলে বসেছেন।

হঠাৎ মাও বললেন—"আপনাদের পার্লামেন্ট থেকে প্রেরিত দল এসেছিল কয়েক মাস আগে। এঁরা নিজেদের বলেছেন কম্যুনিস্ট বা সোসিয়ালিস্ট। সত্যই কি তাঁরা সে সবে বিশ্বাসী?"

—"জানি না আপনাকে কে কি বলেছে—অবশ্য তাদের বক্তব্যের উপরই নির্ভরই করছে তাদের বিশ্বাস। আমাদের দেশের সোসিয়ালিস্টরা বেশির ভাগ কর্মচারী। তাদের নিয়েই প্রভাবশালী লেবর পার্টি। এঁদের শাসনতন্ত্রে প্রভাব খুবই—এঁরা মতে লিবারেল, ও মার্কসবাদী। তবে দেশের দক্ষিণ দিকে আঙ্গুর ক্ষেত্রের বড় বড় মালিকরাও রয়েছেন—যাঁরা প্রায় প্রত্যেকেই সোসিয়ালিস্ট।"

এই প্রাথমিক সত্য উচ্চারণ করাতে সেখানকার সব জিজ্ঞাসু যেন আকাশ থেকে পড়লেন! এই "আর কম্যুনিস্ট পার্টির হাতে সারা ভোটের এক চতুর্থ বা এক পঞ্চমাংশ রয়েছে। এরা খুব সাহসী, সব ছলাকলা ছাড়িয়ে জীবন উৎসর্গ করেছেন, তাঁদের আদর্শের পাদদেশে। এঁরা মনেপ্রাণে বিপ্লবী, সহজে টলবেন না। তবে দল গড়ে তুলতে পারেন না, সংখ্যায়ও কম নিজেরা, কাজেই মনের মত বিপ্লবও ঘটাতে পারছেন না। অবশ্য পুনর্বীক্ষণ যা সোভিয়েট দেশে উঠেছে তাতে এঁদের সংখ্যায় হ্রাস ঘটে নি, কিন্তু মারমুখী সতেজ ভাব অনেক কমেছে।"

—"অবশ্য দল হিসাবে দেখলে এ সকলে তো আমাদের বিরুদ্ধে। যেমন আলবেনিয়া ছাড়া অন্যসব দেশের দল।"

—"এদের সকলকে এক নতুন ধরণের জনতন্ত্রে বিশ্বাসী সোসিয়ালিস্ট বলা যায়। এরাই ছিলেন স্টালিনের শেষ দিনের বড় অনুচর দল। ব্যক্তিগতভাবে বলি এসব কম্যানিস্টরা সম্প্রতি দেখছি রুশিয়ার দিকে এক, আর আপনাদের দিকে অন্য গাল ফিরিয়ে রয়েছেন।"

মনে হল মাও বুঝলেন না অর্থ। অনুবাদিকা বিশদ করে ব্যাখ্যা করলো। ততক্ষণে মাও ফিরেছেন প্রেসিডেন্ট ও অন্যান্য সচিবদের দিকে। শুনেছিলাম মাও-এর হাসি সংক্রামক, ছোঁয়াচ লাগে খুব। মাওর সঙ্গে সকলে স-শব্দে হেসে উঠলেন। গাম্ভীর্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবার পর মাও বললেন—"জেনারেল দ্য-গল কি ভাবেন এ বিষয়ে?

—"এর উপর তিনি বেশি গুরুত্ব আরোপ করেন না; এ বিষয়ে তিনি ভাবেন

প্রাক্ নির্বাচনের ব্যাপারে···—অবশ্য—ফরাসী জাতি ও দেশের ভবিষ্যৎ তাঁর উপর নির্ভর করছে।"

মাও একটু ভাবলেন, পরে বললেন—"প্লেখানভ প্রমুখ মেনশেভিকরাও ছিল মার্কসবাদী, এমন কি লেনিনপন্থীও বলা চলে। তবে তাঁরা শেষে জনগণের কাছ থেকে বিছিন্ন হয়ে পড়লেন—শেষ অবধি বলশেভিকদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করলেন। ফলে বেশির ভাগ হলেন নিহত-বা-দেশত্যাগী। এখন কম্যুনিষ্টের সামনে দুটি পথ—একদিকে চললে সোসিয়ালিস্ট সংগঠনে কাজে নামতে হয়, শেষ অবধি দাঁড়াবে সেই পুনঃসমীক্ষা ও প্রত্যাবর্তন। আমরা অবশ্য আর গাছের বাকল খাচ্ছি না, তবে সৈনিকের মত আমাদেরও বরাদ্দ আজও একবাটি ভাত। আপনাদের বলেছি কৃষক হাঙ্গামার তাণ্ডব নিয়েই এ বিপ্লব সুরু।

তারপর সেই কৃষকদের নিয়েই কুয়ো-মিন-টাং শাসিত শহরগুলির বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়েছিলাম। তবে কুয়ো-মিন-টাং-এর পরে যাঁরা উঠেছেন তাঁদের কম্যুনিস্ট বলা যাবে না—বস্তুত তাঁরা যেন এক নবভাবের জনতান্ত্রিক দল। বিপ্লবের গতি বজায় রাখতে, বড় শহরের পরিশ্রমী মজুরদের দুর্বলতার দরুণ কম্যুনিস্টরা এদেশে প্যাতি-বুর্জোয়ার সঙ্গে জোট বেঁধেছে। এই জন্য শেষ অবধি আমাদের বিপ্লব ঠিক রুশদের মতো দেখায় না, যেমন রুশ-বিপ্লব দেখাবে ফরাসী বিপ্লবের সঙ্গে তফাৎ। আমাদের দেশের প্রধান প্রধান স্তরগুলির এমন মনোভাব ও এমন তাদের সক্রিয়তা যে তাদের দেখায় প্রত্যাবর্তন অভিমুখী। তবে তারা যা চায় তা করতে এ দেশের জনগণকে তো সঙ্গে নিয়েই করতে হবে।"

আমার মনে এলো স্টালিনের এক উক্তি। তিনি এক সময় বলেছিলেন—"এই অক্টোবর বিপ্লব আমরা ঘটিয়েছি—সে তো কুলাকদের হাতে শক্তি সমর্পণ করার জন্য নয়।"

—"উৎকোচের স্পৃহা, অবৈধ আচরণ, অবিবাহিতদের দেমাক বা কাজের মধ্যে স্ববংশের সম্মান রক্ষার প্রয়াস খাটিয়ে হাত নোংরা করার অনীহা—এই সব নির্বুদ্ধিতা শুধু একই ভাবের বাহিরের লক্ষণ। এর প্রকাশ পার্টির ভেতর বা বাইরেও দেখা যাচ্ছে। শুধু ঐতিহ্যই এর একমাত্র কারণ নয়। রাজনীতি চালিয়ে আজ এই অবস্থা দাঁড়িয়েছে।"

আমি মাও-এর মতবাদ জানতাম। সমালোচনায় অসহিষ্ণুতা—সংশয়বাদীদের অপসারণ—পরে জনমতের উপর বলপ্রয়োগ। শুধু পার্টির ভেতর বিপ্লবশক্তি বজায়

রাখতে "শ্রেণী সৃষ্টিতে" রাজী হয়েছেন, পরে ক্রুশ্চেভের মত প্রচার—আমরা সহা-বস্থান চাই—তখন আমেরিকানরা ভিটনামে এসে দাঁড়িয়েছে।

আমি তাঁর আগেকার কথা ভুলি নি।

মাও বলছেন—"আমাদের এ দেশে শতকরা সত্তর ভাগ দরিদ্র। তাদের বিপ্লব যে কি—এ বুঝতে ভুল হয় নি।" তাদের কথা কি বুঝেছেন—তাই এবার বললেন—"লোক শিক্ষা দিতে দেশের লোককে জানতে হবে। সেই জন্য সোভিয়েটের পুনর্বীক্ষণবাদ এক হিসাবে বলতে হয় স্বধর্মত্যাগ।"

অনুবাদিকা ঠিক কথাটি প্রয়োগ করলেন প্রায়—তিনি বলার সঙ্গে সঙ্গে; আমি ভাবলাম—কনভেণ্টে সিস্টারদের কাছে এর বোধ হয় লেখাপড়া শেখা।

"ওরা পুঁজিবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চলেছে। তাই জিজ্ঞাসা করি—এই ব্যবহারে ইউরোপ সন্তুষ্ট নয় কেন?"

—"আমার মনে হয়, এরা উৎপাদন ক্ষেত্রগুলি ব্যক্তির বিশেষ সম্পত্তিতে পরিণত করতে চায় না।"

—"একথা দৃঢ়ভাবে কি বলতে পারেন? যুগোশ্লাভিয়ার দিকে নজর ফেরান!"

আমি যুগোশ্লাভিয়ার কথা পাড়তে চাইলাম না। তবে মনে হল দুই প্রধান বিদ্রোহী—মাও আর টিটো—এরা কেউই মস্কোর ধূসর শিক্ষায়তনের ভেতরে ঢোকেন নি, দুজনেই গেরিলা বাহিনীর সর্দার। বললাম—"আমার মনে হয় রুশিয়া স্টালিনের যুগ শেষ করতে চায়। সত্য সত্য প্রত্যাবর্তন ও পুঁজিবাদের আকাঙ্ক্ষা তার নেই, সেই জন্য তাদের লিবারেল ঘেঁষা মনে হচ্ছে। কিন্তু সে দেশে শক্তিমান নায়কদের পরিবর্তন হচ্ছে। লিবারেল স্টালিনবাদ বলে কিছু নেই। এতদিন যাকে জানতাম রুশ কম্যুনিজম, সেটি আসল স্টালিনবাদ। এখন সেটি বদল হচ্ছে। চক্রবন্দী খেলা শেষ হয়েছে। রাজনৈতিক আরক্ষবাহিনী উঠে গিয়েছে। আর ১৯৪৫ সালে বিজয়ের পর আজ শাসনের চতুর্থ যুগ। এতে অনেক মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছে। লেনিনের পর যেমন স্টালিনবাদ পট পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। ব্রেজনেভ এক হিসাবে ক্রুশ্চেভের উত্তরাধিকারী। সেই পথেই চলেছেন। যাঁরা ব্রেজেনেভের পরে আসবেন তাঁরাও ওই পথেই চলবেন। কিন্তু এক সময়ের কথা মনে পড়ছে—যখন নিজের স্ত্রীর সঙ্গেও পলিটিকস আলোচনা চলতো না। আজ শুনছি মেট্রোতে শাসনবিধির সমালোচনায় মুখ ফোটাতে লোকে সাহস করছে'।

এতে আমার মনে হয় শুধু কঠোরতাতে মোলায়েম ভাব আনা হয় নি—এ বোধ হয় মৌলিক পরিবর্তনেরই বিজ্ঞপ্তি।"

—"অর্থাৎ আপনি ভাবছেন তারা প্রত্যাবর্তনবাদী নয়। তবে এক হিসাবে তাদের আর কম্যুনিস্ট বলা চলে না। বোধহয় আপনার কথাই ঠিক যদি ভাবা যায়"—(অনুবাদিকা ঠিক কথাটা খুঁজে পাচ্ছেন না—আমাদের অনুবাদক জুগিয়ে দিলে) "যে ডামাডোল চলছে।" মাও বলে চললেন—"যে রকম সেখানে ডামাডোল চলছে, তাতে ভাবতে হয় এ শুধু বিশ্ববাসীর চোখে ধুলো দেওয়া ছাড়া অন্য কোন লক্ষ্য আছে বলে আমার মনে হয় না। নায়করা স্তর বিভাগ মানছে। অবশ্য লোকেদের মধ্যে ভিন্ন ক্লাশের সৃষ্টি হয় নি এখনো, তবে এই ভাব কম্যুনিস্ট নীতিকে পীড়া দিচ্ছে। স্পার্টার নীতি ছেড়ে দিয়েই রোম আত্মবিশ্বাস হারিয়েছিল। চীন-স্পার্টাবাদীর সাথে এক পর্যায়ে রোমকপন্থী চীনকে দাঁড় করানো যাবে না। কারণ, তাকে মনে হবে দস্যু কাপোনের অবতার। অবশ্য রুশেরা যে বিরক্তিব্যঞ্জক উত্তর দেবে, তা আমি জানি। কিন্তু কি করে বিদ্রোহের উত্তেজনা বিপ্লবের কার্য সমাপনের পরে ধরে রাখা সম্ভব হবে? কি দিয়ে সেই অক্টোবর মনোভাব ধরে রাখা চলবে? এখন জারের সময়ের পরাজয়ের দিনগুলি নেই, পুঁজিবাদও নেই কিংবা জমিদারও নেই এখন। চীনারা এখন যে সব নিয়ে ভুগছে সেসব আমরা জেনেছি—ভুগেছি, ত্রিশ বৎসর আগে। তাদের ছিলনা কোন সম্বল—আমরা অর্জন করেছি কিছু। আবার রিক্তদশায় ফেরৎ যেতে চাইনা। নতুন এক তথ্য উঠে এই সব কথা চাপা দিতে চাচ্ছে—আণবিক যুদ্ধ শেষ অবধি সব জাতির বিনাশ ঘটাবে। ক্রুশ্চেভ অবশ্য ধরপাকড় বা কয়েদ আবাসের ভয় দূর করেছে, ভাবছে নিরস্ত্রীকরণ নীতিতে বিশ্বজনকে একমত করতে পারবে। হাল্কাহাতে শাসন চালিয়ে গিয়েছে। তবে আমরাও চাই যুদ্ধকে একেবারে পৃথিবী থেকে বিদায় করে সারা বিশ্বে কম্যুনিজমের প্রতিষ্ঠা করতে।"

এবিষয়ে ভেবেছিলাম মৃত্যুশয্যা থেকে লেনিন যা বলেছিলেন এখানে মাও-তা উদ্ধৃত করবেন। লেনিন বলেছিলেন: "শেষ অবধি বিচার বিশ্লেষণ করে স্থির বুঝেছি আমরাই যুদ্ধে জয়ী হবো। এ ঘটবেই। কারণ রুশ, চীন ও ভারতের লোক-সংখ্যা একত্র করলে বিশ্বজনের প্রধান প্রকাণ্ড অংশে দাঁড়াবে, তার ভার অন্যাংশের পক্ষে অসহনীয়।" মাও স্থির ভাবছেন এ বিষয়ে চীনা পার্টির অভিজ্ঞতা অন্য সব জাতির থেকে বেশি। তিনি ভাবছেন তাঁর সহকর্মী লিউ-শাও-চির বিবৃতি অনুযায়ী

মাও নিজের প্রতিভায় মার্কস-লেনিনবাদের ইউরোপীয় ‘বেশ’ বদলে তাকে এশিয়ার পোষাক পরিয়েছেন। মাও আবার বললেন, “কেময় (Quemoy) ও মাৎস্যুর ব্যাপারে চীনকে ত্যাগ করেছিলেন ক্রুশ্চেভ। এটা বিশ্বাসঘাতকতা হয়েছিল। আবার ইউ-এন-ও'র কন্‌গো নীতিকে রুশিয়ার সমর্থন করা, আর একটি বিশ্বাস-ঘাতকতার উদাহরণ।

“রুশ অভিজ্ঞদের সেই স্থান থেকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ায় সেখানে যে ভূমি তৈরি হয়েছিল সেটি জোর করে ভেঙে দেওয়া হলো। এই সব কাজে তার প্রতি দরিদ্র বিপ্লবীদের ঘৃণা বেড়ে চলেছে। কলোনীয় যুগের অবসান ঘটাতে এখনই তাড়াতাড়ি কিছু করতে হবে। ক্রুশ্চেভ তো নিজে পাতিবুর্জোয়া, সত্যকার লেনিনপন্থী নয়। নিউক্লিয়ার যুদ্ধ বাধলে বিপ্লবের কি হবে, এই ভেবেই সে কাতর। সোভিয়েট শাসকরা আর জনমত ডেকে আনতে চায় না। তারা কি বলবে—এই তাদের ভয়ের কারণ।

ইনজিনিয়ার বা চীনা কারখানার ডিরেক্টর এবং শহুরেদের সাধারণ কম্যুনে পাঠানো-টা, আপাত দৃষ্টিতে কঠোর শাসন বলা যাবে। ইউরোপে তো এই ভাবে সকলকে সৈনিকের কাজে শিক্ষানবিশী করতে হয়। পার্টির কর্মপন্থার এটি পরিপন্থী নয়, যদিও বাড়াবাড়ি হলে কাব্যে দাঁড়ায়। এই সব বুর্জোয়া মনোভাবের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযান। পিতামাতার সন্তানস্নেহ বা পুরুষ স্ত্রীর আকর্ষণ যখন উগ্রভাবে হয় তখন এটি অত্যাচার অনাচারে দাঁড়ায়। এসব কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করতে পার্টিকে নিত্য প্রস্তুত থাকতে হবে। আমাদের সেবাব্রতী চাই। যুদ্ধ করার থেকে—তাদের তৈরী করা ঢের বেশি চীনের প্রয়োজন।”

তাঁর ধারণা দেখলাম যুক্তরাষ্ট্র—চীন কি ভিটমান—কারও বিরুদ্ধে আণবিক অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করবে না—যেমন কোরিয়ায় করে নি সে। মাও এর দৃঢ় বিশ্বাস অবিচ্ছিন্ন বিপ্লব চাই। এইখানে তাঁর সঙ্গে রুশদের পার্থক্য।

আবার তৃতীয়বার—এক সেক্রেটারী এসে লিউ-শাও চি'র সঙ্গে কথা বললেন। প্রেসিডেন্ট আবার মাওকে কিছু বললেন মৃদুস্বরে তৃতীয়বার। শ্রান্ত ভঙ্গীতে হাতলের উপর দুই হাতে ভর করে মাও উঠে পড়লেন। খাড়া একখানা পাথরের মত আমাদের সকলের থেকে সোজা দাঁড়িয়েছেন। হাতে এখনো সিগারেট। বিদায় নিতে গেলাম, আমায় হাত বাড়িয়ে দিলেন, রমণীয় নরম হাত দুখানা, এত লাল যেন ফুটন্ত জল থেকে এই মাত্র উঠান হয়েছে। আমায় টেনে মঞ্চে নিয়ে চললেন—

এ তো আশ্চর্য ! অনুবাদিকাটি আমাদের মাঝে একটু পেছনে—আর নার্স'টি আসছে তাঁর পরে। আগে চলেছেন, আমাদের দেশের দূত এবং এ রাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট—ইনি এতক্ষণ একটি কথাও বলেন নি। বেশ একটু পেছনে অল্পবয়স্ক কয়জন—বোধ হয় এঁরা কর্মচারী। হাঁটু যেন ভাঙ্গছে না, পা-পা করে চলেছেন মাও, ব্রোঞ্জের রাজমূর্তির সঙ্গে সাদৃশ্য আরও বেশি ফুটে উঠছে। তাঁর কালো পোষাক, তবে চারিদিকে সকলে সাদা বা ফিকে উজ্জ্বল রঙের এক ভাবের ড্রেস পরে রয়েছেন।

আমার মনে পড়লো চার্চিলকে। আমাদের দেশে মুক্তি-ক্রুশে ভূষিত হতে এসেছেন, সম্মানরক্ষীদের প্রত্যেককে দেখতে দেখতে চলেছেন চার্চিল—একটু দাঁড়ান, নিরীক্ষণ করেন প্রত্যেকের সম্মানী অভিজ্ঞান—আবার এগিয়ে চলেন—এক পা—এক পা। যেন মরণের ছোঁয়াচ লেগেছে—আহত বৃদ্ধ সিংহ এক, কোন মতে এগিয়ে যাচ্ছেন, আর সিপাহী প্রত্যেকে সম্ভ্রমের সঙ্গে চেয়ে আছে। মাওকে কিন্তু বজ্রাহত, মরণোন্মুখ মনে হলো না সেদিন—মনে হ'ল বৃদ্ধ সেনাপতি চলেছেন, দেহের ভার ভালভাবে রক্ষা করা যাচ্ছে না যেন উপকথার কোন সম্রাটের কবর থেকে পুনরুত্থিত এক আবির্ভাব—সামনে দেখ্‌ছি।

চ্যু-এন-লাই-এর কয়েক বৎসর আগের একটি কথা তাঁর কাছে পুনরুক্তি করলাম—"আমরা ১৯৪৯ সনে নতুন এক দীর্ঘ অভিযান সুরু করেছি—এই সবে তারই প্রথম পদক্ষেপ।"

মাও উত্তর করলেন, "লেনিন লিখেছেন, প্রলেটরীয় হুকুমৎ—সে তো পুরনো সামাজিক সব ঐতিহ্য, সব শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই। ক্রুশ্চেভ সত্যই কি ভেবেছিলেন, সব বিরোধ মিটে গেছে রুশিয়ায় ? এবং তিনি শাসন করতে নেমেছেন এক পুনঃসঞ্জীবিত দেশে ?"

—"কোন দেশ ?"

—"কেন জিত হবার পর রাশিয়ায়। মনে নানা ভুলের জন্ম দিয়েছে এই জয়। ক্যাম্প ডেভিড থেকে ফিরে, এখানে যখন শেষবার এলেন, তখন ক্রুশ্চেভ ভাবছেন, আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া হয়ে গিয়েছে। ভাবছেন, সোভিয়েট শাসকদের ও সারা রাশিয়ার জনমত যেন একই কথা। যেন গরমিল সবই মিটে গিয়েছে। তবে সুখের কথা এই ঃ বিভেদ বেশি বেদনা-দায়ক হচ্ছে না আজকাল বিজয়ী লোকের মনে, কিন্তু অমিলের গভীরতা রয়ে

গিয়েছে প্রায় আগের মতই। হয়ত নিজের থেকে লোকে পুঁজিবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবেন না, উৎপাদনের উপায়গুলিকে সে আর ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি করে তুলতে চাইবে না—এ আপনি ঠিকই বলেছেন। তবে সমাজে বৈষম্য তো আবার ফিরে আসছে। যে সব কারণে সেখানে আবার শ্রেণীভেদ গড়ে উঠছে তা তো বেশ জোরদার মনে হয়।

এখানে আমরা বিভিন্ন শ্রেণীর নির্দেশক ভূষণ বা ঐরকম নামকরণ তুলে দিয়েছি। প্রতি সপ্তাহে একদিন দেশের সবাইকে নিজের হাতে শ্রম করতে হয়। ট্রেনে করে শহরের লোক যাচ্ছে সাধারণ কম্যুনে—সেখানে খাটছে সারাদিন। ক্রুশ্চেভ ভেবে বসলো বিপ্লবের কাজ শেষ হয়ে গেছে, কারণ এক কম্যুনিস্ট পার্টির হাতে সর্বশক্তি সমাহৃত রয়েছে—তাতেই ভাবলে সারা জাতির মুক্তি হলো।"

স্বর উঁচু নয়, তবে মাওর কথায় রুশীয় কম্যুনিস্ট পার্টির প্রতি বৈরীভাব বেশ ফুটে উঠেছে। যুক্তরাষ্ট্রের বিষয়ে আলোচনার সময়ে চ্যু-এন-লাই-ও এইরূপ বিরাগ প্রকাশ করেছিলেন। লো ইয়াং-এ বা পিকিং এর অলিতে গলিতে কিন্তু আমাদের দেখে আদরের হাসি ফুটে উঠতো ছেলে মেয়েদের মুখে—তারা ভাবতো আমরা রুশ, অন্য কোন শ্বেতকায় লোক তো তারা দেখে নি।

"লেনিন ঠিকই বুঝেছিলেন, বিপ্লবের এই সবে সুরু। যে ঐতিহ্যের কথা তিনি তুলেছেন, সে শুধু বুর্জোয়াদেরই একান্ত উত্তরাধিকার নয়। আমাদের সকলেরই অদৃষ্ট—এ ভবিতব্য। লি-সাং-ইয়েন ছিলেন আগে কুয়ো-মিন-টাং এর—উপসভাপতি, আবার তাই-ওয়ান থেকে এখানে ফিরে এসেছেন। আর একজন বাড়লো আমাদের। তাঁকে বলেছিলাম বিশ ত্রিশ বৎসর চেষ্টা করলে চীনকে এক শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত করতে পারবো আমরা। তবে সে চীন কি তাই-ওয়ানের মতো দাঁড়াবে? পুনর্বীক্ষণে যাদের অভ্যাস, কার্য আর কারণে তারা গোলমাল করে বসে। সাম্যজ্ঞান একটা অপরিহার্য প্রয়োজনীয় বোধ নয়, তবে যাঁরা সাধারণ জনের সঙ্গে যোগসূত্র হারান নি, তাঁদের এটি সহজাত বলে মনে হবে। যুবারা যদি মেহনতী বা চাষাদের সঙ্গে সত্যই যুক্ত বলে নিজেদের ভাবে, তবে তারা মনে প্রাণে বিপ্লবী বটে। লাল ঝাণ্ডাবাহী মন নিয়ে কেউ তো জন্মায়নি। এই অল্পবয়স্করা বিপ্লবের কিছুই জানে না।

ওদিকে ভাবুন, ত্রি-বিংশতিতম কংগ্রেসে কসিগিনের কথা। সর্বসাধারণের জীবন যাত্রার মান উন্নততর স্তরে তোলা মানেই কম্যুনিজম। এ যেন সাঁতারের বেশ,

যার অর্থ হল বিশেষ ভাবে সেজেগুজে জলে নামা। স্টালিন তো তাঁদের কুলাকদের শেষ করেছেন। রুশ জারের বদলী আজ ক্রুশ্চেভকে বসিয়ে, একধরণের বুর্জোয়া সমাজের পরিবর্তে অন্য আর এক সমাজ প্রতিষ্ঠা করে, তাকে কম্যুনিস্ট বললেই তো কাজ হাসিল হলো না। স্ত্রী লোকদের সম্বন্ধে একই কথা। অবশ্য আইনের সামনে সমান অধিকার দিতেই হবে। কিন্তু সেই সুরু, অন্য সব কাজই বাকী। যে পুরাতনী কৃষ্টি, ভাব-ভাবনা, আচার, ব্যবহার আজ আমাদের চীনবাসীকে এই অবস্থায় টেনে নামিয়েছে তাদের সবটাই মুছে দূর করতে হবে। মেহনতীকর্মী প্রোলেটরীয় চীনের ভাবনা, ধারণা, কৃষ্টি—এসব গড়তে হবে, তার এখনো কিছুই জন্মায়নি। স্ত্রীশক্তি বলে কিছু এখনো গড়ে উঠেনি দেশে, সে ইচ্ছা শক্তি জাগাতে হবে। স্ত্রীর স্বাধীনতা দেওয়া অর্থে শুধু কাপড়-কাচার কল তৈরি নয়, যেমন তাদের স্বামীদের মুক্ত করতে শুধু দো-চাকা তৈরি করে—নিশ্চিন্ত থাকা যায় না, মস্কো শহরের মত মেট্রোও চাই।"

এই কথা শুনে মাও-এর স্ত্রীদের কথা মনে হলো, অবশ্য সে গল্প যেমন শুনেছি। মাও, সেই অতীত কালের লোক, শেষ সম্রাজ্ঞীকেও হয়ত চোখে দেখে থাকবেন। বাপ-মায় দিলেন প্রথম বিয়ে। ঘোমটা সরিয়ে বৌ পছন্দ হলো না, গেলেন পালিয়ে। দ্বিতীয়া, গুরু কন্যা। একে খুব ভালবেসেছিলেন, কবিতায় নাম নিয়ে রঙ্গ করে বলেছিলেন আমার মহিমময়ী, দেওদার! পরে কুয়ো-মিন-টাং একে জামিন রেখেছিল, শেষে শিরশ্ছেদ করলে। এক ছবিতে দেখেছি, চু-কিং-এ চ্যাংকাইসেকের সামনে পান পাত্র তুলে ধরেছেন, নিশ্চল নিস্পন্দ হিম তুষার। ছবি দেখেছি স্ট্যালিনের রিবেনট্রপের সঙ্গে। তবে এ ছবিতে আরও বেশি বিরাগ ফুটে উঠেছে। তৃতীয়া ছিলেন, লম্বা পাড়ির বিখ্যাত সঙ্গিনী, পথে চৌদ্দবার আহত হয়েছিলেন। আজ ছাড়াছাড়ি (চীনা পার্টিতেও ডাইভোর্স আছে) হয়েছে, কোন প্রদেশের এখন নাকি গভর্ণর। শেষের বারের স্ত্রী, সাং-হাই-এর রঙ্গমঞ্চের তারকা, চিয়েং-চিং—মাওএর বিপক্ষ-গণ্ডী ভেদ করে গিয়েছিলেন ইয়েনানে। পার্টির কাজে যোগ দিয়ে সেনারঙ্গমঞ্চ পরিচালনা করতেন। পিকিং দখলের পর আর প্রকাশ্যে বের হন না—শুধু মাও-কে নিয়ে অন্তঃপুরবাসিনী।

মাও বলে চলেছেন—"মেহনতী চীন—সে কুলিও নয়, মাণ্ডারিনও নয়। জন-বাহিনী বলতে পার্টির দল বা চ্যাং-কাই-সেকের ফৌজ নয়। তবে যুদ্ধ করেই নব রীতি কৃষ্টির জন্ম, যতদিন এই যুদ্ধ ততদিনই এ সব থাকবে। অন্যথা পিছে হটে

আবার ফিরে যাবার ভয় আছে। পঞ্চাশ বছর তো বেশিদিন কিছু নয়—এক পুরুষের একটু বেশি। আপনাদের দেশে আজ আচার-ব্যবহার মধ্য যুগের সামন্ততন্ত্রের যুগ থেকে অনেক বদলে গিয়েছে। নব চীনকে সেইরূপ পুরনো ঐতিহ্য কাটিয়ে নতুন রীতি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। লোকে খাটছে, ফৌজী যুদ্ধ করছে, আমাদের বুনিয়াদ তৈরি। এরই উপর উঠাতে হবে নতুন ইমারত। যারা এসব বোঝেনা, তারা বিপ্লবের বাহিরে গিয়েছে। শুধু একবার যুদ্ধে জয়ী হলেই চলবে না। বহু পুরুষ ধরে দেশের নানা ধরণের মানুষকে মেজেঘষে গড়েপিটে দাঁড় করাতে হবে নতুন রূপে।"

ভাবছি, এই ভাবে প্রচার চালাতেন মাও ইয়েনানের গুহায়। মনে হল, এক কবিতায় চেঙ্গিশও চীন স্থাপয়িতা পূর্ব পুরুষের কথায় বলেছেন—

"ভাবো সে সব দিনের কথা.........."। বললাম, "আপনার এই চীন তো সেই অতীতের চীন সাম্রাজ্যের জের।"

—"তা জানি না, তবে কর্ম পদ্ধতি যদি ভাল হ'য়, যদি আমরা বিচ্যুতিকে না আসতে দিই তো নবরূপে চীন তৈরী হবে।"

এবার বিদায় নেবার পালা। বাহিরে বারান্দায় গাড়ি দাঁড়িয়ে, মাও বলে চলেছেন,

"কিন্তু একাই চালাতে হবে এ যুদ্ধ, তবে, এ' তো প্রথম নয়, জনগণের মধ্যে মিশে আছি আমি, ভবিষ্যতের আশায়।"

কথায় এক আশ্চর্য সুর ; মধ্যে তিক্ততার রেশ, হয়তো একটু বিদ্রুপও মিশেছে, সর্বোপরি প্রকাণ্ড অভিমান ও আত্মমর্যাদার অভিব্যক্তি। কথাগুলি হয়তো সঙ্গীদেরই উদ্দেশ্যে। তবে তারা সরে যাবার পরই—এসব আবেগপূর্ণ কথাবার্তা। আরও আস্তে চলেছেন, তবে এ অসুস্থতা নয়। আবার বললেন, "পুনঃসমীক্ষা ও প্রত্যাবর্তন হাল্কা কথা, বলতে চাওয়া যে বিপ্লবের মৃত্যু হলো। তবে সেনাবাহিনী নিয়ে যা করেছি তাই এখনো করতে হবে। শেষ অবধি আপনাকে বলি, বিপ্লব এক ভাবের অভিব্যক্তি। যদি রুশ দেশের মত এখানেও, আমরা এই ভাবকে অতীতের কাহিনী বলে দেখি—তবে সবই ধুলিসাৎ হবে। শুধু বিজয় দিয়েই, বিপ্লবকে স্থায়ী করা যায় না।"

—"আপনার মহান উল্লম্ফন, শুধু পুরনো ঘরকে সুদৃঢ় করার আহ্বান নয়।

চোখের সামনে যতদূর দৃষ্টি চলে চারদিকে ঘিরে, দিকচক্রবাল ভরে, উঠেছে সব ইমারত এই নীতির ফলে…।"

—"হ্যাঁ ঃ তবে পরে কি ? অনেক দেখে গেলেন তবে আরও অনেক রয়ে গেল চোখের আড়ালে। সারা জীবন বিপ্লব বইতে চায় না, মানুষ। বলছিলাম মার্কসবাদ চীনদেশের ধর্মে দাঁড়িয়েছে। তবে জানেন কি এ দেশের গ্রামে কম্যুনিষ্ট কতো ? হয়ত শতকরা এক ভাগ মাত্র। তাই যতদিন এরা—লম্বা পাড়ির মত—নতুন কর্ম পদ্ধতিতে মনপ্রাণ ঢেলে পরিশ্রম করবে ততদিন চীনকে বলা যাবে সত্য-সত্যই কম্যুনিষ্ট। নিজেদের ভেবেছি চীনের সন্তান—চীন ভাবছে—আমরা আগে যেমন বলেছি, আমরা দেবতার পুত্র। তবে জনগণই—সবিতা, সেই সত্য পূর্ব-পুরুষ—তারই পূজারী চীন। কম্যুনিষ্ট পার্টি বিজয়ী হলেও সারা চীন দেশের লোক নয় তারা।"

—"আপনার মার্শালরা সকলেই স্থায়িত্ব চান—তবে আপনি আবার শ্রেণীভেদ চান না।"

—"শুধু মার্শালরা কেন, বহু পুরনো লোক রয়েছে আজও যাঁরা সংগ্রামের মধ্য দিয়েই দাঁড়িয়েছেন। পাকা বিচক্ষণ তাঁরা, হাতে কলমে বিপ্লব শিখেছেন। আজ অনেক অল্প বয়সী রয়েছেন তত্ত্ববিচারে বিপ্লবী। শুধু তত্ত্ব কথা গোবরের থেকেও কম কাজে লাগে। তবে যা চায় তারা তাই করুক, এমন কি প্রত্যাবর্তনও। আপনাদের দূত মশাই যাই বলুন, বর্তমানে যুবকদের মতিগতি ভয়ের কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেখা যাক অন্য ভাবের ছেলে-মেয়েদের সাক্ষাৎ পাই কিনা।"

মনে হলো, ইনি বুঝাচ্ছেন, একসঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র আর রুশ, এমন কি চীনের সঙ্গেও "কোন বিচ্যুতি বরদাস্ত করা যায় না।"

আস্তে, পা ফেলে বারান্দার কোলে এসে দাঁড়িয়েছি, তাঁর দিকে তাকাই। মাও-এর দৃষ্টি সোজা সামনে, কথার মধ্যে কি এক গুরুতর ইঙ্গিত ! বুঝলাম, কিছু একটা করতে চাইছেন, এবার কি যুবকদের নিয়ে, না ফৌজ বাহিনীর মধ্যে ? লেনিনের পরে এমন ভাবে জগতে ঐতিহাসিক আলোড়ন সৃষ্টি করেন নি কেউ। লম্বা যাত্রায় যে চরিত্র-বৈশিষ্ট্য ফুটেছে, তা চেহারায় দেখা যায় না। একটা কিছু করতে যাচ্ছেন, হঠাৎ এক অটল নির্মম মনোভাব নিয়ে। এখনো সংশয় রয়েছে মনে। এ যেন মহাকাব্যের নায়কের মনে দ্বিধার আন্দোলন। কি করবেন বুঝলাম না। চেয়েছিলেন চীনের নবসংস্কার, তাতো একরকম করেছেন ; কিন্তু চাচ্ছেন

অবিরাম বিপ্লব। আর দৃঢ় ইচ্ছা, নব্যেরাও যেন তাই চায়। ট্রট্‌স্কির কথা মনে হয়, তবে তার বিপ্লবতো অন্য ব্যাপার। ট্রট্‌স্কিকে একদিন দেখেছিলাম পরাজিত, রাগত (মোটর মাথার আলোকে সুবিন্যস্ত সাদা রূপালি চুল, মুখে কষ্টের হাসি, মাড়িতে এলোমেলো বিরল বিপর্যস্ত ছোট ছোট দাঁত)। আমার পাশে আজ চলেছেন যিনি তিনিও অবিরত বিপ্লবের স্বপ্নে-বিভোর, তবে সে দ্বৈত ভাবনায়, সে কথা আলোচনা হয় নি আমাদের। অনগ্রসর জাতি পৃথিবীতে সংখ্যায় অনেক বেশি। আগে যারা ছিল উন্নত জাতির কলোনীর প্রজা, তারা আজ মুক্ত হয়েছে। মাথা তুলেছে নব নব জাতি। সংগ্রাম আজ সুরু হয়েছে। অবশ্য ইনি জানেন যে, বিশ্বব্যাপী বিপ্লব তিনি দেখে যেতে পারবেন না। ১৮৪৮ এ আমাদের যে অবস্থা ছিল অনগ্রসর জাতিরা আজ সেখানে। হয়ত আবার এক মার্কস, এক লেনিনের উদয় হবে। আর একশত বৎসরে কত কি হবে, শুধু বাহিরের ভেতরের মেহনতী কর্মীর সংযোগ নয়, ভারতে ট্রেড ইউনিয়ন সংঘ নয়, আলজেরিয়ার সঙ্গে ফরাসী কম্যুনিষ্টের মিতালী নয়, এ এক সীমাহীন অন্তহীন দুর্দশায় সংহত হয়ে ছোট ইউরোপীয় উপদ্বীপের বা ঘৃণিত আমেরিকার বিরুদ্ধে মিলিত যুদ্ধযাত্রা। হয়ত আজকের প্রলেটরিয়াণ ও ধনিক এক সঙ্গে এর বিরুদ্ধে দাঁড়াবে, যেমন সুরু হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে বা রুশিয়ায়। কিন্তু একটি দেশ অস্ত্র ত্যাগ করবে না, সে চায় প্রতিহিংসা ও ন্যায়-বিচার। বিশ্ব সংঘাত বাধাতে সে চলেছে, তার সাহসের অন্ত নেই। তিন শ' বছরের ইউরোপীয় সক্রিয়তার ফল আজ প্রায় মুছে গেছে। এখন চীনে যুগ আরম্ভ হয়েছে।

এঁকে দেখে একবার সম্রাটদের কথা মনে হয়েছিল। আজ এ দেশের রাজারা সরগোমের ক্ষেতে ধূলায় ধূসর, সেনানায়কদের কঙ্কালমূর্তি মনে ভেসে উঠেছে, সম্রাটদের কবরস্থানে যেতে পথের ধারে যা দেখেছিলাম। আমাদের কথাবার্তার পেছনে, বিশ্বে সন্ধ্যা নেমে আসছে। উঁকি ঝুঁকি এখানেও। সুদীর্ঘ অলিন্দ বেয়ে আসতে কর্মচারীরা থেমে গিয়েছে, তারা চলে যেতেও সাহস করছে না।

মাও বললেন—"আমি একা।"

আবার হঠাৎ থেমে, "তবে দূরের বন্ধুরাও রয়েছেন, আমার শ্রদ্ধা জানাবেন জেনারেল দ্যগলকে। আর ঐ ওঁরা? (রুশিয়াকে মনে মনে ভেবে), বিপ্লবে বস্তুত ওঁদের আর কৌতূহল নেই।"

রোলাঁ ও রবীন্দ্রনাথের প্রথম সাক্ষাৎ

(রোলাঁর ডায়েরী থেকে)

১৯ এপ্রিল ১৯২১।

রবীন্দ্রনাথ টাগোর এসেছেন, সঙ্গে আছেন তাঁর পুত্র। দেশভ্রমণের পথে পারীতে থাকবেন আট দিন। রয়েছেন Autour du Monde 9 কে দ্য 4 সেপ্তম্বর-পেনের-ধার-বুল্যাঁ-এ।

তাঁর সজ্জা ভারতীয়ের, মাথায় উঁচু কাল ভেলভেটের ক্যাপ, লম্বা বেইজ-রঙের পোশাক। দেখতে ইনি অতি সুন্দর, একটু অত্যধিক-ই মনে হ'লো। দীর্ঘকায় শুদ্ধ আর্যের মত সুসম-সুন্দর আকৃতি। তবে সূর্য-দীপ্ত দেশের জীবন-যাত্রা তাতে উত্তপ্ত সোনার আভা এনে দিয়েছে। সুঠাম ভুরুর ছায়ায় ফুটেছে সুন্দর ব্রাউন চোখে দীপ্তি। নাসিকা সরল, শুভ্র গোঁফের তলায় হাসি হাসি মুখ, ত্রিশীর্ষ শ্মশ্রু সিল্কের মত চিক্কণ, তবে দু দেশের শুভ্র কেশের মধ্যের স্তরটি এখনো কালো রয়েছে। সারা অঙ্গ থেকে ছড়িয়ে পড়ছে পরিপূর্ণ ও শান্ত আনন্দের লাবণ্য; তাঁর সব কথার মধ্যে তা প্রকাশ পাচ্ছে।

নিজে শুধু ইংরাজী বলেন, আমার বোনই দোভাষী রইল।

তাঁকে সব মিলে দেখাচ্ছিল একটু যাদুকরের মত।

আমারই সৌভাগ্য যে মানুষটি ব্যবহারে সহজ ও ভদ্র। অমায়িক ও সুমিষ্ট তাঁর কথাবার্তা। রইলেন দেড় ঘণ্টা, অনর্গল কৌতুকময় বিদগ্ধ কথার স্রোত বইল, তারই মধ্যে সময় সময় বিচিত্র রূপকের ব্যঞ্জনা।

*

ইনি সারা এসিয়ার উপযোগী এক বিশ্ববিদ্যালয় ভারতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, এসিয়ার সব দেশের বিখ্যাত অধ্যাপকদের নিয়ে যাবার কল্পনা রয়েছে সেখানে, তাঁদের সঙ্গে ভারতীয় ও ইউরোপীয় ছাত্রদের যোগাযোগ হবে। মনজুড়ানো ভদ্র ব্যবহার, তবে বোঝা যায় ইউরোপের সঙ্গে তুলনা করে এসিয়ার ও বিশেষত ভারতের আদর্শ নীতিবোধ ও বুদ্ধিমত্তা যে অনেক ভাল—এতে তিনি স্থির বিশ্বাসী

হয়েছেন। বললেন, ইউরোপ যেন একজন সুদক্ষ কারিগর—সঙ্গীতের উপযোগী এক সুন্দর যন্ত্র সে ভেবেছে ও তৈরিও করেছে—নিজে কিন্তু তার উপযোগী সঙ্গীত-রচনা করতে জানে না। সে সঙ্গীত কিন্তু আসবে ভারত থেকেই। আরও বললেন, যে আদর্শ অন্য সব দেশের লোকে অনুসন্ধান করে বিফল হয়েছে—বিশ্ব-শান্তির সেই কল্পনা মূর্ত করতে ভারতই সক্ষম হবে। কারণ শান্তি হলো হিন্দুজাতির মর্মকথা। হিংসাকে সে প্রতিহিংসা দিয়ে কখনই রোধ করেনি। বার বার বৈরী অভিযানকে শেষ অবধি প্রতিহত করেছে তার অপ্রতিরোধ। এবার গান্ধীজী কর্মপদ্ধতির বিবেকসম্মত নীতি হিসাবে (দেশে) এটিকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এর উত্তরে আমি বলি—অপ্রতিরোধ কার্যত ফলপ্রসূ হবেই। তবে এই নীতির অনুসরণ অনেক সহজ দাঁড়ায় যখন অসংখ্য লোকে এটিকে প্রয়োগ করে। শেষের কথা বলবার পালা যে তাদের থাকবে, সে বিষয়ে তারা নিঃসন্দেহ হতে পারে—কারণ স্বজাতির প্রচণ্ড প্রাণশক্তি তাদেরই স্বপক্ষে। তবে প্রতীচ্যবাসীদের পক্ষে এই নীতির অনুসরণ খুবই বিপজ্জনক—কারণ (সংঘাতে) নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার ভয় তা'দের সব সময়ই রয়েছে। শান্তিকামনা দু'ভাবের হতে পারে—হয় ঃ (বলিষ্ঠ মনের) ত্যাগের উপর তার প্রতিষ্ঠা কিংবা জৈব দুর্বলতা ঘটিত (ভীরু মনের) নৈরাশ্যের উপর তার ভিত্তি। জীব-প্রাচুর্যের উপর স্থির-বিশ্বাসে অহিংস-নীতির অনুসরণ করা চলে—তবে একমাত্র ভারতেরই সেইরূপ আচরণ সম্ভব। এই মহার্ঘ চিত্তবিনোদনের দাম একলা সেই-ই দিতে পারবে। শেষ হিসাবে—নিছক বেঁচে থাকার প্রশ্ন এটি।

*

প্রতীচ্যের সর্বত্র হিংসা ও বর্বরতার তাণ্ডবে ঠাকুরের মন যে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে—সে কথা তিনি লুকিয়ে রাখলেন না। বললেন তাঁর পক্ষে এ সহ্য করা কষ্টকর, এখানে বাস করা অসম্ভব। আমাদের কিন্তু এই সব থেকে কখনই নিষ্কৃতি নেই—তাই এর যে কষ্ট তার বোধও ইউরোপীয় আমরা হারাতে বসেছি। দান্তে যেমন নরকে সন্ত্রস্ত হয়ে ঘুরেছিলেন—এই দেশ পরিক্রমায় ভারতীয়দের সেই দুর্দশা হতে পারে।

জীবের প্রতি নৃশংসতা, মৃগয়ায় জঘন্য প্রাণহিংসা এ সবই বিশেষ করে ঠাকুরের বীভৎস ঠেকছে। বললেন শুধু যে সূক্ষ্ম অনুভূতি এভাবে বিপর্যস্ত হচ্ছে তা নয় মানবিকতার গৌরবও এতে হীন হয়। এখনো তির্যকযোনি-সুলভ এই বিকৃতিগুলি

ঠাকুরকে পীড়া দিচ্ছে—তবে উত্তরআমেরিকায় তিনি যে গভীর কষ্ট পেয়েছিলেন তা অবর্ণনীয় গুরুভার দুঃস্বপ্নের মত—তাঁকে প্রায় সংজ্ঞাহীন করেছিল। ভারতের যে শান্তি ও বিশ্রামভরা ছবি তিনি আঁকলেন—তা শুনে আমি বলে ফেললাম—আমার মত বহু ইউরোপীয় পৃথিবীতে বর্তমান বর্বরতা থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য বিশ্বস্ত কোন আশ্রয় বৃথা খুঁজে বেড়াচ্ছে। আমরা তা হলে এবার ভারতকেই বেছে নেব। উত্তরে ঠাকুর আমাকে সস্নেহে তার ভবনে আতিথ্য গ্রহণের নিমন্ত্রণ জানালেন।

জিজ্ঞসা করলাম ভারতবর্ষে কি বহু-লোকে টলস্টয় পড়ে ও বোঝে ? উত্তর করলেন, মনে হয় পড়ে ঠিকই—তবে তাঁর চিন্তার স্বরূপ হয়ত না বুঝতে পারে। গান্ধীর বিশ্বাস টলস্টয়ের কাছ থেকেই তিনি প্রেরণা পেয়েছেন। তবে মনে হয় এটা তাঁর ভুল। তাঁর অপ্রতিরোধনীতি টলস্টয়ের থেকে সম্পুর্ণ ভিন্ন বস্তু। মনে হল ঠাকুর টলস্টয়কে বেশী পছন্দ করেন না। খ্রীষ্টিয় সন্ন্যাসীর উৎকট বৈরাগ্য ঠাকুর অনুমোদন করেন না (বললেন, কোন হিন্দুই করবে না), ভারতের আকাশ বাতাস এর অনুকূল নয়। বৈরাগ্য বা তিতীক্ষা প্রতীচ্যের (হয়ত বা জাপানেরও) পক্ষে ভাল। এ সব দেশের লোকে স্বভাবে বেশী অশান্ত এবং দুর্বার কাজেই তাদের সংযমের প্রয়োজন আছে। ভারতীয়ের (সাধারণত) সংযমের থেকে উদ্দীপনার বোধ হয় বেশী প্রয়োজন। ঠাকুরের চোখে প্রতীচ্যের শিল্পে বা চিন্তাধারায় দ্বন্দ্ব ও সংঘাতই চিরন্তন—এতে তাঁর মনে সংবেদনের সাড়া উঠে না।

*

দুজনে সঙ্গীত নিয়ে অনেক কথা হলো। তাঁর জন্য বেহালায় সব রকমের ইউরোপীয় সুর বাজান হলো। বাক, বেথভেন, থেকে দ-বুসী পর্যন্ত। শুনে বললেন, বুঝতে পারছি। তারিফও করলেন। তাঁর ধাতে বাকের সঙ্গীত সব থেকে বেশী সংবেদন জাগায়। (এতে আমি খুব বিস্মিত হলাম) ভারতে আজকাল নাকি Wagner-এর গীতিনাট্যের অভিনয় হচ্ছে। যদিও ভারতীয়রা গাওয়া-গান ও তান বিস্তারই বেশী পছন্দ করেন তবু (বা হয়ত সেই জন্যই) গান থেকে Wagner-এর অরকেস্ট্রার ঐকতানই তাঁদের বেশী পছন্দ। এতে তাঁদের ভুল হয়নি।

ঠাকুর নিজেই গানের সুর রচনা করেন। মার্গরীতির তিনি বিরোধী। সুর সংযোজনায় রাগরাগিণীর চিরাগত নিয়ম তিনি মানতে রাজী নন।—তাঁর সৃষ্টি নতুন

ধরনের—দেশের লোকে সে সব অনুমোদন করে—চারিদিকে সকলে সেই সুরই গেয়ে থাকে ও তা' শুনে তিনি গভীর আনন্দ পান।

*

কথায় প্রকাশ না হলেও আমার মত তিনিও বুঝেছেন ভারত ঘেঁষা ইউ-রোপীয়েরা, তার সভ্যতাকে সত্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না, বরং ভারতের প্রতি তাচ্ছিল্য ও অবহেলার ভাব তাদের ভদ্র সমর্থনের মধ্যেও প্রকাশ হ'য়ে পড়ে। তবে ইংরাজ (ক'জন আছেন) খুব চেষ্টা করেন—। বোদ্ধাও ভাল, তবু দরদী কল্পনার অভাব, তাঁরাও যথার্থ সংবেদনের সাড়া অনুভব করেন না। তবে অন্য জাতির ভাব-ভাবনা রুশেরা আত্মীয়ের মত গ্রহণ করতে পারে, দুজনেই এ কথা স্বীকার করলাম। তারাই ভবিষ্যতে হয়ত এসিয়া ও ইউরোপের মধ্যস্ত দোভাষী হবে। জাপানের বিষয় বললেন, সেখানে উৎসাহ ও আগ্রহ দেখেছিলেন প্রচুর, খুব ঘটা করে প্রথমে তাঁকে আবাহন করেছিল ওরা। তখন জাপানী সরকার একটু বিচলিত হলেন ও প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করতে লাগলেন। সরকারী কেন্দ্রের প্রচণ্ড চাপে জাপানের যুব-সমাজের কণ্ঠরোধ হয়ে গেল।

ঠাকুরের পুত্রটিকে দেখলে মনে হয় বিংশতি বর্ষীয় যুবা (সত্যি বয়স বেশীই হবে)। পরনে ছিল ইউরোপীয় পোশাক, তবে মাথায় এক ধরণের ফেজ-টুপি। মনে হয় বেশ সজাগ ও বুদ্ধিমান, তবে একটা কথাও বললেন না। এঁর গায়ের রং পিতার থেকে অনেক তফাত। ভিন্ন জাতির সঙ্গে মিশ্রণের কথা মনে হয়—তাতে কৃষ্ণবর্ণ জাতিও থাকবে। তাঁকে একলা দেখলে ভারতীয় মুসলমান মনে হত।

*

"Autour du Monde"-এ প্রাতরাশের জন্য আমার ও আমার বোনের নিমন্ত্রণ। টাগোর এইখানে রয়েছেন। হোটেলের অবস্থান অতি সুন্দর, শেন-নদীর ধারে, সামনে মঁ্য-ক্লু গ্রাম ও বনে ঢাকা সানুদেশ। বসন্তকাল, গাছে গাছে ফুল এসেছে। ভবনে সেক্রেটারী ও একটি বৃদ্ধা বাসিন্দা ছাড়া আমরা সকলে যেন একটি পরিবার ঘরোয়া ভাবে মিলিত হয়েছি। আমিও আমার বোন, আর আছেন টাগোর, তার ভ্রাতুষ্পুত্র ও পুত্রবধূ (ইনি ভারতীয় পোশাকে)। আমারই কপাল মন্দ, সরাসরি আলাপ করা হলো না টাগোরের সঙ্গে কথার প্রতিচ্ছবি পাচ্ছি বোনের কাছ থেকে। তার

মিষ্ট ভাষায় ও সৌজন্যে (এবার) আরও বেশী মুগ্ধ হলাম। স্মিত হাসি ও শান্ত —তার মধ্যে ভুল বুঝবার অবকাশ নেই। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই কথা বলেছেন—শান্ত তরল ভঙ্গিমায় স্বরগ্রাম একটু চড়া—তবে সদা সংযত ভাব। কখনও থেমে যাচ্ছেন তখন একেবারেই নির্বাক। আমাদের দেশের মানুষের মত সে নীরবতা চাপা দেবার চেষ্টা নেই।

*

বাংলায়, বোলপুরের কাছে শান্তিনিকেতনে, বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করেছেন—তারই কথা বলতে লাগলেন। ইউরোপে ভ্রমণ তারই তাগিদে। সামনের সপ্তাহে স্পেনে যাচ্ছেন—পরে সুইসে—শেষে ইটালী। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য সুন্দর মুদ্রিত আবেদন আমায় দিলেন এককপি। এসিয়ার বিভিন্ন কৃষ্টি (আর্য, মঙ্গলীয় শেমেটিক, ইত্যাদি) আবার প্রতীচ্যের কলা সাহিত্য, বিজ্ঞান, তাদের সৃজনের উৎকৃষ্ট অংশ সব একত্র করে একটা বিরাট কৃষ্টিসমন্বয় এর লক্ষ্য। এই ভাবে 'এসিয়ার জাগরণ' তিনি আনবেন মনে মনে ভাবছেন।

ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা যাঁরা ভারতবর্ষ নিয়ে আছেন, টাগোর দেখছেন তারা হিন্দু চিন্তার স্বরূপ কেউই বোঝেন না—গীতাঞ্জলির ২টি গান আমাদের গেয়ে শুনালেন। সুর রচনায় মামুলী নিয়মগুলি মানেন নি তিনি। সঙ্গীত চর্চায় ভারতের ঐতিহ্য-নির্দেশিত মার্গ অনুসরণ করেন না।

গানগুলি ছন্দোবন্ধে সুন্দর—আমাদের ইউরোপীয় মেলডি-ঘেঁষা। এতে কৌতূহলের উদ্রেক হয় না তবে মনে থেকে যায়। জনপ্রিয় হয়ে এর প্রচার সহজেই হবে। আমার মনে হল, টাগোরের সঙ্গীতে অভিনবত্ব খুব কম—যা সত্য ভারতের মার্গ সঙ্গীতে—যা গত বৎসর দিলীপ রায় আমাকে শুনিয়েছেন—সৃষ্টি হিসাবে তার দাম অনেক বেশী। পায়ের আঘাতে তাল রেখে বসে বসে গাইলেন টাগোর। বললেন গীতাঞ্জলির সব কবিতার সুর তাঁর দেওয়া, তাঁর প্রায় সব রচনাই—এইভাবে তিনি সুর দিয়েছেন। আমার প্রশ্নের উত্তরে বললেন কবিতাই প্রথমে লিখেছেন পরে সুর, তবে কখন কখন সুরটি মনে এসেছে, পরে তার উপযোগী কথা-রচনা করেছেন। ভারতে মুসলমানের ধর্মেকর্মে সঙ্গীতের নাকি প্রবেশ নিষিদ্ধ। মসজিদের সামনে হিন্দু শোভাযাত্রায় গান গাইলে সংঘাত বেধে যায়। পারস্য দেশের মন্দিরে—সর্বত্র—মহম্মদীয় ধর্ম ভালভাবেই প্রবেশ করেছে। সকলেই ওই ধর্ম

মানে। তবে আর্যরক্তে কলাচর্চার নেশা, (তাই) পারস্যে মুসলমানেরা ধর্মস্তোত্রও সুরে আবৃত্তি করে।

*

ফিরে আসবার সময় Crambault ও Empedocles বই দুখানি টাগোরকে দিলাম।

যাবার আগে আমাদের সঙ্গে আবার দেখা করতে চাচ্ছেন—টাগোর। তাঁর সঙ্গে আমাদের নিমন্ত্রণ হলো মাদাম কারপেলের বাড়ি। আমরা যেতে পারি নি। সস্নেহে সনির্বন্ধ অনুরোধ এলো যেন যাবার আগে আর একবার দেখা হয়। বুলঁ্য-তে আবার আমরা গেলাম—২৬শে—টাগোরের ফ্রাঁস ছাড়ার আগেরদিন। এবার নিভৃতে তার ঘরেই আমাদের অনেক কথা হ'লো। বোনই মধ্যস্থ দোভাষী রইলেন। প্রায় শুধু, বিশ্বভারতীর কথাই বললেন—তাঁর পরিকল্পনা, ও যেসব প্রতিবন্ধক খাড়া হয়েছে ইংলণ্ডের তরফ থেকে। দেশের সরকার সন্দেহ করছেন ওখানে হিন্দু স্বাধীনতার কেন্দ্র হবে। তাই বন্ধ করার জন্য সবই করেছেন তাঁরা, এসব চেষ্টা সত্ত্বেও পরিকল্পনার কথা যখন ছড়িয়ে পড়লো ইউরোপে ও আমেরিকায়—তখন তাঁরাও এবার সমর্থনের ভান দেখাচ্ছেন। তবে এটি যেন তাঁদের দখলে আসে। টাগোর বলছেন তাঁরা প্রথমে বৈরীভাবে ক্ষতির চেষ্টা করেছেন—এখন সৌজন্যে ও সমর্থন করে তাঁরা ক্ষতি করবেন। টাগোরকে বলছেন, পরিচালনার সব ভার তাঁরা নেবেন, টাকাও দেবেন এবং অধ্যাপক ও ছাত্রদের বাছাইও তাঁরাই করবেন। টাগোর ধন্যবাদ দিয়ে প্রত্যাখান করলেন। বললেন; তাঁর প্রতি সম্মান দেখিয়ে যেসব বিখ্যাত ব্যক্তিদের বা সরকারী কর্মচারীদের সহকারী বলে তাঁকে দিতে চান—তাঁদের সঙ্গে তিনি কখনও কাজ করতে পারবেন না। কারণ নিজে তিনি বাঁধন ছাড়া পথ-হারা, মান্যবর সরকারী-প্রধান নন। তাই শুধু বুদ্ধিজীবী বা বিদ্যা-দিগ্গজ নিয়ে এ বিশ্ববিদ্যালয় গড়তে তিনি চান নি, তাঁরি পছন্দ মত সব দেশের স্বাধীনচেতার বা দরিদ্র ছাত্রমণ্ডলীর জন্য এই বিশ্বভারতী হবে। তা ছাড়া আরও লিখেছেন—সরকার তাঁকে বিশ্বাস করতে পারেন যে, কোন রাজনৈতিক মতলব হাসিলের জন্য এটি করা হচ্ছে না। (তবু আমার কথায়, স্বীকার করলেন সরকারের অবশ্য সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণই আছে। গভীর ভাবে দেখলে—সব থেকে সর্বনাশা শত্রু তাঁদের হলো আমাদের দু'জনের মত লোক, যারা জাতীয়তা

ছেড়ে আন্তর্জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী)। আমি পরামর্শ দিলাম—আপনি সরকারী কর্মচারীদের ছেড়ে ইংলণ্ডের স্বাধীন লেখকদের লিখুন যাতে সেখানে জন মতে আন্দোলন গড়ে সরকারী এই দুষ্টবুদ্ধিকে ঘায়েল করে। দেখে আশ্চর্য লাগল খুব অল্প ইংরাজ লেখক বা শিল্পীদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ আছে। (অবশ্য Bertrand Russel-কে বাদ দিতে হয়, তিনি তো এখন চীন দেশে)। টাগোর বললেন, গত যুদ্ধের মধ্যে তিনি ইংরাজ সরকারকে তাঁর সম্মানসূচক উপাধিগুলি প্রত্যর্পণ করাতে সকল ইংরাজই তাঁকে সন্দেহ করে। তবে এটি প্রকৃত কারণ বলে আমার মনে হল না। (তাঁর সেই গৌরবময় বিদ্রোহ বরং সব স্বাধীন ইংরেজের মনের দরদ ও সংবেদন তাঁর দিকে টেনে এনেছিল)। মনে হল ভারতীয়-মুখ চেয়েই এইভাবে নিজেকে ইংরাজদের থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছেন। কারণ, যখন জিজ্ঞাসা করলাম—আপনি কি ভারতে আপনার আদর্শানুরাগী অনেক শিষ্য পেয়েছেন। স্বীকার করলেন যদিও দেশের বহুলোকে তাঁকে শিল্পীভাবে সম্মান জানায় ও প্রশংসাও করে—তবে খুব কমই (হয়ত বা কেউই না) আছে যারা তাঁর এই প্রাচ্য-প্রতীচ্যের পুনর্মিলনের অভিলাষে অনুরাগী। দেশাত্মবোধ আজ খুব জেগেছে তাঁর দেশবাসীর মধ্যে—এত যে অত্যাচার দুঃখ কষ্ট পেয়েছে তারা, তার দ্বেষ বা বিরক্তি এখন নিদারুণ। কাজেই স্বেচ্ছায় ইউরোপের সঙ্গেও মৈত্রী পাতাবে না তারা। তারা হাত বাড়িয়ে দেবে না এর জন্য। কারণ তারা ভাবছে ইউরোপে আছে তাদের জন্য শুধু ঘৃণা ও অবহেলা এবং বুঝবার ভুল। সেজন্যই টাগোরকে ইংরাজ-সম্পর্কে এত সাবধান হতে হয়েছে। তিনিও তাদের উপর নির্ভর করতে চাচ্ছেন না। ভয় এই, ভারতের না মনে হয় তাঁর এই গঠন চেষ্টা তাও ইংলণ্ডের কারসাজী। অন্যভাবে দেখলে, ইউরোপীয়দের ভারতে আসা কিন্তু নিতান্ত দরকার (শুধু লেখাই যথেষ্ট নয়)। তখনই প্রমাণ পাবে হিন্দু জাতি, যে প্রতীচ্যে এখনও এমন লোকেরা আছেন, যাঁরা তাদের ভালবাসেন, প্রশংসার চক্ষে দেখেন ও তাদের গৌরবময় ভবিষ্যতে বিশ্বাসী। ফ্রাঁসে এমন লোক পাওয়া আমার দুরূহ মনে হয় না, যারা ভারতের বিষয়ে উৎসাহী। আর্থিক ব্যাপার ইত্যাদির অনুকূল সম্ভাবনা থাকলে তারা ভারতেই যেতে চাইবে। তবে স্বীকার করাই ভাল যে জারমানী ও রুশ দেশ থেকেই সমবেদনা বেশী ও সেখানে ভারতের দলে যোগ দেবার বহু লোক পাওয়া যাবে। এমন দুর্ভাগ্য, এখন ঠিক এই সময়ে তারা কেহ ভারতবর্ষে যেতে পারবে না। রুশকে বলশেভিক বলে সন্দেহ হবে। আর

ইংরাজ সরকার তো আইন পাশ করেছেন, যুদ্ধের পর পাঁচ বৎসর কোন জার্মান ভারতে যেতে পারবে না। বর্তমান ইউরোপের জঘন্য কর্তারা বড় ব্যস্ত হয়েছেন যাতে সব দেশের লোক আবার না মেলামেশা করে বা একত্র হতে পারে। এঁরা ঘৃণা আর ভুল বোঝার গণ্ডি কেটে লোকেদের পৃথক রাখতে চান। এই অবস্থায় টাগোরের লক্ষ্যে পৌঁছতে অনেক কষ্ট পেতে হবে। আমার দুঃখ বেশী যে তিনি স্বীকার করছেন তার পাশে দ্বিতীয় হয়ে দাঁড়াতে কোন ভারতীয় নেই। যে দুই শিষ্যের উপর তাঁর পূর্ণ বিশ্বাস—তারা দুজনেই ভারতবাসী ইংরাজ। যেসব যুবজন ব্রতী হয়ে তাঁর সাহচর্য করতে চায়—সকলের কাছে টাগোর চাইছেন তাঁর মৈত্রী আদর্শে স্থির বিশ্বাস।

আমার বোনের সঙ্গে কথা কইছেন, আমি অনেকক্ষণ সেই একপাশে ফেরা চেহারার দিকে তাকিয়ে আছি। সেই তীক্ষ্ণ গৌরবময় রূপরেখা প্রশংসার চক্ষে দেখছি। যে সুষমা ও শান্তি, যা প্রথমে দেখেছিলাম—তাতে আজ বিষাদের আবির্ভাব দেখলাম। মিথ্যা আশা আর পোষণ করছেন না মানুষের জন্য। তবে বুদ্ধিদীপ্ত পৌরুষের ভাব—সকল সংঘাতের স্থিরভাবে সম্মুখীন—সে-যদিও আত্মার কামনা—এসব বিরোধ ঝঞ্ঝাট নিয়ে সে থাকতে চায় না। টাগোরের ৬০ বৎসর বয়স হলো। Zwelg লিখেছেন জার্মানী তার ষাট-পূর্তির উৎসব করবে, ফ্রান্সে এ বিষয়ে নজর নেই—বোধ হয় ইংলণ্ডেরও নয়। তবে সত্য বয়সের থেকে কম দেখায় তাঁকে। আমার থেকেও কমবয়সী লাগে, যদিও যে কুঞ্চিত কেশরাশি তার কান ঢেকে রেখেছে—তা তো একেবারে সাদা। দেহে উত্তপ্ত সোনালী আভা। গলার সুর ঈষৎ উচ্চতারে। কথা বলবার সময় প্রশ্নকারীর দিকে চান না, শেষ হলে সম্মুখে ফেরান হাসিমুখ, তাও মুহূর্তের জন্য। চোখ দুটি আবার মাটির দিকে নামে। যখন বিদায় নিলাম, ঈষৎ ঝুঁকে করমর্দন করে, যুক্ত হাত দুটি ঠোঁটের কাছে তুললেন—যেন প্রার্থনায়।

কাল ইনি স্টাসবুর্গে যাবেন— সেখান থেকে সুইস-জার্মানী, সুইডেন-নরওয়ে-হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, শেষে ইটালী থেকে জুনের শেষে জাহাজে ভারতে ফিরবেন। সেদিন যেতে যেতে Eiffel তোরণের সামনে বোন জিজ্ঞাসা করেছিল আপনি কি এটিকে পছন্দ করেন। হেসে বললেন—এতো বিস্ময়ের (ছেদ) চিহ্ন ! পারীর লোকে নিজেরাই নিজেদের বাহবা দিতে তুলেছে।

মহা-পাল-কথা

যোসেফ আগনন

[হিব্রু লেখক সামুয়েল যোসেফ আগনন্ (Agnon) এ বৎসর সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার অর্জন করে যশস্বী হয়েছেন। এঁর বয়স প্রায় আশীতে ঠেকলো—জন্ম হয়েছিল পোলাণ্ডে। ২১ বৎসর বয়স থেকে Palestine-এর অধিবাসী হয়েছেন। তাঁর লেখা থেকে সংগৃহীত কয়েকটি গল্পের ফরাসী তরজমা ১৯৫৯ সালে 'জেরুসালেমের গল্প' বলে প্রকাশিত হয়। Agnon মুখ্যতঃ ইহুদীদের সমস্যা সামনে রেখে গল্পগুলি লিখেছেন। পড়তে গিয়ে নিজের দেশের সমস্যাগুলির সঙ্গে নাড়ীর যোগ প্রতিভাত হাওয়ায়, চমৎকৃত হয়েছি। তাই একটি গল্পের সারাংশ বাংলায় প্রকাশ করার লোভ কাটাতে পারলাম না। La Bache নামক গল্পের যথাসাধ্য অনুবাদ এটি।—সত্যেন বোস]

একদা বড় দুঃসময় ভেঙ্গে পড়েছে এক জনপদে। পত্তনের পর থেকে কখনও এরূপ সর্বনাশা অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়নি সে দেশ-কে! আকাশে মেঘ নেই, শুক্‌নো মাঠ থেকে কোন ফসলই আর উঠ্‌ছে না। জমি ও আকাশ দুই যেন প্রতিজ্ঞা করেছে উদ্বাস্তু পলাতকদের মধ্যে জীবিত শেষ ক'টিকেও মৃত্যুর কবলে ঠেলে বিলীন করে দেবে! অল্পে অল্পে খাদ্যসামগ্রী বাজার থেকে উধাও হলো, ক্ষুধার শীর্ণ ও বিকৃত হয়েছে সকলের শরীর। রাই-এর শীষ রূপার থেকে বেশী মূল্যবান দাঁড়িয়েছে, গোধূমের কণা সোনার দামে বিক্রী হচ্ছে। দুধের রং হয়েছে জলের মত—জলও আর পাওয়া যাচ্ছে না—দারুণ খরার দিন পাঠিয়েছেন ভগবান!

দিন যায়—সূর্য আকাশে গড়াচ্ছে—মাঠে যেন আগুনের গোলা খেলা চলছে! রাতে চাঁদ উঠলো, সেও যেন শুকিয়ে বেশী এবড়ো খেবড়ো হয়ে গেল। অবশ্য আকাশে অসংখ্য তারার দল—উজ্জ্বল, আর নীচে জমিতে মহাজনদের প্রভুত্বের সমান দাপট! বর্তুল এদের জঠরগুলি—মৃতদেহের পরিস্ফীতির কথা মনে করিয়ে দেয়।

এদিকে কিন্তু সবলেরা দুর্বল হয়ে পড়্‌ছে—দুর্বল পড়্‌ছে রোগের কবলে—আর

জীবন দীপ ক্রমে নিভে এলো রোগীর! বিপদ কখনও একা আসে না! ক্ষীণ প্রতিরোধের সামর্থ্যও যখন নেই লোকের শরীরে তখন জানা গেল দেশ ঘেরাও করেছে শত্রু এবং আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে! বাহিরের সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে গেল—কোন পণ্যই আর আসে না বিদেশ থেকে। এখানে সব সময় প্রাচুর্যের বৎসরেও গম ও মাংস আমদানী করতে হতো। এবার সবেতে টানাটানি, লোককে খাবার জোগাবার কোন উপায়ই রইল না—সরকারের। অস্ত্র হাতে শত্রুর সঙ্গে লড়্‌তে যাবে, ক্ষুধার্ত সাধারণের সে অবস্থা নয়—সামর্থ্য নেই যে মাথা তুলে দাঁড়ায়। ফাটকা-মহাজনের কথা স্বতন্ত্র। তারা বুক ফুলিয়ে প্যারেড করছে। এই ভাবে প্রমাণ করছে তাদের বাদ দিলে দেশের চল্‌বে না আর তারাও যেন নিজেদের উৎসর্গ করেছে সাধারণের কল্যাণ কাজে! তারাই খাদ্যবন্টন নিয়ন্ত্রণ করছে, দেশের সকলে নতি স্বীকার করছে তাদের কাছে—অন্যথায় সকলকে বুভুক্ষায় মরতে হয়!

শত্রু দেখ্‌ছে—এগিয়ে বাধা দিতে কেউ-ই পারবে না, তার স্পর্ধা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। বাহিরে সীমান্তে যুদ্ধের বিভীষিকা, ভিতরে—সর্বত্র—দুর্ভিক্ষের ছায়া!

এর থেকে বেশী শোচনীয় হতে পারে না অবস্থা! তবু আবার এক নতুন হাঙ্গামা এসে জুটলো—এর বিভীষিকা আরও বেশি! বিধাতা যখন পাঠাব মনে করেন—তখন বিপদের ইয়ত্তা বা পরিমাণ কত হবে কেউ জানে না, তাঁর ভাণ্ডারে জমা অসীম—আপৎপাতের বিভীষিকা উত্তরোত্তর বেড়েই চলে! পুরানো কথায় একটু ফেরা যাক্! দেশ ছিল দুই দলের হাতে—এক নাঙ্গা-শির, অন্যটি শির-টোপা। এক দলে যা বলে, প্রতিবাদ করে অপর দল! আবার প্রত্যেক দলের মধ্যেও নানা জোট সব পরস্পরকে ঘৃণা করে। একত্রিত দুই দলকে—শত্রু অবশ্য সুনজরে দেখে না, তবে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে যে ঘৃণা প্রকট হচ্ছে—তা বিদেশীর বিদ্বেষকেও ছড়িয়ে যায়।

এক দেশ—এক নেশন! এরই মধ্যে শত্রুভাবাপন্ন দুই জাতি কি করে আশ্রয় পেলে? পেয়েছে যে, এ সত্য—কারণও সহজে বোঝা যায়! এ দেশে প্রত্যেকে অতীতের ইতিহাস বুঝেছে নিজের ধরণে, কারণ ঐতিহ্য তাকে এক বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করেছে! (যদিও পৃথিবীর চেহারা এতদিনে অনেক বদ্‌লেছে, রীতি ও আচারে এসেছে অনেক পরিবর্তন—যে ঐতিহ্য পূর্বগামীদের একান্ত প্রিয় ছিল আজ

তাদের বংশধরেরা তার অনেকটাই পরিত্যাগ করেছে।) সকলেই একমত, এখানকার অধিবাসীরা সকলেই ইহুদী জাতি থেকে অবতীর্ণ। তবে, একদল ঘোষণা কর্‌ছে— নীতিপ্রবর্ত্তক মুশার পূর্বের আদি ইহুদীদের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক! সেই পূর্বকালে মাথাঢাকা আবশ্যিক বলে চলতো না। তাই সেই দল নাঙ্গাশির! অপর দল দাবী করছেন মুশার নীতি চালু হবার পর ইহুদীবংশে তাঁরা অবতীর্ণ হয়েছেন! মাথা ঢেকে তাঁরা সেই ঐতিহ্য বজায় রেখেছেন! এঁরাই হলেন—শিরটোপার দল! নাঙ্গাশির ও শিরটোপার মধ্যে ঘৃণার গভীরতার কারণ হয়ত বোঝা যায়। কিন্তু যে যার দলের মধ্যে কেন এত গরমিল? সকলেই তো মাথা ঢাক্‌ছে! সে সত্য বটে— তবু নানা ধরণের টুপী দেখ্‌ছ তো, কোনটি বেরে, কোনটি কাস্‌কেট, কারোর টুপী পিরামিডের আকার। কোনোটি কোণাকৃতি, কোনটি গোলাকার, আবার কোথাও টুপীর উপর ভাগ সমতল। শির ঢাক্‌ছে কোথাও পাগড়ী কোথাও পানামা! আবরণ কখনও ভেলভেটের কখনও রেশমের। পিনের মাথার মত ছোট টুপী দেখা যায় আবার ঘৃণার সঙ্গে টুপীর সাইজ—কখনও মাত্রা ছাপিয়ে পড়ে! মাথা ঢাকা আছে সকলের তবু মুখ্য লক্ষ্য হলো কি প্রকারের সে আচ্ছাদন।

এখন নাঙ্গাশিরদের মধ্যে কি নিয়ে ঝগড়া? সকলের চুলে তো হাওয়া খেলছে! তবু দেখো, কারোর মাথায় টাক, কোথাও বা পুরো কামান—চুল কোথাও ব্রাশ করা —কোথাও বা বাবরীতে সাজান, আবার কোথাও সামনের চুল বড়, কারও মাথার দু-পাশ কামান—মাথার উপর কোন আবরণ নেই—তবু তারও প্রকারভেদই মুখ্য কথা! যত মাথা, তত মত, খুসীমত আবহাওয়ায় মুখ ঘুরছে ফিরছে, কখনও পূবে কখনও পশ্চিমে। হঠাৎ মুখো-মুখি হলেই ঝগড়া বেধে গেল। কোন ব্যাপারে মতের মিল কোথাও নেই এদেশে। তবে একটি কথায় সকলেই সায় দেবে। ভিন্ দলের ভুল ভ্রান্তিই দেশের সব অসুবিধার কারণ। নির্ভয়ে বলতে গেলে লেখকও বল্‌তেন —হ্যাঁ, এই এক বিষয়ে কোন পক্ষই ভুল বল্‌ছেন না।

এখন, সেই দেশেই ছিল একজন, যে নাঙ্গাশির বা শিরটোপা—কোন দলেই পড়ে না। সরলপ্রাণ, সে হয়ত একটু বোকা, তাই মাথা চুলকাতে টুপী খুলতো, আবার ঘরের বার হতে টুপী পরতো। ধ্বংসের পথে এগোচ্ছে-দেশ—তাকে বাঁচাবার আশায় সে স্থির কর্‌লে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করবে। দয়াল প্রভুর কাছে কৃপাভিক্ষা করি, একথা প্রত্যেকেরই মনে উঠা উচিত—তবু ও-দেশের লোকেরা কথাটা ভাবেনি! যা বেশী বেশী ভাবা উচিত, মানুষ হয়ত তা বেশী তাড়াতাড়ি

ভুলে যায়। সরল মানুষ প্রথমে সব প্রার্থনামন্দিরে ঘুরে ঘুরে বেড়ালো, কোথাও জায়গা পায় না—নিজেদের প্রচার কাজে শিরটোপারা সর্বত্র দখল করে রেখেছে। শেষে ছাই মেখে, থলি পরে মাঠ ভেঙ্গে সে গেল বনের দিকে। সেখানে মানুষে কখনও যেত না! মানুষ ভালবাসে গ্রাম-শহর—সেখানে আলোচনা—সে করতেও পারবে, শুনতেও পারবে। বনে ভগবানকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে সর্বান্তঃকরণে প্রার্থনা কর্‌লে! কেঁদে বল্‌লে, প্রভু! বৃষ্টি পাঠাও, তৃষিত জমিকে উর্বর করো, মানুষ যেন বেঁচে থাকে! এখন ভগবান চান মানুষ প্রার্থনা করে—তাদের আশাপূর্ণ করতে তিনি রাজী। সদাশয় তিনি, সকল জীবে তাঁর ভালবাসা! আর্তকে সান্ত্বনা দেন, বিপন্নকে উদ্ধার করেন তিনি। দয়া ও পরিত্রাণের যোগ্য যারা তাদের বাঁচিয়ে সকল সুখের বিহিত করেন! দয়াল ও সর্ব দুঃখত্রাতা তিনি! দেশের লোকে কিন্তু পরস্পরে ঝগড়া হিংসা ঘৃণা নিয়েই মেতে রয়েছে—স্রষ্টা ও পরিত্রাতার কথা ভাববার অবসর তাদের নেই!

যাঁকে নিত্য স্মরণ করা উচিত, দেশের মানুষ যখন তাঁকে ভুলে গিয়েছে, সেই সময় খবর রট্‌ল, দেশের কে একজন নাকি বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করছে! কথা বাড়তে বাড়তে এ খবর সরকারী মন্ত্রীদের কানেও পোঁছে গেল! দুই দলই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো—নাঙ্গাশির ও শিরটোপা উভয়েই! নাঙ্গা-শিরদের সব থেকে বেশী ভয়। প্রার্থনা পূর্ণ হলে প্রমাণ হয়ে যাবে তাদের থেকে বেশী শক্তিধর কেউ আছে তো! এদিকে শিরটোপারা উন্মত্ত হ'য়ে উঠেছে, কে একজন প্রার্থনায় ভিড়েছে দেখে, যে কখনও তাদের স্কুলে পড়েনি, ধর্মসমাজের সভ্য নয়, যাজকদের উচ্ছিষ্ট ভোজনও করেনি কখনও। প্রার্থনা—সে তো তাদেরই কৃত্যকর্ম! প্রায় নিজস্ব সম্পত্তি এটি। এর অনুশীলনে একমাত্র তাদেরই ভগবান অধিকার দিয়েছেন! অতএব সকলেই বিচলিত হয়ে উঠলো। নানারকমের ছুতায় মহা সোরগোল আরম্ভ কর্‌লে! সত্য বল্‌তে, যে প্রার্থনা করছে তার বিরুদ্ধে অসন্তোষের কারণ মাত্র একটি: সে কোন দলের মধ্যেই নেই। কাজেই অবিলম্বে অনধিকারীর বিরুদ্ধে যুগপৎ এই বিক্ষোভ সকলকে কাছাকাছি টেনে আনলে—প্রকাশ্যে না হলেও মনে মনে। এই ব্যাপারে প্রেসের তৎপরতা খুব সার্থক হয়ে উঠলো। সকল দলকেই উত্তেজিত করতে লাগল! কিছু কর্‌তেই হবে। সত্যি কে এই লোক? কে তাকে পাঠালে কাদের নাম করে, কাদের প্রতিনিধি সেজে সে তাঁরই কাছে হাজির হল—যিনি সবার উর্দ্ধে? এই সব প্রশ্ন ও নানা কথা সাংবাদিকদের

কলমের মুখে পুনঃ পুনঃ বের হতে লাগলো। সামান্য তুচ্ছ লোক নিজেকে মহাপুরুষ বলে জাহির করছেন, এই বলে অনেক ঠাট্টাতামাসা ছাপা হলো। জাতীয় প্রতিনিধিদের উপেক্ষা করে,একজন সামান্য লোকের সেবা নিতে যাচ্ছেন যে কোন দলই গঠন করতে পারে না, এই বলে অনুযোগ করা হলো উর্ধাসীন প্রভুর কাছে। টীকা-টিপ্পনীর দরজা খুলে গেল, আসলেন নানা ঢং-এর সমালোচকরা। ভাল ভাল বাগ্মী ও প্রচারকদল প্রত্যেকেই পরামর্শ দিতে লাগলেন এসময়ে কি করা উচিত, অন্যথা অবস্থার গুরুতর পরিণতি হতে পারে। শিষ্টাচার অতিক্রম করে লোকটি দেশের ভিত্তি কি নাড়া দিতে বসেন নি? এতে নীতি ও শৃঙ্খলাকে হেনস্থা করা হচ্ছে। যিনি দুঃসাহস করে সর্বোচ্চের দরবারে হাজির হয়েছেন, তিনি সংখ্যা-গুরু বা লঘু কোন দলেরই প্রতিনিধি নন। সে বস্তুতঃ নৈরাজ্যবাদী, বিপ্লবী ও দেশের শত্রু। এভাবে কলমের মুখে কালি ঝরতে লাগলো—পাঠকেরা গলাধঃকরণ করে, আবার সারা দেশে উদগারণ করে ছড়িয়ে দিতে লাগলো।

সারা দেশ জানলো। কেউ কিছু বলতে সুরু করলেই বাধা পেয়ে শেষ অবধি একই কথার অবতারণা হয়। সব থেকে আশ্চর্য্যের হলো যে মাত্র ভাবনায় এক নয়, সকলেই এক কথা, একই ভাবে ও এক সুরেই বলছে। তারপর সংঘবদ্ধ হয়ে আবেদন পত্র লেখা হলো, মন্ত্রীদের কাছে প্রতিনিধিদের পাঠান হলো। তাঁরা আবেদন গ্রহণ করলেন, এই অশিষ্ট উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তিকে দমন ও নিজেদের রক্ষাকল্পে যুদ্ধ ঘোষণা করতে রাজী হলেন। অবশ্য কাজের বদলে বক্তৃতাই চললো। মহাজনরা এর ভেতর না জুটলে এই স্তরেই থেকে যেত আন্দোলন, গলাবাজী ও কথার ধোঁয়া থেকে বেশী দূর গড়াত না। যে কোন দলে নাম-লেখা থাকুক, ফাটকা-বাজের মাথায় শুধু এক চিন্তা—কি করে টাকা আসবে। এই ব্যাপারের সুদূরপ্রসারী সম্ভাবনায় তারা সক্রিয় হয়ে নেমে পড়লো। মনের মিলন ঘটাতে বা অহেতুক বিরাগের বিলোপ করতে, তারা জানে, অর্থের সমতুল্য কিছু নেই। তাই দেশের মহাজনেরা বিশেষ এক কংগ্রেসে মিলিত হলেন। নতুন ধরণের অশিষ্টতা, সব নিয়মকে তুচ্ছ করে যাতে শাসনশক্তিকে খর্ব না করে—এর জন্য অবিলম্বে কিছু করা প্রয়োজন। সঙ্গীন সন্ধিক্ষণ উপস্থিত। জাতি শক্তিহীন, রক্তশূন্য, দেশ বিপন্ন ও জনসাধারণ ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়েছে। যে হতভাগ্য ক্ষুধার জ্বালায় জ্বলছে তার বরাতে বাকী কিছু নেই। যে সর্বহারা সে বিদ্রোহ করতে তৈয়ার। (এই ফাঁকে লেখক স্বীকার করছেন, মহাজনদের এ কথাটি সত্য, লোকেরা ক্ষুধায় দুর্বল

ও অসহায় হয়ে পড়েছে। কংগ্রেসের শেষদিন আনুষ্ঠানিক ভোজের খাদ্য ও পানীয় সম্ভার বয়ে পরিচারকেরা কাঁধ ভেঙ্গে নুয়ে পড়ছিল, এই তো সেই কথার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ।)

ভাল খানা-পিনা প্রাণারামের সেরা ব্যবস্থা। জঠর পূর্ণ হলে মন সহজেই সখ্যরসে ভরে ওঠে। সুতরাং ভোজের শেষে সকল গ্লানি অন্তর্হিত হলো, সৌজন্যে হাসিমুখে সকল মহাজনই একমত হয়ে পড়লেন। এমনকি কে নাঙ্গাশির, কে শিরটোপা—বাহিরের লক্ষণে বোঝা কঠিন হয়ে দাঁড়াল। ভূরি-ভোজ ও পানের ফলে সকলেই স্বেদাক্ত হয়ে উঠেছেন। একদল বায়ুসেবনের ইচ্ছায় মাথার আবরণ খুলে নাড়ছেন—হয়েছেন নাঙ্গাশির। অন্যদল স্বেদ মুছতে তোয়ালিয়ার ব্যবহারে শিরটোপা। আশ্চর্যান্বিত হলেন সকলেই। এতদিন একে অন্যকে বৈরী ভাবতেন কেন? সকল বিষয়েই তাঁদের মিল রয়েছে, এমনকি দেখাচ্ছেও এক। কাজেই এই জরুরী সমস্যা সমাধানের জন্য সর্বগ্রাহ্য এক উপায় আবিষ্কারে কৃতসংকল্প হলেন সবাই। উপায়টি কি? শীঘ্রই জানবে, ধৈর্য ধরতে হবে।

আপাত দৃষ্টিতে দৈব-সাধ্য অঘটন ঠেকলেও, এটি হয়ে গেল। প্রতিনিধি ও মন্ত্রীদের অনীহা দূর হলো, ফন্দীবাজ ব্যবসায়ী বিপক্ষকে ছেড়ে নিজের দলের লোককেই আক্রমণ করতে লাগলো—সেই অবধি সব দল রাজী হয়ে প্রকাশ্য জনসভায় মিলিত হলো এক স্থানে—'জাকামে' (সেথায় যারা জিব দোলায় ভাল—তাদেরই রাজত্ব)। নানা লোকে নানা ঢং-এ বক্তৃতা করলে—তবে সকলেই বললে, শেষ অবধি বৃষ্টি হলে লোকের বিপদ কি! আকাশের দুয়ার খুললে জমিতে অবশ্য ফসল হবে, তবে সব দিক থেকে দেখলে শৃঙ্খলা নষ্ট হবে এতে, কারণ সরকার তো সম্মতি দেয় নি! এক দুঃশাসন, নিজের ফিকিরে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করেছে! এই খারাপ দৃষ্টান্তের অনুসরণ করে আরও অনেক দুষ্কার্য ঘটবে, শেষ অবধি দেশের সর্বনাশ। অধিকরণ শক্তির সম্মতি না নিয়ে যার যা খুসী কর্‌ছি, এইভাবে আমরা কোথায় পৌঁছব? তা ছাড়া শ্রীভগবানের উপর ভরসা না রাখাই ভাল—না ভেবে-কখন কি-করে বসবেন তিনি! আচমকা যদি বৃষ্টি পাঠান? তাই সর্বসম্মতিক্রমে গ্রাহ্য হলো—কোনো আলোচনা না করে—অবিলম্বে কিছু করা হোক, যা প্রত্যাহার করা যাবে না। কর্তব্য নির্ণয়ের ভার নিলেন যে সভা, সেথায় শুধু বড়োদেরই প্রবেশের অধিকার রইল। বেশীক্ষণ ভাবতে হল না। প্ল্যান ঠিক করলেন নাঙ্গাশিরেরা। এঁরা কিছুতেই সন্তুষ্ট হন না। রোদ চান না,

মাথা যে গরম হয়ে উঠে, আবার খোলা মাথায় বা টাকে বৃষ্টি পড়ে সেও অসহ্য। আকাশ যেন চালাকি করে তাদের মাথা ঢাকতে বাধ্য করছে। আকাশের এ অন্যায়ের বিরুদ্ধে তারা প্রতিরক্ষার এক উপায় উদ্ভাবন করেছে। টুপী পরে না, কিন্তু সুদিন বা দুর্দিনে মাথাকে বাঁচাতে খাড়া করেছে তাঁবুর মত, ছাতা—যাকে বলা যায় আতপত্র বা বারিত্রাণ। কাজেই আকাশের খেয়াল থেকে রক্ষার ব্যাপারে, তাদের বুদ্ধির অভাব ঘটলো না। সমস্যা নতুন নয়। বৃষ্টিপাত থেকে দেশকে বাঁচাতে তারা যে, দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত—তাঁবু বা পাল টাঙ্গানর কথা ভাববে এতো বিচিত্র নয়। এভাবে বৃষ্টি এলে—অর্ধপথে আটকা পড়বে, কিছুতেই মাটিতে পৌঁছবে না। মাঠ চষা বন্ধ থাক্‌বে, শৃঙ্খলাও বজায় থাকবে, এইভাবে অধিকারের ভিত্তি টলবে না। শাসনশক্তি দুর্বল করার প্রয়াস নিষ্ফল হবে। বিদ্রোহ ও দুষ্কৃতকারীকে অঙ্কুরেই বিনাশ করবে। নাঙ্গাশিররা এই প্রস্তাব করলেন। শিরটোপারা সন্তুষ্ট হলেন—কারণ আচ্ছাদন করাই-এর মূলকথা। ওটি তাদের দলে আবশ্যিক বলে বিবেচিত হয়—কাজেই তাঁরা সোৎসাহে মানলেন। তৎক্ষণাৎ কয়েকটি কার্য নিয়ামক সমিতি নির্বাচন করা হলো। প্রথমটি দেশের দৈর্ঘ্য প্রস্থ জরীপ করবে—দ্বিতীয়, তন্তুবায়েদের উপর পাল তৈরীর ভার দেবে। তৃতীয়টি কারিগর খুঁজবে, যারা পাল চাপাবার দণ্ডকাষ্ঠ তৈরী করবে কিংবা যারা সেগুলি ভূমিতে প্রোথিত করবে। সব কাজ তদারকের ভার পড়লো আর এক কমিটির উপর। শেষ সাধারণ কমিটির 'ক' ও 'খ' চিহ্নিত দুটি—এদের নির্দিষ্ট কোন কাজ নেই।

এই সব কমিটির নিয়োগ শেষ হলে—সব কমিটি নিয়ে পালের উপযুক্ত নামকরণে এক কমিশন বসাতে হলো। নাম হচ্ছে কর্মের প্রতীক যার ব্যবহার করে প্রচুর অর্থ-সংগ্রহ করতে হবে। পাল ও দণ্ডকাষ্ঠ নির্মাণ ও উত্তোলনে বহু ব্যয় হবেই—তাছাড়া অতগুলি কমিশন চালাবার খরচ তো আছেই। তাই নামের কমিশন বসল। বহু আলোচনার পর এঁরা ভাষা-পরিষদের হস্তে অর্পণ কর্‌লেন সমুদয় ক্ষমতা। নানা ভাষা অধ্যয়ন ও আলোচনাই এই পরিষদের একমাত্র উদ্দেশ্য। কাজেই এর থেকে বেশী সমীচীন কোন সিদ্ধান্ত ভাবা যায় না। বিখ্যাত এই সভার সভ্যেরা অন্ততঃ দশটি ভাষা বলতে পারেন ও বহু হাজার কথা তাঁদের জানা। তাঁদের মধ্যে কতকজনে আবার মাতৃভাষাও জানেন বলে প্রসিদ্ধি আছে। বড় বড় ভাড়া করা বাড়ীতে এই সব নানা কমিশন বসছে। তাঁরাও

নিযুক্ত করলেন কেরানী, সেক্রেটারী, পিয়ন, সিপাহী প্রভৃতি। ভাষা পরিষদ এক বিশেষ অধিবেশনে নাম সন্ধানে ব্যাপৃত হলেন। সেখানে অনেক প্রস্তাব উঠলো, যেমন বৃষ্টি আটকাবে বলে বারি-সম্বর, শৃঙ্খলা বাঁচাবে বলে নয়ধর—তাঁবুর মত বলে কিংতাম্বুর। বর্ষা আসলে শাসন শক্তির হ্রাস হবে বলে আপত্তি, তাই নামহল প্রতিবাদ, শেষ অবধি 'প্রতিবাদ' নামই পছন্দ হল।

এ দিকে সরকার কর্তব্যে ভুল করেন নি। সরকারী ঋণের খাতা খোলা হলো, সংগ্রহের জন্য প্রচারক ইত্যাদি নিযুক্ত হল। হিসাব রাখলেন খাজাঞ্চি প্রভৃতি। গ্রামে গ্রামে সভা সমিতিতে বক্তৃতার আয়োজন হলো! লোক জড় হলো। বক্তারা সব সময় বিশৃঙ্খলাও নৈরাজ্যের নিন্দায় শুরু করেন—শেষ করেন উদ্দীপক স্লোগানে।

প্রতিবাদের পক্ষে আমরা—সকলে মিলে যাও বিপন্না দেশমাতাকে বাঁচাতে হবেই।

প্রাণে প্রাণে উদ্দীপনার বিজলী খেললো। উদার হস্ত প্রসারিত হলো, টাকার থলির বাঁধন টুটলো, কৃষকে বের কর্‌ল গহ্বর থেকে লুকানো শস্যের কণা। ঐক্য ও শান্তির প্রচারে বের হলেন প্রতিনিধিরা, তাঁদের সম্মানে ভোজের আয়োজন! পান-ভোজন, সর্বত্র আনন্দ! এই আনন্দের হাওয়ায় মত্ত হয়ে সদ্য বিবাহিতেরা তাদের প্রাপ্ত পণ ও উপঢৌকনসম্ভার দেশকে দিতে এলো! বৃদ্ধেরা তাদের অন্তিমের বাস ও সজ্জা আচ্ছাদন নিয়ে এল প্রতিবাদের জন্য উৎসর্গ করতে। যাদের সাহস হয়—কিছু দেব না বলে—তাদের নির্যাতনের বিভিষীকা—অগত্যা তারাও বিত্ত-উৎসৃজনে বাধ্য হলো! ভিক্ষা, দান ও ঋণের অর্থ একত্রিত হলো। কাজ আরম্ভ করলে তন্তুবায় ও সূত্রধর, কেউ খাট্‌ছে পালে, কেউ বা তাকে উপরে খাটাবার খাম্বা-তৈরীর কাজে লেগেছে। দল বা গোষ্ঠীসূচক নানা বর্ণের ব্যবহার হলো—কালো, নীল বা লাল। শেষে পাল তৈরী হলো। খাম্বা সব পোঁতা হলো! দেশের একদিক থেকে অপর দিক পর্যন্ত পালে ঢাকা পড়েছে। লোকে নিরীক্ষণ করলে—উৎসাহে সোচ্চার হলো দশ দিক—প্রতিবাদের জয়। দুঃশীল বারিধারা রাজ্যশক্তিকে তুচ্ছ করতে চেয়েছিল—প্রতিবাদ তাকে জয় করছে। আজ আমাদের কি আনন্দ—আমাদের কি আনন্দ—দেশে শৃঙ্খলার প্রত্যাবর্তন, সকলে ঐক্য ও শান্তির পুনঃস্থাপন দেখবার অধিকারী হয়েছে।

ওদিকে সরল মনের প্রার্থনায় ফল হলো, অবশ্য শ্রীভগবানের ইচ্ছাই বেশী

কার্যকরী! তিনি তাঁর রত্নাগারের অর্গল উন্মুক্ত করতে চাবিকাটি হাতে নিলেন। আকাশের কুলুপে অনেকদিন চাবি খেলেনি! মরচের ঝঙ্কৃতি সর্বত্র। দেব-লোকের দরজায় চাবি ঘোরাবার ভীষণ কর্কশ আওয়াজ শোনা গেল! দুর্যোগের বজ্র-নির্ঘোষ। ধাতুময় ঝঙ্কার সর্বত্র ছড়ালো, আকাশের সবদিক মেঘে ঢাকলো—অন্ধকার! বাজ কড়কড়িয়ে হাঁক্‌ছে, বড় বড় ফোঁটা পড়তে সুরু করলে!

বর্ষার বন্যায় পাল শতছিন্ন হয়ে গেল। বৃষ্টি মাটিতে নেমে পড়লো—জমি উর্বর করলে, দলবাজদের 'প্রতিবাদ' ভেসে গেল—সাময়িক ক্ষতি হলো খুব! অবশ্য ফলের কথা গৌণ—ভাবনাই আসল, যেটি সব কাজ চালিয়েছে। বৃষ্টি পড়ে ফোঁটা গড়িয়ে মানুষকে ক্লেদাক্ত করলে, পালের নানা রং মিশে একাকার হলো। লাল-কালোয় তফাৎ রইল না—আদিতে কি ছিল তাও ঠাহর করা শক্ত দাঁড়াল! (লেখক দেখিয়েছেন) সব মন্দের মধ্যে কিছু ভাল থাকবেই, আবার এর উল্টোতেও সত্যি কথা। এই পৃথিবীতে ভালোয় মন্দে সর্বত্র মিশিয়ে আছে—একটিকে বাদ দিয়ে শুধু অন্যটিকে কোথাও দেখা যায় না। সর্বত্র আতিশয্য দূর করে ভারসাম্য রক্ষিত হচ্ছে। এবার প্রচুর বারিপাতে জমির সেচ ভাল করেই হলো—ফসল উঠলো। খাবার রুটি ও পানের জল সবাই পাচ্ছে। যখন বুভুক্ষুরা হর্ষধ্বনি করছে, ফাটকা ব্যবসায়ীরা বিষণ্ণ, ভাবছে বাজারে দাম কমছে—তাদের ভাণ্ডারে জমা খাদ্যসম্ভার এবার অকেজো হতে চললো। তবে সকলের আনন্দও একেবারে নির্ভেজাল নয়। শিরটোপাদের টুপী ভিজে তেবড়ে গিয়েছে। শিরনাঙ্গাদের কপাল মাথা ঠাণ্ডায় বিকল হলো। ভিতরের শত্রু এইভাবে দমন হলো—বাহিরের সীমানায় যে শত্রু হুমকী দিচ্ছিল—তারা রইল! সে কথা নিয়ে অন্য দিনের গল্প চলবে।

শেষের সাত দিন

[টল্‌স্টয় শেষ জীবনে পারিবারিক অশান্তি থেকে সরে যেতে চেয়েছিলেন। ছোট মেয়ে শাচা ও ডাঃ মাকোভিৎস্কি-কে সঙ্গে নিয়ে গৃহ ছেড়ে নিরুদ্দেশ যাত্রা-পথে অসুস্থ হয়ে পড়াতে রেলরাস্তার ধারে একটা ছোট স্টেশন—আস্তাপোভোতে নামতে হয়েছিল। বিবরণীতে সর্বত্র রুশ পদ্ধতিতে তারিখ দেওয়া রয়েছে—আমাদের পরিচিত তারিখ পেতে ১৩ দিন যোগ করতে হবে। প্রবন্ধ মূলতঃ 'র্‍যাঁরী ত্রইয়া'র ফরাসী জীবনী টলস্টয় থেকে অনুবাদ।]

আস্তাপোভো-তে ১লা নভেম্বরের রাত ২টা। ১৯১০ সাল। টল্‌স্টয়ের নিশ্বাসের কষ্ট হ'চ্ছে, শরীর জ্বরের উত্তাপে পুড়ে যাচ্ছে—এমন সময় চেরৎকফ—সেরগেন্‌কো-কে সঙ্গে নিয়ে টেলিগ্রাম পেয়ে রাতেই এসে হাজির। তাদের দেখে টল্‌স্টয়ের কি আনন্দ। শিষ্য গুরুর শীর্ণ—জরাজীর্ণ হাতখানি আবেগভরে চুম্বন করলেন। দু'জনেই কাঁদলেন—দু'জনকে দেখে। নিজেকে সামলে নিয়ে পরে টলস্টয় জিজ্ঞাসা করলেন—মনিয়া, ছেলেমেয়ে ও বন্ধুদের খবর। চেরৎকফ-ও তাঁকে পড়ে শুনালেন সব কাগজ—তিনি কিভাবে টল্‌স্টয়ের গৃহত্যাগের কারণ ছাপিয়েছেন। অনবদ্য হয়েছে মৃদুস্বরে বললেন—টল্‌স্টয় সবটা শুনে।

২রা বেলা ১১টায় জ্বর উঠলো ৩৯·৬ সেণ্টিগ্রেড। হৃদয় দুর্বল হয়ে পড়েছে দেখে ডাঃ মাকো-ভিৎস্কি তাঁকে শাম্পেন খাওয়ালেন। ঘরে যারা ঢুকছে সকলের পায়ে রাতের চটি—যেন চলতে না আওয়াজ হয়। বিকেলের দিকে ষ্টেশন-মাষ্টার আমোলীন খুব বিচলিত হয়ে দৌড়ে এসে শাচা (মেয়ে)-কে নিভৃতে জানালেন শ্চেকিনো থেকে তাঁর সহকর্মী তারে জানিয়েছে কাউণ্টেস ও পরিবারবর্গ 'টুলা' থেকে স্পেশাল ট্রেনে বের হয়েছেন ও আস্তাপোভোতে পৌছে যাবেন আন্দাজ রাত ৯টায়। মুহূর্ত্তের জন্য বিচলিত হ'য়ে সকলে পরামর্শ করতে একত্র হলেন—স্থির করে ফেললেন—সকলের ধারণা শরীরের এই অবস্থায় টল্‌স্টয় ও তার স্ত্রীর সাক্ষাতের ফল খুব খারাপ হবে। ডাঃ মাকোভিৎস্কি চিকিৎসক—অতএব তাঁর এটি অধিকার তিনিই কাউণ্টেস ও পুত্র কন্যাদের রোগীর এই অবস্থায় দেখা করতে বারণ করবেন রোগীর সঙ্গে।

'মা'-কে ঠেকিয়ে রাখতে কন্যাই বেশী ব্যস্ত। অন্য সকলে যাই বলুক মাকে এখানে আসতে দেওয়া হবে না। অবশ্য বাবা যদি না চান। স্যর্জ (ভাই) ও ডাঃ নিকিতিন-কে খবর দেওয়া এখন ভাবছেন ঠিক হয় নি। যা হোক তা হোক ভেবে ভাইকে আবার সংশোধনী তার পাঠালেন—'এখনই ভয় নেই—অবস্থার পরিবর্তন হয়—আবার জানাব।" তবে এটা বড় দেরীতেই হ'লো ; স্যর্জ সেই দিন সন্ধ্যা ৮-টায় আস্তাপোভোতে নামলেন। তাঁর ইচ্ছা তখনই বাপের কাছে যান—তবে স্বীকার করলেন—ছেলে যে তার পলায়নের স্থান জেনেছে শুনে বাবা হয়ত খুবই চটে যেতে পারেন। শেষকালে কপাল ঠুকে, দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকলেন। প্রায় রিক্ত ঘর—পেট্রল-ল্যাম্প জ্বলছে—এককোণে লোহার খাটে শুয়ে বাপ শীর্ণকায় বিবর্ণ রক্তহীন—মুখে সাদা দাড়ি। রোগী চোখ বুজে নাসিকা কুঞ্চিত করে হাঁপাচ্ছেন। ডাঃ মাকোভিৎস্কি কানে কানে বললেন—স্যর্জ এসেছে। এতে টল্‌স্টয় চোখ খুলেছেন—দৃষ্টিতে আর্ত বন্যজন্তুর মত ভয়ের প্রকাশ। ছেলে হাতে চুম্বন করতে—জিজ্ঞাসা করলেন—"কি করে জানলি—আমি এখানে—কি করে এলি ?"

"ছেলে বললে গের-বাৎ-চেভো-তে হঠাৎ তোমার সঙ্গে গাড়ীর যে কণ্ডাকটর এসেছিল—তার সঙ্গে দেখা। সেই বললে তুমি এইখানে নেমেছো।'

এটি মিথ্যা কথা তবে রোগী আশ্বস্ত হলেন—নিজের পরিবারের কথা জিজ্ঞাসা করলেন। স্যর্জ বললে সে 'মস্কো থেকে আসছে—মা' এখনো ইয়াস্‌নয়া পলিয়ানাতেই, একজন নার্স ও ডাক্তার তাঁর দেখাশুনা করছে, মনে হয় তিনি বেশী বিচলিত না হয়েই সব নিয়েছেন। ছেলে চলে যাবার পর কন্যা শাচাকে বললেন টল্‌স্টয়—"ওকে দেখে, আমার খুব আনন্দ হল, ও আমার হাত চুম্বন করলে—" তারপর ডুকরে কেঁদে উঠলেন।

দুপুর রাতের একটু আগে—পরিবারের অন্য সবাইকে নিয়ে স্পেশাল ট্রেন থামলো। প্লাটফর্মে ছুটলেন ডাঃ মাকোভিৎস্কি কাউন্টেসকে মানা করতে। ব্যস্ত বিচলিত হয়ে জানালার কাচে কপাল ঠেকিয়ে শাচা দেখছেন পুরু কুয়াশার মধ্যে আলো আবছায়া ফেলেছে। মা চলেছেন—এক ছেলের হাতের উপর ভর দিয়ে—একটু ঝুঁকে পড়েছেন। অনেকক্ষণ ছায়াগুলি ইতঃস্তত চলেছে, পরে দলের সব একত্র বের হয়ে রাতের অন্ধকারে মিশে গেল। ডাক্তার আনন্দোজ্জ্বল মুখে ফিরে টল্‌স্টয়ীয় সকলকে আশ্বস্ত করলেন—চেরৎকভ, শাচা শেরগেন্‌কো

বারবারা, ফিয়োক্‌তোভা ও অন্যান্য সকলকে। গুরুর জীবন ও চিন্তার প্রতি সকলেই রক্ষণশীল—পরিবারের সকলে সবদিক ভেবে ঠিক করেছেন কাউণ্টেসকে স্বামীর কাছে আসতে দিলে বিপদ হতে পারে। এই কঠোর আদেশ 'শনিয়া' নিজে থেকেই মেনে নিলেন। স্পেশ্যাল ট্রেন স্টেশনের এক সাইডিং লাইনে দাঁড়িয়ে রইল—যাঁরা এসেছেন—সকলেই তার মধ্যেই রইলেন—অন্য কোথাও থাকবার যায়গার অভাব। যতদিন দরকার, পড়ে থাকবেন, তবে রোগীর সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা করবেন না।

৩রা নভেম্বর মস্কো থেকে এসেছেন ডাঃ নিকিতিন, টল্‌স্টয়কে পরীক্ষা করলেন—ফুসফুসের প্রদাহ—নাড়ী খুব দুর্বল তবে জ্বর নেমেছে ৩৭°—ডিগ্রী-এর কম। একেবারে নিরাশ হবার কারণ নয়। হঠাৎ সঞ্জীবিত হয়ে, বৃদ্ধ ডাক্তারের সঙ্গে মস্করা করছেন—নিজের জীবনকথা বলছেন ডাক্তারকে—আর যত শীঘ্র হয় তাঁকে ফের উঠে যাত্রা করতে দিতে, সনির্বন্ধ অনুরোধ করেছেন। এবার যে ২।৩ সপ্তাহ বিছানায় শুয়ে থাকতে হবে—শুনে কপাল কুঁচকাচ্ছেন। মাঝে মাঝে টল্‌স্টয়ের ছেলেরা ঘুরে বেড়াচ্ছেন—এসে বাড়ীর চারিদিকে। সর্বহারা পারিয়াদের মত তাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ। তারা জানলায় টোকা মারছেন। খড়খড়ি তুলে মৃদুস্বরে—শাচা অবস্থার সব খবর দিচ্ছে। তারা সে কথা মার কাছে পৌঁছে দিচ্ছে। সাইডিং-এ নীল রংএর প্রথম শ্রেণীর কামরায় তিনি শোকসন্তপ্ত হয়ে বসে। এখনো কি স্বামীর কাছে তার যাওয়া একেবারে বারণ! এদিকে কিন্তু কত অনাত্মীয়দের সারি চলেছে দেখতে। চেরৎকভ, গোল্ডেনস্টাইন, গোরবুলফ। শেষের দু'জন পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গেই টলস্টয় দেখা করতে চেয়েছেন। পিয়ানো বাদক গোল্ডস্টাইন বাজনা ছেড়ে তাঁর শয্যার কাছে এসেছে—এতে তাকে বকুনি দিচ্ছেন টলস্টয়।

"কৃষক (মুজিক) চাষ করছে তখন তার বাপ মরছে বলে তো ক্ষেতের কাজ ফেলে রাখে না। ঐকতান বাদন তো তোমার ক্ষেতের সামিল, সেইখানেই তোমার খাটতে হয়।" তারপর "mediator"-এর সম্পাদক গোরবুলফকে ডেকে বললেন "আমরা যে শুধু কাজের সূত্রেই বাঁধা তা নয়, প্রীতির বন্ধনেও বটে।" —"যা কিছু আমরা দুজনে করতে পেরেছি তা সব প্রেমে অভিষিক্ত। ঈশ্বর কৃপা করুন যেন আমরা এই সাধু অভিযান বরাবর চালিয়ে যেতে পারি"।—"হ্যাঁ, তোমাকে করতেই হয়—আমার কিন্তু এই শেষ"। ফিস্‌ফিস করে বললেন টলস্টয়। যে সব

পুস্তিকা ক্রমে প্রকাশ হবে, তার বিষয়ে কথা হ'লো—তাঁর বই "জীবনের পথ"—এর শেষাংশের বিষয় বেশী করে আলোচনা—কিন্তু স্বর ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসছে। তিনি বিশ্রাম করুন এই ভেবে গোরবুলফ চলে এলেন, কিন্তু শান্ত হবার পরিবর্তে শাচাকে ডাকের ওপর ডাক, তা ছাড়া বারবারা, চেরৎকফ ও ডাঃ নিকিতিনকেও। তাঁর মনে হচ্ছে "শনিয়া" বুঝি কাচের দরজার পেছনে লুকিয়ে। "কাচের পেছনে দেখছি দুটো মেয়ের মুখ আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে যে।" তাঁকে শান্ত করার জন্য কম্বল দিয়ে কাচ ঢেকে দেওয়া হলো। তারপর অসুস্থ মনের সক্রিয়তা তাঁকে পেয়ে বসলো। কাগজ সব পড়া—শুনলেন আরও যত প্রেরিত চিঠি-পত্র। প্রত্যেক লেখককে কি উত্তর দিতে হবে বলে চলেছেন। প্রকাশক রয়ামের মভ-কে ইংরাজীতে লিখতে হবে—একটা চিঠি বলে গেলেন চেরৎকফকে, তারপর পুত্রের কাছে এক টেলিগ্রাম—(সে যে ইতিমধ্যেই আস্তাপোভোতে পৌঁছে গিয়েছে তা—তিনি জানেন না।) "আমার অবস্থা আগের থেকে ভাল—তবে হৃদয় এত দুর্বল—যে তোমার মার সঙ্গে দেখা—আমার পক্ষে বিপজ্জনক হবে" বলছেন চেরৎকফকে—বুঝেছ, আমাকে সে দেখতে চাইলে তাকে ফেরাতে পারবো না—তবে সেই দেখাই হবে আমার পক্ষে সাংঘাতিক।" এই পরিষ্কার কথা শুনে 'শাচা' খুসী মনে মাকে সেই বার্তা পৌঁছে দিতে গিয়েছে। দেখলে তিনি বিশ্বের সকলের উপর বিরক্ত—নিজের মনে—এদিকে অনুতাপের লেশমাত্র নেই। হতভাগিনী বলছেন—"সে কি জানে আমি জলে ঝাঁপ দিয়েছিলাম" "হ্যাঁ—জানেন"—তারপর ? বল্‌লেন তুমি আত্মহত্যা করেছ জানলে খুবই শোক পেতেন, তবে তার জন্য নিজেকে দায়ী ভাবতেন না, কারণ অন্য কিছু তাঁর করার ছিল না।"—"এর জন্য আমায় ৫০০ রুবল খরচ করে দৌড়াতে হলো।" শনিয়া চীৎকার করে স্বামীর নানা দোষ কীর্তন করতে লাগলেন—"ও, একটা অমানুষ—এবার যদি সেরে উঠে তো—আমি তাকে কোথাও যেতে দেব না।" সেদিন রোগীর মাথার তলায় দিকে কারুকার্য করা ছোট বালিশ একটি, ডাক্তারের হাতে দিয়েছে 'শনিয়া', এ বালিশ স্বামীর খুবই প্রিয়—তাই বিশেষ করে ইয়াসনয়া পলিয়ানা থেকে আনা হয়েছে। এর মধ্যে কোন মতলব আছে—এ না ভেবেই ডাক্তার নির্দেশ মত বালিশ রাখলেন। টলস্টয় দেখেই চিনেছেন—জানতে চাইলেন—এটি—কি করে এলো। ডাক্তার অপ্রস্তুত হয়ে বলে ফেললেন বড় মেয়ে তানিয়া এটি তার কাছে পৌঁছে দিতে বলেছে। বড় মেয়ে এসেছে শুনে বৃদ্ধ খুব আনন্দিত হয়ে বিছানার কাছে ডেকে

পাঠালেন। যেই আসা জিজ্ঞাসা করলেন 'শনিয়া'র বিষয়। যতদূর সম্ভব সহজভাবে বলতে চেষ্টা করলে যে, মা ইয়াসনয়াতেই রয়ে গেছেন। বৃদ্ধ আরও প্রশ্ন করে চলেছেন—'সেখানে কি করছে—কেমন আছে—খাচ্ছে তো—এখানে আসবে না ?' কথা ঘুরিয়ে নেবার চেষ্টা করতে লাগল মেয়ে—অবশেষে বৃদ্ধ চীৎকার করছেন—চোখে জল। "উত্তর দে—আমার এর থেকে বেশী জানবার কী থাকতে পারে ?" তানিয়া বিব্রত হয়ে পড়লো—এড়াবার জন্য কয়েকটা কথা বলে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বের হয়ে গেল। বাহিরে স্থির দেখালেও নিজের বিবেককে শান্ত করতে পারলো না। পারিবারিক এই নাটক লোকের মধ্যে এত জানাজানি হয়েছে যে সবটা বড়ই অপ্রীতিকর হয়ে উঠেছে। নানা সাংবাদিকরা ইতিমধ্যেই এই স্টেশনে অভিযান সুরু করেছে। যে কেহ স্টেশনমাষ্টারের লালবাড়ী থেকে বের হয়—তাকেই ছেঁকে ধরে টাট্‌কা খবরের জন্য। 'শনিয়া'-র কোন কাজ নেই। তাদের সঙ্গে অবাধে কথা বলছেন—যেন খুব নিগৃহীতা তিনি—নিজের পক্ষের কথাগুলি সব বিশদ করে বলে যান। 'পাথে'-কোম্পানী তার সিনেমা গ্রাহক মায়ারকে তার করেছেন "স্টেশনের ছবি তোল—সেখানকার পরিবেশ—নাম—পরিবারের ও অন্যজনের যাদের সকলে জানে—এদের সব ছবি—তা ছাড়া যে গাড়ীতে তারা রাত্রিবাস করে—তার ছবিও দরকার। সব তুলে 'টুলা'য় পাঠাও যেন আমাদের কাছে পাঠিয়ে দেয়।" এদিকে বিশেষ অনুমতি ভিন্ন রেল-ওয়ে বা স্টেশনের ছবি তোলা যায় না রুশিয়ায়, কাগজওয়ালারা প্রতিবাদ সুরু করলে—"আমাদের ন্যায্য কাজে বাধা পড়ছে।" পুলিশকর্তা মস্কোয় জানালেন, শেষে তার করে অনুমতি এলো। ছোট স্টেশনটি ক্যামেরার ঝট্-ঝটানিতে মুখরিত হয়ে উঠলো। বাধামুক্ত ফটোগ্রাফাররা যা কিছু সবেরই ছবি তুলছে—স্টেশন প্ল্যাটফর্ম রেলিং সংলগ্ন ছোট ফুলের বাগান—বাদলা দিনে কাদা ও বরফে ঢাকা বাহিরের মাঠ ঘাট। লাল বাড়ীর দরজার সেরগেইন্‌কো প্রহরী—চেরৎকফের বা শাচার দ্বারা বাছাই দুই একটি লোকছাড়া কাউকে ভেতরে ঢুকতে দিচ্ছে না। মুহুর্মুহু টেলিফোনের ঘণ্টা। তারের বন্যায় টেলিগ্রাফ কর্মীরা হাবুডুবু খাচ্ছে, সরকারী সদরে সাহায্যকারী চাইছে। ৩রা নভেম্বর বিকাল—ডাক্তারেরা প্রথম স্বাস্থ্যের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করলেন। বাম ফুস্‌ফুসের নিম্নদেশের প্রদাহ। ছড়িয়ে পড়ছে। রুশ দেশের স্বরাষ্ট্রসচিব ভয় পেলেন, গণ্ডগোল হবে কি ? সাঙ্কেতিক তারে স্থানীয় কর্তাদের সতর্ক করলেন 'উপযুক্ত ব্যবস্থা নাও—কাছাকাছি পুলিশের

ঘোড়সওয়ার-বাহিনী রেখো'। আস্তোপোভাতে সশস্ত্র পুলিশের একটি দলও মোতায়েন রইল। চারিদিকে এত যে গণ্ডগোল টল্‌স্টয়ের সে হুঁস নেই। তিনি তাঁর কালো বাঁধান ডায়েরী চেয়ে এনে ১২৯ পাতায় রুলটানা কাগজের উপর কাঁপা হাতে পেন্সিলে কয়েক ছত্র লিখেছেন ; খুব কষ্ট করলে এখন পড়া যায়। "৩রা নভেম্বর—কষ্টের রাত—২ দিন জ্বরে শুয়ে। চেরৎকভ এসেছে ২রা, লোকে বলছে সোফিয়া আঁদ্রেয়িভনা—৩ তারিখে—তানিয়া—রাতে সঙ্গে এসেছে—আমাকে খুব বিচলিত করেছে—আজকে নিকিতিন—তানিয়া—গোল্ডভাইসর—আইভান আইভানভিচ !! আমার প্ল্যান এই—করবো যা—যা সব আমাদের ও সকলের ভাল হবে"।

সন্ধ্যায় হিক্কায় বড় কষ্ট হতে লাগলো। ডাক্তারে পথ্য ঠিক করেছে—সোডা ওয়াটার ও চিনি মেশান দুধ। তাঁর 'গোঙানি' চলেছে—"চাষারা—তারা মরে কি ভাবে"। হঠাৎ কাঁদতে শুরু—ভুল বকছেন, দরকারী একটা কি—বলতে চান—লিখে যেন নেওয়া হয়—তবে জিব অসাড় হয়ে আসছে। মুখে বার হচ্ছে অসংলগ্ন কথা। মেয়ের উপর রাগ—সে কেন লিখে নিচ্ছে না। তাঁকে শান্ত রাখার জন্য তাঁর প্রবন্ধ থেকে বাছা লেখা উচৈঃস্বরে পড়তে লাগলো শাচা'। যখন সে শ্রান্ত হয়ে পড়লো—চেরৎকভ বই হাতে নিলে তাকে রেহাই দিলে—এইভাবে সারারাত—রোগীর শিয়রে পড়া হচ্ছে—এতেই শান্ত হয়ে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। আবার জেগে উঠে বলেন কোন কোন কথা আবার পড়া হোক, আগে সেটা ভাল বোঝেন নি।

৪ঠা নভেম্বর সকালে মৃদুস্বরে বল্‌ছেন—'মনে হচ্ছে—মরবো—সত্যি কি ?' ছটফটানি, হাঁফ লাগছে। গায়ের কম্বলের এক কোনা, নিজের আঙ্গুলে জড়াচ্ছেন। কি একটা ভাবছেন—ভুরু কুঁচকান—কথা বলতে পারেন না—কণ্ঠের গোঙ্গানি শোনা যাচ্ছে, শাচা বলছে—'আর ভেব না'—"কী, ভাববো না—ভাবতেই হবে।" পাতলা ঠোঁট খোলা, হাঁ করে ঝিমিয়ে যাচ্ছেন—সারা শরীরে ভীষণ যন্ত্রণার ছাপ—কাঁপছেন ভাঙ্গা—ছাড়া ছাড়া কথা বলেছেন—"খোঁজা, সব সময় খোঁজা"। আঙ্গুলের ডগা দিয়ে গাঢাকা চাদরের উপর তাড়াতাড়ি লেখার ভান করছেন। নিরলস এই কর্মীর জ্বরের ধমকে কি হারিয়ে গেল এবার—কোন রম্য রচনা বা কোন দার্শনিক তত্ত্ব যা এখনো লিখতে চাইছেন তিনি। সন্ধ্যার সময় বারবারা ঘরে ঢুকেছেন—বৃদ্ধের মনে হলো তাঁর মৃতকন্যা—'মাসা' বুঝি—বিছানায় উঠে বসেছেন

—অস্বাভাবিক আনন্দে চোখ উজ্জ্বল দুহাত বাড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠেছেন :**'মাসা-মাসা'** !

আবার চিৎ হয়ে পড়ে গেলেন—"বড়ই শ্রান্ত হয়েছি আর আমায় জ্বালিও না।" এদিকে স্ত্রী শনিয়া রেলগাড়ীর কামরায়—নার্স আর পুত্রের নজরবন্দী—ছটফট করছেন—চারবার তাদের ফাঁকি দিয়ে লালবাড়ীর কাছে এসে—জানলা দিয়ে স্বামীকে দেখতে চাচ্ছেন, তবে সব সময়—'তারা' সামনের পরদা টেনে দিচ্ছে। দরজা দিয়ে দৌড়ে যাবেন, শেরগেন্‌কো—বাধা দিচ্ছে—তাকে ঠেলে ফেলে যাওয়া যায় না। প্রবেশ নিষেধ। রাগ করছেন—এদের কি অধিকার। লিয়ো, হয়ত মৃত্যুমুখে—৪৮ বৎসর একসঙ্গে কাটিয়েছি—এখন এই সব অপরিচিতরা আমাকে ঠেকিয়ে রাখছে—তার কাছে যেতে দেবে না। সে যদি জানে—আমি এখানে, অনুতপ্ত আমি—আমার ভালবাসা—সে বুঝবে----সেই বলবে—ঘরের দরওয়াজা পুরো খুলে দেওয়া হোক"। চেঁচামেচি করছেন প্রহরীর সামনে 'শনিয়া', দৌড়ে এসে ছেলেমেয়েরা টেনে গাড়ীতে নিয়ে গেল। তাঁর পরনে কাল পোষাক, ফেল্টের টুপীর উপরে সাদা ওড়না—চিবুকের তলায় বাঁধা, এই বেশে সাংবাদিকদের সামনে যাওয়া আসা করছেন। পরের দিন ৫ই নভেম্বর রোগীর অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে। জরুরী ডাক পড়লো—মস্কো থেকে ডাঃ বার্কেনহাইন এলেন। সঙ্গে আনলেন, নরম বিছানা, ডিজিটালিন, ও অক্সিজেনের সিলিণ্ডার। বৃদ্ধকে পরীক্ষা করে উদ্বেগ চাপতে পারলেন না। হৃদয় যে কোন মুহূর্তে জবাব দিতে পারে। টলস্টয় কোন সেবা নিতে চাচ্ছেন না। ঝিমিয়ে রয়েছেন, ভুল বকছেন—নামে ভুল হচ্ছে,লোক চিনছেন না। মাঝে একবার বললেন "শনিয়া-র উপর অনেক ভার পড়লো।" কি বলতে চান, না বুঝে তানিয়া জিজ্ঞাসা করলে----'শনিয়া'কে কি দেখতে চাচ্ছ ?' আর কোন উত্তর নেই। অর্থশূন্য দৃষ্টি, নিশ্বাসে শাঁই শাঁই শব্দ। একটু বাদে সার্জ (ছেলে)-কে বললেন---"আমি আর ঘুমতে পারছি না। সব সময়ই রচনা করছি----লিখতে হচ্ছে----অবশ্য সবই শৃঙ্খলার সঙ্গে চলেছে।" প্রত্যেক গাড়ীর সঙ্গে সাংবাদিক, ফটোগ্রাফার----সিনেমা চালকের দল নামছে। কোথায় তাদের থাকতে দেওয়া যাবে। রেলকোম্পানী ওয়াগনে থাকতে দিতে আরম্ভ করলে। সেও ভর্তি হয়ে গেল। তখন একটা বাড়ী খুলে দিলে----সবে তৈয়ারী শেষ হয়েছে —তবে দেয়ালে চুনকাম শুকোতে আগুনের তাপ দিতে হবে। জরুরী তাগিদ যাচ্ছে একটার পর একটা। আস্তোপোভার জন্য দশ পনেরটা মজবুত টেবিল বাতি চাই। ব্যাগেজ-ভ্যানে করে অনুগ্রহ করে তোষক গদি—বালিশ পাঠান। রোগীর

চারদিকে---যতদূর সম্ভব নিস্তব্ধ রাখা হচ্ছে---রেলের চালকেরা ব্রেকের কর্কশ আওয়াজ বেশী করছে না----গাড়ীর যোগদণ্ডের ধাক্কাধাক্কি যতদূর সম্ভব মৃদু—ষ্টীম ছাড়ার হুশ্-হুশ্ শব্দও চেপে হচ্ছে। গাড়ী দাঁড়ালে সব দরজায় সারি সারি যাত্রীদের মুখ। রেলগাড়ী শব্দ না করেই থামছে----আবার নিঃশব্দে চলে যাচ্ছে। আস্তোপোভার কোলাহলশূন্য রাস্তাগুলিতে এখন পৃথিবীর নানাদেশের ভাষা শোনা যাচ্ছে। রেলের ভোজনাগারের কেউ ব্যস্ত----কেউ বা নিষ্কর্মা, নোনা-সসেজ----তার সঙ্গে ভডকা পান চলছে—আর চলছে উচ্চৈঃস্বরে মরণাপন্ন লেখককে নিয়ে আলোচনা। সকলকে জানান হচ্ছে—শ্বাস-প্রশ্বাস-নাড়ীর গতিক, শরীরের উত্তাপ, টলস্টয় স্বাস্থ্যের সব লক্ষণ, যত্ন করে লিখছেন ডায়েরীতে সারাজীবন, এবার পৃথিবীর সব কাগজেই বের হ'চ্ছে সেগুলি ধারাবাহিক ভাবে। প্রকৃতির পরিহাস—তাঁর সকল গুপ্তকথা যা শুধু নিজস্ব ডাইরীতে লেখা হ'তো, এখন সব বড় বড় খবরের কাগজে ছাপা হ'তে লাগলো। যে লোক পালিয়ে চেয়েছিল নিস্তব্ধতা, সমাজকে যে ভুলতে চেয়েছিল, তারই জীবনের সব খবর এমনি প্রচার সুরু হলো—যা কোন লেখকের ভাগ্যে কখনও হয় নি।

এই ঘটনার প্রতিধ্বনিতে সারা বিশ্বে প্রতিক্রিয়া ঘটতে পারে এই ভয়ে রুশের স্বরাষ্ট্র সচিব দ্রুত উপযুক্ত সতর্কতা নিলেন। ৪ঠা নভেম্বর থেকে প্রাদেশিক গভর্ণর ও রিয়াজানের সশস্ত্র পুলিশের অধিকর্তা চারিদিকে নজর রাখছেন। ৫ই প্রাদেশিক পুলিশের সহকারী অধিনায়ক ছদ্মবেশে বেড়িয়ে গেলেন। সর্বসাধারণে বিপ্লব ঘটাবে না কি এই থেকে? সেপাইদের মধ্যে টোটা বিতরণ হয়েছে। সাধারণের পোষাকে সাংবাদিকের সঙ্গে ঘুরছে পুলিশের চর। এ দিকে গীর্জার কর্তারাও নিষ্ক্রিয় রইলেন না। সেণ্টপিটার্স বর্গের বড় যাজক রোগীর কাছে তার পাঠালেন—তাঁর পূর্ব ব্যবহারের জন্য অনুতাপ করতে—এটি যেন শ্রীভগবানের দরবারে হাজির হবার আগেই করেন। চেরৎকভ কিন্তু এই তার টলস্টয়কে দেখাতে রাজী হলেন না। ৫ই নভেম্বর সন্ধ্যা থেকে আপ্তিমা পুস্তিনার সন্ন্যাসী আশ্রমের কর্তা এসে পৌঁচেছেন—তবে আত্মীয়স্বজন ও ভেষকেরা সকলেই রোগীর সঙ্গে দেখা করতে দিতে চাচ্ছেন না। তবু তিনি আশা ছাড়েন নি। টলস্টয়ের আত্মীয়দের উপর শ্রীভগবানের দয়া হবে—তাদের মত বদলাবে—এই আশা করে রয়ে গেলেন দু দিন। রিয়াজানের প্রধান পুরোহিত কিন্তু সকলকে বলে গেছেন—শেষ সময়ে বিধর্মীর কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অধিকার নেই। অবশ্য

যাজকদের অনেকে অনুরোধ করেছিলেন—মুমূর্ষু যেন শেষ সময়ে অনুতাপ করেন, তবে সেই সব অনুরোধ রোগীর কাছে পৌঁছাল না। ৬ই নভেম্বর পুত্রকন্যারা আরও দু জন ডাক্তার ডাকলেন—উষফ ও পুরোভস্কি—যতই ঔষধে ফল হয় না দেখা যাচ্ছে—ততই রোগীর কাছে ডাক্তারের সংখ্যা বেড়ে চলেছে—এখন দাঁড়াল ছয় জন। এত সব বিখ্যাত লোক দর্শক—বেচারী স্টেশন মাষ্টার নিজের লালবাড়ীর সবটা ছেড়ে উঠলেন সিগন্যালম্যানের কামরায়।

শরীরের উত্তাপ মাত্র ৩৭·২° কিন্তু এত নির্জীব হয়ে পড়েছেন টলস্টয়, মনে হচ্ছে বাঁচবার কোন আশা আর নেই। তানিয়া ও শাচা মাথার শিয়র থেকে আর নড়ে না। তখন তানিয়াকে বলছেন টলস্টয়—'এই দেখ, এই শেষ—আর এতো কিছুই নয়।" শাচা বিছানা ও বালিশ গুছাচ্ছে, হঠাৎ আধা বসে জোরে বললেন—"এ কথাটি মনে করো, আমার উপদেশ—এই পৃথিবীতে লিও নিকোলোভিচ ছাড়াও অনেক লোক আছে—তুমি কিন্তু শুধু এক ব্যক্তিকে নিয়েই রয়েছ।" মাথা হেলে পড়চে—এই পরিশ্রমে—নির্জীব জ্ঞানহীন হয়ে পড়লেন—নাক, হাত, নীলাভ দেখাচ্ছে, মনে হচ্ছে—সব শেষ হলো বুঝি। শনিয়া ও ছেলেরা ছোট লালবাড়ীর সামনে জমায়েত হয়েছেন ; ডাক্তারেরা অক্সিজেন দিতে লাগলো, কর্পূরের তেল ইন্‌জেকশন করলে। মা, আর তিন ভাইকে গাড়ীতে ফেরৎ পাঠান হল। মিনিট বিশেক বাদে জ্ঞান ফিরে এলো টলস্টয়ের, ছটফট করছেন গোঙাচ্ছেন। ঝুঁকে পড়ে মুখের কাছে স্যর্জ শুনলে "আঃ কি কষ্ট। এমন কোথাও যাবো যে, আমায় আর কেউ পাবে না। আমায় শান্তিতে থাকতে দাও"। হঠাৎ রুষ্ট মুজিকের মত চীৎকার করে উঠলেন…"এ ছাউনি তোলো—তুলতে হবেই।"

সন্ধ্যার দিকে বিষম হিক্কা উঠলো, মিনিটে যাট বার—প্রত্যেক ধাক্কায় সর্বাঙ্গ ঘাড় থেকে পা পর্যন্ত কেঁপে উঠছে। বিছানায় উঠে বসতে চাচ্ছেন, যেন স্বস্তিতে নিশ্বাস ফেলতে চান, কিন্তু কোন অঙ্গই আর নাড়তে পারছেন না। মরফিন ইন্‌জেকশন হলো—সে ভাব কাটলো—যেন শান্ত হলেন।

রোগীর অবস্থা নৈরাশ্যজনক শুনে শ্রমণ ভেরসনফি'র একটু আশা হলো, শাচার সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন। ভাবলেন কম বয়স, মন নরম, হয়ত সে বুঝবে। তবে ছোট একটি চিঠি লিখে জানালে 'শাচা'—"দেখা হবে না, বাবাকে এখন ছেড়ে যেতে পারবো না। আমাকে তাঁর মিনিটে মিনিটে দরকার।

আমাদের পরিবারের সকলে যা বলেছে আপনাকে, তার থেকে বেশী কিছু, আমার বলার নেই। নিজের যা মতই থাক, সব বিষয়ে পিতার ইচ্ছা ও মতানুসারেই আমরা চলবো"। এ চিঠি পেয়ে সন্ন্যাসী তখনই উত্তর দিলেন "তুমি বোধ হয় জান, তোমার পিতা, সন্ন্যাসিনী পিসিমার সঙ্গে, আমার সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলেন। বোধ হয় নিজের আত্মার শান্তির জন্য আমাদের সঙ্গে আলোচনার প্রয়োজন তিনি অনুভব করেছিলেন। বিনীতভাবে আমার এই অনুরোধ, কাউণ্টকে যেন জানান হয়, আমি এই আস্তোপোভাতেই রয়েছি। যদি ২।৩ মিনিট দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করেন তো সেই মুহূর্তেই তাঁর পাশে হাজির হবো যদি না চান তো আমি আপ্তিমা-পুস্তিনাতেই ফিরে যাই। শ্রীভগবানের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।" শাচা, আর কোন উত্তর দেবার কথা ভাবলে না। বাপ তো এদিকে মরতে বসেছেন। বৃদ্ধের শীর্ণ হাত দুটি গায়ের ঢাকা তোষকের উপর কি যেন খুঁজছে, বুকের উপর তুলে যেন কোন অদৃশ্য যবনিকা সরিয়ে দেবার চেষ্টা করছে। নতুন করে, কান, ঠোঁট, নখের উপর নীল ছাপ পড়তে লাগলো। রাত দশটায় শ্বাস রুদ্ধ প্রায় "আর নিশ্বাস নিতে পারছি না"। ডাক্তারেরা অক্সিজেন সুরু করলে আবার কর্পূরের তেলের ইন্‌জেকশন —এতে হৃদয় যেন চাঙ্গা হলো। বিড় বিড় করে বলছেন। "বোকার কাণ্ড এ সব। সেবাযত্নের আর দরকার কি।" একটু ভাল ঠেকছে ইনজেকশনে, স্যার্জকে ডেকে পাঠালেন। ছেলে যখন এলো, মুখ কুঞ্চিত করে, চোখ গোল গোল করে কি যেন বলতে চাইছেন—খুব দরকারী কিছু।

"সত্য, আমি বড় ভালবাসি—যেন তারা—"

এই তাঁর শেষ কথা। আবার নিস্তেজ হয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। যেন সব উৎকণ্ঠার অবসান হলো। ঘর অন্ধকার, শুধু শিয়রে একটি ছোট টেবিলে একটি বাতি জ্বলছে। পাশের ঘর লোকে ভর্তি। সেখানে মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস, মৃদু কথা—ক্যাঁচ ক্যাঁচ—দরজা খুলে পা টিপে ডাক্তার রোগীর কাছে বসছেন, শুনছেন নিশ্বাসের শব্দ, আবার মাথা নেড়ে বাহিরে যাচ্ছেন। রাতের শব্দহারা মিনিটগুলি কাটছে—শাচা একেবারে ক্লান্ত হয়ে পাশের একটি সোফায় এলিয়ে পড়লো। স্যার্জ আর চেরৎকভ কিন্তু অতন্দ্র প্রহরী। মাঝ রাতের পর তারা শাচাকে ডাকলে। টলস্টয়ের অবস্থা খুবই খারাপ—ছটফট করছেন—তো-তো শব্দ করছেন স্পষ্ট কোন কথা নয়। রাত দুটায় নাড়ী আরও স্তিমিত হয়ে এলো।

দ্রুত শ্বাস পড়ছে, ঘড়-ঘড় শব্দ। চিৎ হয়ে চোখ বুজে যেন কোন কষ্টকর সমস্যা নিয়ে ভাবছেন। ডাক্তারেরা পরামর্শ করে শাচাকে বললে—এবার মাকে ডাকো। এর বিরুদ্ধে কেউ কিছু বললে না। সকলে ভাবছে রোগী তার স্ত্রীকেও চিনবে না। ছেলের উপর ভর দিয়ে গাড়ী থেকে নেমে 'শনিয়া' লালবাড়ীর দিকে দৌড়ে এলেন। জানলায় ঈষৎ আলো দেখা যাচ্ছে। কামরার চৌকাটে একবার দাঁড়ালেন—ইতস্ততঃ করছেন—তাঁকে ঘৃণা করে এই সব লোক—কি করে এদের সামনে স্বামীর কাছে যাবেন। অনেকক্ষণ দূর থেকে কঙ্কালসার বৃদ্ধটির দিকে চেয়ে রইলেন—। গালে টোল, পাকা দাড়ি—সারা জীবনের প্রিয় এই—সেই। শেষে সাহস করে এগিয়ে এসে কপালে চুমু খেয়ে হাঁটু গেড়ে বসে বললেন—"ওগো, আমায় ক্ষমা করো"। কিন্তু সে তো শুনছে না কোন কথা। এদিকে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে এসেছে। আরও কত কথা বলে চলেছেন—শনিয়া, অসংলগ্ন সব কথা—কত ভালবাসা—কত ভৎর্সনা—কত প্রতিজ্ঞা—একসঙ্গে মেশ্যান। আবার যখন তিনি শান্ত হলেন—ডাক্তাররা অনুরোধ করলে—আপনি পাশের ঘরে অপেক্ষা করুন। তারপর আরও ইন্‌জেকশন। সব স্তিমিত হয়ে এলো, ডাক্তারের ডাকেও সাড়া দিচ্ছেন না। সব শেষ হলো ৭ই নভেম্বর (১৯১০) সকাল ছয়টায়।

* * *

স্যর্জ ও মাকোভিৎস্কি মৃতকে স্নান করালেন—বেশ পরিবর্তন করালেন—ধূসর রং-এর প্যাণ্ট, মোটা কাপড়ের ব্লাউজ, উলের মোজা ও চাষাদের চপ্পল—এই সব তিনি ভালবাসতেন। শত শত টেলিগ্রাম আস্তোপোভা থেকে নানাদিকে ছুটলো। অর্ডার গেল, বার্নিশ করা ওক কাঠের ছয় ফুট আন্দাজ মাপের কফিন পাঠাও, আর তার ভেতর দস্তার বাক্স। এদিকে নিজের গাড়ীতে ফিরে—শনিয়া নিজের রোজনামচায় লিখেছেন—"আস্তোপোভা ৭ই নভেম্বর, সকাল ছটায় লিও নিকো-লোভিচ্ মারা গেলেন—মাত্র তার শেষ নিশ্বাস ফেলার সময় আমাকে যেতে দিলেন কাছে—স্বামীর কাছে শেষ বিদায়ও নিতে পারলাম না—কি নির্মম সব লোক !" তারপর মৃত স্বামীর শিয়রে বসে রইলেন সারাদিন। সকাল ৮টা থেকে স্টেশন মাষ্টারের বাড়ীর সব দরজা খোলা রয়েছে সর্বসাধারণের জন্য। মৃতের সামনে হাত জোড় করে চলে গেলেন—বন্ধুরা—রেলের কর্মচারী—সাংবাদিকরা—গ্রামের লোক সব—কুলী মজুর। ঘরে কোন ক্রুশ বা দেব-দেবীর মূর্তি নেই। পেট্রলের এক বাতি থেকে মৃদু আলো লিও টলস্টয়ের শান্ত মুখের উপর পড়েছে—আর শনিয়ারও

মুখে—কান্নায় তাঁর চোখ লাল—চিবুক কাঁপছে—পোকার কামড়ে ফুলে বিকৃত দেখাচ্ছে ঠোঁট দুটি।

'টুলা'র বিশপ আগের রাতের ট্রেনে এসে আস্তোপোভায় নামলেন সকাল সাড়ে আটটায়। লিও টলস্টয় ইতিমধ্যেই মারা গিয়েছেন শুনে বিরসমনা হলেন। বেশী সময় নষ্ট না করে পরিবারের সকলকে একে একে ডেকে জানতে চাইলেন—মৃতের রকম সকম থেকে কি ভাবা যাবে যে তিনি শেষ ধর্মীয় অনুষ্ঠানের জন্য কোন ইচ্ছা করেছিলেন। সকলে বললেন—না। এমন কি আঁদ্রে বললেন "মহাশয়, আমি নিজে যথারীতি সব ধর্ম-কর্মে বিশ্বাসী ও ক্রিয়াবান বটে। আমার খুব ইচ্ছা ছিল বাবা মশায়ের সঙ্গে চার্চের শান্তির বন্ধন পুনঃস্থাপিত হয়। কিন্তু মিথ্যা কথা তো বলতে পারবো না।"

এই সঙ্গে পুলিশের স্বরাষ্ট্র সচিবের দপ্তরে সেক্রেটারীকে সাংকেতিক টেলিগ্রাম করলেন—"মহামান্য বিশপের চেষ্টা বিফল হল। পরিবারের কেহ-ই সত্য করে বলতে পারলে না যে লিও মারবার আগে চার্চের সঙ্গে শান্তি স্থাপিত করে নিজেকে সেই গোষ্ঠীতে অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছিলেন।" অন্যদিকে সন্ন্যাসী শ্রীভেরসনোফি পাছে কর্তৃপক্ষ তাঁকে দোষী করেন ভেবে রিয়াজানের শাসনকর্তাকে দিয়ে একটা সার্টিফিকেট লিখিয়ে নিলেন। "কাউন্ট টলস্টয়ের সব পরিজনের কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালেও শ্রীভেরসনোফি-র সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হয় নি। আর দু-দিন ধরে তিনি যে স্টেশনে অপেক্ষা করছেন, এও মৃতকে জানান হয় নি।" এর পরে যাজকবৃন্দ বিফল মনোরথ হয়ে ফিরলেন, আর স্থানীয় যাজক নিকোলাস গ্রাস্থিয়ানস্কি বাপুজীকে বারণ করে গেলেন—টলস্টয়ের আত্মার জন্য শেষ প্রার্থনায় তিনি যেন যোগ না দেন। সশস্ত্র পুলিশ রয়েছে—তারা দেখছে আজীবন স্বৈরাচারের বৈরীর মৃতদেহের সামনে জনমনের কি প্রতিক্রিয়া দাঁড়ায়। খবর যত ছড়াতে লাগলো, তত দর্শকের সংখ্যাও বেড়ে চললো। বন্য দেওদারের ডালপালা দিয়ে রেলের কর্মচারীরা বিছানা সাজিয়ে দিলে এবং প্রথম অর্ঘ দিলে শ্রদ্ধা কিরীট লেখা প্রেমের ঋষিকে। কাগজের ফুল সাজান দ্বিতীয় শ্রদ্ধাঞ্জলি দিলে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা—অন্তিম শয্যার তলে রেখে দিলে কবি ডেলভিকে-র নাতনী—লেখা —আমাদের বরেণ্য দাদু'কে—তাঁরই গুণমুগ্ধ কিশোর-কিশোরীরা। নিকটের গ্রাম থেকে হৈ হৈ করে কৃষকেরা এলো সঙ্গে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীর দল। এক কৃষকপত্নী বলছেন তাঁর ছেলেকে "দেখ্ মনে রাখিস ইনি আমাদের জন্যই খেটেছেন সারা-

জীবন। মেয়েরা কাঁদছে—ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করছে—ক্রুশের সংকেত করা হচ্ছে। কত অজানা এসে হাতে চুমু খাচ্ছে, যিনি সব সময় দরিদ্রের হয়ে যুঝতেন, তাঁর হাত দু-খানি এবার চিরকালের জন্য অনড় হয়ে থাকবে। মনে হল রুশদেশের সব দরিদ্রই ভাবছে—তারা সকলেই মৃতের পরিবার। দুপুরের দিকে স্বতঃস্ফূর্ত কণ্ঠে গান উঠলো—'চিরকালের স্মৃতি'। চার্চ তাঁর অন্তিম অনুষ্ঠান করতে চাইলে না। দেশের সবলোক নিজেদের মনোমত শেষ উৎসবের আয়োজন করছে। সেই ছোট্ট কামরার মধ্যে অশিক্ষিত কণ্ঠে ধ্বনিত হলো—এই স্তব। তাঁরই ভৃত্য, লিও-র আত্মাকে শ্রীভগবানের কাছে নিবেদন করলে।

এদিকে ধর্ম-মহামণ্ডলের আদেশ মানতেই হবে—এই ভার পড়েছে সিপাহীদের উপর। তারা এই ভাবের শ্রদ্ধা প্রকাশ পছন্দ করলো না। কোমরে তরবারী—তারা দৌড়ে এসে বলল—"ঢের হয়েছে—গান-গাওয়া—বন্ধ করো।"

সকলে থামলো—তবে আবার একটু বাদে ভীত ক্ষীণ কণ্ঠে সুরু হলো ভজন—চলল—শেষে আবার সিপাহীরা বারণ করলে। সব দিক থেকে হিসাব করে কর্তারা বেশী অসুখী বোধ করলেন না। বিকাল একটায় কাপ্তেন সংকেতে উপর-ওয়ালাকে জানালেন—"রিয়াজানের গভর্ণরের নির্দেশ ও অনুমতিক্রমে এখানে শ্রদ্ধা-ঞ্জলি দিতে দেওয়া হয়েছে, তবে কোন বিরুদ্ধ, অমান্যকারী লেখা নিশান নেই—যার থেকে কোন জন-উত্থান ঘটতে পারে। কোন নিন্দনীয় প্রকাশ এর থেকে হতে পারে—এমন কোন ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে না। অফিসারের সংখ্যাও বাড়ান হচ্ছে। বাহিরে শান্তি সংরক্ষিত। সব সতর্কতা আরও জোরদার করা হচ্ছে। যত শীঘ্র সম্ভব মৃতদেহ সরিয়ে দেবার ব্যবস্থা হবে—যাতে কৌতূহলের বশে কোন বড় সোরগোল না ওঠে এখানে।"

এক ডাক্তারী পড়া ছাত্র মৃতের শিরায় ফরমোল ঢুকিয়ে দিলে। মারকুরফ তুললে মৃতের মুখের ছাপ। চিত্রকর পাস্তেরনাক ছেলে বরিশকে নিয়ে মস্কো থেকে হাজির হলেন—শেষ শয্যার কাছে আঁকবার ইজেল খাড়া করলেন। তবে জনতা সবসময় তাঁকে বিব্রত করতে লাগলো—সেই অবস্থায় আঁকা অসম্ভব। তাড়াতাড়ি একটা স্কেচ করে নিলেন। দেয়ালে টলস্টয়ের যে ছায়া পড়েছে তার চারিপাশ বেষ্টনী দিয়ে পেন্সিলে আঁকলে রেলের এক খালাসী। সাংবাদিক, ফটোগ্রাফার—সবদিক থেকে ছবি তুললে—তারপরে তাঁকে কফিনে শোয়ান হলো।

সারাদিন সারারাত কল থামছে না—সারা পৃথিবী টলস্টয়ের পরিবারের কাছে টেলিগ্রামে সমবেদনা জানাচ্ছে। ২৪ ঘণ্টায় তারবাবু কাহিল হয়ে পড়লেন। ষাট হাজার মেসেজ—কল থেকে তুলতে হয়েছে।

৮ই নভেম্বর, চার ছেলে নিরাভরণ সাদাসিদে—নিষ্প্রভ হলদে রং-এর কফিন ঘাড়ে করে মালগাড়ীতে তুললে। কাল কাপড়ে ঢাকা বেদীর উপর রাখা হল। ছবি তুলতে ধস্তাধস্তি-সিনেমার ছবিওয়ালারা পাগলের মত হাণ্ডেল ঘুরিয়ে চলেছে।

খড় ও পাইনের পাতা ডাল দিয়ে মালগাড়ী সাজান হয়েছে। শনিয়া ও পরিজনেরা যে প্রথম শ্রেণীর কামরায় এসেছিলেন, উঠলেন তাতে—তারই পেছনে জোড়া হলো এই মালগাড়ী। আর এক কামরায় উঠলেন জন পঁচিশ প্রেস-সাংবাদিকরা—এই নিয়ে স্পেশাল রওয়ানা হল ১।১৫ মিনিট, আস্তোপোভা থেকে কোমলভ জাসেকার দিকে রওয়ান হ'লো। তাঁকে কোথায় কবর দেওয়া হবে তার নির্দেশ রেখে গিয়েছেন টলস্টয়। ইয়াস্‌নৃয়া-পলিয়ানার জাকাসের বনে এক র‍্যাভিনের কাছে যেখানে ছেলেবেলায় তাঁর ভাই নিকোলাস বলতো—বিশ্ব প্রেমের ফরমূলা—একটা ছোট সবুজ কোঁদাও মাটিতে পোতা আছে।"

শেষ মুহূর্তে মানা করে দিলেন স্বরাষ্ট্রসচিব—ইয়াসনয়ায় কোন স্পেশাল ট্রেন যাবে না। ধর্ম মহামণ্ডলের আপত্তি—এই ধর্মত্যাগীর স্মরণে কোন অনুষ্ঠান যেন না করা হয়। পুলিশের প্রতি কড়া হুকুম হলো ব্যবসায়ীদের উপর কড়া নজর রাখতে—বিদ্রোহ সূচক লেখা নিয়ে কোন শ্রদ্ধা কিরীট তারা যেন বিক্রী না করে। বড় বড় সহরে সৈন্যদের সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। কাগজের উপর রাতারাতি নজরবন্দী চাপান হলো। এদিকে সারা রুশিয়ার লোকে শোকে মুহ্যমান—অশৌচ পালন করছে। সব কাগজের প্রথম পাতায় লেখকের ছবি ছাপা হলো। কাল বর্ডারে ঘেরা। কয়েকটা থিয়েটারও বন্ধ রইল—সেণ্ট পিটার্সবর্গের বিশ্ববিদ্যালয়ে সব পড়া বন্ধ—মহামান্য জার স্বয়ং ডুমা সাম্রাজ্যের সংসদ পরিবারের কাছে জানালে তার করে। এদিকে কোথাও ষ্ট্রাইক হলো ছেলেদের ডিমনস্ট্রেশন বন্ধ করতে সৈন্য ডাকতে হলো। আর যে ছোট বৃদ্ধকে নিয়ে এতো তুমুল কাণ্ড—সে একটি তুচ্ছ কফিনে বন্ধ—পেরেক ঠোকা—চলেছে—এক মালগাড়ীতে।

৯ই নভেম্বর ভোর ছটায় গাড়ী ষ্টেশন জাসেকায় পৌঁছাল—প্লাটফর্মে—ষ্টেশনে চারিদিকে প্রচুর ভীড়। ইয়াসনয়ার কৃষকরা, টুলার চারিদিকের গরীব মুজিকরা—

মস্কোর কাছ থেকে ছাত্ররা—নানা সংস্থার প্রেরিত দল—নিকট বন্ধু অজানা শিষ্যরা—সকলে দাঁড়িয়েছে—গাড়ীর দরজা খোলা হতে সকলে টুপী খুললে—ও "চিরতরের স্মৃতি" গাওয়া সুরু হল। চারি পুত্রে বাবার কাঠের কফিন কাঁধে করে নামালে।

* * * *

বড় রাস্তা দিয়ে জনস্রোত চলেছে—এই পথ দ্রুতগতিতে কতবার না অতিক্রম করেছেন—টলস্টয়—। চারিদিকে অন্ধকার, বরফের মত ঠাণ্ডা বাতাস বইছে—রাস্তায় মাটির উপর বরফের স্তূপ জমা।

ব্যূহ মুখে দুই কৃষক পাতাকা হাতে চলেছে—"আমাদের প্রিয় লিও নিকোলোভিচ্ তোমার স্মৃতি আমাদের মন থেকে কখনও মুছে যাবে না—ইতি অনাথ ইয়াসনয়ার কৃষকরা"। তারপরে কফিন আসছে—তারপরে ঘোড়ার গাড়ীতে শ্রদ্ধাঞ্জলির বোঝা। —তার পর শোকাচ্ছন্ন তিন চার হাজার লোকের জনতা—তার পরে সাদা পোষাক পরা পুলিশের দল। শোভাযাত্রা দুই তোরণের মধ্য দিয়ে ফটক পার হয়ে বাড়ীতে ঢুকলো। বাহিরে বাগানে—সশস্ত্র সেপাহীদল পায়চারী করছে। বাড়ীর কাছে ফটোগ্রাফোরের সংখ্যা বেড়ে গেল।

* * *

স্যর্জের নির্দেশে, যে ঘরে কাজ করতেন টলস্টয়—দুই দরজার মাঝে একটা টেবিলে—নামান হলো কফিন—এক দরজা দিয়ে ঢাকা দালান হয়ে লোক ঘরে আসতে পারে, অন্যটি দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া যায় বাহিরের বারান্দায়। কফিনের ঢাকা খোলা হলো—এবার শব সকলে দেখতে পাচ্ছেন। আত্মীয়রা কিছুক্ষণ চারিদিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রইলেন। ১১টা থেকে এক পাশ থেকে লোকের শেষ বিদায়যাত্রা সুরু হল প্রায় পৌনে তিনটা পর্যন্ত। মধ্যে মধ্যে কেউ চেঁচিয়ে উঠছে,—এগিয়ে চলুন মশায়রা দাঁড়াবেন না। এত লোকের ভার—কাঠের মেঝে মচ্ কে শব্দ করছে—বুঝিবা ভেঙ্গে পড়ে। দর্শকদের কালো পোষাকের তুলনায়—মৃতের মুখ আরও ফেকাশে দেখাচ্ছে। চারিদিকে রিক্তপ্রায় সাদা দেয়াল—তার মাঝে বার্নিশ করা কাঠের বাক্সে শয়ান রয়েছেন তিনি—দর্শকেরা কেউ ঝুঁকে দেখছে, মাঝে মাঝে শবের মাথা একটু নড়ছে—এদিক ওদিক। দুদিনে যেন আরও শীর্ণ হয়ে গেছেন—নাক যেন আরও লম্বা, চামড়া যেন পাতলা স্বচ্ছ হয়ে পড়েছে। বহু বৎসর অক্লান্ত কর্মের অবসানে হাত দুটি আজ বুকের উপরে। মনে হচ্ছে যেন

মোমে তৈয়ারী—মধ্যে মধ্যে কুয়াশা জমে সিল্কের মত চিক্‌চিক করছে কপাল ও চিবুক—আবার হঠাৎ আবহাওয়ার খেয়ালে সে সব উবে যাচ্ছে। তাঁরই "যুদ্ধ ও শান্তিতে" বর্ণিত প্লেটো কারাটাইয়েফের মতো। পৌনে তিনটে—শবাধার উঠান হলো—বাহিরের বারান্দায় লোকের ভিড়। সিনেমার ক্যামেরায় ছবি উঠে চলেছে—কেউ বা পায়ের আঙ্গুলে ভর দিয়ে উঁচু হয়ে সমস্ত দৃশ্যের ছবি নিতে চেষ্টা করছে।

জনতা শবের অনুসরণ করছে—সবাই গাইছে—'চিরতরের স্মৃতি'। রাস্তা দিয়ে বরফে জমা আবর্জনার উপর দিয়ে হাঁটছে লোক। বনের উপান্তে টলস্টয়ের নির্দেশ মত গর্ত খোঁড়া হয়েছে। গ্রামীণরা দড়ি বেঁধে কফিন নামিয়ে দিলে। বিদায়ের গান সহস্র কণ্ঠে বহুগুণ বর্দ্ধিত হয়ে সারা বনে ছড়িয়ে পড়লো। যতদূর দৃষ্টি চলে পুরুষ স্ত্রী হাঁটু গেড়ে প্রার্থনা করছে। এত ভিড়, কিন্তু কোথাও দেখা গেল না যাজকদের কাজ করা পোষাকের পাড়—বা তাদের গলায় ঝোলান ক্রসের ঝিক্‌মিকি। রুশিয়ার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার এত বড় জন সমাগমের মধ্যে এই প্রথম—যে ধর্ম যাজকেরা একটিও উপস্থিত নেই। তবু জনসাধারণের হৃদয়ের উষ্ণ আবেগ—এর থেকে কখনও বেশী হতে দেখা যেত না—যদি এর পরিবর্তে সেন্ট-পিটার্স বর্গের সহুরে জনরা এই কাজে যোগ দিত।

বাড়ীর লোক চেয়েছিল—কোন বক্তৃতা না হয়। শুধু একজন অজানা বৃদ্ধ উঠে "আমাদের মহাপ্রাণ লিও-র" বিষয়ে কিছু বললেন। তাঁর শিষ্যদের অগ্রণী একজন সকলকে বুঝিয়ে দিলেন—মরার পর টলস্টয় কেন এই স্থানেই চিরশয়ান থাকতে চেয়েছিলেন।

হঠাৎ কয়েকজন বনের প্রহরীদের যেতে দেখা গেল—সকলে চেঁচিয়ে উঠলো—হাঁটু গেড়ে বস—টুপী খোলো। খানিকক্ষণ ইতস্ততঃ করে তারা টুপী খুলে হাঁটু ভেঙ্গে বসলো। গর্তের মধ্যে বরফ জমা মাটি পড়ছে—আকাশ অন্ধকার হয়ে গেল।

'শনিয়া' দুঃখে জড়ের মত হয়ে গেছেন—আর কাঁদেন না। সব শেষ—নিঃশব্দে ভিড় ভাঙ্গতে লাগলো।

প্রহরীরা আবার ঘোড়ায় চড়ে বসলো।

পরিজনেরা বাড়ীর দিকে ফিরতে সুরু করলে॥

গ্রন্থ ভূমিকা ও অন্যান্য

ডাঃ ভাণ্ডারকর, অর্থনীতিতে কাইয়াজা, অঙ্কশাস্ত্রে কালিস হ্যামিল্টন ও তাঁদের মত আরও অনেকে।

প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করে ধূর্জটি অন্য অনেকের মত বিজ্ঞানের দিকে ঝুঁকলেও শেষ পর্যন্ত ইতিহাস, অর্থ ও রাষ্ট্রনীতি বেছে নিয়েছিলেন। তাঁর স্নেহপ্রবণ মন, গভীর বন্ধুবাৎসল্য ও সরস কথাবার্তা তাকে সকলের প্রিয় করেছিল। সুকুমার কলার উপর তাঁর অনুরাগ ছিল অসীম। তাছাড়া বই সংগ্রহে তিনি আমাদের অগ্রগণ্য ছিলেন। তিনিই বোধ হয় আবিষ্কার করেন, রুশ, ফরাসী, জার্মান, নরওয়েজীয়ান ও অন্যান্য বিদেশী ভাষা থেকে অনূদিত সাহিত্য কলকাতায় পাওয়া যাচ্ছে। এবং সংগ্রহও করেছিলেন অনেক মহামূল্য ও দুষ্প্রাপ্য সাহিত্য চিত্রকলা ইতিহাস সমাজ-নীতির বই। আমরা তাঁর ভাণ্ডার থেকে অনেক সময় ধার করে উপকৃত ও লাভবান হয়েছি। অনুপ্রেরণায় দেশে তখন নানা সাহিত্যিক চক্র গড়ে উঠেছে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাড়ীতে বিচিত্রার আসর জমাচ্ছেন। তার আগে সাহিত্যে চলিত ভাষার প্রবক্তা প্রমথ চৌধুরী তাঁর ব্রাইট ষ্ট্রীটের বাড়ীতে যে সান্ধ্য বৈঠকের আয়োজন করেছিলেন, ধূর্জটি সেখানে প্রায় প্রতিদিন হাজির থাকতেন। তাঁরই প্রেরণায় ধূর্জটিপ্রসাদের প্রথম বাংলা রচনা এবং তা চৌধুরী মহাশয়ের সবুজ পত্রে ছাপা হয়।

ভারতীয় সঙ্গীত ঐতিহ্যের প্রতি ধূর্জটিপ্রসাদের বিপুল আকর্ষণ। সে সময়ে সঙ্গীতের অনেক বিখ্যাত আচার্য কলকাতায় আসর জমাতেন। প্রায় সব জায়গাতেই তাঁকে দেখা যেত। এর ফলে সঙ্গীতের মূল্যায়ন এবং সঙ্গীতের রূপ নিরূপণে তাঁর মতামতের প্রতি সকলের শ্রদ্ধা ছিল।

শিক্ষাদীক্ষা শেষ করার পর কয়েক বছর এই ভাবেই কেটেছিল। পরে লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয় পত্তন হবার পরেই ধূর্জটিপ্রসাদের সেখানে ডাক পড়ল। সেখানে সঙ্গীত ও চারুকলা চর্চা করার প্রচুর সুবিধা ও সময় পেলেন। সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ রতন জনকর ও আর্ট কলেজের অসিত হালদারের সঙ্গে তাঁর অনেক সময় কাটত। এছাড়াও ঐ সময়েই কবি অতুল প্রসাদের সংস্পর্শে এসে পড়লেন। লক্ষ্ণৌতে যে সঙ্গীত সম্মেলন হয় তাতে ধূর্জটিপ্রসাদ বিশেষ অংশগ্রহণ করেছিলেন। এদিকে শিক্ষক ধূর্জটিপ্রসাদের বাসা প্রতিদিন সরগরম থাকত রাজনীতি, সমাজনীতি, ইতিহাসের চর্চায়। লক্ষ্ণৌ-এ ও উত্তর প্রদেশের অন্যত্র আজকের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যাঁরা নায়কত্ব করছেন, তাঁরা অনেকেই শ্রদ্ধার সঙ্গে

স্মরণ করেন, যৌবনে ডি. পি.-র কাছে তাঁদের সাক্রেদির কথা। তিনি সাহিত্য, শিল্প ও সঙ্গীত চর্চা করে সারা জীবন কাটিয়ে গেলেন।

তাঁর স্বাভাবসিদ্ধ সৌজন্য ও মহানুভবতা, সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন ঐতিহ্যের প্রতি মমতা, তাঁর ভঙ্গীকে একটা বিশেষ রূপ দিয়েছিল। বহু বৎসর ধরে তাঁর এই স্বকীয়তা ফুটে উঠেছে। পাঠকরা—Tagore-A-Study—এই বই-এর মধ্যে অনেক নির্দেশ পাবেন। হয়ত তাঁর মতামতের সঙ্গে পাঠকের অনেক জায়গায় মিল থাকবে না। তবুও ধূর্জটিপ্রসাদ নিজের মতকে প্রতিষ্ঠিত করতে যে চিন্তা ও মনস্তত্ত্বের নিদর্শন দিয়েছেন, তা দেখে তাঁকে সাধুবাদ দিতেই হবে। এই বই যখন লিখেছিলেন তখন অনেক বিষয়ে তাঁর মত পাকাপাকি নির্দিষ্ট রূপ নিয়েছে। পাঠক তা পুরোপুরি গ্রহণ না করলেও তাঁর লেখার ভঙ্গি ও সরস মন্তব্য উপভোগ করবেন বলে আমার বিশ্বাস।

মাদাম কুরী প্রসঙ্গে

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষভাগে, অদ্ভুত একটি বোমার বিস্ফোরণে জাপানের হিরোশিমা শহর প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। আবার ২।৪ দিন বাদে একই রকম আক্রমণের ফলে নাগাসাকী সহরের অসংখ্য নিরীহ লোক প্রাণ হারালো। এইভাবে বিশ্বমানবের মনে মহাপ্রলয়ের বিভীষিকা জাগিয়ে নতুন পারমাণবিক যুগের সূচনা হয়েছে। তারপর থেকে পরীক্ষাচ্ছলে এই ধরণের বিস্ফোরণ হয় নানা স্থানে—তার কথা প্রায়ই খবরের কাগজে ছাপা হয়। এরই ফলে তেজস্ক্রিয় ধূলিকণা পৃথিবীর আকাশে-বাতাসে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে। বহুদিন বেপরোয়া এই ভাবের পরীক্ষা চালালে অবাঞ্ছিত জঞ্জাল জড় হয়ে তেজস্ক্রিয়তার প্রভাবে পৃথিবীতে প্রাণ-শক্তির স্বচ্ছন্দ বিকাশের অন্তরায় ঘটাবে—এই ধরণের কথা সাধারণ লোকের মুখেও মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে আমাদের দেশে—এবং এই স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে শোভাযাত্রাও বেরোচ্ছে মাঝে মাঝে।

যে তেজস্ক্রিয়তার গুণাগুণ আজ এইভাবে সাধারণ জনের আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, ৬০।৬২ বৎসর আগে কিন্তু লব্ধপ্রতিষ্ঠ বিজ্ঞানীমহলেও এর খবর অজানা ছিল! আবিষ্কারের ধারা শুরু হলো ফরাসী বিজ্ঞানী বেকেরেলের এক সমীক্ষা থেকে। অন্ধকার বাক্সের মধ্যেও ইউরেনিয়মঘটিত যৌগিক পদার্থগুলি কালো কাগজে মোড়া ফটো-ফলকের উপর কোন অজ্ঞাত উপায়ে পরিবর্তন ঘটাতে পারে। সম্ভবতঃ কোন অজানা রশ্মির প্রভাবে এটি হচ্ছে মনে হলো—কারণ কালো কাগজ তাকে প্রতিরোধ না করলেও পাতলা ধাতুর চাক্‌তি সে-রশ্মিকে আটকায়; ফলকটিকে বের করে ছবি উঠাবার জানা-প্রক্রিয়ার মধ্যে ফেলে দেখা যায় ধাতুর চাক্‌তিগুলির ছাপ পড়ে গিয়েছে ওই ফলকের উপর।

বেকেরেলের এই নিরীক্ষার মধ্যে যে রহস্যের ইঙ্গিত ছিল, তার মর্ম পরিস্ফুট করতে বদ্ধপরিকর হলেন কুরী দম্পতী—অজ্ঞাতকুলশীল এক যুবতী অনুসন্ধানী ও তাঁর যশস্বী অথচ নিরভিমান আত্মভোলা স্বামী পিয়ের কুরী। তাঁদের বহু বৎসরের পরিশ্রমের ফলে রেডিয়ম ও পলোনিয়মের আবিষ্কার হলো। সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানীদের

'মাদাম কুরী'—ইভ কুরী ; অনুবাদ—কল্পনা রায়

চোখের সামনে খুলে গেল নতুন এক জগৎ। তেজক্রিয়তার প্রথম প্রকাশ হলো ও শুরু হলো পদার্থবিজ্ঞানের নতুন এক অধ্যায়ের রচনা।

এই বৈজ্ঞানিকী ইতিকথা উপন্যাসের মতোই মনমাতান তার রোমাঞ্চকরণের আলোক তখনো কুরী দম্পতিকে উদ্ভাসিত ক'রে বিশ্বের সামনে প্রকাশ করে নি। তাঁরা নিজেদের যথাসর্বস্ব এই কাজে ব্যয় করে চলেছেন—অন্ধকারে অপরিষ্কার পরিত্যক্ত নীচের তলার একটি ঘরে। কলকারখানার মতো ব্যয়সাধ্য ও শ্রমসাপেক্ষ কর্মরীতিতে তাঁরা মেতে রইলেন ৩।৪ বৎসর। উৎসাহ দেবার মতো কোন সভা, বিশ্ববিদ্যালয় বা ওই রাজ্যের সরকার তখনও এগিয়ে আসেন নি। শুদ্ধ সত্যের সন্ধানে নতুন জ্ঞান আবিষ্কারের উন্মাদনা তাঁদের চালাচ্ছিল। রেডিয়ম-আবিষ্কার সারা পৃথিবীকে চমৎকৃত করলো। দেশে-বিদেশে যখন কুরী দম্পতির সুনাম ছড়িয়ে পড়েছে, তখনও নিজের দেশের উপযুক্ত প্রশংসা বা সাহায্য পেতে অনেক দেরী হয়েছিল কুরীদের। এই কাহিনীর পক্ষে মানুষের দৃঢ়পণ-নিপুণতা ও একাগ্রতার বর্ণনা একসঙ্গে মিশে যে অপূর্ব এক গাথার সৃষ্টি করেছে, তার বর্ণনা অতি সুন্দরভাবেই করেছেন কুরী কন্যা ইভ।

অবশ্য ইতিমধ্যে চলচ্চিত্রের সাহায্যে এই কাহিনীর পরিচয় হয়েছে।

আর আমার মতো দু'চার জন বিজ্ঞানী এদেশে এখনো রয়েছেন যাঁদের সৌভাগ্য হয়েছিল মাদাম কুরীকে স্বচক্ষে দেখা, তাঁর সঙ্গে কিছু আলাপ করা—তাঁর বিখ্যাত লেবরেটরিতে কাজ করা বা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর বক্তৃতা শোনা! তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তা' রেডিয়ম আবিষ্কারের অনেক পরে। নিদারুণ দুর্ঘটনায় পিয়েরের তিরোভাব ঘটেছে। একাই কৃত্যকর্তব্য চালিয়ে দু'বার নোবেল পুরস্কার বিজয়িনী মাদাম কুরী প্রায় তখন উপকথার মানুষ! দেবদুর্লভ যশের অধিকারিণী তিনি—তাঁকে দেখতে, তাঁর নির্দেশে কাজ করতে সারা বিশ্ব থেকে লোক এসে জুটছে পারীর বিদ্যামন্দিরে।

আজ তেজক্রিয়তার সঙ্গে যেন অভিশাপ যুক্ত হয়ে রয়েছে! কিন্তু ভুললে চলবে না, এই রেডিয়ম আবিষ্কারের পর দুরারোগ্য ব্যাধির উপশমের জন্য তার ব্যবহারই ছিল কুরী দম্পতির প্রধান লক্ষ্য!

আজ পারী নগরে র‍্যু-দ-পিয়ের কুরীতে সুবৃহৎ অট্টালিকা উঠেছে যেখানে রেডিয়ম ইত্যাদি তেজক্রিয় পদার্থের প্রয়োগে রোগীর চিকিৎসা চলছে। সারা বিশ্বে এই ধরনের রোগ উপশমের পদ্ধতি আজ জনপ্রিয় হয়েছে। এই কলিকাতা নগরীতেও

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে রয়েছে ক্যানসার ইনস্টিটুট্—সেখানেও তেজস্ক্রিয় ধাতুর ব্যবহার আজ সুবিদিত।

অবিস্মরণীয় সেই অমর কাহিনী লিখে ইভ কুরী বিশ্বজনকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন।

ভারতীয় বিজ্ঞানীদের কাছে কুরী পরিবার সুপরিচিত। মারীর কন্যা আইরিন মা'র কাছে শিক্ষালাভ করে নিজের জীবন মায়ের আদর্শেই গড়েছিলেন। তাঁরই মতো এই তেজস্ক্রিয়তার সন্ধানে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন আইরিন ও তাঁর স্বামী ফ্রেডরিক জোলিও। এঁরাও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নানা আবিষ্কার করে যশস্বী হয়েছেন, নোবেল পুরস্কারও পেয়েছেন এ'রা দু'জন। ভারতের বিজ্ঞানীদের প্রতি জোলিও ও আইরিন কুরীর অকৃত্রিম সহানুভূতি ছিল। ২।৩ বার এই দেশে নানা ভাবের বিচক্ষণ পরামর্শ দিতে এসেছিলেন জোলিও। আইরিনও ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে বোম্বাই এসে বিজ্ঞান সভায় যোগদান করেছিলেন। বিজ্ঞানী মহলে এসব কথা সকরুণ স্মৃতি জাগায়—কারণ এঁরা দু'জনেই চলে গিয়েছেন। নানা ভাবে মানব সেবায় ও বিজ্ঞান প্রগতির ইতিহাসে কুরী পরিবারের নাম চিরকালের জন্য স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। ভারতীয়দের কাছে তাই এই জীবনকাহিনী এত আদরণীয়। বাঙলা ভাষায় বিজ্ঞানের প্রচার আমার চিরকালের কাম্য। বাঙলা দেশের লোক প্রখ্যাত বিদেশী বিজ্ঞানীদের জীবন-চরিত পড়ুক এবং বাংলার মাধ্যমে এই পরিচয় ঘটান অবশ্যকর্তব্য বলে আমার মনে হয়।

শ্রীমতী রায়-জায়া নিজের নানা কাজের মধ্যেও যে এই অনুবাদ করার অবসর পেয়েছেন—সেটি আমাদের সপ্রশংস বিস্ময় উৎপাদন করেছে। বাঙলায় এই উপভোগ্য তর্জমা পড়ে আমি ও অনেকে সুখ্যাতি করছি। শুনেছি অনুবাদিকা নিজে ইংরাজীতে এই জীবনী পড়ে এত অভিভূত হয়েছিলেন যে, সারা দেশের বাঙলা-ভাষীকে সেই আনন্দের ভাগ দিতে উদ্যোগী হয়েছেন। তাঁর এই পরিশ্রম সার্থক হয়েছে। তিনি বাঙলার বিজ্ঞান সমাজের যে উপকার করেছেন তা' ভুলবার নয়। ভাষাপ্রেমিকদের পক্ষ থেকে তাঁকে আমার শ্রদ্ধা জানাই।

আশা করি সুধী সমাজে ও ছাত্রমহলে এই পুস্তকটির যথেষ্ট আদর হবে।

আইনস্টাইন প্রসঙ্গে

অধ্যাপক আইনস্টাইনের মৃত্যুসংবাদ প্রচারিত হবার পর আমি যে কটি কথায় তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করি তার সারাংশ এই—'বরাবরই তিনি সাধারণ থেকে একটু ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ। যে উন্নতির দুরাশা সারাজীবন মানুষকে অস্থির করে, মাতিয়ে রাখে, তার অসারতা কিশোর বয়সেই তাঁর মনে পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছিল। পেট ভরলেই যে মানুষের মন ভরে না, এ সত্য তাঁর কাছে অল্প বয়সেই ফুটে উঠেছিল। তাই অল্প বয়সেই প্রথমে তাঁর মন ঝুঁকেছিল ধর্মের দিকে। হঠাৎ বারো বছর বয়সে বিজ্ঞানের চলতি বই পড়ে তাঁর মনে হলো, বাইবেলের কথা ও গল্প কখনও সত্য হতে পারে না। হঠাৎ মন বেঁকে বসলো সম্পূর্ণ নতুন পথে। স্বাধীন চিন্তার দৌরাত্ম্যে মনে হলো—ইচ্ছা করেই সমাজ চিরদিন মানুষের মন ভোলাবার জন্যে মিথ্যা প্রচার করে আসছে। সেই থেকে আপ্তবাক্যে অবিশ্বাস তাঁর মনে মজ্জাগত হয়ে উঠলো। কোন ক্ষেত্রেই কোন চিরাচরিত মতামত, বিচার না করে সহজে তিনি গ্রহণ করতে পারেন নি।

...মানুষ হিসাবে তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল অসাধারণ। অত্যাচার কিংবা অসত্যের কাছে কখনও মাথা নত করেন নি। মানুষের উপর তাঁর বিশ্বাস ছিল অপরিসীম। নিজে অনেক অবহেলা সহ্য করেছিলেন—তাই বিজ্ঞানের নবীন ব্রতীদের তিনি স্নেহ করতেন। ..নতুন মতবাদ, যার মধ্যে সত্য নিহিত আছে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন, তাকে তিনি খোলাখুলি সাহায্য ও প্রশ্রয় দিয়েছেন।...সর্বক্ষেত্রেই তাঁর মতামতের একটা অভিনবত্ব ছিল। তুচ্ছ আত্মগরিমা কিংবা নিজের আর্থিক প্রতিষ্ঠার জন্যে তিনি কখনও ব্যগ্র ছিলেন না—অনেক সময় অনেক কথা হয়তো সকলের মনঃপূত হত না, তবু সকলেই জানতো তিনি কোন ব্যক্তিগত কোণ থেকে তা সমালোচনা বা প্রচার করছেন না।

স্নেহাস্পদ শ্রীমান রবীন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রতি শ্রীমতী ক্যাথেরীন ওয়েল্স পেয়্যার রচিত অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের জীবনী বাংলায় অনুবাদ করেছেন। অনুবাদ প্রাঞ্জল ও সুখপাঠ্য। শ্রীমতী পেয়্যার ছোটদের উপযোগী আইনস্টাইনের জীবনী প্রথম ১৯৪৯ সালে লিখেছিলেন। বইটির ভূমিকায় তিনি বলেছেন,

অধ্যাপক আইনস্টাইনের সেক্রেটারী মিস হেলেন ডুকাস এবং তাঁর বন্ধু ও চিকিৎসক ডাক্তার রুডলফ্ এরম্যানের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে এই বইটি লিখেছেন। আইনস্টাইনের বাল্য জীবনের অনেক কথা এ থেকে আমি জেনেছি। সকলেরই কৌতূহল—এইরকম মনীষী কি পরিবেশে জন্মেছিলেন, বাল্যকালে কাদের সংস্পর্শে এসেছিলেন, কোথায়বা তাঁর শিক্ষাদীক্ষা হয়েছিল এবং এই অলোক-সামান্য মহামানবের মানসিক পরিণতি কি ভাবে ও কোথায় বিকাশ লাভ করেছিল। শ্রীমতী পেয়্যার লিখেছেন—যদিও আইনস্টাইন জার্মানীর উলম্ শহরে জন্মেছিলেন, কিন্তু প্রথম যৌবনে যখন বার্ণে সরকারী চাকুরী গ্রহণ করেন, তখন তিনি সুইজারল্যাণ্ডের নাগরিক হিসাবে পরিগণিত ছিলেন। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে জার্মান দেশের নাগরিক হিসাবে পরিচিত ছিলেন। আমি তাঁর সংস্পর্শে আসি ১৯২৫-২৬ সালে। তখন তিনি নিজেকে জার্মান বলেই গণ্য করতেন। জার্মানীর রাজনৈতিক পটভূমি তখন স্পষ্ট রূপ নেয় নি। হিটলার তখনও একজন অজ্ঞাত সৈনিক মাত্র। গ্রেশম্যান তখন চেষ্টা করছিলেন মিত্রশক্তির সঙ্গে যথাসম্ভব মিলেমিশে শান্ত পরিবেশে জার্মানীর শাসনকার্য্য চালাতে। আইনস্টাইন তাঁদের দেশের লোক বলে জার্মান সরকার তখন গর্ববোধ করতেন। পট্সডাম (Potsdam) মান-মন্দিরের একটা অংশের নাম তখন 'আইনস্টাইন টুরম' বলে বিখ্যাত ছিল।

অনেক সময় তাঁর সঙ্গে ৫নং হ্যাবারল্যাণ্ড ষ্ট্রাসের বাড়ীতে দেখা করতে গিয়েছি। অনেক সময় আমার সঙ্গে বিখ্যাত জার্মান বিজ্ঞানীরা থাকতেন। কাজেই বিদেশীদের চক্ষে তখন আইনস্টাইনের প্রতি জার্মানীর বিরূপ মনোভাব ধরা পড়ার কথা নয়। আমার সঙ্গে দেখা হবার কিছুদিন আগে তিনি জাপান বেড়িয়ে গিয়েছিলেন এবং নানা কারণে ভাবতবর্ষে আসা হয় নি বলে তিনি দুঃখও প্রকাশ করেছিলেন আমার কাছে! অবশ্য আইনস্টাইনের মনে ইহুদীদের ঐতিহ্যের ওপর শ্রদ্ধা ছিল। তাঁর অনেক কথাবার্তায় সে কথা আমি বুঝতে পারতুম।

জেরুজালেমকে কেন্দ্র একটা ইহুদী উপনিবেশ গড়ে উঠুক – যার রাজনৈতিক তত্ত্বাবধান ইংরেজের হাতে থাক্‌লে সবার চেয়ে কল্যাণকর হবে ইহুদীদের পক্ষে—এটা তিনি আমাকে একবার বলেছিলেন। আমি দেশে ফিরে আসি ১৯২৬ সালের শেষ ভাগে। একনায়কদের স্বৈরাচার তিনি আদৌ পছন্দ করতেন না। একটা ছোট ঘটনা থেকে সকলে তাঁর এ মনোভাবের আভাস পাবেন।

১৯২৭ সালে কোমো নগরে ভল্‌টা শতবার্ষিকী উপলক্ষে ইটালীর একনায়ক মুসোলিনী একটা আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান-সম্মেলেন আহ্বান করেন। যাবার নিমন্ত্রণ ছড়ানো হয়েছিল সারা বিশ্বে—এমন কি আমাদের দেশ্ থেকে প্রতিনিধি হিসাবে ডঃ দেবেন্দ্রমোহন বসু সেখানে গিয়েছিলেন। অনেক বিখ্যাত বিজ্ঞানী এই সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন এবং মুসোলিনী তাঁদের আপ্যায়ন করেছিলেন প্রচুর। একমাত্র আইনস্টাইন এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন নি এবং কোমোতে উপস্থিত ছিলেন না। মনে হয়, তিনি নিজের আচার-ব্যবহারে বিন্দুমাত্র ভুল ধারণার সুযোগ দিতেন না যে, তিনি স্বৈরাচারী একনায়কদের সঙ্গে কোনরূপ আপোস করতে ব্যগ্র।

শ্রীমতী পেয়্যার ডক্টর এরেনফেস্ট-এর নাম উল্লেখ করেন নি, কিন্তু হল্যাণ্ডের এই বিখ্যাত বিজ্ঞানী পরিবারের সঙ্গে আইনস্টাইনের ঘনিষ্ঠ হৃদ্যতা ছিল। কিছুদিনের জন্যে হল্যাণ্ডে অবসর বিনোদন করতে গেলে তিনি ওঁদের আতিথ্য অনেক সময় গ্রহণ করতেন।

১৯২৬ সালের পর থেকে মিত্রশক্তির সঙ্গে জার্মানীর সম্পর্ক ক্রমশঃ অবনতির দিকে যেতে লাগল। এর রাজনৈতিক কারণ ও তার ফলাফল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের যে সব প্রামাণিক ইতিহাস লেখা হয়েছে তার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে।

দারুণ আর্যামি-র বিষ যখন নাৎসী পার্টিতে গভীরভাবে প্রবেশ করল, তখন জার্মানীর অনেক শহরে ইহুদীদের ওপর নির্মম অত্যাচার হলো এবং তখন আইনস্টাইন বিশ্বজনের দরবারে তার প্রতিবাদ ও দমননীতির কঠোর সমালোচনা করেন। এর ফলে তাঁকে জন্মভূমি জার্মানী ছাড়তে হয় এবং অবশেষে তিনি আমেরিকার প্রিন্সটন শহরে আশ্রয় নেন, এখানে বিজ্ঞানী-সমাজ তাঁকে সমাদরে গ্রহণ করলেন। শেষের দিকে তিনি আমেরিকার নাগরিকত্বও গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর নির্ভীক ও সতেজ মত সঙ্কীর্ণ জাতীয়তার বহু ঊর্ধ্বে সমগ্র মানবজাতির ভবিষ্যতের জন্যে ব্যাকুল হয়ে থাকত। তাঁর লেখায়, কথাবার্তায় সব সময় তা প্রকাশ পেয়েছে।

আমার দুঃখ এই যে, জার্মানী ছাড়ার পরও আমি চেষ্টা করেছিলুম, কিন্তু আমেরিকায় গিয়ে অধ্যাপক আইনস্টাইনের সঙ্গে দ্বিতীয়বার দেখা করতে পারি নি। আশা করেছিলুম, যে, আপেক্ষিকতাবাদের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে যখন তিনি বার্ণে আসবেন তখন তাঁর সঙ্গে দেখা হবে। কিন্তু তার আগেই তাঁর মহাপ্রয়াণ ঘটলো।

এস্‌রাজ প্রসঙ্গে

"ছেলেবেলায় গান শোনার প্রবল আগ্রহ ছিল। তাছাড়া বন্ধুদের মধ্যে মণ্টু (দিলীপ কুমার রায়) তখন গানে একজন খুব মস্ত বড়ো পাণ্ডা। আমরা সব মণ্টুর গান পছন্দ করি, ওঁর সঙ্গে ঘুরে বেড়াই। সুর এবং সুরের বিষয় অনেক আলোচনা হতো বন্ধুবর ধূর্জটিপ্রসাদ (মুখোপাধ্যায়) প্রমুখ নানা সমজদার লোকের সঙ্গে। বি-এস-সি পরীক্ষার আগে মণ্টুর সঙ্গে আলাপ। ধূর্জটির বাড়িতে গানের চর্চা ছিল। ওর মা সুগায়িকা ছিলেন, ধূর্জটির ছেলেও বর্তমানে সুগায়ক। গানের ব্যাপারে আমার নিজের কোন বর্ণপরিচয় ছিল না। একটা ছোট এসরাজ কিনে নিজে নিজে বাজাবার চেষ্টা করা হলো। অবশ্য স্বরলিপি দেখে বাজাবার অভ্যাস করতে হয়েছিল। তাছাড়া বিজ্ঞানী লোক হিসেবে ইংরেজীতে যাকে বলে harmonics সে স সবগুলো অনুসন্ধান করে তার দ্বারা কি করে এ বাজানো যায় এইসব নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা নানান রকমের করা যেত ; এইভাবে এসরাজের সঙ্গে পরিচয়। তারপর, সে হবে অনেক-দিনের কথা। আরম্ভ হয়েছিল বোধ হয় বয়স যখন কুড়ি-একুশ হবে। কিছুদিন ছোট এসরাজ বাজাবার পর ঢাকায় যেতে হল। সেখানে আমার এক ছাত্র ঢাকায় তৈরি বর্তমানের এসরাজটি সংগ্রহ করে দিলেন। তারপর থেকে মধ্যে মধ্যে বাজাই। ঢাকায় তখন গান-বাজনার খুব রেওয়াজ ছিল। রাসের সময়ে বৈষ্ণবদের বাড়িতে খুব গান-বাজনা হতো। আলাউদ্দীন খানের দাদা, ভগবান সেতারী, শ্যাম সেতারী এঁরা সকলে ওখানে প্রায় বাজাতেন। আমার নিজের কথা বলতে গেলে ধারাবাহিকভাবে কিছু করা হয় নি। তবে বলতে গেলে অনেক বছরই বাজানো হচ্ছে। ওতে যেটুকু হাত এসেছে ওই আর কি—।

তখন অনেকে বলতেন, আমাদের হিন্দু রাগ-রাগিনী এমনভাবে সৃষ্টি হয়েছে যে, রাগ যেগুলো আমরা বলি তাছাড়া অন্য কিছু হওয়া সম্ভব নয়। আমার এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করবার পর হঠাৎ একদিন মনে হলো যে চেষ্টা করে দেখা যাক নতুন ধরণের কিছু করা যায় কি না। সেই সময়ে একটা স্বরলিপি করেছিলাম এবং সেটা অনেক সময়ে গান নিয়ে যাঁরা আলোচনা করেন

তাঁদের শোনাই তাঁদের মনে ধোঁকা দেবার জন্যে। শেষ অবধি সেই যে কাঠামো হয়েছিল তাতে আমার বন্ধুবের পশুপতি ভট্টাচার্য মশায় একটা গান যোজনা করেছিলেন এবং কিছুদিন সে গান আমাদের বন্ধু মহলে গাওয়া হতো, অনেককে শোনানো হয়েছিল। তবে যাঁরা আমাদের হিন্দী সংগীতের বৈয়াকরণ তাঁরা বললেন, ওই কানাড়ার ঘরের একটা কিছু হয়েছে। অবশ্য যা করা হয়েছিল তার বিস্তার খুব বেশিদূর হয় নি। বিস্তার করতে গেলে হয়ত একটা কারুর সঙ্গে মিলে যেতেপারতো। কিন্তু এমনি অনেককে শুনিয়ে তাঁদের অনেক সময়ে একটু মাথা চুলকাতে হতো যে, এটা কি।

গুরুর বাজনা? আইনস্টাইন সাহেবের বাজনা শুনি নি, যদিও অনেক সময়ে তাঁর ঘরে দেখেছি বেহালা রয়েছে। কখনো সাহস করে তাঁকে অনুরোধ করতে পারি নি যে, আমাকে একটু বাজনা শোনান।

শুনেছিলাম তিনি যখন জাপানে গিয়েছিলেন তখন বেহালা-টেহালা নিয়ে গিয়েছিলেন এবং সেখানকার লোকেও তাঁর বাজনা শুনেছিলেন। বিজ্ঞানীরা অনেকে, বিশেষ করে জার্মান বিজ্ঞানীরা সংগীত ভালোবাসেন। আমি এক জার্মান বন্ধুকে বলি যে, আইনস্টাইন সাহেব বেহালা বাজান। তিনি খুব গম্ভীর ভাবে বললেন, প্ল্যাঙ্ক সাহেব পিয়ানো বাজান। বেহালা কিম্বা পিয়ানো জার্মানীতে খুব আদৃত হত।

[কথিকাটি ভক্তি প্রসাদ মল্লিকের টেপ রেকর্ডার থেকে সংগৃহীত]

জাহাজ ডুবি

কয়েক বৎসর আগে ডিসেম্বর মাসের এক সকালে লিভারপুল বন্দর থেকে এক প্রকাণ্ড বাষ্পে-চলা জাহাজ যাত্রা করলো—নিয়ে চল্‌লো দুই শ'র বেশী যাত্রী, তার মধ্যে প্রায় সত্তর জন মাঝি মাল্লা।

কাপ্তেন, নাবিকরা প্রায় সব ইংরেজ, আর যাত্রীদের মধ্যে কিছু ইটালিয়ন—তিন-জন ভদ্রলোক—এক পাদরী—ও বাজনদারের একটি দল! জাহাজ যাবে মাল্টা দ্বীপে—দিন হলেও তখনও চারিদিক অন্ধকার।

তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের মধ্যে ডেকে রয়েছে এক ইটালিয়ন ছেলে—বয়স হবে প্রায় বারো—সে তুলনায় দেখতে ছোট তবে জোরাল শরীর। সিসিলি দ্বীপের ছেলে—সুন্দর মুখে তার দৃঢ়তা ও কর্মক্ষমতা প্রকাশ পাচ্ছে! ঘণ্টি-ঝোলা মাস্তুলের কাছে একরাশ/জাহাজের কাছি তাল-পাকান, তারি উপরে বসে ছেলেটি,—পাশে পুরানো বাক্স—তার মধ্যে কাপড়-চোপড়, হাত রেখেছে তার উপর! শ্যামবরণ মুখ, কাল কোঁকড়ান চুলের রাশি কাঁধ অবধি নেমে এসেছে! গরীবের পোষাক পরা—ছেঁড়া কাঁথা কাঁধে—গলায় ঝুলছে এক পুরোনো চামড়ার ব্যাগ। কত কি ভাবছে সে—চারিদিকে দেখছে কত যাত্রী, সমুদ্র অশান্ত,—আর ডেকের উপর নাবিকরা দৌড়ো-দৌড়ি করছে!

পারিবারিক মস্ত এক দুর্ঘটনা কাটিয়ে উঠেছে সম্প্রতি—তার ছাপ রয়েছে ছেলেটির মুখে। কিশোর মুখে পরিণত বয়স্কের মত ভাবনার ছাপ।

জাহাজ ছাড়বার কিছু পরে ইটালিয়ন এক নাবিক,—মাথার চুল পাকা—ডেকে হাজির হ'ল—একটি মেয়ের হাত ধরে। ছোট সিসিলিয়ানের সামনে এসে দাঁড়াল, বললে—"মারিও, তোমার এই এক সহযাত্রী, দেখো!" নাবিক চলে গেল—মেয়েটি দড়ির স্তূপের উপর ছেলেটির পাশে বস্‌ল।

পরস্পরের দিকে তাকাল দু'জনে। ছেলেটি জিজ্ঞাসা কর্‌লে—"কোথায় যাবে?" মেয়েটি উত্তর দিলে—"নেপল্‌স হয়ে মাল্টা", আরও বল্‌লে—"সেখানে মা' বাবার সঙ্গে দেখা হবে—তারা অপেক্ষা করে আছে"—আমার নাম জুলিয়েটা ফাজানী।

কিছু বললে না ছেলেটি—কয়েক মিনিট পরে ঝুলির থেকে বের

কর্‌লে রুটি, শুকনো ফল—মেয়ের কাছে ছিল বিস্কুট—খাওয়া সুরু হল দু'জনের।

তাড়াতাড়ি যেতে যেতে, সেই নাবিকটি বল্‌লে—"বেশ আনন্দ, দেখছি—এবার কি ব্যালে আরম্ভ হবে।"

হাওয়ার বেগ বেড়েই চলেছে, জাহাজ জোরে জোরে দুলছে, তবে ছোট ছেলে-মেয়েদের সমুদ্রের মাতনে অসুখ করে না। তারা সে দিকে খেয়াল কর্‌লে না। মেয়েটির মুখে হাসি—দেখতে একবয়সী, তবে সে একটু বয়সে বড়ই, ময়লা ছিপছিপে পাতলা চেহারা—হয়ত একটু বেশী পারিপাট্য। ছোট করে ছাঁটা কোঁকড়ান চুল—মাথা ঘিরে বাঁধা লাল রুমাল—কানে সরু রূপোর রিং, মাক্‌ড়ী।

খেতে খেতে দুজনের সব ব্যাপার বলা হলো! ছেলেটির মা বাপ কেউই বেঁচে নেই। বাপ লিভারপুলে কোন কলে কাজ করতো, তাকে একা রেখে কয়েকদিন আগে মারা গেছে। ইটালিয়ন কনসাল দেশে ফেরৎ পাঠাচ্ছেন তাকে। পালেরমো সহরে যাবে, দূর আত্মীয় আছে বা কেউ সেখানে।

মেয়েটি আগের বছর এক বিধবা খুড়ীর কাছে লণ্ডনে এসেছিল—তাকে ভাল-বাসতো ওখানকার সকলে—নিজে গরীব, ভেবেছিল বুড়ী খুড়ী কিছু দিয়ে যাবে। কিন্তু কয়েক মাস আগে বুড়ী বাসের দুর্ঘটনায় মারা পড়েছে—এক পয়সাও রেখে যায়নি। তাকেও কনসালের কাছে যেতে হয়েছিল—তিনিও তাকে এই জাহাজেই দেশে ফেরৎ পাঠাচ্ছেন, দু'জনকেই দেখাশুনা করতে ওই বুড়ো নাবিককে সুপারিশ করা হয়েছে। মেয়েটি বল্‌লে "বাপ মা ভেবেছিলেন—পয়সা কড়ি পাব—বড় লোক হয়ে ফিরবো—ফিরে যাচ্ছি—কিন্তু সেই গরীব। তবে আমার এই ভাল, ভাইদেরও ভাল লাগবে হয়ত—চার ভাই আমার—সব ছোট ছোট। আমি বাড়ীর বড় মেয়ে—তাদের সাজাই, কাপড় পরাই, আমাকে দেখলে সবাই খুসী, পা টিপে টিপে কাছে আসে—ওঃ! এ সমুদ্দর তো ভারি খারাপ।" পরে ছেলেকে শুধালো—

"তোমার আত্মীয়দের কাছে থাকবে?"

"হ্যাঁ, তারা যদি আমাকে চায়।" উত্তর হলো!

"তোমাকে পছন্দ করবে তারা?"

"জানি না তো!"

"এইবার খ্রীষ্টের জন্মদিনে আমার ১৩ বছর পূর্ণ হবে।"

পরে আরো আলোচনা চল্‌লো—সমুদ্র ও চারিদিকের যাত্রীদের নিয়ে। সারাদিন

দু'জনে কাছাকাছি বসে—মাঝে মাঝে অল্প স্বল্প কথাবার্তা! যাত্রীরা ভাবে এরা ভাই বোন। মেয়েটি মোজা বুনছে, ছেলেটি বসে ভাবছে। সমুদ্রের তোলপাড় ক্রমশঃ বেড়েই চললো।

রাত্রে ঘুমোতে যেতে ছাড়াছাড়ি—মেয়েটি বল্‌লে—মারিওকে "ভাল করে ঘুমিও"। এদিকে কাপ্তেনের ডাকে ইটালিয়ন নাবিক দৌড়ে চলেছে—শুনতে পেয়ে বল্‌লে—

"বাছারা, আজ ভাল ঘুম হবে না কারোর।" শুভরাত্রি জানাতে বন্ধুকে—ছেলেটি উঠে দাঁড়িয়েছে—এমন সময় আচমকা প্রকাণ্ড এক ঢেউয়ের ঝাপটায় ছেলেটি জোরে এক চেয়ারের উপর ছিট্‌কে পড়লো!

"মাগো, রক্ত বেরিয়ে গেল যে"—মেয়েটি ছেলেটির উপর ঝাঁপিয়ে পড়্‌লো।

এদিকে তাদের দেখ্‌তে কেউ নেই, সব যাত্রী ছত্রভঙ্গ হয়ে নীচে নেমে গিয়েছে!

মেয়েটি মারিও'র পাশে হাঁটু গেড়ে বস্‌লো—ছেলেটি তখন আঘাতে মোহাচ্ছন্ন। তার কপাল মুছিয়ে দিলে—রক্ত তখনও পড়্‌ছে—নিজের লাল রুমাল মাথা থেকে খুলে নিয়ে ছেলেটির মাথার চারিদিকে ঘের দিয়ে কষে গিঁট বাঁধলো রক্ত বন্ধ করতে—এদিকে তার হলদে পোষাকে কোমরের কাছে রক্তের ছাপ লেগে গেল!

মারিও গা-ঝাড়া দিয়ে আবার দাঁড়িয়ে উঠ্‌লো—"এবার একটু ভাল মনে হচ্ছে?" মেয়েটি জিজ্ঞাসা কর্‌লো। "আর কিছু নেই", উত্তর দিল ছেলেটি—জুলিয়েটা বল্‌লে—ভাল করে ঘুমিও। উত্তরে মারিও, তাকে শুভরাত্রি কামনা করলে। তারপর পাশাপাশি সিঁড়ি দিয়ে যে যার ঘুমের কামরায় চলে গেল।

নাবিকের ভবিষ্যৎবাণী সত্য হ'ল। কারোর ঘুম হলো না—সে রাতে! ভীষণ ঝড় উঠ্‌লো।

প্রচণ্ড ঢেউয়ের অতর্কিত আঘাতে কয়েক মিনিটের মধ্যে ভেঙ্গে পড়লো এক মাস্তুল—তার উপর ক্রেনে ঝোলান—তিনটে নৌকো। গাছের পাতার মত তাদের ভাসিয়ে নিয়ে গেল—তার সঙ্গে ভেসে গেল ডেকে বাঁধা চারটে গরু!

জাহাজের মধ্যে ভীষণ গণ্ডগোল সৃষ্টি হলো। ভেঙ্গে চুরে পড়ছে সব—নানা চেঁচামেচি—কান্নার কলরোল—প্রার্থনার কাকুতি—এ হট্টগোল শুনে গায়ের লোম, মাথার চুল খাড়া হয়ে ওঠে আতঙ্কে! ঝড়ের তাণ্ডব—সারারাত বেড়েই চল্‌লো—পরের দিনের আলো ফুট্‌ছে—তখনও চল্‌ছে। প্রকাণ্ড ঢেউ জাহাজের উপর আছড়ে পড়ছে—সব ভেঙ্গে, ছাত ধসে—সমুদ্রের গর্ভে ঝেঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। যন্ত্র ঘরের ছাত ধসে গেল প্রচণ্ড শব্দ করে জল ঢুকতে সুরু করলে—আগুন নিভে গেল।

কলের মিস্ত্রিরা পালাতে সুরু কর্‌লো —সর্বত্র বাধাঠেলে—কিছু না মেনে—তোড়ে জল ঢুক্‌ছে ! গম্ভীর স্বরে আদেশ হলো—পাম্পে লাগো—এ স্বর কাপ্তেনের !

খালাসীরা সব পাম্পের দিক দৌড়াল। কিন্তু পেছন থেকে ঢেউয়ের তাড়নায় জাহাজের প্যারাপেট প্রবেশ দ্বার—সব খসে পড়লো—প্রচণ্ড জলের তোড়।

যাত্রীরা সব মরি-বাঁচি করে বড় হল ঘরে আশ্রয় নিলে।

এমন সময় কাপ্তেন এসে দাঁড়ালেন !

সকলে একসঙ্গে চীৎকার করে উঠ্‌লো—কাপ্তেন, কাপ্তেন—কি করা যায়—কোথায় আছি আমরা—কোন আশা আছে কি—আমাদের বাঁচাও !

কাপ্তেন অপেক্ষা কর্‌লেন, সকলে চুপ কর্‌লে নীরস-ভাবে বললেন—"ভগবানই ভরসা"। মাত্র একজন মহিলা চীৎকার করে উঠ্‌লেন দয়া কর প্রভু ! অন্য সকলের মুখে কিন্তু কোন আওয়াজ বের হলো না। ভয়ে সকলে একত্রে জড়-সড়, অনেকটা সময় এইভাবে কাটলো নিঃশব্দে—এ যেন সমাধির মধ্যে নীরবতা !

ফ্যাকাশে মুখে সকলে চেয়ে আছে। সমুদ্রে তাণ্ডব মাতন চল্‌ছে তখনও। এধার ওধার দুল্‌ছে-ঘুরছে আস্তে-আস্তে—বোঝাই জাহাজ। এর মধ্যে এক সময় কাপ্তেন চেয়েছিলেন—নৌকা ভাসাবেন—লোক বাঁচাতে। পাঁচ জন নাবিক নিয়ে নৌকা ভাসাল—কিন্তু ঢেউ উল্টে দিলে—দু জন খালাসী ডুবে গেল—তার মধ্যে এক ইটালিয়ন নাবিক। অন্যরা কোন রকম দড়ি ধরে—বেঁচে—আবার জাহাজে উঠে পড়লো।

এখন নাবিকরাও সাহস হারিয়ে ফেলেছে। দু'ঘণ্টা বাদে দেখা গেল—জাহাজে ঢোকবার মুখ পর্যন্ত জল উঠে এসেছে।

তখন ডেকের উপর এক মর্মান্তিক দৃশ্য। মা হতাশ হয়ে বুকের মধ্যে সন্তানকে আঁকড়ে। বন্ধুরা আলিঙ্গন করে শেষ বিদায় চাচ্ছে। কতকলোক আবার নিজের কেবিনে নেমে গেল—সেইখানেই—সমুদ্রকে চোখের আড়ালে রেখে মরবে এক কোনে। একজন যাত্রী কেবিনে যাবার পথে—সিঁড়ির ধারে—পিস্তলের ঘায়ে নিজের খুলি উড়িয়ে দিয়ে মরলো। অনেকে পাগলের মত জড়াজড়ি কর্‌ছে—মেয়েদের আর্তনাদ মর্মন্তুদ হয়ে উঠ্‌ছে। কয়েকজন পাদরীকে ঘিরে নতজানু। চারিদিকে দীর্ঘ নিঃশ্বাস, চাপা কান্নার কোরাস। ছেলে মানুষের মত অদ্ভুত সুরের ক্রন্দন।

কোথাও বা দেখা গেল মানুষ নিথর হয়ে মর্মর প্রতিমার মত দাঁড়িয়ে—মৃত বা পাগলের মত বিস্ফারিত চোখে—দৃষ্টিতে আলোক নেই।

মারিও ও জুলিয়েটা জাহাজের এক মাস্তুল জড়িয়ে সমুদ্রের দিকে চেয়ে রয়েছে—পলক পড়ছে না চোখে—যেন সংজ্ঞাহীন।

কাপ্তেন চেঁচিয়ে এবার বললেন—"ডিঙ্গিটা ভাসাও"—এই শেষ ডিঙ্গি—জলে ভাসান হল—তার মধ্যে নেমে পড়লো ১৪ জন নাবিক আর তিন জন যাত্রী। কাপ্তেন জাহাজেই রইলেন।

নীচে থেকে চীৎকার হচ্ছে—"আমাদের কাছে নেমে আসুন"।

আমার এই কাজের জায়গা—এইখানেই মরবো—কাপ্তেন উত্তর করলেন।

নাবিকরা চীৎকার কর্ছে—"কোন জাহাজ হয়ত পেয়ে যাব—বেঁচে যাব—নেমে আসুন—এ জাহাজ তো রক্ষা হলো না"।

"আমি এইখানেই থাকি!" তবে আরও একটা মাত্র জায়গা আছে—অন্য যাত্রীদের সরিয়ে বল্‌লে—কোন মহিলা আসুন।

কাপ্তেনের হাত ধরে এক মহিলা এলেন। নৌকা তখন কিছু দূরে সরে গেছে। লাফিয়ে পার হতে পারবো না—ভেবেই ডেকে বসে পড়লেন মহিলা। অন্যরা মৃত প্রায় সজ্ঞাহীন ও নিশ্চল।

নাবিকরা চীৎকার করে বল্‌লে—অল্প বয়স্ক কেউ এসো একজন।

এই চীৎকার শুনে সিসিলিয়ান বালক ও তার সঙ্গিনী হঠাৎ যেন জেগে উঠলো—এতক্ষণ জড়তার ঘোরে আচ্ছন্ন ছিল—এবার বাঁচবার সহজ প্রবৃত্তির উন্মাদণী তাগিদ। একসঙ্গে দু'জনে চীৎকার কর্‌লে—"আমাকে নাও"—আর দুটো বন্য পশুর মত চারিদিকে ঘুর্‌তে লাগলো।

নাবিকরা বললে "যে সবের ছোট এসো—নৌকা বোঝায় ভরপুর—সবার থেকে যে ছোট চলে এসো।"

এই শুনে বজ্রাহতের মত মেয়েটি হাত নামিয়ে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। মরণাহত দৃষ্টিতে মারিও'র দিকে চেয়ে রইল। মারিও তার দিকে চাইলে—এক মুহূর্ত—দেখলে তার বুকের উপর পোষাকে রক্তর ছাপ—সব কথা মনে এসে গেল—স্বর্গীয় এক আলোকে উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌লো তার মুখ—।

'সবের ছোট এসো'—একসঙ্গে চীৎকার—নাবিকরা ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। 'আমরা যাচ্ছি এবার।'

মারিও তখন চীৎকার করে বল্‌লে—এ কণ্ঠস্বর যেন তারই নয়। "ওই বেশী হাল্‌কা—জুলিয়েটা তুমি যাও—তোমার মা—বাবা রয়েছেন—আমি তো একা, তুমি আমার জায়গায় বসে যাও—নেমে পড়ো—

নাবিকরা বল্‌লে "জলে ফেলে দাও"—

কোমর জড়িয়ে তুলে ধরে জুলিয়েটাকে জলে ফেলে দিলে—মারিও!

মেয়েটি চেঁচিয়ে উঠ্‌লে—একবার ডুবলে—নাবিকরা তার হাত ধরে টেনে নৌকায় তুলে নিলে।

ছেলেটি জাহাজের ধারে দাঁড়িয়ে রইল—মাথা উঁচু করে—হাওয়ায় চুল উড়্‌ছে—শান্তি সমাহিত নিশ্চল! নৌকা তাড়াতাড়ি চললো—যাতে জাহাজ ডুবলে—ঘূর্ণি থেকে—দূরে সরে নিজেদের বাঁচাতে পারে।

কাছে থাকলে উল্টে যাবার সম্ভাবনা!

এতক্ষণ মেয়েটি ছিল যেন সংজ্ঞাহীন—এইবার চোখ তুলে ছেলেটির দিকে চাইলে—চীৎকার করে উঠ্‌ল—মারিও—

বিদায়—দীর্ঘশ্বাস পড়্‌ছে, দুই হাত বাড়িয়েছে ছেলেটির দিকে চীৎকার করছে—বিদায়! বিদায়! বিদায়!

'বিদায়' ছেলেটির উত্তর হ'ল—তার হাত দুটি ঊর্দ্ধে আকাশের দিকে প্রসারিত!

সংক্ষুব্ধ সমুদ্রের উপর দিয়ে নৌকা দ্রুতবেগে সরে যাচ্ছে—সমুদ্রে উত্তাল তরঙ্গ—আকাশ অন্ধকার!

জাহাজের উপরে নীরবতা। কোন চীৎকার নেই। জল ডেকের উপর উঠে এসেছে। হঠাৎ ছেলেটি নতজানু হয়ে হাত জোড় করে আকাশের দিকে ঊর্দ্ধ নেত্রে চেয়ে রইল।

মেয়েটি হাত দিয়ে চোখ ঢেকে মুখ নীচু করে রয়েছে। যখন মাথা তুলে সমুদ্রের দিকে আর একবার তাকালে—তখন আর সে জাহাজ নেই!!

[একটি বিদেশী গল্পের অনুবাদ]

বিজ্ঞান পত্রিকা সম্পর্কে একটি চিঠি

[১৯৭৪ সালের ১৪ই মার্চ বাংলাদেশের 'বিজ্ঞান সাময়িকী' পত্রিকার সম্পাদক আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর লেখা একটি চিঠি পেয়েছিলেন। চিঠিটিতে কোন তারিখ ছিল না ; তবে খামের উপর ডাক ঘরের সীল থেকে বোঝা যায় খামটি ডাকে দেওয়া হয়েছিল ১৯৭৪ সালের ২২শে জানুয়ারি। ঠিক তার বারদিন পর ৪ঠা ফেব্রুয়ারী তাঁর মহাপ্রয়াণ ঘটে। একটি জনপ্রিয় বিজ্ঞান পত্রিকায় কি ধারনের লেখা থাকা উচিত সে সম্পর্কে আচার্যের অভিমত এই চিঠিটি থেকে পাওয়া যাবে। বিজ্ঞান সাময়িকী'-র 'সত্যেন বসু সংখ্যা' (এপ্রিল, ১৯৭৪)-য় প্রকাশিত চিঠিটি এখানে পুনর্মুদ্রিত করা হল।]

বাইশ, ঈশ্বর মিল লেন
কলিকাতা-ছয়

বিজ্ঞান সাময়িকীর সম্পাদক মহাশয়,

নিয়মিতভাবে আপনার কাগজ পাচ্ছি ও পড়ে প্রচুর আনন্দ পাচ্ছি। প্রায় তিরিশ বছর পর বাংলাদেশের এই সংস্কৃতি চর্চা ও আলোচনা আমাকে মুগ্ধ করেছে। মনে পড়ছে আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হলো (তখন) আমরা কয়জন নবীন মিলে 'বারোজনা' বলে একটি সভায় মিলিত হতাম। তার মধ্যে পেয়েছিলাম সবে বিলাত প্রত্যাগত হাকিম শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়কে ও পরলোকগত পূর্ণেন্দু মজুমদারকে যিনি তখন ঢাকা কলেজের উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক। কাজী মোতাহার হোসেন তখন ছিলেন সকলের থেকে বয়সে ছোট সভ্য। সেই আড্ডায় নানা বিষয়ের আলোচনা হতো। শেষ অবধি 'বিজ্ঞান পরিচয়' নামে বাংলায় একটি মাসিক পত্র বার করা হয়। দেশ ভাগ হলো, আমি চলে এলাম, তারপরেও কিছুদিন সে কাগজ চলেছিল বলে শুনছি। বিজ্ঞানের বিষয়ে ঝরঝরে সুন্দর রচনা বার হচ্ছে আপনার সাময়িকীতে। তবে একটি কথা বলে আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করতে ইচ্ছে করছে। বিদেশে যেসব অদ্ভুত আবিষ্কার হয়েছে সেই কথাই শুধু প্রচার করা এদেশের বিজ্ঞানীর মুখ্য ধর্ম নয় বলে

আমার ধারণা। নিজের দেশের সঙ্গে নিবিড় পরিচয়, আর গাছপালা-জীবজন্তুর কথা, তার নদ-নদী. কৃষি-বাণিজ্য এবং শেষাবধি বর্তমানে দেশের মধ্যে যেসব নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে তার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দিলে দেশে বিজ্ঞানের হাওয়া চলবে ও মনোভাব তাড়াতাড়ি বদলাবে বলে আমার ধারণা। প্রাচ্যদেশে সনাতনী মনোভাব, গোঁড়ামী ও জাতিবিদ্বেষ হলো সর্বনাশের মূল।

বাংলাদেশ প্রাকৃতিক সম্পদে মনোহরা। চট্টগ্রামের পার্বত্য প্রদেশ, পদ্মা-মেঘনা ঘেরা বিস্তৃত সমতল ও তার পরিশ্রমী অধিবাসীরা, সব মিলে আকর্ষণীয় করে রেখেছে চিরদিনই বাংলাদেশকে। নতুন প্রগতির যুগে কি শিল্প গড়ে উঠলো, আরো দেশের প্রয়োজনীয় কত কি গড়তে বাকী রয়েছে সে সবের হিসাব আপনার সাময়িকীতে প্রকাশ হোক। বাংলা ভাষাভাষী আমরা দু'দেশে শুনেছি—ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে আপনারা অনেক উন্নতি করেছেন, সংগ্রহ করেছেন অনেক প্রাচীন গাথা ও কাহিনী, বলার ভঙ্গী ধরে রেখেছেন নানা সংগ্রহে। সেসব অমূল্য সম্পদে এদেশে লোককে অংশীদার হিসেবে ভাবলে হয়ত আপনদের আপত্তি হবে না।

'৭৩ সাল মোটামুটি দুর্বৎসর বলে সাধারণে ভাবছে। চারিদিকে সংঘাত, দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ, লোকক্ষয় ইত্যাদি। আমাদের মতো, বাংলাদেশের লোকেরাও নানা দুঃখ-কষ্টের মধ্যে জীবন কাটাচ্ছে। তবে আপনাদের মতো আশাবাদীদের দেখে মনে বিশ্বাস দৃঢ় হয়েছে যে, বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ যোগ্য হাতে অর্পিত হয়েছে। ভাষা ও দেশ, সংস্কৃতি ও সম্পদ আপনারা ধাপে ধাপে উচ্চে তুলতে থাকুন। যেসব নবীনেরা বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর চারদিকে জড়ো হয়েছে তারাই বাংলা মাকে সুজলা, সুফলা, শশ্যামলা, প্রসন্নময়ী সোনার বাংলা করে রাখবে। সবহুমান অভিবাদন জানিয়ে শেষ করি।

ইতি

সত্যেন বোস

শেষ চিঠি

[১৯৭৪ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী আচার্য সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়। তার বার দিন আগে, ২২শে জানুয়ারী তিনি তৎকালীন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী নুরুল হাসানকে একটি চিঠি লিখেন। চিঠিটি শেষ করতে পারেন নি। স্বাক্ষরবিহীন এই চিঠিটি যাদবপুরের ভারতীয় বিজ্ঞান অনুশীলন সমিতির প্রবীন অধ্যাপক শ্যামাদাস চট্টোপাধ্যায় (যিনি সত্যেন্দ্রনাথের পরামর্শে হিলিয়াম সংগ্রহ প্রকল্পে কাজ করছিলেন) কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর কাছে পাঠিয়ে দেন। অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় চিঠির সঙ্গে তাঁর বক্তব্যে যাদবপুরে হিলিয়ান গ্যাস নিয়ে যে গবেষণা করা হচ্ছে, সে সম্পর্কে আচার্য্য বসুর শেষ সুপারিশের কথা উল্লেখ করেন। চিঠিটির বাংলা রূপ ১২ই ফেব্রুয়ারী (১৯৭৪ -র আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়]

প্রিয় অধ্যাপক নুরুল হাসান,

জানুয়ারীর ৯ তারিখে নয়া দিল্লি থেকে (নং ৩৬৪/ই এম'৭৪) আপনি আমাকে যে চিঠি দিয়েছেন, তার জন্য ধন্যবাদ। প্রথম যৌবনে মানুষের মনে যে অতি উজ্জ্বল আশার স্বপ্ন জেগে ওঠে, জীবন সায়াহ্নে যেন তাকেই ব্যঙ্গ করা হয়। জীবনের শেষ দিকে বন্ধু-বান্ধব ও ছাত্রদের কাছ থেকে প্রীতি ও সম্মান পেতে বেশ ভাল লাগে। জীবনের শেষ বেলায় মানুষ নানা দুশ্চিন্তায় ক্লিষ্ট হয়। ওই সময় বেঁচে থাকার জন্য যে সংগ্রাম করতে হয়, তা অনেক সময় বুদ্ধিজীবী মানুষের উদ্দীপনা নষ্ট করে দেয়। কেউ যদি পড়াশুনা ও গবেষণা নিয়ে জীবন কাটাতে চায় তার জন্য প্রথম প্রয়োজন অভাব থেকে মুক্তি, কাল কী হবে, এই চিন্তা থেকে রেহাই। সুতরাং জাতীয় অধ্যাপকের পদের মেয়াদ আরও পাঁচ বছর বৃদ্ধি আশীর্বাদ ছাড়া আর কিছু নয়।

আমি হিলিয়াম সংগ্রহ গবেষণা প্রকল্পাদি দীর্ঘ মেয়াদী অনুমোদনের পক্ষপাতী। এই প্রকল্প আধা-বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদন শুরু করতে চলেছে। ভাবা পরমাণু গবেষণা কেন্দ্র আমাদের উৎপন্ন পরিশোধিত হিলিয়ামের সবটাই চেয়েছেন। আমার প্রস্তাব ঐ. প্রকল্পের মেয়াদ আরও পাঁচ বছর বাড়িয়ে দেওয়া হোক। তা করা হলে আমরা আরও সুপরিকল্পিত ভাবে কাজ করতে পারবো।

তথ্যসূচী

বিজ্ঞান চিন্তা :

বিজ্ঞানের সংকট—	পরিচয়, শ্রাবণ, ১৩৩৮
আইনস্টাইন —	পরিচয়, শ্রাবণ, ১৩৪২
শক্তির সন্ধানে মানুষ—	জ্ঞান ও বিজ্ঞান, মার্চ, ১৯৪৮
পাউলি ও তাঁর পরিবর্জন নীতি—	জ্ঞান ও বিজ্ঞান, অক্টোবর ১৯৬৪
দেশবিদেশে বেতার চর্চা— (আদিপর্ব)	মাসিক বাংলা দেশ, ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৪
জৈববিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার—	জ্ঞান ও বিজ্ঞান, মার্চ, ১৯৬৬
জলসন্ধানী যাদুকর—	দীপপুঞ্জ

বিজ্ঞান প্রসঙ্গ :

প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞানে অগ্রগতি—	অজ্ঞাত
বৈজ্ঞানিকের সাফাই—	শ্রদ্ধাঞ্জলি (সত্যেন্দ্রনাথের সপ্ততিতম জন্মদিবসে প্রকাশিত), ১৯৬৪
ততঃ কিম্—	জ্ঞান ও বিজ্ঞান, আগস্ট, ১৯৬৯

শিক্ষাচিন্তা :

শিক্ষা ও বিজ্ঞান—	কালান্তর, ১১ই মে, ১৯৬৩ ; রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়ে সত্যেন্দ্রনাথের ইংরেজী সমাবর্তন ভাষণের সংক্ষিপ্ত বাংলা রূপান্তর। অনুবাদ—শ্রীচিন্মোহন সেহানবীশ
শিশু ও বিজ্ঞান—	কিশোর বাংলা (শারদীয়), ১৩৫৭
শিক্ষা ও নতুন যুগ—	রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা, বর্ষ ৯, সংখ্যা ৪
আমাদের উচ্চশিক্ষা—	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সত্যেন্দ্রনাথের ইংরাজী সমাবর্তন (১৯৬২) ভাষণের ভাবানুবাদ : অনুবাদক-শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত
মাতৃভাষা—	১৯৬২ সালের অক্টোবর মাসে হায়দরাবাদে অনুষ্ঠিত 'আংরেজী হঠাও' সম্মেলনে সত্যেন্দ্রনাথের বাংলা বক্তৃতা
বাংলা ভাষা চালুর ব্যাপারে—	অজ্ঞাত

বাংলার শিক্ষা সমস্যা ও আশুতোষ—	দেশ (সাহিত্য সংখ্যা), ১৩৭১
নঈ তালিম—	সাপ্তাহিক বসুমতী (শারদীয়), ১৩৭৫
পরিভাষা প্রসঙ্গে—	গবেষণা, খণ্ড ২, সংখ্যা ১, ১৯৭০

জীবন কথা ঃ

আইনস্টাইন-২—	জ্ঞান ও বিজ্ঞান, এপ্রিল, ১৯৫৫
ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার—	জ্ঞান ও বিজ্ঞান, মার্চ, ১৯৬২
শিশির কুমার মিত্র—	জ্ঞান ও বিজ্ঞান, নভেম্বর, ১৯৬৩
গণিত-বিজ্ঞানী জ্যাক হাদামার—	জ্ঞান ও বিজ্ঞান, মার্চ, ১৯৬৪
গ্যালিলিও	জ্ঞান ও বিজ্ঞান, এপ্রিল, ১৯৬৪
আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর	জ্ঞান ও বিজ্ঞান, আগস্ট, ১৯৬৪
জাপানী বিজ্ঞানী তোমোনাগা	জ্ঞান ও বিজ্ঞান, এপ্রিল, ১৯৬৬
আইনস্টাইন—৩	আদি মহাকালী পাঠশালা পত্রিকা, মার্চ ১৯৬৫
আণবিক যুগের পথিকৃৎ মাদাম কুরী	অমৃত ৭ম বর্ষ (১৩৭৪), ২৭ সংখ্যা
মাদাম কুরী—২	জ্ঞান ও বিজ্ঞান (শারদীয়), অক্টোবর-নভেম্বর, ১৯৬৭
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	অজ্ঞাত

স্মৃতিচারণ ঃ

আমার বিজ্ঞান চর্চার পুরাখণ্ড—	সাপ্তাহিক বসুমতী (শারদীয়), ১৩৭৪
পুরনো দিনের স্মৃতি—	জ্ঞান ও বিজ্ঞান, অক্টোবর, ১৯৬৬
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র স্মরণে	জ্ঞান ও বিজ্ঞান, আগস্ট, ১৯৬১
মাদাম কুরী সান্নিধ্যে	জ্ঞান ও বিজ্ঞান (শারদীয়), অক্টোবর নভেম্বর, ১৯৬৭
অটো হান স্মরণে	জ্ঞান ও বিজ্ঞান, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ১৯৬৮
কুমার হারীতকৃষ্ণ দেব	জ্ঞান ও বিজ্ঞান, আগস্ট, ১৯৬৬
প্রবোধচন্দ্র বাগচী—	বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৬৩, নিবন্ধটির অনুলেখক—শ্রী সুশীল রায়

স্মৃতিকথা—	জ্ঞান ও বিজ্ঞান, ডিসেম্বর, ১৯৭২, (ব্রাহ্মমন্দিরে অনুষ্ঠিত প্রয়াত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের স্মৃতিসভায় রচনাটি পঠিত হয়েছিল)

শ্রদ্ধাঞ্জলি ঃ

জগদীশচন্দ্র—	জ্ঞান ও বিজ্ঞান, নভেম্বর, ১৯৫৮
আশুতোষ—	অজ্ঞাত
বিবেকানন্দ—	"
নেতাজী	"
সৌম্যেন্দ্রনাথ—	"

ভাষণ ঃ

নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে—	১৯৫২ সালে কটকে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে বিজ্ঞান শাখার সভাপতির রূপে সত্যেন্দ্রনাথের ভাষণ
সপ্ততিতম জন্মদিবসে—	১লা জানুয়ারী, ১৯৬৪, সপ্ততিতম জন্মদিবসে, মহাজাতি সদনে অনুষ্ঠিত সম্বর্ধনা সভায় অভিনন্দনের পর সত্যেন্দ্রনাথের ভাষণ (জ্ঞান ও বিজ্ঞান, মে, ১৯৬৪-তে প্রকাশিত)
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে—	১৬ই জুন, ১৯৭৩ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েব সত্যেন্দ্রনাথের সমাবর্তন ভাষণ

নানা চিন্তা ঃ

কথা প্রসঙ্গে—	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে এক আলোচনাচক্রে সত্যেন্দ্রনাথের প্রতিভাষণ (পরিচয়, বর্ষ ৩৩, সংখ্যা ৭ মাঘ, ১৩৭০-এ প্রকাশিত)

বিষয়

বাঙলা দেশ ডাক দিয়েছে—	যুগান্তর (সাময়িকী), ১৮ই এপ্রিল, ১৯৭১

অনুবাদ ঃ

বিশ্বপ্রকৃতির সত্তাবোধের কল্পনায় ম্যাক্সওয়েলের প্রভাব—	'জ্ঞান ও বিজ্ঞান', সেপ্টেম্বর, ১৯৬১।
গণিতক্ষেত্রে উদ্ভাবনের মনস্তাত্ত্বিক বিচার—	জ্ঞান ও বিজ্ঞান, মার্চ, ১৯৬৪
আইনস্টাইন ও আপেক্ষিকবাদ সম্পর্কে পাউলি—	জ্ঞান ও বিজ্ঞান, অক্টোবর, ১৯৬৪
হয়েল-নারলিকারের মহাকর্ষের নতুন থিওরী—	জ্ঞান ও বিজ্ঞান, আগস্ট, ১৯৬৪
মাও-মালরো সংবাদ—	সাপ্তাহিক বসুমতী, ১১ই মাঘ, ১৩৭৪ পুনঃপ্রকাশিত—মাসিক বাংলাদেশ, ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৪
রোলাঁ ও রবীন্দ্রনাথের প্রথম সাক্ষাৎ—	দেশ, ২১ ফাল্গুন, ১৩৭২
মহাপাল-কথা	কম্পাস, ২৮ জানুয়ারী, ১৯৬৭
শেষের সাত দিন	শারদীয় কম্পাস, ১৩৭৪

গ্রন্থভূমিকা ও অন্যান্য ঃ

টেগোর এ স্টাডি	
মাদাম কুরী প্রসঙ্গে	
আইনস্টাইন প্রসঙ্গে	
এসরাজ প্রসঙ্গে	
জাহাজ ডুবি	আদি মহাকালী পাঠশালা পত্রিকা
বিজ্ঞান পত্রিকা সম্পর্কে একটি চিঠি	
শেষ চিঠি	

—০—